হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

# জন্মভূমি।

( সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী )।

## পঞ্চদশ ভাগ-পঞ্চদশ বর্ষ।

( ১৩১৩ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩১৪ সালের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত
দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ )।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে
সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।







CALCUTTA.
PRINTED BY N. DUTT.
*AT THE JANMABHUMI PRESS.*
*39, Manick Bose's Ghat Street.*

1907

ক মূল্য ১।০ দেড় টাকা। ] [ ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা।

সম্পূর্ণ।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

# জন্মভূমি।

( সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী )।

## পঞ্চদশ ভাগ-পঞ্চদশ বর্ষ।

( ১৩১৩ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩১৪ সালের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত
দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ )।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে
সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।







CALCUTTA.
PRINTED BY N. DUTT.
*AT THE JANMABHUMI PRESS.*
*39, Manick Bose's Ghat Street.*

1907

[ …ক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ] [ ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা।

সম্পূর্ণ।




"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

( মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। )

১৫শ বর্ষ। } শ্রাবণ, ১৩১৩ সাল। { ১ম সংখ্যা।

## বর্ষবৃদ্ধি।

গত আষাঢ় মাসে জন্মভূমির চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই শ্রাবণ মাসে পঞ্চদশ বর্ষ আরম্ভ। গত বৎসরের প্রারম্ভে সংশয়ে সংশয়ে আমরা বলিয়া রাখিয়াছিলাম, চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসান্তে শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন, চতুর্দ্দশবর্ষান্তে জন্মভূমির ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা বিধাতারই পরিজ্ঞাত। অদ্য আমরা জগৎ-পিতাকে ধন্যবাদ দিয়া, মা সরস্বতীর চরণে প্রণিপাত করিয়া, জননী জন্মভূমির মঙ্গল গীত গাহিয়া, সানন্দ শ্লাঘাসহকারে বলিতেছি নির্ব্বিঘ্নে জন্মভূমির চতুর্দ্দশবর্ষ অতীত হইয়াছে। গ্রাহক ও অনুগ্রাহক মহোদয়বর্গের কৃপায় যথাসম্ভব সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি।

[illegible] সম্বন্ধে এই কথা। তাহা ছাড়া জন্মভূমি সম্বন্ধে শুভ লক্ষণ [illegible]। এখন আমাদের স্বদেশমধ্যে স্বদেশী-অনুরাগের জলন্ত উৎসাহ! চতুর্দশবর্ষ ধরিয়া যে আশা আমরা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, লেখনীমুখে ব্যক্ত করিয়া, স্বদেশবাসিগণের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়া আসিয়াছি, গত বৎসর হইতে সেই আশা ফলবতী হইবার পূর্ব্বলক্ষণ সূচিত হইতেছে। পর মুখাপেক্ষী হইয়া, বিদেশী দ্রব্যজাতের ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বজাতীয় ধর্ম্ম, স্বজাতীয় আচার, স্বজাতীয় বসন ভূষণ, স্বজাতীয় শিল্প, স্বজাতীয় বাণিজ্য এবং স্বজাতীয় সাহিত্য ও সমাজের উন্নতি কল্পে স্বদেশবাসীগণের অসীম উৎসাহ দৃষ্ট হইতেছে। ভারতের দশদিকে মাতৃপুজার যথেষ্ট আয়োজন চলিতেছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, জন্মভূমির পঞ্চদশবর্ষে কিরূপ ফল প্রসব করিবে, তাহা সেই অনন্ত ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা এবং আমাদের অনুগ্রাহক বন্ধুবান্ধবগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে।

# আত্মহত্যা ও আত্মবলিদান।

### লেখক—রাজা শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

পূজ্য পণ্ডিত মহাশয়গণের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি, আত্মহত্যাকারীর পাপের মুক্তি নাই এবং তাহার মৃত শরীরের সহিত আত্মীয় স্বজনের কোন সম্বন্ধ থাকে না, তাহার শরীরের সৎকার নাই, তাহার জন্য অশৌচ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা নাই। শুনিয়াছি, কতকগুলি কর্ম্মের ফলভোগ হেতু ও তৎসঙ্গে নূতন কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত আত্মা দেহ ধারণ করিয়া থাকে। আত্মহত্যা বা অপঘাত মৃত্যু ঘটিলে তৎশরীরে উপযুক্ত কর্ম্মফল ভোগ শেষ হয় না ও অশরীরী আত্মাকে তন্নিবন্ধন প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ ক্লেশ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং এই অসৎ কর্ম্ম হইতে অপর নানারূপ অসৎ কর্ম্মে আত্ম-হত্যাকারীর আসক্তি জন্মে। অসৎ কর্ম্মের আকর্ষণে যেমন অপর অসৎ কর্ম্মে আসক্তি হয়, সেইমত সৎকর্ম্মের আকর্ষণে অপর সৎকর্ম্মে আসক্তি জন্মে। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, উশীনরপুত্র রাজা শিবির ধর্ম্মবল পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে দেবরাজ ইন্দ্র ও ধর্ম্মরাজ যম, শ্যেন ও কপোত পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন। কপোত, শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া রাজা শিবির অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্যেন, ক্ষুধাতুর হইয়া রাজাকে এই কথা বলেন যে,—

বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতা কপোতকে তাহার আহার্য্য করিয়াছেন, অতএব কপোতকে প্রত্যর্পণ করা উচিত। রাজা শ্যেনের বাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া বলিলেন, তাঁহার পক্ষে শরণাগতকে ত্যাগ কর ধর্ম্মসঙ্গত নহে। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, রাজা শিবির নিজদেহ হইতে কপোতের পরিমাণ মাংস কর্ত্তন করিয়া ক্ষুধার্ত্ত শ্যেনপক্ষীকে ভক্ষণ করিতে দিবেন। প্রাচীন কালে আদর্শ হিন্দুর পক্ষে শরণাগতের নিমিত্ত আত্মনাশসাধন প্রশংসিত আছে। অনুমান হয়, হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশও এইরূপ। অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুর নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পার্থ এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আগামী সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বধ করিব এবং যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তাহা হইলে স্বয়ং অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিব। প্রতিজ্ঞাপালনে অপারগ হইলে আর্য্যদিগের মধ্যে আত্মনাশ সাধন প্রচলন ছিল। একদা জ্যেষ্ঠ সহোদর পুণ্যশ্লোক রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধনঞ্জয় তিরস্কার দ্বারা অপমানিত করেন। মনোমধ্যে আত্মগ্লানির উদ্রেক হইলে গুরুজন অবমাননা হেতু ফাল্গুনি আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। গুরুজনে ভক্তি, আর্য্যগণ মধ্যে এত প্রবল ছিল যে, তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা আত্মনাশ রূপ মহাপাপে প্রবৃত্ত হইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। হিতোপদেশে বর্ণিত আছে যে, বিধবা জননীর একমাত্র সন্তান নাগ, শঙ্খচূড়কে গরুড়ের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বোধিসত্ব জীমূতবাহন দয়ার্দ্র হইয়া শঙ্খচূড়ের পরিবর্ত্তে নিজ দেহ সমর্পণ করেন। প্রভু শূদ্রকের রক্ষাকল্পে বীরবর আত্মনাশ করিয়াছিলেন। রাজপুতনার অন্তর্গত মিবারের মহারাণার পুত্র শিশু উদয়সিংহের জীবন অধিকতর প্রয়োজনীয়, এই জ্ঞানে ধাত্রী পান্না রাজকুমারের পরিবর্ত্তে নিজপুত্রকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে উদয়াচার্য্য নিজ জীবন তুষানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন। রাজপুত ললনাগণ মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কায় ও ঘৃণায় জহর ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। আর্য্য মহিলাগণ স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতেন। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় ছিল। বৃত্রাসুর দেবরাজ্য অধিকার করিয়া দেবগণকে অমরাবতী হইতে নির্ব্বাসিত করিলে দেবরাজ্য পুনঃসংস্থাপন ও জগতের মঙ্গলকামনায় মহামুনি দধীচি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনায় বৃত্রবধ উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে বজ্র নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত নিজ জীবন বিসর্জ্জন করতঃ স্বীয় অস্থি দান করিয়া ত্রিলোক পরিতৃপ্ত করেন। আমি পূজনীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ কাব্যতীর্থের নিকট হইতে হিন্দুশাস্ত্রে আত্মহত্যার যে বিধি আছে, তাহা গ্রহণ

করিয়া এস্থলে নিবদ্ধ করিলাম।

সমাসক্তো ভবেৎ যস্তু পাতকৈ মহদাদিভিঃ
দুশ্চিকিৎস্যৈর্মহারোগৈঃ পীড়িতো বা
ভবেত্তু সঃ
স্বয়ং দেহবিনাশস্য কালে প্রাপ্তে মহামতিঃ
আব্রাহ্মণঃ বা স্বর্গাদিমহাফলজিগীষয়া।
প্রবিশেজ্জ্বলনং দীপ্তং কুর্য্যাদনশনন্তথা।
এতেষামধিরোহস্তি নান্যেষাস্ত কদাচন,
নারাণামথ নারীণাং সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥

যে ব্যক্তি মহাপাপ প্রভৃতি দ্বারা সমাক্রান্ত হয়, অথবা চিকিৎসায় অসাধ্য মহারোগ দ্বারা পীড়িত হয়, কিংবা যাঁহার দেহ ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মলোক বা স্বর্গলোক জয়েচ্ছু হইয়া জলন্ত অনলে প্রবেশ ও অনশনব্রত অবলম্বন করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণেরই এই কার্য্যে অধিকার আছে, অন্য কাহারও নাই। সকল বর্ণের নরনারীসম্বন্ধেই এই নিয়ম।

অন্যান্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পর্ব্বতাদি হইতে ও জলে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিবার ব্যবস্থা আছে।

জগতে দেহত্যাগের আর এক প্রকার সুবিমল পবিত্র দৃষ্টান্ত আছে। ইহা জীবনের কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিয়া স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ বা ইচ্ছামৃত্যু। ভগবানের অবতার অথবা সিদ্ধপুরুষের পক্ষে ইহা সম্ভবপর, অপর সাধারণের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে। ইহাঁদিগের উপর মৃত্যুর প্রভাব নাই। ইহাঁরা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগপূর্ব্বক তিরোহিত হন। নিজকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে ভ্রাতা লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। লক্ষ্মীর অংশোদ্ভবা সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশ ও ভগবান্ কালপুরুষের উপদেশে শ্রীরামচন্দ্রের সরযূ নদীতে আত্মবিসর্জ্জন এই শ্রেণীর তিরোভাব। ইচ্ছা-মৃত্যু ভীষ্ম দেবের শর শয্যায় শয়ন ও ধর্ম্ম উপদেশ সমাপ্ত করিয়া দেহত্যাগ ইহার একটী জলন্ত উদাহরণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব যোগ মুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শুকদেব গোস্বামী মুক্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হন। খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশুখৃষ্ট এই ভাবে দেহত্যাগ করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবেরও তিরোধান এইরূপ। পুণ্যশ্লোক রাজা যুধিষ্ঠিরেরও মহাপ্রস্থান এস্থলে উল্লেখযোগ্য

এইগুলির আদর্শ অতি গূঢ়তত্ত্বে নিহিত ও জনসমাজে মৃত্যুভীতিনিবারক হইয়াছে। অবশ্য ইচ্ছামৃত্যু সকলের ভাগ্যে ঘটে না ও উহা অননুকরণীয় এইরূপ মৃত্যু এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ও নহে। মনুষ্যের সুখসমৃদ্ধি পুণ্য উপার্জ্জন ও চরিত্রগঠন জন্য সমাজ দ্বারা নানাবিধ অনুষ্ঠানসমষ্টির ব্যবস্থা হইয়াছে। এক প্রাণনাশপ্রযুক্ত এই সকলকে পরিত্যাগ করিতে হয়।

সমাজ কি অবস্থায় মানুষের নিকট এই কঠোর ত্যাগ স্বীকার আশা করে, তাহা জানা আবশ্যক। সভ্যতার উন্নতির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিরাজমান। এই প্রবন্ধে আমি ইহারও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অধুনা মানুষ মধ্যে সুখস্পৃহা প্রবল, ইন্দ্রিয়লালসা বেগবতী, সমৃদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা দুর্জ্জয়, এই জন্য অনেক সময়েই লোককে হতাশ হইতে হয় এবং তন্নিবন্ধন আত্মহত্যা এক্ষণে এত প্রবল। মড্সলে ( Physiology of Mind ) বলেন, অত্যধিক মানসিক চর্চ্চা কর্ত্তৃক স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু চিত্তবিকার হইয়া বর্ত্তমান কালে আত্মহত্যা হইতেছে। আর একটী কারণে এক্ষণে আত্মহত্যা সংসাধিত হয়। কুকার্য্য কর্ত্তৃক লজ্জা ও ঘৃণায় চিত্ত আচ্ছন্ন হয় এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য-প্রযুক্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া লোকে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। মনুষ্য যদিও সাধারণতঃ উত্তেজিত হইয়া হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যসমাজের গতি এত ধীরে ও অতীতের নিরবচ্ছিন্ন সংমিশ্রণে চালিত হয় যে, পণ্ডিতেরা বলেন, মনুষ্যচরিত্রে জ্ঞান লাভ হইলে ঋতুবিশেষে বা জাতিবিশেষে, বা স্ত্রীলোক বা পুরুষ মধ্যে এমন কি বিভিন্ন বয়সমধ্যে কত আত্মহত্যা সাধিত হয়, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বলা যাইতে পারে। এইরূপ তালিকাও প্রস্তুত হইয়াছে। আবার, জাতিবিশেষের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে, ধনী ও নির্ধনের মধ্যে আত্মহত্যাসম্বন্ধে যে তারতম্য হয়, তাহাও জানা যাইতে পারে।

অপর এক ঘটনা দ্বারা আত্মহত্যার কারণ নিরাকরণ হইতেছে। অধুনা চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষ প্রচলনে মনুষ্যের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য কি নিমিত্ত সংঘটিত হয়, তাহা উপলব্ধি করা যাইতেছে এবং তাহার সহিত ইহা নিবারণের ব্যবস্থা হইবার সূচনা হইতেছে।

এক্ষণে কোমলপ্রকৃতি অপরিণতবয়স্কা মহিলাদিগের মধ্যে আত্মহত্যার প্রকোপ দেখা যায়। স্বামী বা আত্মীয় পরিজনকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত বা অপমানিত জ্ঞান করিয়া ইঁহারা মানসিক ক্লেশে অভিভূতা হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হন ও

এই দুষ্কার্য্যসাধন করিয়া থাকেন। কখন কখন নিজ জীবন বা অবস্থাকে অসহায় অনুভব করিয়া ও দুঃখনিবারণের জন্য কোন সুগম উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম না হইয়া অবশেষে হতাশ হৃদয়ে আত্মহত্যাকে দুঃখবিমোচনকারী সুহৃদ্ জ্ঞানে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষদিগের পরস্পর আচরণ ও ব্যবহারের সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়।

শোভাবাজারের সাহিত্য সভার ৭ম বার্ষিক দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর উক্ত শিরোনামাঙ্কিত একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ানমিরার সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সেই বক্তৃতার উপর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মন্তব্যটি সমাদরে নিম্নভাগে পরিগৃহীত হইল :—

# মন্তব্য।

## লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

অদ্যকার সভায় মাননীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর আত্মহত্যা ও আত্মবলিদান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধটি যে, সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায় বিষয়টি সময়োপযোগী। আত্মহত্যা ও আত্মবলিদান দুইটি বিসদৃশ বিষয়। একটি ঘৃণিত, অপরটি সমাদৃত। একটি সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর, অপরটি মঙ্গলকর। কিন্তু, পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশে আত্মহত্যা যেমন প্রবল দেখা যায়, আত্মবলিদান সেরূপ দেখা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে দেশের মঙ্গলোদ্দেশে যদি আমরা আত্মবলিদানে যত্নবান্ হই, নীচ স্বার্থপরতা জলাঞ্জলি দিয়া পরোপকারে, সমাজের হিত সাধনে যত্নবান হই, তাহা হইলে দেশের শ্রী সম্পদ পুনরভ্যুদিত হয় এবং সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট অন্তর্হিত হয়। আমি আশা করি, বক্তা যাহা বলিলেন, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া আপনারা সকলে উপকৃত হইবেন এবং আত্মবলিদানের ভাব সকলের মনে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে।

রাজা যে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলে যে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, ইহা বলা বাহুল্য। তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় সকলের মনে দৃঢ় মুদ্রিত করিবার জন্য অনেক ঐতিহাসিক কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার গবেষণা শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি গ্রীক ও রোমান ইতিহাস হইতে যে সকল

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে প্রবন্ধটি সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। এইরূপ বিষয়ের আলোচনার দ্বারা যে আমাদের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বক্তার ন্যায় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি এই-রূপ হিতকর বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত হন, তাহা হইলে দেশের যে কত উপ-কার হয়, তাহা বলা যায় না। দেশে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি লোকের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে আত্মহত্যা যে বৃদ্ধি পায় ইহা বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ আমেরিকা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পার্থিব সুখ-বিলাস-লালসা বৃদ্ধি পায়, এবং সেই লালসা পূর্ণ না হইলে ধর্ম্মহীন মানুষের জীবন ধারণ অকারণ বলিয়া মনে হয়। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, কিছু দিন পূর্ব্বে ইউরোপ ও আমেরিকায় Is eife worth living অর্থাৎ বেঁচে থাকায় প্রয়োজন আছে কি না, এই বিষয়ে খুব আন্দোলন চলিয়াছিল। আপনারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, ঐ সকল দেশে Swicide Club আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্যে সভা পর্য্যন্ত আছে। সুখের ইচ্ছার অপরি-তৃপ্তিই যে, ইহার কারণ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমাদের দেশেও ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই জন্য এদেশেও এখন আত্মহত্যার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায়ই দেখা যায় কোন না কোন একটা পার্থিব সুখের ইচ্ছায় বিফলমনোরথ হইলেই স্ত্রী কি পুরুষ আত্ম-হত্যা করিয়া বসে। যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে আত্মহত্যা করে, যুবতীরা সামান্য সাংসারিক বিষয় লইয়া অহিফেন সেবনে আত্ম-হত্যা করে, এরূপ সংবাদ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। আবার, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করিবার অনেক সহজ উপায় হইয়াছে। অহিফেন Prussic acid ইত্যাদি জীবননাশী সামগ্রী এখন সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ যদি জানিত, সে যে কষ্ট হইতে অবহতি পাইবার জন্য আত্মহত্যা করে, সে কষ্ট দূর না হইয়া আত্মহত্যায় তাহা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে কখনই সে এই ঘৃণিত পাপকর কার্য্যে আপনাকে কলুষিত করিত না। অনেকেই অবগত আছেন, যে সকল গৃহে আত্মহত্যা হয়, অথবা অন্য কোন অস্বাভাবিক উপায়ে লোকের প্রাণ নষ্ট হয়, তথায় ভূতপ্রেতাদির উপদ্রব হইয়া থাকে। অনেকে এ সকল কথায় উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু প্রেততত্ত্ব বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—অস্বাভাবিক মৃত্যু হইতেই প্রেতযোনির আবির্ভাব হয়। মৃত্যুর পর তাহাদিগের আত্মা এই পৃথিবীতে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতে করিতেই অতিবাহিত

হয়। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রে আত্মহত্যাকারীর অশৌচগ্রহণ নিষিদ্ধ। মনু স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা জীবনত্যাগী ব্যক্তির উদকদানাদি ক্রিয়া করিবে না। ইহার কারণ এই যে, আত্মহত্যাকারীর আত্মা এই পৃথিবীতে বদ্ধ থাকে; শ্রাদ্ধাদি দ্বারাও সে উর্দ্ধ লোকে গমন করিতে পারে না। আমরা পরমেশ্বরের নিকট হইতে যে জীবন লাভ করিয়াছি, তাহাকে বিনষ্ট করিবার আমাদিগের অধিকার নাই। এই জন্যই ইংরেজের দণ্ডবিধিতে আত্মহত্যাকারীর দণ্ডের বিধান আছে। যে আত্মহত্যার চেষ্টা করে, সে কেবল ইহলোকে কষ্ট পায়, তাহা নহে; পরকালেও অশেষ দণ্ড ভোগ করে। এক দিকে আত্মহত্যা যেমন পাপজনক, সেই রূপ আত্মবলিদান মহাপুণ্যজনক। আত্মবলিদান আত্মার নাশ নহে, উহা কেবল আমিত্বের বিনাশমাত্র। দেশের মঙ্গলকামনায় বা অপরের উপকার-সাধনের জন্য যিনি আপনার স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া প্রাণপণে কার্য্য করেন, যিনি এই রূপে আত্মবলিদান করেন, তিনি ইহ পর লোকে অনন্ত সুখ ভোগ করেন। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে এইরূপ আত্মবলিদানের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। পাশ্চাত্য দেশেও এখনও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কুষ্ঠরোগীদিগের শুশ্রূষার জন্য ফাদার ডামিয়েনের আত্মত্যাগের কথা কে না অবগত আছেন? কিন্তু গভীর ধর্ম্মভাব না থাকিলে কেহ আত্মবলিদানে সমর্থ হয় না। পুরাণে দধীচি মুনির আত্মবলিদানের কথা আপনারা সকলেই জানেন। কিরূপ উচ্চ ধর্ম্মভাবে উদ্দীপিত হইয়া দধীচি মুনি দেবগণের হিতের জন্য আত্ম-বলিদান দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এইরূপ আত্ম-বলিদানের ভাব, আমাদের দেশের লোকের মনে যদি প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইলে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আমাদিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, মৃত্যু বলিয়া কোন জিনিস পৃথিবীতে নাই। যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি, তাহা কেবল অবস্থান্তর মাত্র। যেমন জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া লোকে নব বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা এই জড় দেহরূপ বসন পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করে, ইহাকেই লোকে মৃত্যু বলে। এই মৃত্যুতে অনন্তসুখ-অনন্ত আনন্দ। আর, যাহারা বলপূর্ব্বক এই দেহকে নষ্ট করে, তাহারা সেই সুখের পরিবর্ত্তে অনন্তদুঃখভাগী হয়। এই কথা স্মরণ রাখিয়া আমরা যেন আত্মহত্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখি এবং যাহাতে আমাদের স্ত্রীগণ এই মহাপাপ উপলব্ধি করিতে পারেন, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত এবং সেই সঙ্গে আত্মবলিদানের উচ্চ আদর্শ সকলের চক্ষের সম্মুখে যাহাতে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাব

হয়, সে জন্যও যত্ন করা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যেরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আত্মবলিদানের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। আমরা আত্মবলিদান দিতে সমর্থ না হইলে দেশের অণুমাত্র মঙ্গল হইবে না। আমি আশা করি, অদ্যকার এই আলোচনা হইতে আমাদিগের মধ্যে যেন আত্মবলিদানের ভাব জাগ্রত হয়।

---

# মৃত্যুর মিলন।

লেখক—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(১)

বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে নন্দলাল প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার মনে কত কথা উঠিতেছিল। অতীতের একটী প্রবল ঝটিকা আসিয়া তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতেছিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের একটী ক্ষুদ্র ঘটনা অতীতের কঠোর স্মৃতির ন্যায় অল্পে অল্পে তাঁহার মনে পড়িতেছিল। মনে পড়িতেছিল পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এক মধুময়ী যামিনীতে একটি দশ বৎসরের বালিকা কেমন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহার ক্ষুদ্র মুখখানির উপর সমুজ্জ্বল আলোকরশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া কেমন সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিয়াছিল, তাঁহার সোহাগের সম্ভাষণে বালিকা হাসিতে গিয়াছিল, কিন্তু লজ্জা আসিয়া সে হাসি ফুটিতে দেয় নাই, অধরের হাসিটুকু অধরেই মিলাইয়া গিয়াছিল, সে চিত্র কি মধুর! তাঁহার সাদর আহ্বানে বালিকা একবার নীলপদ্ম সদৃশ চক্ষুদুটী তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়াছিল, চাহিয়াই চক্ষু মুদিত করিয়াছিল, লজ্জার রক্তিমরাগ তাহার নিটোল কপোলদেশে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; সে দৃশ্য কি সুন্দর কত মনোহর! তারপর—তারপর ফুল শয্যার জিনিস পত্র লইয়া শ্বশুরের সহিত পিতার বিরোধ, ক্রোধান্ধ পিতার পুত্রবধূত্যাগ, শ্বশুরের কন্যা লইয়া গমন। সে আজ কতদিনের কথা, কিন্তু সেই কথা গুলাই পাঁচ বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধানটাকে পশ্চাতে ফেলিয়া নূতনের মত অল্পে অল্পে তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপের তীব্র শিখা একটু একটু করিয়া তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল।

অনুতাপ বৈ কি। সেই যে একদিন তাঁহার পিতা রাগের মাথায়, "আমি পুত্রবধু চাহি না, আবার ছেলের বিবাহ দিব" বলিয়া চারুকে বিদায় দিয়াছিলেন,

জ্ঞানহীনা বালিকা চারুও আপনার সর্ব্বনাশ বুঝিতে না পারিয়া হাসিতে হাসিতে পিতার সহিত চলিয়া গিয়াছিল, সেই দিন হইতে আরতো তাহার কোন খোঁজ খবর লওয়া হয় নাই ? তাহার পর সুদীর্ঘ পাঁচটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে, জগতে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু চারুর কি হইল, সে সংবাদ তো একবারও জানা হয় নাই ? নন্দলাল কাজটা কি ভাল করিয়াছেন ?

কাজটা যে ভাল হয় নাই, একথা নন্দলালও জানে। কিন্তু জানিলে কি হইবে, পিতার আদেশের প্রতিবাদ করিতে তাঁহার কথার উপর কথা কহিতে কয়জন হিন্দু সন্তানে পারে ? যে পারে পারুক, কিন্তু নন্দলাল পারিলেন না। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে, পিতার এ ক্রোধ কিছুদিন পরেই শান্ত হইবে। কিন্তু শান্ত হওয়া দূরে থাক, তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, কিছু দিন পরেই চারুর পিতা আপনা হইতেই আসিয়া তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিবে। কিন্তু তিন বৎসর হইয়া গেল, অভিমানী বেহাইতো একবারও আসিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থী হইল না ? মেয়ের বাপের এত স্পর্দ্ধা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি পুনরায় পুত্রের বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু এবার নন্দলাল তাঁহার অবাধ্য হইলেন। স্পষ্ট কিছু না বলিলেও আজকাল করিয়া গোলমালে একটী বৎসর কাটাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা শেষ হইল। তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া পশ্চিম যাত্রা করিলেন।

পশ্চিমে গিয়া নন্দলাল এক বৎসর বাটী আসিলেন না। তাঁহার পিতা অনেকবার বিবাহের স্থির করিয়া তাঁহাকে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ছুটীর ওজর করিয়া প্রতিবারেই পিতাকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। পিতাও পুত্রের ছুটীর মুখ চাহিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া ছিলেন। কিন্তু কাল তাঁহার মুখ চাহিল না! তিনি বৃদ্ধ বয়সে অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। রোগের অবস্থা ক্রমশঃ কঠিন হইলে নন্দলালকে টেলিগ্রাম করা হইল। নন্দলাল ছুটিয়া আসিয়া পিতার অন্তিম শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। পিতা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, অতি কষ্টে বলিলেন, "বাবা. বৌমাকে আনিও।" তার পর পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বৃদ্ধ পরলোক যাত্রা করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর নন্দলাল চারুর সংবাদ লইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কেমন বাধ বাধ ঠেকিল। এত দিনের মধ্যে একবারও যাহাদিগের সংবাদ লওয়া হয়

নাই, আজি সহসা কি বলিয়া সেখানে যাওয়া যায়। প্রতি পদেই তিনি লজ্জায় অনুতাপের প্রবল তাড়না অনুভব করিতে লাগিলেন। না যাইলেও নয়, মাতার আদেশ, শ্রাদ্ধের সময় বৌমাকে আনিতেই হইবে, তিনি কি পৃথক ঘাট করিবেন? এস্থলে লোক পাঠাইয়া সংবাদ দেওয়াও তিনি ভাল মনে করিলেন না। অগত্যা একদিন খুব সকালে নন্দলাল স্বয়ং শ্বশুর বাড়ী চলিলেন। বাটীর বাহির হইতেই সম্মুখের তেঁতুল গাছ হইতে একটা কাক বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; তিনি ভ্রুকুটী করিয়া দুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করিলেন।

[ ২ ]

গৌরহাটী হইতে নন্দলালের শ্বশুরালয় চাঁদবাটী গ্রাম বারো ক্রোশ দূর কয়দিনের কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছিল, বিশেষতঃ এদিকের পথও তাঁহারি বিশেষ পরিচিত ছিল না। জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি চাঁদবাটীতে উপস্থিত হইলেন। গ্রামে প্রবেশ করিতে তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল। এত দিনের পর তিনি কি বলিয়া শ্বশুরের সাক্ষাতে দাঁড়াইবেন? চারুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে কি বলিবেন? কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন? এত দিনের পর চারুকে দেখিতে পাইবেন কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? আশঙ্কায় উদ্বেগ লজ্জায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল

ভাবিতে ভাবিতে নন্দলাল গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যায় অন্ধকার একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছে, কৃষক বধূরা প্রদীপ হস্তে লইয়া গোশালায় তুলসী তলায় সন্ধ্যা দেখাইতেছে। গৃহস্থ বালাগণ শঙ্খ বাজাইয়া সন্ধ্যা দেবীর আবাহন করিতেছেন। নন্দলাল একবার মাত্র বিবাহের দিনে শ্বশুরের বাটীতে আসিয়াছিলেন, সে আজ কত দিনের কথা। অগত্যা তিনি একজন লোককে তারাপদ চট্টোপাধ্যায়ের বাটী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটী সবিস্ময় দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অঙ্গুলী সঙ্কেতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী দেখাইয়া দিলেন। নন্দলাল ধীরে ধীরে আসিয়া সেই বাটীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। কতদিন পূর্ব্বের একটী কোমল স্মৃতি আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একদিন মধুর রজনীতে বিবিধ বাদ্যোদ্যমের সহিত সমুজ্জল আলোক মালা পরিবৃত হইয়া কত আনন্দে কত আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি এই বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হায়! সেদিন কি সুখের দিন!

বাটীর বহির্দ্বার রুদ্ধ। নন্দলাল সেই বহির্দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ভাবিতে

লাগিলেন। ডাকিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কি বলিয়া ডাকিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না! ডাকিতে গিয়া কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, কথা ফুটিল না। অবশেষে দুই একবার কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "বাটীতে কেহ আছেন কি ?" নিজের স্বরে নিজেই চমকিত হইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ তাঁহার স্বর শুনিতে পাইয়াছে কি ? ডাকিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু কোন উত্তরই আসিল না। এবার তিনি সাহস করিয়া স্বরটা আরও একটু উচ্চে তুলিয়া আবার ডাকিলেন, "চট্টোপাধ্যায়মহাশয় বাটীতে আছেন কি ?" এবার নিশ্চয়ই কেহ শুনিতে পাইয়াছে। এইবার হয় তো চারু নিজে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিবে ;সে সহসা তাঁহাকে দেখিয়া হয়তো চিনিতে পারিবে না। চিনিতে পারিলে হয়তো লজ্জায় ছুটিয়া পলাইবে। চারু এতদিনে কত বড় হইয়াছে ? এই পাঁচ বৎসরের পরিবর্ত্তনে সেই বালিকা চারু কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ?

রুদ্ধদ্বার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নন্দলাল এইরূপ কত কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু এতক্ষণ পরেও ভিতর হইতে কোন উত্তর দিল না বা দ্বার মুক্ত করিল না। তখন নন্দলাল আরও একটু উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন। এবার সে বাটীর সম্মুখস্থ বাটী হইতে একযুবক বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন," মহাশয় কাহাকে খুঁজিতেছেন ?"

নন্দলাল কি উত্তর করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। যুবক আবার প্রশ্ন করিলেন। এবার নন্দলাল ধীরে ধীরে বলিলেন, "তারাপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কি এই বাটী ?"

যুবক বলিলেন, "হাঁ আপনি কি তাঁহার কোন আত্মীয় ?,' নন্দলাল আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "আত্মীয়-হাঁ-না-আত্মীয় বটে।

যুবক বলিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে আসুন।"

নন্দলাল কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কোন কথা না বলিয়া যুবকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। যুবক তাঁহাকে লইয়া নিজের বাটীর বৈঠকখানায় বসাইলেন। বৈঠকখানায় আলোক জ্বলিতেছিল। যুবক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নন্দলালের মুখের দিকে চাহিলেন, নন্দলাল মুখ নত করিলেন। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আপনার কি প্রয়োজন ?"

নন্দলাল একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন. "প্রয়োজন, তাঁহাদের সংবাদ লওয়া।"

যুবক বলিলেন, ' কতদিন হইতে তাঁহাদের সংবাদ জানেন না।

নন্দলাল বলিলেন, "বহুদিন, প্রায় পাঁচ বৎসর।"

যুবক আর কিছু বলিলেন না দেখিয়া নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সংবাদ বলিতে পারেন কি?"

যুবক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "পারি।"

নন্দলাল বলিলেন, "তবে বলুন, তাঁহারা কোথায়?"

যুবক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ইহলোকে নাই।"

সহসা যদি শত বজ্রধ্বনি নন্দলালের কর্ণে প্রবেশ করিত, তাহাতেও নন্দলাল এত চমকিত হইতেন না। যুবকের কথা শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। ক্ষণপরেই তিনি সবলে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। স্পষ্ট করিয়া বলুন।"

তখন যুবক একে একে সকল কথা বলিলেন। নন্দলাল বুঝিলেন, বাস্তবিকই আর তাঁহারা এ জগতে নাই। তাঁহার বিবাহের দুই বৎসর পরেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হন, এবং একবৎসর এই রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোক যাত্রা করেন। তাহার একবৎসর পরেই চারুর মাতাও স্বামীর অনুসরণ করিয়াছেন। তখন সহায়হীনা নিরাশ্রয় চারু অনেকের কু-দৃষ্টিতে পতিত হয়। অগত্যা হতভাগিনী উপস্থিত যুবকদের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাঁরা শূদ্র, মাতৃপিতৃহীনা অসহায়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিশেষ যত্নের সহিত গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এজন্য ব্যর্থ মনোরথ অনেক দুষ্ট লোকের মুখে ইহাঁদের অপবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাঁরা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে দুষ্ট লোক প্রচারিত এই কুৎসা কাহিনী চারুর কর্ণেও প্রবেশ করে। এই সময় হইতে হতভাগিনী শোকে দুঃখে অপমানে দারুণ মূর্চ্ছা রোগে আক্রান্ত হয়। কয়েক মাস এই ভীষণ রোগ যন্ত্রণা ভোগের পর একদিন রাত্রিকালে এই রোগের প্রবল আক্রমণে অভাগিনী সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বিধাতা তাঁহার দুঃখিনী কন্যাকে আপনার কোলে টানিয়া লইয়াছেন পতি গৃহনির্ব্বাসিতা চির দুঃখিনী সংসারের কঠোর তাড়নার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। তাহার যন্ত্রণাদগ্ধ দেহ শ্মশানে শৃগাল কুকুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে, জ্বালাময় অস্থিখণ্ড গুলি টানিয়া লইয়া দামোদর আপনার শীতল-সলিল গর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

নন্দলাল স্থিরভাবে বসিয়া সমস্ত কথা শুনিলেন। যুবকের কথা শেষ হইলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন! স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "তবে সব শেষ হইয়াছে!"

যুবক ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নামই কি নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় ?,'

নন্দলাল তখন দ্বারের নিকট গিয়াছেন ; যুবকের কথা শুনিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন, তারপর দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যুবক অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলেন, কিন্তু অন্ধকারে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

( ৩ )

সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া পরদিন মধ্যাহ্নকালে নন্দলাল বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার ভগিনী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! বউ আনিলে না ?"

নন্দলাল কোন উত্তর করিল না। সে আবার বলিল, "দাদা! বউ কোথায় ?"

নন্দলাল কেবল উর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহার ভগ্নিনী কাঁদিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতা আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একটা করুণ ক্রন্দন রোলে বাড়ীখানা কাঁপিয়া উঠিল। নন্দলাল বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

যাহা হউক একজন্ত নন্দলাল পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে কোনরূপ ক্রটী করিলেন না। একরকম সমারোহের সহিত বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ হইল। শ্রাদ্ধশেষে মাতা নন্দলালকে পুনর্ব্বার বিবাহের জন্ত ধরিয়া বসিলেন। প্রতিবাসীগণও তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনেক অনুরোধ করিল, অনেক বুঝাইল! দুই একটী বয়স্থাপাত্রীও আসিল, কিন্তু নন্দলাল সম্মত হইলেন না। তিনি সকলকেই স্তোকবাক্যে নিরস্ত করিয়া কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিলেন।

( ৪ )

পশ্চিমে গিয়া নন্দলাল কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়টা বড়ই শূন্য বোধ হইত, শূন্য প্রাণটা থাকিয়া থাকিয়া খাঁ খাঁ করিয়া উঠিত। শুষ্ক মধ্যাহ্নে নিদাঘ বায়ু প্রবাহ অশান্ত প্রেতের উচ্চ হাহাকারের মত তাঁহার বাঙ্গালার চারিদিকে হুহু করিয়া ছুটিয়া বেড়াইত, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যথিত হৃদয় হইতে একটা নৈরাশ্যের হাহাকার উঠিয়া তপ্ত বায়ু প্রবাহে মিশিয়া যাইত। শান্ত অপরাহ্নে রক্তিম সৌরকর দূর পাহাড়ের গায় লুকোচুরি খেলিত, সোণালি বর্ণে চিত্রিত মেঘ খণ্ডগুলি পাহাড়ের অঙ্গে ঢলিয়া

পড়িত, একটা চিরবিরহী পক্ষীর সকরুণ বিষাদ শাখা আকাশ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া কাহার উদ্দেশে দিগন্তে ছুটিত, আর তাঁহার ভগ্ন বক্ষ পঞ্জর গুলা ঠেলিয়া একটা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাহির হইত। এইরূপে প্রাণের অবিচ্ছিন্ন আকুলতার উচ্চ হাহাকার শুনিতে শুনিতে নন্দলালের অসহ্য দিনগুলা একে একে কাটিয়া যাইত।

বিবাহের পর হইতেই নন্দলাল চারুর সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেও তখন হৃদয়টা এত শূন্য হয় নাই, তখন জীবনটা এত ভারবোধ হয় নাই। তখনও মাঝে মাঝে চারুর কথা মনে পড়িত, থাকিয়া থাকিয়া প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিত, হৃদয়টা বড় ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশার মধুর আশ্বাসে আবার শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের মধুর কল্পনায় অতৃপ্ত প্রাণে তৃপ্তির একটা শান্ত স্রোত বহিয়া যাইত। কিন্তু এখন সে আশা অন্তর্হিত, সে কল্পনার চিত্রখানি বিসর্জ্জিত। যতক্ষণ আশা ছিল, ততক্ষণ সব ছিল, আশার সঙ্গে সঙ্গে সব চলিয়া গিয়াছে ; এখন নৈরাশ্যের প্রবল স্রোতে জীবনটা কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। হায়, এই স্রোতে জীবনটাকে একেবারে ডুবাইয়া দিলেও চারু আর ফিরিবে না।

নন্দলালের মনের অবস্থা তখন ভয়ানক। তাঁহারই দোষে, তাঁহারই মূঢ়তায় একটী বালিকা কি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে অকালে সংসার ত্যাগ করিয়াছে, তাঁহারই উপেক্ষায় তদ্গতপ্রাণা চারু মৃত্যুর করাল কবলে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাঁহারই অযত্নে বিধাতার সযত্নরোপিতা একটী ক্ষুদ্র বল্লরী সংসারের খরতাপে অকালে বিশুষ্ক হইয়াছে। এ মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই ? ছিল—যদি একবার মাত্র চারুর নিকট এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিতেন, যদি বুঝাইয়া বলিতে পারিতেন, "আমি তোমার ধ্যানেই মগ্ন" তাহা হইলে বুঝি তাঁহাকে এত অনুতাপের তীব্র কষাঘাত সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু হায়, সে আশা আর নাই। নন্দলালের হৃদয়ে অনুতাপের সহস্রশিখা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

নন্দলালের আর পশ্চিম ভাল লাগিল না। তিনি অন্যত্র বদলির জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই নন্দলাল বদলি হইয়া মধ্য বঙ্গের * * * * জেলায় মানিকগঞ্জে আসিলেন।

( ৫ )

মানিকগঞ্জে আসিবার কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রিকালে নন্দলাল রত্নেশ্বরীর তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। জ্যোৎস্নাপুলকিতা নিদাঘ-রজনী, শুভ্র কৌমুদী ধারা-

নবপল্লবিত তরুশিরে পড়িয়াছে, বিরল পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া তাহার মুখোচুম্বন করিতেছে ; নিম্নে স্বচ্ছসলিলা নিদাঘ-সঙ্কুচিত শরীরা রত্নেশ্বরী কৌমুদী-প্লাবিতা হইয়া মন্থরগমনে চলিয়াছে, মৃদু নৈশ সমীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে হীরক জ্বলিতেছে। রাত্রি প্রহরাতীত হয় নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে নীরব, সুষুপ্ত। কেবল কদাচিৎ বন পার্শ্ব হইতে দুই একটা শৃগালের চীৎকার, কদাচিৎ দূরে তরল মেঘের কোলে পাপিয়ার উচ্চতান, কচিৎ নবপল্লবভূষিত অশ্বত্থশিরে একটা কোকিলের ঝঙ্কার উত্থিত হইয়া গ্রাম খানির নৈশ সুপ্তি ভঙ্গ করিতেছিল।

শীতল শৈল বায়ুস্পর্শে হৃদয়ের তীব্র জ্বালা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিবার উদ্দেশে নন্দলাল প্রায় প্রত্যহ এইরূপ সময়ে নদী তীরে ভ্রমণ করিতেন। আজি তিনি যে ভ্রমণ করিতে ছিলেন তাহার, ঠিক পার্শ্বেই বিরল অরণ্যাণী বেষ্টিত একটী জীর্ণ বহুপুরাতন মন্দির। মন্দিরটী কালো যে কোন দেবতার অধিকারে ছিল তাহা নিশ্চয়, কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামার সময় দেবতা নিজ চির দখলী স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিয়া ছিল, তাহা এপর্য্যন্ত কেহ স্থির করিতে পারে নাই। তদবধি মন্দিরটী অনধিকৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তবে এক সময় এই মন্দিরটীর স্বত্ব লইয়া রসুলপুরের জমিদার মজুমদার মহাশয়দিগের সহিত মানিকগঞ্জের জমিদার চৌধুরী মহাশয়দিগের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, তদ্বারা অধিকারীর সহিত এইরূপ একশত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত, একথা ইতিহাস সগর্ব্বে ঘোষণা করিতেছে।

বেড়াইতে বেড়াইতে নন্দলালের দৃষ্টি সহসা সেই ভগ্ন মন্দির দ্বারে নিপতিত হইল। দৃষ্টি মাত্রই তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন সুনির্ম্মল জ্যোৎস্নাধৌত মন্দির দ্বারে বসিয়া এক রমণী। রমণী সুন্দরী, যুবতী। সুন্দর মুখমণ্ডল, তাহাতে চন্দ্রপ্রভা পতিত হইয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছে। অবেণী সম্বদ্ধ কৃষ্ণ কুন্তলদাম পৃষ্ঠদেশে আচ্ছন্ন করিয়া মৃত্তিকাস্পর্শ করিয়াছে। গৈরিকবসনে রমণীর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, ধীর সমীরণে তাহার অঞ্চল উড়িতেছে। রমণী স্থির দৃষ্টিতে নদী তরঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে দৃষ্টি বড় সমুজ্জ্বল, বড় ব্যগ্র ; যেন কোন দূর দেশ হইতে কাহারও অপ্রত্যাশিত আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

নন্দলাল অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন। এ সময়ে এই নির্জ্জন নদীতীরে বহুদিনের পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দির দ্বারে বসিয়া কে এ রমণী? অন্য কেহ হইলে ভৌতিক কাণ্ড ভাবিয়া হয়তো এতক্ষণ পলায়ণ

করিত, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে নন্দলাল তাহাতে বড় একটা বিশ্বাস করিতেন না। তথাপি বিস্ময়ের সহিত তাঁহার হৃদয়ে একটু ভয় আসিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলের মাত্রাও বাড়িয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রমণীর সেদিকে লক্ষ্য নাই। তাঁহার দৃষ্টি পূর্ব্ববৎ স্থির নিশ্চল, সে দৃষ্টিতে বুঝি পলক নাই। নন্দলাল মন্দিরের নিকটস্থ হইলেন। আর একবার দাঁড়াইয়া রমণীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এবার বেশ ভাল করিয়া মুখ খানা দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে ভয়ে বিস্ময়ে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল, তিনি একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইলেন!

পরদিন প্রাতে আসিয়া নন্দলাল মন্দির, গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু রমণীর কোন চিহ্নই পাইলেন না।

( ৬ )

এই দিন হইতে নন্দলালের চিত্ত বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। বহুদিন হইলেও চারুকে তিনি ভুলেন নাই। সব ভুলিলেও বালিকার সেই সুন্দর স্বভাব কোমল মুখখানি তিনি জীবনে ভুলিবেন কি না সন্দেহ। সেই কয় বৎসর পূর্ব্বে আটদিন মাত্র যে একখানি মুখ দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে পাষাণ রেখার ন্যায় চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। দূর অতীতের ঘনান্ধকারের মধ্য হইতেও সে মুখের একটী সমুজ্জ্বল চিত্র সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে জাগিত। কালি নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে ভগ্নমন্দির দ্বারে নন্দলাল যে মুখ খানি দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার হৃদয় চিত্রিত মুখেরই সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব মাত্র। যদি যুবক কথিত চারুর মৃত্যুস্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে না জাগিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সেই মুখের অধিকারিণীকে চারু বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু রমণীতো চারু নয়। তাহাও কি সম্ভব? কিন্তু এরূপ অদ্ভুত সাদৃশ্যও একবারেই অসম্ভব। তবে কি ইহা ভৌতিক কাণ্ড? রমণী যদি চারু হইত! কিন্তু হায়! মৃত্যুর সুদৃঢ় রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া চারু কি আর আসিবে?

অনেক ভাবিয়াও নন্দলাল কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। এ চিন্তা হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে মন যেন এ চিন্তার সহিত আরও দৃঢ়রূপে জড়িত হইয়া পড়িল। তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই

দেখিয়াছেন, সে নিশ্চয়ই চারুরই ছায়া মূর্ত্তি। কথাটা ভাবিতে নন্দলাল শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি অনেক পুস্তকে পড়িয়াছেন যে, যাঁহারা চিরকাঙ্ক্ষিত কামনার তৃপ্তি না হইতেই পরলোকগত হয়, তাহাদের প্রেতাত্মা সেই অপূর্ণ বাসনার সংস্কার বশে ইহলোকে আসিয়া ছায়ারূপে কাম্যবস্তুর অনুসরণ করিয়া বেড়ায়। হায়, তবে কি চারুও তাঁহারই মত অতৃপ্ত কামনার ভাব হৃদয়ে লইয়া ইহলোকের পরপারে গিয়াও তাঁহারই মত লক্ষ্যহীন পথে বেড়াইতেছে!

ভাবিতে নন্দলাল চারিদিকেই যেন চারুর ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। সত্যই যেন মৃত্যুর মসীময় যবনিকান্তর ভেদ করিয়া চারুর অশান্ত প্রেতাত্মা অতৃপ্ত হৃদয়ের করুণ হাহাকার ব্যক্ত করিতে করিতে তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সত্যই যেন তপ্তবায়ুর সহিত তাহার আকুলতাপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে। পদে পদে নন্দলাল সে মূর্ত্তির অলক্ষিত অনুসরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। সে ছায়ামূর্ত্তি নীরব অভিশাপ অনুভব করিয়া তিনি যেন পাগলের মত হইলেন। এ অবস্থায় কার্য্যে মনোনিবেশ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অগত্যা পরদিনই তিনি ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিয়াই গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে বুঝি নারীহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

( ৭ )

বাটীতে আসিয়া নন্দলাল কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন! প্রিয়তমা জন্মভূমির স্নেহ ক্রোড়ে বসিয়া, স্নেহময়ী জননীর অনুপম স্নেহরাশি ভোগ করিতে করিতে —বিধবা ভগিনীর নিরাস্বার্থময় হৃদয়ের সহানুভূতি লাভ করিতে করিতে—তাঁহার অশান্ত হৃদয় একটু শান্ত হইল। অগ্নিদগ্ধ-কলেবরে মানব সহসা শীতল বারিপ্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া যেরূপ ক্ষণিক শান্তিপায়, সেইরূপ শান্তি পাইলেন; কিন্তু জ্বালা জুড়াইল না। বরং আরও জ্বলিয়া উঠিল।

নন্দলালের ভোজনে তৃপ্তি নাই, ভ্রমণে সুখ নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই। নিদ্রা কেবল স্বপ্নময়ী বিভীষিকাময়ী। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দেখেন, কেবল চারুর ছায়া মূর্ত্তি, শুনিতে পান কেবল তাহার করুণ হাহাকার-জ্বলন্ত অভিশাপ নন্দলাল কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত সংযত হইল না।

বাটী আসিবার কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রি কালে নন্দলাল বাহিরের বৈঠকখানায় শয়ন করিয়াছিলেন। বৈঠকখানা প্রাচীর বদ্ধ নহে। তাহার দ্বার উন্মুক্ত। বাহিরে পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকে তাহার কয়েকটা রশ্মি নন্দলালের

শয্যার উপর পড়িয়াছিল। শুভ্র জ্যোৎস্না সাগর কম্পিত করিয়া ধীরে ধীরে নৈশ সমীরণ বহিতেছিল। তাহার শীতল স্পর্শে নন্দলাল নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু সে নিদ্রা গাঢ় নিদ্রা নহে, স্বপ্ন সমষ্টি মাত্র। নন্দলাল স্বপ্নে দেখিতেছিলেন, যেন রত্নেশ্বরীর নির্জ্জনতীরে ভগ্ন মন্দিরদ্বারে গৈরিকবসন আলুলায়িত রুক্ষ কুন্তলা চারু বসিয়া রহিয়াছে। তাহার অপরিম্লানমুখের উপর তেমনই চন্দ্রকর পড়িয়াছে, বাতাসে তেমনি গৈরিকাঞ্চল উড়িতেছে, রুক্ষ কুন্তলদাম নড়িতেছে। মুগ্ধ নন্দলাল স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। চারু যেন ধীর মধুর কণ্ঠে বলিতেছে, "ছিঃ আমাকে দেখিয়া তুমি ভয়ে পলাইলে? লজ্জাবনত বদনে কাতরস্বরে নন্দলাল বলিলেন, "আগে বুঝিতে পারি নাই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর চারু! আর ফেলিয়া পলাইও না।" চারু সে কাতরোক্তিতে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "ছিঃ তুমি বড় নিষ্ঠুর।" দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ হইতে এক অনৈসর্গিক জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল, সেই জ্যোতি রাশির মধ্যে মিশাইয়া চারুর দেহ ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। নন্দলাল ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন, কিন্তু সে তখন এত উর্দ্ধে উঠিয়াছে, সেখানে আর নন্দলালের হাত যায় না। তখন নন্দলাল চীৎকার করিয়া বলিলেন, "চারু! চারু! ফিরিয়া আইস, আর আমাকে কাঁদাইয়া যাইও না।"

শেষোচ্চারিত কথা গুলা নন্দলালের মুখ হইতে স্পষ্ট বাহির হইল। তিনি জাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু একি, সহসা কাহার দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু তাঁহার পায়ে পড়িল? কাহার একটী উষ্ণশ্বাস তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিল? তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। অস্ফুট জ্যোস্নালোকে দেখিলেন, এক রমণী ধীরপদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে। নন্দলাল লাফাইয়া উঠিলেন, দ্রুতপদে দ্বারের নিকট গিয়া রমণীর পথাবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু একি! এ যে সেই —সেই রমণী! নন্দলাল "চারু! চারু!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার মূর্চ্ছিত দেহ রমণীর পাদমূলে নিপতিত হইল।

৮

যখন নন্দলালের চৈতন্য হইল, তখন উষার ক্ষীণ আলোক রশ্মি গৃহে প্রবেশ করিয়াছে; শীতল প্রভাত বায়ু তাঁহার তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছে। নন্দলাল ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন। চাহিয়া দেখিলেন; তাঁহার মস্তক এক অপরিচিতা রমণীর ক্রোড়ে স্থাপিত। অল্পে অল্পে তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে চাহিলেন। ভয়ে—বিস্ময়ে তাঁহার হৃদয় আলো-

শয্যার উপর পড়িয়াছিল। শুভ্র জ্যোৎস্না সাগর কম্পিত করিয়া ধীরে ধীরে নৈশ সমীরণ বহিতেছিল। তাহার শীতল স্পর্শে নন্দলাল নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু সে নিদ্রা গাঢ় নিদ্রা নহে, স্বপ্ন সমষ্টি মাত্র। নন্দলাল স্বপ্নে দেখিতেছিলেন, যেন রত্নেশ্বরীর নির্জ্জনতীরে ভগ্ন মন্দিরদ্বারে গৈরিকবসন, আলুলায়িত রুক্ষ কুন্তলা চারু বসিয়া রহিয়াছে। তাহার অপরিম্লানমুখের উপর তেমনই চন্দ্রকর পড়িয়াছে, বাতাসে তেমনি গৈরিকাঞ্চল উড়িতেছে, রুক্ষ কুন্তলদাম নড়িতেছে। মুগ্ধ নন্দলাল স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। চারু যেন ধীর মধুর কণ্ঠে বলিতেছে, "ছিঃ আমাকে দেখিয়া তুমি ভয়ে পলাইলে? লজ্জাবনত বদনে কাতরস্বরে নন্দলাল বলিলেন, "আগে বুঝিতে পারি নাই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর চারু! আর ফেলিয়া পলাইও না।" চারু সে কাতরোক্তিতে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "ছিঃ তুমি বড় নিষ্ঠুর।" দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ হইতে এক অনৈসর্গিক জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল, সেই জ্যোতি রাশির মধ্যে মিশাইয়া চারুর দেহ ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। নন্দলাল ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন, কিন্তু সে তখন এত উর্দ্ধে উঠিয়াছে, সেখানে আর নন্দলালের হাত যায় না। তখন নন্দলাল চীৎকার করিয়া বলিলেন, "চারু! চারু! ফিরিয়া আইস, আর আমাকে কাঁদাইয়া যাইও না।"

শেষোচ্চারিত কথা গুলা নন্দলালের মুখ হইতে স্পষ্ট বাহির হইল। তিনি জাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু একি, সহসা কাহার দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু তাঁহার পায়ে পড়িল? কাহার একটী উষ্ণশ্বাস তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিল? তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। অস্ফুট জ্যোস্নালোকে দেখিলেন, এক রমণী ধীরপদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে। নন্দলাল লাফাইয়া উঠিলেন, দ্রুতপদে দ্বারের নিকট গিয়া রমণীর পথাবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু একি! এ যে সেই—সেই রমণী! নন্দলাল "চারু! চারু!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার মূর্চ্ছিত দেহ রমণীর পাদমূলে নিপতিত হইল।

৮

যখন নন্দলালের চৈতন্য হইল, তখন ঊষার ক্ষীণ আলোক রশ্মি গৃহে প্রবেশ করিয়াছে; শীতল প্রভাত বায়ু তাঁহার তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছে। নন্দলাল ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন। চাহিয়া দেখিলেন; তাঁহার মস্তক এক অপরিচিতা রমণীর ক্রোড়ে স্থাপিত। অল্পে অল্পে তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে চাহিলেন। ভয়ে—বিস্ময়ে তাঁহার হৃদয় আলো-

ড়িত হইয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অমনই পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাঁহার কম্পিত দেহ ধরিয়া ফেলিল। তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ধারণকারী জনৈক বৃদ্ধ বাবাজী। নন্দলালের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি দুই হাতে মাথা ধরিয়া ধীরে ধীরে তথায় বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ হইতে আপনা-আপনি উচ্চারিত হইল, "চারু!" অমনই কম্পিত কলেবর তাঁহার চরণতলে পতিত হইল।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে নন্দলালের গৃহখানি আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। হৃদয়ের কোন্ প্রবল আকর্ষণে কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে আসিয়া সহসা চারু তাঁহার অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কোন্ মহাপুণ্যবলে তিনি হারানিধি ফিরিয়া পাইলেন, কোন্ মহামন্ত্রবলে এই মৃতার মিলন সংঘটিত হইল। নন্দলালের মাতা আদর করিয়া পুত্রবধুকে ঘরে তুলিলেন। তাঁহার ভগিনী হুলুধ্বনি দিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই এই অদ্ভুত ব্যাপার—এই মৃতার পুনর্ম্মিলন সমস্ত গ্রামখানিতে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ আসিয়া নন্দলালের আনন্দ মুখরিত গৃহ পূর্ণ করিল।

ইহার পর নন্দলাল এই অভূতপূর্ব্ব রহস্যোদ্ভেদের জন্য চারুকে অনুরোধ করিলেন, চারু একে একে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত করিয়া, তাঁহার বিস্ময়াপনোদন করিল। চারু যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই ;—একদিন রাত্রে অন্যান্য জ্বরের ন্যায় চারু মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা সে বারে রোগটা বড় প্রবল হইয়াছিল। এজন্য কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তাহার জীবনী ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে সকলেই তাহাকে মৃতা বলিয়া স্থির করিল, এবং তাহার সৎকারাদির জন্য চেষ্টিত হইল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই তাহার নামে একটা মিথ্যা অপবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, এজন্য কেহই তাহাকে দাহ করিতে স্বীকৃত হইল না, অগত্যা বৃদ্ধঘোষজা মহাশয় জনৈক গুলিখোর ব্রাহ্মণকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া সম্মত করান। ব্রাহ্মণ গোপনে একাকী চারুর মৃতদেহ নদীতীরে নিক্ষেপ করিয়া আসে। কিন্তু এসকল কথা চারু জানে না, পরে শুনিয়াছে।

নদীতীরে নিক্ষিপ্ত হইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই অল্পে অল্পে চারুর চৈতন্য হয়। যখন তাহার একটু একটু জ্ঞান হইল, তখন সে চারিদিকে চাহিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। বুঝিতে পারিল না সে কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে। তারপর যখন তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞানোদয় হইল, তখন বুঝিতে পারিল, তাহার দেহ একখানি মাদুরে বেষ্টিত। উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, মাদুরের সহিত সে দৃঢ়

বন্ধনে আবদ্ধ। সভয় দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল, তরল মেঘাচ্ছাদিত ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, নীরব নিস্তব্ধ নদীগর্ভ, তীরে অন্ধকার আলোকের মধ্যে বড় বড় গাছগুলা বিকটাকার দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, নিকটে দামোদরের সলিলরাশি কলকল রবে বহিয়া যাইতেছে। ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে বিস্তৃত শ্বেত-সৈকতভূমি প্লাবিত। চারু বিস্মিত স্তম্ভিত। একটা শৃগাল আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল, চারু ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, শৃগালটা পলাইয়া গেল। তখন বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য চারু বল প্রকাশ করিতে লাগিল, অল্প আয়াসেই খড়ের বন্ধন গুলা চড়্চড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। চারু উঠিয়া বসিল। তৃষ্ণায় তাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে জলের নিকট উপস্থিত হইল, কয়েক অঞ্জলী জলপান করিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। তখন জল সন্নিহিত সৈকত ভূমিতে বসিয়া চারু আপনার অবস্থার চিন্তা করিতে লাগিল। প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না; তারপর একটু একটু করিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগিতে লাগিল। তখন একে একে সব কথা মনে পড়িল,—আপনার অবস্থা মনে পড়িল, শ্বশুর বাড়ীর কথা মনে পড়িল, ঘোষেদের বাড়ী মনে পড়িল, মূর্চ্ছার কথা মনে পড়িল।" ইহার পর আর কিছুই মনে পড়ে না। চারু ভাবিল, বোধ হয় তাহার মৃত্যু হইয়াছে,তাই সকলে তাহাকে এই নির্জ্জন শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কথাটা ভাবিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল। তবে কি সে এখন জীবিতা নয় মৃতা? তাহার এদেহ আর পার্থিব দেহ নয়, পরলোকগত ছায়া শরীর! সম্মুখের নদী দামোদর নয় বৈতরণী? ঐ যে বৃক্ষরাজী, ঐ যে অদূরদৃষ্ট ধূমাচ্ছাদিত গ্রামখানি, ও সকল বুঝি যমপুরীর। সে আর ইহলোকে নাই, সে এখন পরলোকের কোন দেশে। কিন্তু পরলোকেও কি ইহলোকের স্মৃতি থাকে? চারু বুঝিল থাকে। সহসা পশ্চাতে মনুষ্য পদশব্দ শুনিয়া চারু চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, এক মনুষ্যমূর্ত্তি তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। চারু বসিয়া থাকিবে কি পলাইবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ভাবিল, আমি যদি সত্যই মৃতা হই, সত্যই যদি আমার এই দেহ ছায়াময় হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর মনুষ্য তো তাহাকে দেখিতে পাইবে না। ক্রমে মূর্ত্তি নিকটস্থ হইলে চারু দেখিল এক বৃদ্ধ বাবাজী। বাবাজী এসময়ে জনশূন্য নদীতটে চারুকে একাকিনী দেখিয়া বিস্মিত ভাবে দাঁড়াইল এবং তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তখন চারু বুঝিল, সে তবে মৃতা নয় জীবিতা, সে তবে এখন পরলোকের অজ্ঞাত পথে দণ্ডায়মান নয়, এই পৃথিবীরই চাঁদ বাটী গ্রামের দামোদরের তীরে বসিয়া আছে। চারু তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাজীর

সঠিক সংবাদ পাইলেন না। অগত্যা পুনর্ব্বার তাহাকে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। তিনি স্থির করিলেন, নন্দলালের বাটীতে তাহার কর্ম্মস্থানের সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইবে, তারপর নন্দলালের নিকট যাওয়া যাইবে। এই যাত্রাকালেই একদিন রাত্রিতে অন্য কোন স্থানে আশ্রয় না পাইয়া তাহাদিগকে মাণিকগঞ্জ পূর্ব্বোক্ত ভগ্নমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা জানিতেন না যে এই গ্রামেই নন্দলাল রহিয়াছেন। ঘটনা ক্রমে সেই দিনই নন্দলাল একবার চারুর দর্শন পাইয়া ছিলেন।

ইহার পর তাঁহারা ইতঃস্তত পর্য্যটন করিয়া সেই রাত্রিকালে চাঁদ বাটীতে উপস্থিত হন। কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ায় আর কোথাও আশ্রয় পান নাই। তখন তাহারা নন্দলালের বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করেন। তদনুসারে এই বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকে তাঁহারা দেখিতে পান, অনবরুদ্ধ বৈঠকখানায় একব্যক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তখন তাহার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করিবার জন্য তাহারা অগ্রসর হইলেন শায়িত পুরুষের নিকটস্থ হইয়াই চারু চমকিয়া উঠিল। ক্রমে আরও নিকটে আসিল, তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। বাবাজী চারুর মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, শায়িত পুরুষ আর কেহ নহে, নন্দলাল। এই সময় নন্দলাল স্বপ্নঘোরে চারু! চারু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চারু আর দাঁড়াইতে পারিল না, অবসন্ন দেহে নন্দলালের পদতলে বসিয়া পড়িল। তাহার বহুদিনের সঞ্চিত অশ্রুরাশি স্বামীর চরণে ঢালিয়া জীবন সার্থক করিল।

চারুর দুঃখপূর্ণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে নন্দলাল আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। আনন্দে-কৃতজ্ঞতার আবেগে বাবাজীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

বাবাজীর আর বৃন্দাবনে যাওয়া হইল না। এক বৎসর পরে একটী সোণার পুতুল আসিয়া চারুর ক্রোড় আলোকিত করিল। বাবাজী তাহার নাম রাখিলেন বৃন্দাবন চন্দ্র।

সমাপ্ত।

---*---

# জ্যোতিষ তত্ত্ব।

লেখক—শ্রীযুক্ত কালিনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল।

## তারাকাহিনী।

### কৃত্তিকা নক্ষত্র।

বৃষ মণ্ডলের পশ্চিম ভাগ প্রাচীনকালে মাতৃমণ্ডল নামে একটী স্বতন্ত্র তারামণ্ডল বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই মাতৃমণ্ডলের তারাগণের মধ্যে ছয়টী তারায় ক্ষুরাকৃতি কৃত্তিকা নক্ষত্র গঠিত। এই নক্ষত্র প্রাচীন নক্ষত্র চক্রের প্রথম নক্ষত্র ছিল, কারণ তৎকালে এই নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ( Vernal Equinox ) অবস্থিত ছিল। কিন্তু আধুনিক নক্ষত্র চক্রে কৃত্তিকা তৃতীয় নক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত। এই কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমারচন্দ্র কার্ত্তিক মাসের নাম দিয়াছে। এই পূর্ণিমাকে রাশ পূর্ণিমা ( নৃত গীত পূর্ণিমা ) বলে। মাতৃ মণ্ডলস্থ ষট্‌কৃত্তিকা স্কন্দদেবের ধাত্রী ছিলেন ( রামায়ণ ১, ৩৮, ২৩ ) এই জন্য স্কন্দদেবের ছয় মুখ এবং এই জন্য তাঁহার কার্ত্তিকেয় নাম ( পদ্মপুরাণ ১।৬ )। কৃত্তিকা নক্ষত্রের অপর নাম বহুলা বলিয়া কার্ত্তিক মাসের অপর নাম বাহুল। কৃত্তিকা নক্ষত্র তারাবৃষের ককুৎ। সূর্য্য নারায়ণ মহাবিষুসংক্রান্তি দিনে এই ককুদে উপনীত হইতেন এ জন্য তৎকালে তিনি ককুৎস্থ হইতেন। সূর্য্যবংশীয় রাজা মাত্রেই কাকুৎস্থ বা ককুৎস্থ সন্তান।

কার্ত্তিকাদি বর্ষের প্রথম দিনে পূর্ণচন্দ্র কৃত্তিকা নক্ষত্রে উদয় হইত, এজন্য চন্দ্রের নাম কৃত্তিকাভব মহাভারত ( ৩।২২৯।৯১ ) (ক) মতে কৃত্তিকা নক্ষত্র সপ্ততারায় গঠিত। এই চম্পক বর্ণ সপ্ততারা ঠাকুর মার গল্পের সাতভাই চম্পা" এবং কৃত্তিকার পার্শ্বস্থ করবীর বর্ণরোহিনী নক্ষত্র ( খ ) ঠাকুর মার গল্পের "বোন্ করবী" "বা ভাই পারুল" ক্ষুরাকৃতি কৃত্তিকার সহিত শশাঙ্কের সমাগম ( Conceuction ) হইলে তারাক্ষুর অদৃশ্য হয়। এই ব্যাপার মূলে ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ প্রহেলিকার উদ্ভব হইয়াছে। প্রহেলিকাটী এই "শশ ক্ষুর ভক্ষণ করে"

---

(ক) নক্ষত্রম্ সপ্তশীর্ষভিঃ।

( খ ) প্রাচীন কালে রোহিণী নক্ষত্র রক্ত করবীর বর্ণ এক তারায় ( Aldebaron ) গঠিত ছিল।

( ঋ, বেঃ ২০।২৮ (গ) কৃত্তিকাগণ কিরূপে নক্ষত্র পদ পাইল তাহা মহাভারতে (৩।২২৩-২৩০) বিশদ রূপে বর্ণিত আছে। কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারত হইতে তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। জিজ্ঞাসু পাঠক মহাভারতের নবম অধ্যায় কয়েকটী পাঠ করিয়া দেখিবেন।

"তিনি (অগ্নিদেব) মহর্ষিগণ প্রদত্ত বিবিধ হব্য গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণকে প্রণাম করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে সেই সকল মহাত্মা মহর্ষিগণের (ঘ) পত্নীরা (ঙ) তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবিষ্ট কেহ কেহ বা নিদ্রিত ছিলেন। ভগবান্ হুতাশন রুক্ম বেদির চন্দ্রলেখার ন্যায় হুতাশন শিখার ন্যায় সেই ঋষিপত্নীগণকে অবলোকন করিয়া কন্দর্প শরে নিতান্ত কাতর হইলেন।

পরিশেষে তাহাদের অলাভে নিতান্ত সন্তপ্ত ও মরণে কৃত নিশ্চয় হইয়া বনে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে দক্ষ দুহিতা স্বাহা ভগবান্ হুতাশনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। দক্ষ তনয়া এক্ষণে অগ্নিকামার্ত্ত হইয়া বনে গমন করিয়াছেন, জানিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি সপ্তর্ষি পত্নীগণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নির নিকট গমন করি। তাহার পরিতোষ লাভ ও আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

২২৩। দক্ষ দুহিতা স্বাহা দেবী প্রথমে অঙ্গিরার সহধর্ম্মিণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাবকসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে হুতাশন আমি অঙ্গিরার ভার্য্যা আমার নাম শিবা।

তিনি অরুন্ধতীর অসামান্য অঙ্গ প্রভাব ও অকৃত্রিম স্বামীশুশ্রূষা নিবন্ধন তদীয় দিব্য রূপ ধারণে অসমর্থ হইলেন।

এইরূপে তিনি ৬জন মহর্ষি পত্নীর রূপ ধারণ করিয়া প্রতিপদ তিথিতে সেই অগ্নিরেত কাঞ্চন কুণ্ডে ৬বার নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজময় স্কন্দরেত হইতে

(গ) ভাষ্যকার গণ এই বেদ মন্ত্রের সহজ ব্যাখ্যা করেন।

(ঘ) মরীচিঃ অত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুঃ অঙ্গিরাঃ॥ বশিষ্ঠঃ চ মহাভাগঃ ব্রহ্মণঃ মানসাঃ সুতাঃ॥

(ঙ) সংভূতিঃ অনুসূয়াচ ক্ষমা প্রীতিঃ চ সন্নতিঃ। অরুন্ধতী তথা লজ্জা তৎপত্ন্যোঃ লোকমাতরঃ॥ [illegible]

এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত তাহার নাম স্কন্দ ( Gsrkandaon the Prence ) হইল।

২২৪। বন বাসীরা কহিত এই ৬ পত্নী ষড়াননের প্রসূতি। এইরূপে সপ্তর্ষিগণ সন্তান উৎপত্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেবী অরুন্ধতী ব্যতিরেকে ৬ পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন।

২২৭। * * তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্কন্দদেবকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহর্ষিগণ পূজা করিতে লাগিলেন।

২২৮। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! এদিকে সেই ছয়জন মহর্ষি-পত্নী স্ব স্ব পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অসামান্য শ্রীসম্পন্ন দেব সেনাপতি কার্ত্তি-কেয়ের সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমাদের স্বামীগণ ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া বিনাপরাধে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন কোন ব্যক্তি আমাদিগের ভর্ত্তৃগণকে কহিয়াছে, আমরা তোমাকে সমুৎপন্ন করিয়াছি। তাহারা এই কথা শ্রবণে বিচার না করিয়াই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। হে মহাভাগ! তোমার প্রসাদে আমাদের অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। আমরা তন্নিমিত্তই তোমাকে পুত্র করিতে বাসনা করি। তুমি আমাদের পুত্র হইয়া মাতৃঋণ হইতে মুক্ত হও।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহর্ষি পত্নীগণ! আপনারা আমার মাতা আমি আপনাদের পুত্র। এতদ্ভিন্ন আপনারা আর যাহা অভিলাষ করেন, তৎসমুদয়ও পূর্ণ হইবে। অনন্তর কার্ত্তিকের দেবরাজকে বিবক্ষু দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, সুর রাজ! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাত্মন্ রোহিণীর (চ) কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ স্পর্দ্ধা করিয়া জ্যেষ্ঠ হইবার বাসনায় তপোনুষ্ঠান করিতে বনে গমন করিয়াছে। তন্নিমিত্ত আমি নক্ষত্র সংখ্যাপূরণে অসমর্থ হইয়াছি। অতএব এক্ষণে তুমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া গগনচ্যুত অভিজিতের পরিবর্ত্তে অন্য নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় চিন্তা কর। স্কন্দ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া (ইন্দ্র) ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে তিনি ধনিষ্ঠাদি কালের কল্পনা করিলেন। সেইকালই পূর্ব্বে রোহিণী নক্ষত্র হইয়াছিল। এদিকে কৃর্ত্তিকাগণ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নক্ষত্র সংখ্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিলেন। তাহারা ছয়জন স্বাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়া সপ্তর্শী ও নক্ষত্ররূপে অদ্যাপি দীপ্তি পাইতেছেন।

(চ) এই রোহিণী নক্ষত্রের বর্ত্তমান নাম জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র।

# সংক্রামক রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়।

লেখক—ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি।

আজকাল—অণুবীক্ষণ—যন্ত্রের সাহায্যে অনেক প্রকার সংক্রামক রোগের বীজাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল বীজাণু ক্ষেত্রানুসারে বিভিন্ন প্রকার রোগ উৎপন্ন করে। যেমন শস্যের বীজ প্রস্তরে বপন করিলে অঙ্কুরিত হয় না, সেই রূপ কোন কোন রোগের বীজাণু কোন কোন মানব দেহরূপ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়া যায়। উর্ব্বর ক্ষেত্রে জাত বৃক্ষ হইতে যেরূপ প্রচুর ফল জন্মে, সেইরূপ অন্তঃসার শূন্য নিস্তেজ দেহে রোগের বীজাণু সকল প্রবিষ্ট হইয়া অতি অল্পকালেই ভীষণরূপ ধারণ করে। একই ফুল কপির বীজ যেমন প্রস্তরে অঙ্কুরিত হয় না, অথবা বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক মাটির টবের উপর লাগাইলে বিকৃত ও ক্ষুদ্র ফুলকপি প্রসব করে কিন্তু উর্ব্বর ক্ষেত্রে লাগাইলে অতি সুন্দর এবং বৃহৎ পুষ্প ধারণ করিতে সমর্থ হয়; সেইরূপ রোগের বীজাণুর ও ক্ষেত্রানুসারে হ্রাস বৃদ্ধির তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

বহুপ্রকার রোগের বীজাণুর সংস্পর্শে থাকিলেও সকলের দেহে সকল প্রকার সংক্রামক রোগ প্রবেশ করিতে পারে না। কেন না কোন কোন লোকের স্বভাব সিদ্ধ রোগ বীজ সহিষ্ণুতা শক্তি আছে, অর্থাৎ সংক্রামক রোগসকল ইহাদের শরীরে সহসা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অনেকেই দেখিয়াছেন যে, প্লেগ, বসন্ত ও ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীর সেবা করিয়া সকলেই যে, সেই সেই রোগগ্রস্ত হইয়াছেন এরূপ নহে। কিন্তু অনেকের এই প্রকার স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা নাই বলিয়া যুক্তিযুক্ত উপায়ে যাহাতে এই সহিষ্ণুতা শক্তি জন্মে বা বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ ভাবে জীবন যাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

প্রাচীনকালে ঋষিগণ দেহ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য বিধি পূর্ব্বক রসায়ন সেবন করিতেন, এবং যে স্থানে সংক্রামক রোগের আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখিতেন সেই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। কিন্তু যাঁহাদের স্থান পরিত্যাগ করিবার সুবিধা নাই বা যাঁহারা বহুমূল্য ও বহু প্রয়াসসাধ্য রসায়ন সেবন করিতে অক্ষম তাঁহাদের পক্ষে কতকগুলি সদুপদেশ প্রতিপালন করা ঐকান্তি কর্ত্তব্য।

১। অনেকেই জানেন যে খাদ্য ও পানীয়ের সহিত অনেক রোগের বীজাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে। ভাত, ডাল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য যে উত্তাপে সিদ্ধ হয়, সেই উত্তাপে কোনও রোগের বীজ জীবিত থাকিতে পারে না। অন্ন সিদ্ধ করিবার সময় যে উত্তাপ আবশ্যক হয়, সেই উত্তাপের কিয়দংশ অন্নে বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে ভোজন করিলে আহারের সহিত রোগের বীজাণু দেহে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই মহর্ষি চরক বলিয়াছেন,—উষ্ণং ভুঞ্জীয়াৎ"। অন্ন শীতল হইলে তাহাতে অনেক মক্ষিকাদি বসিয়া রোগের বীজাণু মিশাইয়া দিতে পারে। সেইজন্য খাদ্য দ্রব্য ও কর্ত্তিত ফল মূলাদি সকল অনাবৃত রাখা কখনও উচিত নহে। এস্থলে আরও একটী বলা আবশ্যক যে, অন্ন অত্যন্ত গরম অবস্থায় খাইলে বলহানি হয় এবং অত্যন্ত শীতল বা শুষ্ক অন্ন খাইলেও শীঘ্র পরিপাক পায় না। অতএব অন্নের উত্তাপের মধ্যম অবস্থায় ভোজন করাই যুক্তি-যুক্ত।

মাংস, অন্ন, দুগ্ধ, জল সুসিদ্ধ হইলে পাকের অগ্নির প্রভাবে নির্দ্দোষ হয় অর্থাৎ এই সকল পদার্থের সহিত কোনও রোগেরই বীজাণু জীবিত থাকিতে পারে না। সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, বহ্নি সর্ব্বভুক্। অগ্নির যুক্তি-যুক্ত ব্যবহারে মানবগণ যে উপকার পাইতে পারেন তাহা শত শত ঔষধেও পাওয়া সুকঠিন।

২। শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত করিয়া লইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়; ইহা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। অল্প চেষ্টায় অনেক দীনহীন ব্যক্তিও এ উপকার ভোগ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। প্লেগ প্রভৃতি রোগের বীজাণু কিয়ৎকাল রৌদ্রে থাকিলেই নষ্ট ও নিস্তেজ হইয়া যায়। অনেক রোগের বীজ অবরুদ্ধ বায়ুতে জন্মায়। বাসস্থানে যাহাতে বায়ু অবরুদ্ধ না থাকে, এইরূপ চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। নদী তীরে অথবা মাঠে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে ব্যাধি হইবার আশঙ্কা কমিয়া যায়; যাঁহাদের দূর দেশে গমন করিয়া বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহাদের নদী তটে বা মাঠে পরিষ্কার বায়ু সেবন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। একই গ্রামে বা সহরে গুদামের ন্যায় ঘর হইতে বহির্গত হইয়া মাঠে কিছুক্ষণ শীতল পরিষ্কার বায়ু সেবন করিলে স্থান পরিবর্ত্তনের ফল পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য প্রদেশে আজকাল ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে ঘরের বাহিরে রাখিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে দেওয়া হয়। বিশুদ্ধ বায়ুতে যত থাকা যায় ততই দেহাভ্যন্তরস্থ রোগের বীজ ধ্বংশ হইয়া যায়।

৩। ব্যায়াম করিয়া শরীর দৃঢ় করিতে পারিলে ব্যাধি হইবার আশঙ্কা

অনেক পরিমাণে কম হয়। আমাদের দেশে ব্যায়াম যত প্রচলিত হইবে ততই মঙ্গল। আজ কাল অজীর্ণরোগ আমাদিগকে অন্তঃসার শূন্য করিয়াছে। ব্যায়াম করিলে, এমন কি বিরুদ্ধ ভোজন ( দুগ্ধ, মৎস্য ও মাংসাদি একত্র ভোজন ) বা বিদগ্ধ ভোজন ( ভাজা ও চোঁয়া ) শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ব্যায়াম দ্বারা সত্ত্ব-গুণ বর্দ্ধিত হয় এবং এই সত্ত্বগুণের দ্বারা মানুষ ইন্দ্রিয় সংযমে সমর্থ হয়। তদ্ভিন্ন সত্ত্বগুণ বাড়িলে, অনেক রকম সংক্রামক রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

৪। যত প্রকার সংক্রামক রোগ আছে, তাহাদের মধ্যে গরমী ( ফিরঙ্গ রোগ ) এবং গণোরিয়া এই দুইটীর মত ভয়ানক রোগ আর নাই। গরমী হইতে সকল প্রকার দুরারোগ্য জটিল রোগ সকল মনুষ্য শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া যৌবনে জরা আনিয়া উপস্থিত করে, অচির কালের মধ্যেই মনুষ্যকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। কোনও কারণ বশতঃ গণোরিয়া রোগের পুঁয একবার চক্ষুতে লাগিলে চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। ঐ সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত। স্ত্রীলোকের শরীরে যদি গণোরিয়া বিষ থাকে এবং প্রসবের সময় যদি সেই বিষ কোন প্রকারে সন্তানের চক্ষে লাগে তাহা হইলে শিশু জন্মান্ধ হইয়া যায়। এই দুইটী সংক্রামক রোগ বোধ হয় জগতের অর্দ্ধাংশ বা ততোধিক লোকের অশান্তির কারণ। সকলে যদি এই উপদেশানুসারে চলেন তাহা হইলে এই দুইটী সংক্রামক রোগের বৃদ্ধি ও বিস্তার কমিয়া যায়।

৫। গো বীজের টীকা লইলে সে বৎসর প্লেগ ও বসন্ত রোগ হইবার সম্ভাবনা অনেক হ্রাস হয়।

জগতে অসংখ্য প্রকার রোগের বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই সকল বীজের সংস্পর্শে আমাদিগকে অহরহঃ আসিতে হইতেছে। ক্ষয় রোগের বা প্লেগ সংক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসিবার কখনও সম্ভাবনা নাই, এমনকুলের কুলবধূ-গণেরও প্লেগ বা যক্ষা হইতে দেখা যায়। সুতরাং জগৎ হইতে বীজাণু ধংশ করা অপেক্ষা দেহরূপ ক্ষেত্র যাহাতে রোগবীজের পক্ষে মরুভূমি হয়, সেইরূপ ভাবে জীবন যাপন করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

আজকাল পাশ্চাত্য আবিষ্কারে জানিতে পারা গিয়াছে যে, য়্যানোফিলিস নামক মশকই ম্যালেরিয়া জ্বরের অঙ্কুর বাহক এবং মূষিক প্লেগ রোগাণুর বাহক। কিছুদিন পরে এইরূপ কত রোগাণু ও তাহাদের বাহক আবিষ্কৃত

হয় রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ অপেক্ষাও কঠিন। ঝড়ের সময় নাবিকদের ঝড় নিবারণ করা যেমন কঠিন ইহাও তদপেক্ষা কিছু পরিমাণে কম নহে। নাবিকের পক্ষে হাল ছাড়িয়া ঝড়ের সহিত মুষ্টিযুদ্ধ করিতে যাওয়াও যেরূপ জগৎকে রোগ বীজাণু শূন্য করিতে যাওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ।

মূষিক মারা, মোশক মারা, অনেক রোগের বীজাণুবাহি মক্ষিকা মারা, কাক মারা, এই প্রকার কত উপায়েই মনুষ্য আত্মরক্ষা করিতে উপদিষ্ট হইতেছে। কিন্তু এবিষয়ে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, এত প্রকার জীবহত্যা না করিয়া নির্ভয়ে, চিত্তে বল আকর্ষণ করিয়া সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে আবশ্যক হইলে যথাসাধ্য সেবা করা উচিত। রোগীর সেবা করিতে করিতে ডাক্তার বা পরিচারকগণের এক প্রকার সহিষ্ণুতা জন্মে। পূর্ব্বে রোগ-বীজাণু সম্বন্ধে আমার যে সকল সংস্কার ছিল, এক্ষণে কলিকাতার ড্রেন পরিষ্কারক মেথরগণের স্বাস্থ্য দেখিয়া সে ধারণার ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে। একটা বাঙ্গলা কথা প্রচলিত আছে যে, "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়", ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। যাহাদের মনে বল নাই, তাহাদের সংক্রামক রোগীর সংস্পর্শে আসা উচিত নহে।

প্রত্যেক চিকিৎসকই বিদিত আছেন যে, আমাদের শরীরের স্বাভাবিক রোগ সহিষ্ণুতা শক্তিই অসংখ্য রোগের বীজ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। কারণ, এই শক্তির অভাবেই আমাদের শরীর নানা রোগের ক্ষেত্র স্বরূপ হইয়া থাকে। জীবনী শক্তির তারতম্যে এক ব্যাধিই নানা প্রকারে আমাদের শরীরে বিকাশ পাইতে পারে। এই শক্তি যে পরিমাণে হ্রাস হইবে, তদনুসারে এক রোগের বীজ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইবে। ক্ষেত্রের গুণেই রোগের নানা ভাবে বিকাশ হইয়া থাকে।

রোগ বা জরা হইতে দেহকে রক্ষা করিতে হইলে প্রথমে চিত্তের বল যাহাতে বাড়ে এইরূপ প্রক্রিয়া করা উচিত। চিত্তে বল বাড়াইবার প্রথম সোপান ইন্দ্রিয় সংযম বা ব্রহ্মচার্য্য। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ধীর ও জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারিলে রোগ সহিষ্ণুতা শক্তি বর্দ্ধিত হইবে না, সহিষ্ণুতা শক্তির অভাবেই মানুষ শীঘ্র শীঘ্র রোগগ্রস্ত হয়। যেমন, আফিং সেকো প্রভৃতি বিষ অভ্যাস করিলে অধিক পরিমাণে সেবন করা যায়, সেইরূপ ড্রেন পরিষ্কারক মেথরেরাও অনেক প্রকার রোগ বীজাণু হইতে সহিষ্ণুতা প্রাপ্ত হয়। আয়ুর্ব্বেদ বলেন— "বিষস্যতো যথা, কীটোন বিষেণ বিপদ্যতে" যত অস্বাভাবিক উপায়ে দেহকে

রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে ততই দেহের সহিষ্ণুতা শক্তি হ্রাস পাইবে। যতটুকু স্বাভাবিক নিয়মের উপর দেহকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিবে ততই দেহ কার্য্যক্ষম হইবে। স্থিরচিত্তে দেখিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, উষ্ণপ্রধান দেশে যাঁহারা কম্ফের্টার প্রভৃতি গরম পশমী বস্ত্র ব্যবহার করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা অনাবৃত দেহ ধীবরগণের শ্লেষ্মার ব্যাধি কম হয়। দেহ দৃঢ় করিতে হইলে, এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে হইলে, প্রকৃতির নিয়ম প্রতি পালন করতঃ সকল বিষয় সহ্য করিতে শিক্ষা করা উচিত।

---

# রঙ মহলের প্রেম।

লেখক—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

## প্রথম স্তবক।

### ঘোর রহস্য।

১৮০৭ সাল। সুলতান তৃতীয় সেলিম তুরুস্কের সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছেন। এই বিশাল রাজ্যের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক এবং রাজনৈতিক গগনে তখন একটি প্রবল ঝটিকা উঠিয়াছিল। সকলেরই মন সেই দিকে আকৃষ্ট, সকলেই উদ্বিগ্ন—সকলেই চিন্তিত! এই সকল রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কনষ্টাণ্টিনোপল অধিবাসিবর্গের হৃদয়ে আর একটি অভিনব চিন্তার উদয় হইয়াছিল; বড় সুচিন্তা নহে; প্রত্যেক অধিবাসীর মনে একটি ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অনন্যকর্ম্মা হইয়া, সেই কথাই ভাবিতেছে; ধনবান, দীনহীন এবং মধ্যবিত্ত সকলে সর্ব্বক্ষণ সেই বিষয়েই তর্ক বিতর্ক করিতেছে, অথচ কেহই এ বিষম রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ফলতঃ, সকলেরই মন উদ্বিগ্ন, সকলেরই মন চঞ্চল, এবং সকলেই বিষম ভীত। রাজ্য-মধ্যে ভীষণ মারিভয় উপস্থিত হইবার কথা শুনিলেও, লোকের মন এত বিচলিত হইত কি না সন্দেহ। দিবাভাগে দিবাকরোজ্জ্বল সুনীল নভোমণ্ডলের পরিবর্ত্তে নিশাকালে নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত স্নিগ্ধকর-সুধাকর-কর-পরিশোভিত গগনের পরিবর্ত্তে, যদি প্রগাঢ় কুজ্ঝটিকা দানে কনষ্টাণ্টিনোপল নগরী দিন যামিনী-সমাচ্ছন্ন থাকিত, যদি ঘোরতর কুয়াসায় লোকলোচনের দৃষ্টি-শক্তি প্রসারণ একেবারেই বিলুপ্ত

হইত, তাহা হইলেও বোধ হয়, নাগরিকগণ এত উৎকণ্ঠায়; এত উদ্বেগে, এত বিভীষিকা পূর্ণ অন্তরে কালক্ষেপ করিত না।

এত চিন্তা, এত উৎকণ্ঠা এবং এত ভীতি কিসের? সুলতান সেলিমের যথেচ্ছাচার, অবশ্য ইহার কারণ নহে, কারণ তাৎকালিক রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনি একজন সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক সম্রাট ছিলেন; তাঁহার ন্যায়পরতা ও সুশাসনের খ্যাতি রাজ্য-মধ্যে সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বিনা বিচারে কাহারো কোন সম্পত্তি রাজসরকারে বজায়াপ্ত হইবে না—উপযুক্ত বিচারালয়ে উপযুক্ত বিচার ব্যতিরেখে বা বাদসাহের বিশেষ আদেশ ব্যতীত, কেহ কাহারো জীবন নষ্ট করিতে পারিবে না—করিলে যে উপযুক্ত দণ্ড পাইবে—এ আজ্ঞা তিনিই প্রথম প্রচার করেন। যথেচ্ছাচারী বাদসাহগণের মধ্যে যিনি এরূপ সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে—এরূপ অপক্ষপাতিতা দেখাইতে সাহস ও আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে রাজা বা রাজকর্ম্মচারীর কোন প্রকার পীড়নে প্রজাসাধারণের অন্তঃকরণ কখনই এতাধিক বিচলিত হইতে পারে না। বাস্তবিকও, রাজা বা রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারে প্রকৃতি পুঞ্জের হৃদয়ে এ ভীতি সঞ্চার হয় নাই। ফলতঃ, ইহা মূর্খ জনগনের মানস-কল্পিত অমূলক ভয়ও নহে। এ সাধারণ ভীতির—এ উৎকণ্ঠার মূলে সত্য প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রকৃত ও সত্য-মূলক। কনষ্টাণ্টিনোপল-বাসীগণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শুভানুধ্যায়ী পাঠকগণের মনে এ উৎকণ্ঠাকে আমরা অধিক্ষণ স্থায়ী হইতে দিব না। আমরা এ সাধারণ বিভীষিকার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি—যে সময় আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে—তাহার দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে কনষ্টাণ্টিনোপলবাসীগণের অন্তঃকরণে একটি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শব বস্‌ফোরস্ নদী-বক্ষে ভাসমান্ দেখা যাইতেছে, শবের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিন তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত শবরাশি নদীতটে পতিত থাকিয়া, নাগরিকগণের হৃদয়ে বিষম বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া দিতেছে, এ বিশ্বাস ক্রমেই লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

ব্যভিচারিণী পত্নীদিগের ও অবিশ্বস্তা ক্রীত-দাসীগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, প্রতারিত পতিগণ ও উপপতি প্রভৃতিরা যে, অনেক সময় গোপনে নিজে নিজেই অপরাধীদিগের দণ্ড বিধান করিবেন তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না; সেই দণ্ড যে অতি কঠোর প্রাণ দণ্ড, তাহাও সকলে জানিত। সুতরাং

আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু বিগত দুই বৎসরে শবের সংখ্যা এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে যে, সহজেই লোকের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। বিশেষতঃ, বিস্ময়ের বিষয়, এই সকল শব নারী দেহ না হইয়া, অধিকাংশই প্রায় পুরুষের মৃতদেহ। লোকের মন যতই ঐ দিকে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইল, ঐ সকল শবের বিষয় লোকে যতই চিন্তা করিতে লাগিল। ততই তাহাদের মনে নূতন নূতন সন্দেহের উদয় হইতে আরম্ভ হইল। আমরা এক এক করিয়া, সেই সকল সন্দেহের আলোচনা করিয়া দেখিব।

অবিশ্বাসিনী রমণীগণের ভর্ত্তারাই বল, আর অন্যাসক্তা রক্ষিতা বারবিলাসিনী নারিগণের উপপতিরাই বল, যখনই তাহারা অধীনস্থা কোন রমণীর প্রাণদণ্ড বিধান করিত, তখনই তাহারা পাপমতি হতভাগিনীদিগের মৃতদেহ একটি থলিয়া পূরিয়া, তাহার মুখ বদ্ধ পূর্ব্বক বস্‌ফোরস্ নদীর তরঙ্গে নিক্ষেপ করিত। পক্ষান্তরে রাজ-অন্তঃপুর বা রাজপ্রাসাদে কোন গুপ্ত হত্যা সংঘটিত হইলে, (পাঠক ভুলিবেন না, সুলতান যদিও নূতন দণ্ডবিধি আইন প্রচার করিয়া, বিনা বিচারে অপরাধীর প্রাণদণ্ড রহিত করিয়াছেন, তথাপি তিনি প্রয়োজন মত ঐরূপ দণ্ড বিধান করিবার অধিকার ত্যাগ করেন নাই।) প্রায়ই সে কার্য্য রজ্জুর সাহায্যে সম্পন্ন হইত। এইরূপে যাহাদিগকে ইহসংসার হইতে অকালে সরাইয়া দেওয়া হইত, তাহাদের শবের গলদেশে রজ্জু ত আবদ্ধ থাকিতই, অধিকন্তু রজ্জুর সংঘর্ষণে সেই সেই গলদেশ স্ফীত, কালিমা প্রাপ্ত ও রক্তাক্ত পরিলক্ষিত হইত। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজকাল যে সকল শব বস্‌ফোরস্ তরঙ্গে ভাসমান্ বা নদী-তীরে নিপতিত দৃষ্ট হইত, তাহাদিগের কোনটিরই প্রাণদণ্ড করিবার জন্যই পূর্ব্বোল্লিখিত উপায় দ্বয়ের অন্যতরের সাহায্য লওয়া হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ সকল শব প্রায়ই পুরুষের মৃত দেহ; সুতরাং যাহাদিগের জন্য সাধারণতঃ থলিয়া ব্যবহৃত হইত। তাহারা সে শ্রেণীভুক্ত নহে। কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ তরয়াল বা ছোরা দ্বারা পশ্চাৎ ভাগ হইতে স্কন্ধদেশে আঘাত পূর্ব্বক প্রায়ই ঐ সকল হত্যা কার্য্য সম্পন্ন হইত, আহত স্থানগুলি বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ইহাও বিলক্ষণ প্রতীত জন্মিত যে, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক পশ্চাৎ হইতে কেহ হঠাৎ অসন্দিগ্ধচিত্ত হতভাগ্যদিগকে আঘাত করিত।

এই সকল ভয়ানক হত্যাকাণ্ডে আরও একটি নূতনত্ব ছিল। হতভাগ্যগণ সকলেই সুন্দর রূপবান্ যুবাপুরুষ; কাহারই বয়স অষ্টাদশের ন্যূন বা ত্রিংশত্বের

অধিক নহে। হত্যার পর কাহারও কোন দ্রব্যাদি হত্যাকারীরা স্পর্শও করিত না। তাহাদের মধ্যে ধনী, দীন এবং মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর তুর্ক, ইহুদি এবং গ্রীক প্রভৃতি সকল জাতির লোকই দৃষ্ট হইত। তটে নিক্ষিপ্ত ধনী যুবকের অঙ্গে রত্নালঙ্কার ও তাহার পকেটে স্বর্ণ মুদ্রা-পূর্ণ মণিব্যাগ যেমন সমভাবে লক্ষিত হইত। তেমনই হীনবস্থ যুবকের পকেটের পয়সাটি পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য থাকিত। ইহাতে স্পষ্টই অনুভব হয় যে, লুণ্ঠন বা অর্থ-লিপ্সায় হত্যাকারীগণ এই সকল গর্হিত কার্য্য করিত না। ডাক্তারেরা ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া, যতদূর অনুধাবন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস, আঘাতগুলি একই অস্ত্রের দ্বারা এবং একই ভাবে হইয়াছে। এই উভয় বিষয় আলোচনা করিয়া, সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এই সকল হত্যাকাণ্ড একই স্থান হইতে, একই জনের দ্বারা সাধিত হইতেছে।

যে দুই বৎসর ধরিয়া, এইরূপ কাণাঘুসা চলিতেছে, এই সময়ের মধ্যে প্রায় শতাধিক সুরূপ যুবক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে? অন্ততঃ, ঐ পরিমাণ শব বস্‌ফোরস্ নদীতে ভাসমান দৃষ্ট হইয়াছে। আর কত শব যে, তরঙ্গ-চালিত হইয়া, মর্ম্মরা সাগরে বা ইউক্সিন নদীতে চলিয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কি সম্ভ্রান্ত, কি ইতর, কি ধনী, কি দীন এইরূপে শত শত পরিবারে কেহ প্রিয়তম পতির জন্য, কেহ প্রাণ-প্রতিমা ভ্রাতার জন্য, কেহ প্রাণাধিক পুত্রের জন্য, অহোরাত্র আর্ত্তনাদ করিতেছে। এইরূপে এক এক করিয়া, সমস্ত নগরবাসীর প্রাণে একটা দারুণ বিভীষিকা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সকলেই মহা আশঙ্কিত—সকলেই বিষম ভীত—সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়!

এইরূপ কত লোকে কত কল্পনাই করিতেছে; এই মাত্র যাহা কারণ বলিয়া স্থির হইল, পরক্ষণেই আবার তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। প্রথম প্রথম লোকে মনে করিতে লাগিল, এই সকল হত্যার মূলে রাজনীতির গূঢ় রহস্য অন্তর্নিহিত আছে, কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিয়াই লোকের এ ভ্রম ঘুচিয়া গেল। যে সকল লোক এইরূপে প্রাণ হারাইতেছে, তাহাদের মধ্যে এমত লোক কেহই ছিল না, যাহাদিগকে কোন কারণে গবর্ণমেণ্ট ভয়ের চক্ষে দেখিতে পারেন। কারণ, তাহারা সকলেই তরলমতি যুবক ও অতি সামান্য দরের লোক, রাজনীতির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। কেহ কেহ এরূপ অনুমানও করিতে লাগিল যে, ইহুদিরা ধর্ম্মান্ধ হইয়া, তুর্ক ও খৃষ্টান-দিগকে এইরূপে হত্যা করিতেছে, এ অনুমানও তর্কের ভর সহিল না। কারণ,

দেখা গেল যে, ইহুদিদিগের মধ্যেও সকলের আশা ভরসা স্থল, অনেক রূপবান্ যুবা পুরুষ এইরূপে প্রাণ হারাইয়াছে। ধর্ম্মান্ধ ইহুদিদিগের এ কার্য্য হইলে, তাহারা কখন এরূপ স্বধর্ম্মীর বিনাশ সাধন করিত না। কোন এক সম্প্রদায় বিশেষ দ্বারা যে, এই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা কোনমতে অনুমতি হয় না। কারণ, সকল সম্প্রদায়ের লোকেই এরূপে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে! বিশেষ কোন প্রকার প্রতিহিংসা ইহার কারণ হইলে, প্রত্যেক হত্যা কার্য্য এইভাবে, একই ঘাতকের দ্বারা এবং একই অস্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হওয়া, কোনমতেই সম্ভাবিত নহে।

পক্ষান্তরে কোন প্রকার প্রতিহিংসাই, যদি এই সকল হত্যার কারণ না হয়, তবে এরূপ ক্রমিক নির্দ্দয় হত্যার অন্য কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? এমন কি অপরাধ মানুষে সম্ভবে, যাহা গোপন করিবার জন্য, নিত্য নিত্য এরূপ শত শত অপরাধ মানুষে করিতে পারে; অনুমান খণ্ড এখানে নির্ব্বাক! সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, যাহারা ভালমন্দ বুঝিতে পারে না, তাহারা কেবল ভয়বিহ্বল ও উত্তেজিত হইয়া, শূন্য দৃষ্টিতে অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। অতি অজ্ঞ, অতি চতুর, অতি বুদ্ধিমানও নিরন্তর মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াও, কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারাও হতভম্ভ হইয়া গিয়াছেন। পরদিন যে কাহার কপাল ভাঙ্গিবে, কোন্ পত্নী যে, পতিহীনা হইবে—কোন্ মাতা যে, পুত্র হারাইয়া পথের ভিখারিণী হইবে—কোন্ ভগিনী যে সহোদর হারাইয়া, নিদারুণ শোক পাইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ধন সম্পত্তি নাই বলিয়া, দীন দুঃখী নিরাপদ নহে, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া, ধনবানের আশঙ্কা ঘুচিতেছে না। ধনী দীন সমভাবে সর্ব্বক্ষণ ভীতি বিহ্বলচিত্তে দিনপাত করিতেছে। কখন যে, কাহার ভাগ্যে এই অনৈসর্গিক বিপদ ঘটিবে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিতেছে না। হত্যা কিন্তু মারীভয়ের ন্যায় অদৃশ্যভাবে, ছায়ার ন্যায় সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে!

এই সকল গুপ্তহত্যার কারণ অনুসন্ধান করিতে, হত্যাকারী বা হত্যাকারী-দিগকে ধরিবার জন্য পুলিশ কর্ম্মচারীগণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র অতিরিক্ত পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াই যে, পুলিশ নিশ্চিন্ত আছে, তাহা নহে। তৎকালে সকল সভ্যদেশে যত প্রকার গুপ্ত অনুসন্ধানের প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার সকল গুলিই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে; জজ, মাজিষ্ট্রেট ও কনষ্টেবলগণ স্ব স্ব প্রাণের মায়া ত্যাগ

করিয়া, বিভিন্ন প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক, কনষ্টাণ্টিনোপলের অতি নির্জ্জন, অতি জঘন্য গলিঘুঁজি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। উদ্দেশ্য যদি কোনরূপে কোন প্রকারে এই রহস্য ভেদ করিতে পারেন। পুলিশ আরো শত শত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ফলতঃ, সে সকল বিস্তারিত বর্ণনা করিতে আমাদের সাধ্য নাই—প্রয়োজনও নাই। ফলকথা, সকলই বিফল হইতেছে কোন সন্ধানই হইতেছে না। হত্যা সমভাবেই চলিতেছে, হত্যাকারী একইভাবে পুলিশের ও সাধারণের চক্ষে ধূলি দিয়া, নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে।

লোক সাধারণের মন এতই উত্তেজিত ও ব্যাকুল হইয়াছে যে, কেহই আর স্বীয় কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছে না। যাহারা রাজার ঘোষিত পুরস্কার লাভে অভিলাষী বা যাহারা কোন আত্মীয় হারা হইয়া, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য মনপ্রাণ সেই দিকে উৎসর্গ করিয়াছে, কেবল তাঁহারাই চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেবলমাত্র আঠার বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসরের যুবকেরাই এই সকল হত্যার বিষয়ীভূত, সুতরাং প্রবীণ ব্যক্তিদিগের নিজের জন্য তত ভয়ের কারণ ছিল না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও না কাহারও পুত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয় বা এমত কোন না কোন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল যে, তাহাদের শারীরিক সৌন্দর্য্যই প্রবীণ আত্মীয়ের মনে নিরন্তর আশঙ্কার সঞ্চার করিয়া দিত। এজন্য কি উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী কি মহাজন কি ব্যবসায়ী কি সাধারণ প্রবীণ ভদ্র লোক, সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিতেন। কে যে কখন কোন্ আত্মীয়ের নিদারুণ মৃত্যু সংবাদ শুনিবেন, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। শয্যায় যাইবার সময় তাঁহারা ঐরূপ ভয়ব্যাকুলচিত্তে শয়ন করিতেন। রাত্রির মধ্যে কাহার ভাগ্যে যে কি অনর্থ ঘটিবে, কাহার কোন প্রিয়তম যে, নিরুদ্দেশ হইবে তাহা কে বলিতে পারে ?

কনষ্টাণ্টিনোপলের অবস্থা এইরূপ। যখন আমাদের গল্পের সূত্রপাত। তখন কনষ্টাণ্টিনোপলবাসীগণের মনের অবস্থা এইরূপ। সে ১৮০৭ সালের গ্রীষ্মকাল।

যথেচ্ছাচার-প্রবল দেশে, যেখানে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা বা আদেশই আইন, সেখানে কোন একটা বিষম বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতিকার জন্য প্রজা সাধারণের চক্ষু সহজে রাজার উপরই পতিত হয়। ফলতঃ ইহা অসঙ্গতও নহে।

নৈতিক কারণ বিদ্যমান্ নাই, যদিও তাহারা সম্রাট সুলতান সেলিমকে এই গুরু-তর অপরাধ হইতে অব্যহতি দিয়াছিল, তথাপি কিন্তু তাহারা বাদসাহার উপর ক্রমে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিল "রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য এই সকল গুপ্তহত্যা নিবারণ করা, হত্যাকারীদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া, যদি তিনি তাহা করিতে সমর্থ না হইলেন, তবে তাহাকে আমরা বাদসাহা বলিয়া পূজা করি কেন? আমরা তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বদর্শী বলিয়া, ভক্তি শ্রদ্ধা করি কেন? এই দুই বৎসরের মধ্যেও যদি তিনি দোষীর অনুসন্ধান করিতে না পারিলেন, তবে তিনি কিসের বাদসাহা?

অশিক্ষিত ইতর জনগণ ত একথা বলিবেই, ক্রমে সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের হৃদয়েও এইরূপ ধারণা জন্মিতে লাগিল; আর রাজকর্ম্মচারীগণ প্রজা সাধারণের মনের ভাব বাদসাহার নিকট গোপন রাখিতে সাহস করিলেন না। সুলতান সেলিম তখন বুঝিলেন, পুলিশ এ যাবৎ যাহা কিছু করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক কিছু না করিলে, তাঁহাকে সাধারণের বিরাগভাজন হইতে হইবে। যদিও তিনি তুরুস্কের অন্যান্য যথেচ্ছাচার সম্রাটগণের অপেক্ষা অনেকাংশে সুশিক্ষিত, সদয় ও ক্ষমতাশালী, তথাপি বর্ত্তমান্ অবস্থায় আর এক জন নরপতি যাহা করিয়া থাকেন, তিনি তাহাই করিতে বাধ্য হইলেন।

বাদসাহা রাজসভার মধ্যস্থ রত্নরাজি-বিরাজিত উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট, বহুমূল্য পরিচ্ছদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, প্রধান প্রধান অমত্যগণ সিংহাসনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। এমন সময় বাদসাহ রাজ্যের প্রধান কাদিয়াস্কার বা প্রধান জজকে সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলেন। কাদিয়াস্কার বাদসাহের সমস্ত পুলিসের কর্ত্তা, রাজ্যের সমস্ত সৈন্য বিভাগ তাঁহার অধীন। আমরা যে সময়ে কথা লিখিতেছি, তখন ষষ্ঠী বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ ঐ পদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিলেন। বৃদ্ধের নাম হোসেন ইফেণ্ডী। সুদীর্ঘ অমল-ধবল-শ্মশ্রু ইফেণ্ডির কটিদেশ পর্য্যন্ত লম্ববান এবং পদোচিত মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিহিত; পুলিসের কর্ত্তা ইফেণ্ডী প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ সভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজ্যের প্রথামত সিংহাসনের সম্মুখে তিনবার সষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ট হইয়া, মকমল মণ্ডিত সিংহাসনের পাদদেশ স্বীয় মস্তক দ্বারা তিন-বার স্পর্শ পূর্ব্বক ইফেণ্ডী বাদসাহার মুখের দিকে চাহিলেন। ইফেণ্ডির প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল; বাদসাহের স্বভাবতঃ সহাস্য বদন গম্ভীর উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; ফলতঃ বয়সে যত না হউক, রাজ্যের চিন্তায় সে ললাট-ফলকে যে সকল কুঞ্চন

ইতিপূর্ব্বেই দেখা দিয়াছিল, অন্তরে ক্রোধের উদয় হওয়ায়, সেগুলি এক্ষণে আরো স্থূলতর হইয়া উঠিয়াছে। ইফেণ্ডির প্রাণের সহিত সর্ব্বশরীর কাঁপিল, সভয়ে রাজ আজ্ঞার প্রতীক্ষায় রহিলেন।

সুলতান কহিলেন—"ইফেণ্ডি! এ ব্যাপার খানা কি? তুমি আমার রাজধানীস্থ পুলিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা। দুই বৎসর ধরিয়া আমার রাজ্য-মধ্যে বিষম হত্যাকাণ্ড চলিতেছে, আর তুমি নিশ্চিন্ত আছ। এই দীর্ঘকাল মধ্যে দোষীকে ধৃত করিয়া, দণ্ড দেওয়া দূরে থাকুক, তুমি ইহার কোন অনুসন্ধান পর্য্যন্ত করিলে না! এই বিষম দুর্ব্বোধ পাপাচারের কথা স্মরণ হইলে শরীর রোমাঞ্চ হয়, শত শত পরিবার ইহার বিষয় চিন্তা করিয়া, দারুণ বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। বৃদ্ধের মনে ভয় সঞ্চার হইতেছে, যুবকের শিরায় উষ্ণ শোণিত ধাবিত হইতেছে।

কাদিয়াস্কার বৃদ্ধ ইফেণ্ডী মস্তক অবনত করিয়া উত্তর করিলেন,—"প্রবল প্রতাপ ধর্ম্মাবতার! অধীনকে ক্ষমা করুণ, এ দাস যে নিশ্চিন্ত হইয়া, এই বিষম অরাজকতা দেখিতেছে তাহা নহে। বিবিধ চেষ্টা করিয়াও এ অধম অপরাধীকে ধরিতে পারিতেছি না বা তাহার কোন একটা সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

বাদসাহ কহিলেন,—"আমার প্রজাপুঞ্জ যারপর নাই বিরক্ত হইয়াছে—তাহাদের বিরক্ত হইবার, অসন্তুষ্ট হইবার—যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। এরূপ আর কোন মতেই চলিবে না। এই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড যেরূপে হউক নিবারণ করিতেই হইবে। এই দুই বৎসর ধরিয়া যেরূপে শত শত নির্দ্দোষীর অপমৃত্যু ঘটিতেছে, তাহাতে আমার রাজ্যের উপর নিশ্চিতই ভগবানের কোপদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, প্রজা সাধারণের অন্তঃকরণে ক্রমে বিরাগ জন্মিয়াছে, বিদ্রোহ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; এবং পরম পবিত্র সর্ব্বজন পূজ্য ওসমান নামে কলঙ্ক রটিতেছে, জগতের অন্যান্য জাতিরা ঘৃণার চক্ষে আমাদিগকে দেখিতেছে। শোন ইফেণ্ডি!—তোমার রাজার আজ্ঞা, বিশেষ মনোযোগের সহিত শোন, আজ হইতে তোমাকে আট দিন সময় দিলাম, এই অষ্টাহের মধ্যে যে কোন প্রকারে হউক, অপরাধী বা অপরাধীদিগকে ধরিয়া দিতেই হইবে। যদি এই নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে, রাজ আজ্ঞা পালন করিতে না পার, তবে নবম দিনের সূর্য্যোদয় হইলে, ও-শির আর তোমার স্কন্ধের উপর থাকিবে না। তোমার ঐ মস্তক দেহচ্যুত করিয়া, তোমার প্রাসাদের উপরিভাগে লম্বিত রাখা হইবে, ইহাতে অন্যান্য কাদিয়াস্কার গণেরই এই শিক্ষা হইবে,

তাহারা বুঝিবে যে, এই উচ্চ পদের উপযুক্ত কার্য্য সাধন করিতে না পারিলে, তাহাদের ভাগ্যেও এইরূপ দশা ঘটিবে।"

বজ্র গম্ভীর স্বরে বাদসাহ এই কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিলেন, তাঁহার বদনে ক্রোধের চিহ্ন বিরাজমান, অন্তরে অন্তরে কিন্তু তিনি এই কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি হস্ত চালনা করিয়া, কাদিয়াস্কারকে তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে কহিলেন। হোসেন ইফেন্দী এই বিষম রাজ আজ্ঞায় কোন প্রকরে প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। অতি বিষাদিত মনে কাদিয়াস্কার আবার তিনবার অভিবাদন করিয়া, বাদসাহার সম্মুখ হইতে বিদায় হইলেন এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ভয়বিহ্বলচিত্তে স্বীয় আবাসে চলিলেন।

বাদসাহও অতি খিন্নমনে সভা ভঙ্গ করিয়া, স্বীয় অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার প্রিয়তম পুত্রদ্বয় মস্তফা ও মহম্মদকে নিকটে ডাকিয়া, সভায় যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় তাহাদিগকে বলিলেন। কুমারদ্বয় পিতাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিল। রাজ কর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য বাধ্য হইয়া, তাঁহাকে এইরূপ কঠোরতর আদেশ প্রচার করিতে হইয়াছে বলিয়া বিস্তর বুঝাইলেন।

পাঠক ও পাঠিকাদিগকে এই সময় বলিয়া রাখা উচিত যে, তুর্করাজ সংসারের প্রথানুসারে যুবরাজদ্বয়কে অন্তঃপুর ও তৎসংলগ্ন উদ্যানে আবদ্ধ থাকিতে হয়। বাহ্য জগতের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রবই থাকে না। তাঁহারা প্রাসাদের বাহিরে আসিতে পারেন না; কিংবা বাহিরের কেহ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে না। কিন্তু অন্তঃপুরের বাহিরে দিন দিন যাহা যাহা ঘটিতেছে, তৎসমুদয় যথারীতি তাহাদিগকে অবগত করা হয়। সুতরাং এই দুই বৎসর যাবৎ কনষ্টাণ্টি-নোপলে যে বিষম হত্যাকাণ্ড চলিতেছে, তাহা তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। এ অবস্থায় কাদিয়াস্কারের প্রতি এই কঠোর আজ্ঞা প্রচার করায় তাঁহারা পিতাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

এদিকে হতভাগ্য কাদিয়াস্কার স্বীয় সুবৃহৎ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। পতিপরায়ণা পত্নী ও স্নেহময়ী কন্যাকে নিকটে ডাকিয়া, সজলনেত্রে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলেন, এবং তাহাদিগকে জানাইলেন নবম দিবসে রাজ আজ্ঞা পালনের জন্য লোক সাধারণের অযথা আন্দোলনের জন্য, তাহার এই পলিত কেশ মস্তক ঘাতুকের কুঠারে ছিন্ন হইবে। সকলের চক্ষেই দরদরিত ধারা বহিতেছে। বৃদ্ধ অতি কাতর স্বরে কহিলেন,—"কেমন করিয়া আমি আটদিনের মধ্যে এই

বিষম রহস্য ভেদ করিব, কেমন করিয়া অপরাধীকে ধরিয়া দিব? আমার সুচতুর পুলিসকর্ম্মচারীগণ দুই বৎসর ধরিয়া, ক্রমাগত চেষ্টা দ্বারা যাহা সম্পাদন করিতে পারে নাই, তাহা আট দিনের মধ্যে কেমন করিয়া হইবে? অষ্টাহের মধ্যে দোষীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আজ্ঞা, আর স্পর্শমনির আবিষ্কার বা সঞ্জীবনী সুধা প্রস্তুত করিবার আদেশ উভয়ই তুল্য!"

কাদিয়াস্কারের পরমা সুন্দরী সরলা কন্যা জুলেকা কহিল—"পিতা! পিতা! ইহার কি কোন উপায় নাই? এমন কোন ক্ষমতাশালী বন্ধু কি আমাদের নাই, যাঁহার কথায় সুলতানের মনে দয়ার উদয় হইতে পারে? যাঁহার কথায় সুলতান নিজের এই কঠোর আজ্ঞা রহিত করিতে পারেন?" কাদিয়াস্কার-পত্নী কহিলেন,—"আমার সহোদর—তিনিও ত একজন ক্ষমতাশালী পাশা—অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন—"

হোসেন ইফেণ্ডী পত্নীর কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"সে আশা বৃথা, সুলতান যখন প্রবল প্রতাপ কাদিয়াস্কারকে এরূপ দণ্ড দেওয়া স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে সে সংকল্প হইতে নিরস্ত করা কোন পাশার সাধ্য নহে।"

অনেকক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন। সকলের মুখে বিষাদ চিহ্ন, কেহ কোন কথাই কহিতেছেন না। অবশেষে কাদিয়াস্কার পত্নী উত্তর করিলেন—কি একটা পূর্ব্ব স্মৃতি তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল—জুলেকার মাতা স্বামীর কাণে কাণে কহিল,—"এমত একজন আছেন; আপনি এক সময় তাঁহার একটী বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন আর তিনিও প্রতিশ্রুত হন—"

শুনিবামাত্র বৃদ্ধের বদন প্রফুল্ল হইল, তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল, তিনি উত্তর করিলেন,—"ভাল কথা স্মরণ করিয়াছ, একজন লোক আছেন বটে, তাঁহার নিকট উপকারের আশা করা যাইতে পারে, তাঁহার ক্ষমতার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। একবারের অনুনয়ে সেলিম বাদসাহা মুগ্ধ হইবার লোক নহেন। তাঁহার মুখ হইতে যে আদেশ একবার বাহির হইয়াছে, তাহা রহিত করা সহজ কাজ নহে; কয়েক দিন ধরিয়া, অনুনয় বিনয় করিলে, যদি কিছু হয়।"

কাদিয়াস্কার-পত্নী কহিলেন,—"তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? এই ত কাগজ কলম রহিয়াছে, এখনিই একখানি চিঠি লেখ।—"

হোসেন ইফেণ্ডী কহিলেন,—"এখনই লিখিব, আমার প্রাণাধিকা জুলেকাই

পত্র লইয়া যাইবে। 'যাঁহার কাছে তাহাকে পাঠান যাইতেছে, তাঁহার সম্মুখে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে জুলেকার কিছুমাত্র ভয় নাই। তিনি অতি উদার স্বভাব, তাঁহার হৃদয় অতি কোমল। জুলেকা সুন্দরী তাহার পিতার জীবনের জন্য সজলনেত্রে অনুরোধ করিলে, তিনি অবশ্য মুগ্ধ হইবেন।"

কোথায় কাহার নিকট যাইতে হইবে, জুলেকা তখনও তাহা জানে না,তথাপি সে পত্রবাহিকা হইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। কাদিয়াস্কার পত্র সমাপ্ত করিলেন। পত্র সমাপন করিয়া, কন্যাকে যাহা যাহা বলিবার তাহা বলিয়া দিলেন। দুই জন ক্রীতদাসী জুলেকার সঙ্গে চলিল। পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া, জুলেকা গৃহের বাহির হইল; ক্রীতদাসীরা যথা নির্দ্দিষ্ট দূরে দূরে প্রভু কন্যার অনুসরণ করিয়া চলিল।

জুলেকা অনিন্দ্য সুন্দরী; স্বর্গ ছবিতে যেরূপ বিদ্যাধরীর কথা বর্ণিত আছে, জুলেকা সেইরূপ সুন্দরী, জুলেকা সুন্দরী অথচ যুবতী—জুলেকা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া, কনষ্টাণ্টিনোপলের রাজপথে পদব্রজে চলিয়াছে, সঙ্গে দুইটী ক্রীতদাসী মাত্র! জুলেকা ক্রমে সুলতানের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং প্রাসাদের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া, ক্রীতদাসীদিগকে তথায় তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া, প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্রীতদাসীরা সেই প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই সিংহদ্বার এত উচ্চ, এত বৃহৎ যে, ইহাকে আলঙ্কারিকেরা তুর্ক গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি বলিয়া থাকেন। অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে মৃদুস্বরে জুলেকা খোজাদিগকে যাহা কহিল, উহারা তাহা বুঝুক আর নাই বুঝুক পথ ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে জুলেকা এক এক করিয়া, অনেকগুলি শান্ত্রীর মহলে প্রবেশ করিল। এখানে যে খোজা প্রহরায় ছিল, তাহার নিকট গন্তব্য স্থানের অনুসন্ধান করায়, সে জুলেকাকে এক বিকট মূর্ত্তি কৃষ্ণকায় কাফ্রি খোজার নিকট লইয়া গেল। তাহার পরিধান একটী মূল্যবান চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদ; উহাতে নানাবিধ সোণার কাজ করা, উভয় স্কন্ধের উপর দুইটী বৃহৎ ঝোপ্পা শোভা পাইতেছে।

খোজার নাম কিসলার আগা। খোজাদিগের তিনিই সরদার। তাঁহার পদও খুব উচ্চ, অন্তঃপুরের মধ্যে তিনিই বাদসাহার প্রধান কর্ম্মচারি। সম্মানে তিনি এক জন পাশার সমান। জুলেকা তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া, স্বীয় প্রার্থনা জানাইল। জুলেকার এ প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে, সে যে, উদ্দেশ্যে রাজ প্রাসাদে আসিয়াছে, তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিসলার আগা প্রথমতঃ অস্বী-

কার করিল, দ্বিতীয়বারের অনুনয়ে তাহার মন কতক নরম হইল। সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; অবশেষে জুলেকার চোকের জলে কাকুতি মিনতি দেখিয়া পাষাণ হৃদয় আগাও গলিয়া গেল। কিসলার আগা জুলেকার প্রার্থনা পূর্ণ করিল। আগা জুলেকাকে সঙ্গে করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিল। এ সময় কিন্তু আমরা পাঠককে জুলেকার সঙ্গে যাইতে দিব না। সময়ে সময়ে পাঠকের কিছুই অবিদিত থাকিবে না। তবে আপাততঃ এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, প্রায় এক ঘণ্টা পরে জুলেকা সুলতানের প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে সময় যদি কেহ অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া, তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, যে মুখে আনন্দের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। যে বিশ্রান্ত নয়নে ক্ষণপূর্ব্বে জল-ধারা বহিতেছিল, তাহা এক্ষণে আনন্দে বিস্ফারিত! তাহার গতি ক্রমে অপেক্ষাকৃত দ্রুত, তাহার পাদক্ষেপ উপেক্ষাকৃত চঞ্চল। দাসীরা দ্রুতপদে ভর্তৃদারিকার অনুসরণ করিয়া চলিল। তাহারা এতক্ষণ সিংহদ্বারের নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিল।

( ক্রমশঃ। )

---

# গীত। *

## লেখক—নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

দেখেছি গালিয়ে লোহা, লোহা নয় কঠিন তেমন।
কঠিন হৃদয় সেজন যেমন, কবিতায় যার গলে না মন॥
কঠিনে মিলে কোমল, দু'য়ে মিলে দুনিয়া সচল;
কঠিন কোমল দেখনা কেবল;
কঠিন কোমলে মেলা, নর-নারীর প্রেমের খেলা
কোমল কঠিন গঠন এ জীবন।
কোমল-কঠিনে ছবি কবি এঁকেছে কেমন।
রঙ্গে হের হে রসিক সুজন॥

---

* শিবপুর, "সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণের অনুরোধে, উক্ত বিদ্যালয়ের "ড্রামাটিক ক্লাবের" নিমিত্ত লিখিত।



LADY CURZON.

## লেডিকর্জ্জন।

পাঠক! উপরে যাঁহার মূর্ত্তি দেখিতেছেন, উনিই আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ডকর্জ্জন বাহাদুরের প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনী।

গত ১৭ জুলাই মঙ্গলবার তারিখে বিলাত হইতে সংবাদ আইসে যে, লেডী কর্জ্জন মহোদয়া অসুস্থ হইয়াছেন; তাহার পর সংবাদ আসিল ১৮ই জুলাই বুধবার অপরাহ্ণ কালে লেডী কর্জ্জন শিশু সন্তানগণকে চিরদিনের মত মাতৃহীন করিয়া, লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। আমরা এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। এক্ষণে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—ভগবান লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করুন।

# শান্তি।

## লেখক—শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চি।

কি বিরাট এ ব্রহ্মাণ্ড—অচিন্ত্য মহান্
কালচক্রে সংখ্যাতীত গ্রহ উপগ্রহ
সঙ্গে লয়ে, একি গতি মহাবেগবান্!
কার অলৌকিকী শক্তি তাহে অহরহ
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই করে প্রতিপলে—
ভাঙ্গে গড়ে-গড়ে ভাঙ্গে একি খেলাতার!
ক্ষুদ্র সে কীটাণু হ'তে এ সৃষ্টি মণ্ডলে—
সে কর চালনে নাহি কাহারো নিস্তার!
অমূর্ত্তে কি মূর্ত্তে-জড়ে অজড়ে জীবত্বে,
বার বার ভাঙ্গা-গড়া যন্ত্রে বিবর্ত্তন—
কি উদ্দেশ্যে ফিরি আমি কি নিগূঢ় তত্ত্বে!
পলকে জীবন পুন পলকে মরণ!
স্তব্ধ হোক্ ক্রিয়া-শক্তি-জন্ম-মৃত্যু-ভ্রান্তি---
সৎচিদানন্দ পদে লভি চির শান্তি।

---

# সে কোথায়!

১

সাধের বাঁশীটি তার পথে গড়াগড়ি যায়—
এখনো অধর সুধা লাগিয়া রয়েছে তায়!
সে যখন গেল চলে,
কিছুত গেলনা বলে,
ফিরে ফিরে চেয়ে চেয়ে গেল পায় পায়-
সে কোথায়—সে কোথায়!

২

যে পথে সে গেছে চলে সে পথে চলেনা কেহ
সে পথের ধারে নাই দয়ামায়াস্নেহ গেহ!
মনে এই অনুমানি,
জীর্ণ শীর্ণ পথখানি,
তাহার পদাঙ্ক বুকে আছে মূরছায়—
সে কোথায়—সে কোথায়!

৩

নিতি নিতি সেই পথে মরি সে যাবার আগে,
কত শিশু ধূলাখেলা খেলিত যে অনুরাগে!
তাহারে হারায়ে তারা,
বুঝি কেঁদে কেঁদে সারা—
কোন্ বনে নিরজনে খুজিয়ে বেড়ায়—
সে কোথায়—সে কোথায়!

৪

তারে বুকে ধরিবারে রাখিত সে তনুপাতা
তার সাথে গাইত সে তন্ধ মধুর গাথা!
গিয়াছে তা তার সনে,
কিছু আর নাই মনে,
দগ্ধ-হৃদি—ধূসরিত আপন ধূলায়!
সে কোথায়—সে কোথায়!

৫

তাই বুঝি মেঘগুলি তার দুখে কেঁদে সারা,
দিয়ে যায় শুষ্ক বুকে তার শত অশ্রু ধারা!
সে পথে চলে না ধেনু,
সে পথে বাজে না বেণু,
সে পথে নূপুর রুণু নাহি শোনা যায়—
সে কোথায়—সে কোথায়!

৬

সে পথে নাচেনা শিখী কোকিলের কুহুকুহু,
শুনিতে পায়না কেহ যা শুনেছে মুহু মুহু,
গোপীকুল কুল নাশী—
সে পথে বাজে না বাঁশী,

সে পথে প্রেমের ফাঁসি ছিল একদায়—
সে কোথায়—সে কোথায় !

৭

ফলে ফুলে সুশোভিত ছিল তরু কত শত
যোগাত সুবাস ছায়া সেই পথে অবিরত
তরুহৃদি করি খালি,
তার তরে ফুল ডালি,
লইয়া আসিত কত মাধবী লতায়—
পরশিতে তার রাঙা পায়।
সে কোথায়—সে কোথায় !

৮

পড়িত ঝরিয়ে ফুল তাহার পরশ আশে,
রাতুল চরণ দুটি মাথাত আপন বাসে-
কোথা লতা-শুষ্ক তরু,
শুধু ধু ধু ধু ধু মরু,
তরু শুষ্ক-লতামৃত মরমের ঘায়—
সে কোথায়—সে কোথায় !

৯

হাহাকার শুষ্কবায়ু এই পথে বারমাস,
ফেলে যায় কত শত উষ্ণ তীব্র দীর্ঘশ্বাস
ঘেরা সদা তমোরাশি,
সে পথে সুধাংশুহাসি
হাসে না-সে অন্ধকার শুভ্র পুর্ণিমায়-
সে কোথায়—সে কোথায় !

১০

যাবার সময় সেই বলেছিল হবে দেখা,
বহুদিন সেত কোথা রহিতে পারেনা একা
কতদিন বয়ে গেল,
ফিরে সেত নাহি এল,
মৃতসম সবে দেখ তার প্রতীক্ষায়
সে কোথায়—সে কোথায় !

১১

পথ ভুলে গেছে সেকি একবার মনে হয়,
পথ তার সব জানা সেত ভুলিবার নয়,
বিপথে যেজন যায়,
ফিরিয়ে সে আনে তায়,
পথ হারা পথিকে সে সুপথ চেনায়
সে কোথায়—সে কোথায় !

১২

ডাকিলে শোনেনা তাই লোকে বলে তারে কালা
শুষ্ক দেখ দোলে ওই তার তরে ফুলমালা
আর কেন আশে আছি,
লয়ে ফুল ডোর গাছি,
ডুবি কালিন্দীর জলে পরিয়ে গলায়—
সে কোথায়—সে কোথায় !

---

# কেন তবে ?

লেখিকা—শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবী।

স্বপনেতে দেখাদিয়া,
কেন যাও পলাইয়া ?
ধরি ধরি পারিনা ধরিতে।
যদি নাহি দিবে ধরা,
কেন তবে এস ত্বরা,
নয়ন না মুদিতে মুদিতে ?

তোমার চরণ তলে,
বেদনা জানাতে গেলে,
কেন নাহি কহ কোন বাণী ?
আমি চাহি জানাবারে,
আমার হৃদয় তারে,
বাজে নিতি কি দুখ রাগিণী ?

যদি সেই নাহি র'বে,
যদি সেই চ'লে যাবে.
যদি না কহিবে কোন কথা,—
কেন তবে হেসে হেসে
দেখাদাও হৃদাকাশে ?
কেন তবে দিতে এস ব্যথা ?

——:*:——

# কবি ও কবি-প্রিয়া।

লেখক-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু বি, এ

ছাত পানে চেয়ে আর চোখ বুজে
সারা হ'ল কবি মিল খুঁজে খুঁজে,
কবি-প্রিয়া তার দুখ নাহি বুঝে
কবিরে রাগিয়া বলে,—
"থাক যদি তুমি চোক্ চোক্ বুজে
কানের উপর কলমটা গুঁজে
ঘরকন্না তবে নাও বুঝে সুঝে
এখনি যাইব চলে।"

"সত্য যদি প্রিয়ে! যাবে তুমি চলে
দয়া করে তবে দিয়ে যাও বলে
চরণটা এই কি করে যে মিলে
আমার পড়েনা মনে ;
মিলায়েছি আমি মুক্তি আর ভক্তি
বল আর একটা কোথা পাই—ক্তি
যদি বল আছে —"রক্তা রক্তি"
তা'তে যে হয় না মানে।"

দাড়িটি ধরিয়া কবির তখন
ঈষৎ হাসিয়া কবি-বধূ কন,—
"বুঝে নাও-তবে বলিব এখন
—"বুদ্ধি থাকিলে ঘটে,"
এত বলি দাড়ি ধরি দুটি করে
যে-দিকে ফিরায় কবি মুখফিরে,
হাসির রেখাটি প্রিয়ার অধরে
অমনি কাঁপিয়া উঠে।

"উহু উহু উঁহু" করে কবিবর
প্রিয়া নাহি ছাড়ে—পাষাণ অন্তর
কবিরে সুধায় "বুঝেছ ?" আবার,
"পেলেকি তোমার—ক্তি ?"
"আর কেন প্রিয়ে ছাড় একবার
বুঝেছি গো সখি বুঝেছি এবার
আমি যে পুতুল তুমি যে গো তার
চালাবার তরে "শক্তি।"

——:*:——

# ওরঙ্গা-নদী।

( জেলা পালামৌ—স্থান পাথরচটী বাঙ্গালা )

**লেখক—শ্রীনগেন্দ্র নাথ সোম।**

বন্ধুর পাষাণ-বুকে চারু তরঙ্গিনী,
কোন্ প্রেমে চিরতরে পড়েছ ঢলিয়ে ?
শ্যাম স্নিগ্ধোজ্জ্বল শোভা চিত্ত-বিমোহিনী,
কারতরে এ বিজনে রেখেছ রচিয়ে ?
জুড়ালে হৃদয়-তাপ করুণ কল্লোলে,
দেখালে ত্রিদিব-চিত্র কি বর-বরণে !
হেরি রূপময়ী মেয়ে প্রকৃতির কোলে,
তৃপ্তময় আঁখি মম এ মরত বনে।
কি রম্য পুলিন শোভা—গম্ভীর মধুর,
চিত্রিত বিচিত্র চিত্রে কানন কান্তার ;
গিরি'পরে গিরিশ্রেণী—বন বহুদূর,
ভূতলে সৃজিত যেন কুঞ্জ অমরার !
হে নদি ! নয়নে মম স্নিগ্ধরশ্মি ঝলে,
হেরিয়ে মাধুর্য্য তব চন্দ্রকরোজ্জ্বলে।

---

# কোথা সে বিজন ?

**স্বর্গীয় কালিদাস চক্রবর্ত্তী বিরচিত।**

কোথা সে বিজন ?
দূর হতে দূরতরে, যথা সে মধুর স্বরে,
বহিল করুণ গীতি সহ-সমীরণ ;
তাপিত নিশ্বাস ফেলি,' প্রকৃতিরে অবহেলি,'
যথা সে কোকিল-কণ্ঠ তুষিল শ্রবণ ;
যথায় সমীর-শ্বাস, বিতরি কুসুম-বাস,
জুড়াইল অভাগার আকুল জীবন ;
কোথা সে বিজন ?
সংসারে যাতনা-ভায় পরাই'ছে শোক-হার,
কি ভীষণ বিভীষিকা করে প্রদর্শন !
সতত সংসার-কোলে অশান্তির ঘোর রোলে,
শুনি ক্ষীন জীর্ণ মানবের বিষাদ ক্রন্দন।
সাজিয়া নীহার-নীরে, ব্রততী-কম্পিত শিরে,
সোহাগে, পাদপে যথা করয় চুম্বন ;
কোথা' সে বিজন ?
যথায় প্রসারি' কর তরু কুল নিরন্তর,
তাপিত পথিক চয়ে করে সম্ভাষণ
তামসী-বসন পরা, যথা সে সুষমা ভরা—
প্রকৃতি, ল'নিল হৃদে আশার স্বপন ;
কোথা' সে বিজন ?

---

# সমালোচনা।

**ললনা।** ( খণ্ডকাব্য ) বারানসী প্রবাসিনী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ঘোষ বিরচিতা মূল্য আট আনা মাত্র। পুরাকালীন আর্য্যরমণীগণের সৎগুণাবলীর উল্লেখ করিয়া এখনকার রমণীগণের সহিত তাঁহাদের তুলনা করিবার প্রয়াসে শ্রীমতী এই কাব্য খানি রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে নারীজাতির মধ্যে সে সকল গুণ অতি বিরল, তজ্জন্য শ্রীমতীর আক্ষেপ। রমণীগণ যাহাতে প্রাচীন কালের আর্য্য নারীগণের আদর্শে সৎগুণ বিভূষিতা হন, ইহাই তাঁহার বাসনা, আমাদেরও বাসনা। আমরা এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। কবিতাগুলি সুললিত হইয়াছে, আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা এই রাজলক্ষ্মীর উপদেশ মত কার্য্য করিলে আমরা আরও সুখী হইব।

**বঙ্গলক্ষ্মী।** নামিকা মাসিক পত্রিকার উপহারের নিমিত্ত চারিখানি পুস্তিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১। শিল্প ভাণ্ডার, ২। কৃষি ভাণ্ডার, ৩। সচিত্র বয়ন বিদ্যা, ৪। গৃহস্থালী। **বঙ্গলক্ষ্মী** পত্রিকাখানি কৃষিও উদ্ভিজ্জ তত্ত্বে ভূষিত হইতেছে, উপহারের পুস্তিকা চতুষ্টয় যথার্থই তাহার উপযুক্ত ; এই চারিখানি পুস্তিকাপাঠে বঙ্গীয় নরনারীগণের অনেক শিক্ষা ও উপকার লাভ হইতে পারিবে।

---

## স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্মভূমি প্রকাশ হইতে যাইতেছে, এমন সময় আমরা দারুণ শোক সংবাদ পাইলাম, আমাদের ভারতহিতৈষী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহসংসারে নাই। গত ২১শে জুলাই শনিবার মিঃ ডবলিউ, সি, বেনার্জ্জি ৬২ বৎসর বয়সে বিলাতের সন্নিহিত ক্রইডন নামক স্থানের বেডফোর্ড পার্কে তাঁহার "খিদির পুর হাউস" নামক ভবনে আত্মীয় পরিজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। বারান্তরে আমরা স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্রের আদর্শ জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিব, এক্ষণে আমরা মৃত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের শোকশান্তি কামনা করি।




"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১৫শ বর্ষ। | ভাদ্র, ১৩১৩ সাল। | ২য় সংখ্যা।

# আত্মোন্নতি।

লেখক—ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি,

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈবহ্যাত্মনোবন্ধু রাত্মৈবরিপুরাত্মনঃ॥ ভগবদ্গীতা।

পরমাত্মা হইতে মনের দ্বারা বল আকর্ষণ করিয়া জীবাত্মাকে উদ্ধার করিবে। জীবাত্মাকে কোন মতে অবসন্ন হইতে দিবে না। আপনিই আপনার বন্ধু, আপনই আপনার শত্রু। আপনই উন্নতি করিতে চেষ্টা না করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা মহাপুরুষগণ কেহই তোমাকে সাহায্য করিবেন না। আমরা মন ও বুদ্ধি পরমাত্মাতে যুক্ত করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিতে যত চেষ্টা করিব, ততই

তাঁহাদের সাহায্য অনুভব করিব। তদগতচিত্ত সদ্‌গুরুরা অহরহঃ সাহায্য করিতে ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছেন, উপযুক্ত শিষ্য হইতে পারিলেই তাঁহাদের সাহায্য প্রতি পদে পদে অনুভব করিতে পারা যায়। আমাদের সকল শাস্ত্রের মত এই যে, মনুষ্য আত্মোন্নতি করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে আত্ম বিস্তার অভ্যাস করিবে।

ষটচক্র ভেদের রহস্য এই যে, সাধক আপনাকে, এই ক্ষুদ্র ৩।০ সাড়েতিন হস্ত দেহে কারাবাসী মনে না করিয়া আপনাকে বিশ্বব্যাপী মনে করে। এই ধ্যানেই প্রকৃত, ঐক্যতা শিক্ষা হয়।

ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক এই সপ্ত স্বর্গ যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধীষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ আজ্ঞা ও সহস্রদলপদ্ম। এই সপ্ত স্বর্গ, এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল এই সপ্ত পাতাল, সর্ব্বশুদ্ধ এই চতুর্দ্দশ ভুবন আমারই দেহের চতুর্দ্দশ অংশ এবং আমার দেহাভ্যন্তরস্থ চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যস্থিত এই ভূর্লোকই পৃথিবী এইরূপ ধ্যান সর্ব্বদা অভ্যাস করিবে। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই আমার অংশ। আমার দন্ত জীহ্বাকে কামড়াইয়া ফেলিলে আমি যেমন ক্রোধ বশতঃ দন্তকে তুলিয়া ফেলি না, সেইরূপ আমার দেহের অংশ ভাবিয়া কাহারও মন্দ না করিয়া অপকার পরায়ন শত্রুও উপকার পরায়ণ হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। হৃদয়ে অহিংসা প্রতিষ্ঠা করাই শান্তিলাভের প্রধান সোপান। তারহীন টেলিগ্রাফ্ একপ্রকার সূক্ষ্ম অথচ সর্ব্বব্যাপী পদার্থকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে, এই পদার্থকে ইথার কহে; এই ইথার জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। ইহা কুণ্ডলিনী শক্তির ন্যায় কেশাগ্রের সহস্র ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম অথচ সর্ব্বব্যাপী আমাদের সহস্রদল কমল এই ইথার অপেক্ষাও কোটী কোটী গুণ সূক্ষ্ম। উত্তাপ, আলোক, বৈদ্যুতিকশক্তি প্রভৃতি যত শক্তি আধুনিক বিজ্ঞানে আবিস্কৃত হইয়াছে, সমস্ত শক্তিগুলিই এই ইথারের তরঙ্গ মাত্র এবং এই ইথারকেই অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, সহস্রদল কমলস্থিত চিদাকাশে কোটী কোটী সৌরজগৎ রহিয়াছে, সেইজন্যসকল সৌরজগৎ এবং তাহাদের অভ্যন্তরস্থ পরমাণু সকলও এক সূত্রে বাঁধা এই কথা ভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন।

ময়ি সর্ব্ব মিদং প্রোতেং সূত্রে মণি গণা ইব। গীতা।

সেই সর্ব্বব্যাপী চিদাকাশ এই ক্ষুদ্র দেহের ভিতরেও আছেন ও বাহিরেও আছেন, যেমন সূর্য্যের রশ্মি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও আতুশি কাঁচের ভিতর দিয়া

আসিলে, তুলা, কাগজ প্রভৃতি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ চৈতন্যময় বাসুদেব সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও মানবের বুদ্ধি তত্ত্বরূপ কেন্দ্রের মধ্যে দিয়া যেরূপ কার্য্য করেন, সর্ব্বত্র সেইরূপ কার্য্য করেন না আমি সর্ব্বব্যাপী আমার সহস্রদল কমলে কোটি কোটি সৌরজগৎ আমি সতত দহ্যমান এই ক্ষুদ্র মানব শরীরে আবদ্ধ নহি। আমাতে অনন্তশক্তি, আমার চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই, এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে মনের বল বাড়ে। সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ আমরই শক্তি, যেমন সূর্য্যের শক্তি হইতে উৎপন্ন মেঘ, আকাশের কিয়দংশ আবরণ করে, সেইরূপ আমার তমোগুণ, আমার অনন্ত প্রকাশ শক্তি ক্ষণিক আবরণ করিয়া থাকে। সূর্য্য হইতে উৎপন্ন বায়ু যেমন ক্রমশঃ গাঢ় মেঘ অপসরণ করিতে পারে, সেইরূপ আমার কর্ম্ম তমোগুণ-রূপ মেঘকে অপসরণ করিতে সমর্থ। অন্ধকারময় গৃহের অভ্যন্তরে বাতায়ন দিয়া সূর্য্য রশ্মি আসিলে তাহাতে যেমন সেই গৃহস্থিত অন্ধকারের সান্নিধ্যে সেই রশ্মি গৃহের বহির্দেশস্থ রশ্মি অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মরন্ধ্র-রূপ বাতায়ন দিয়া সুষুম্নারূপ আলোকের প্রকাশে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝা যায়। গৃহ মধ্যস্থ রশ্মি যেমন সেই গৃহের অন্ধকারকে প্রকাশ করে, সেইরূপ দেহাভ্যন্তরস্থ সুষুম্নার আলোকে অন্নময়, প্রাণময়, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় আনন্দময় এই পঞ্চকোষরূপ দেহের সমস্ত তত্ত্বই বুঝা যায়। গৃহাভ্যন্তরস্থ আলোকে যেরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ (ত্রসরেণু) দেখা যায়, সেইরূপ দেহের সুষুম্নার আলোকে সৃষ্টির সকল তত্ত্বই বুঝা যায়। গৃহাভ্যন্তরস্থ সূর্য্যের রশ্মি অবলম্বন করিয়া জানালার বাহিরে দেখিলে যেমন অনন্ত সূর্য্যের প্রকাশের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ দেহমধ্যস্থিত সুষুম্নার প্রকাশক শক্তির সাহায্যে অনন্ত চৈতন্যের সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ হয় নাই এই জ্ঞান লাভ করা যায়। ডাইনেমো নামক ( Dynamo ) যন্ত্রের সাহায্যে যেমন মৃত্তিকাস্থিত বৈদ্যুতিক শক্তিকে যোগ নিদ্রাবস্থা হইতে জাগ্রত করা যায়, সেইরূপ আমাদের ইচ্ছাশক্তিরূপ Dynamo যন্ত্রের দ্বারা আমরা যত শক্তি আকর্ষণ করিব, ততই আমাদের চিত্তের বল বাড়িবে। যত আমরা আপনাদিগকে দীন হীন, ভিক্ষুক মনে করিব, ততই আমাদের চিত্তের বল কমিয়া যাইবে। আমি সেই অনন্ত শক্তি মানের এক অণু, আমি তাঁহার চরাচর ব্যাপী অখণ্ড মণ্ডল হইতে কখনও পৃথক হই নাই, এই ধ্যানে চিত্তে শান্তি হয়। ইহাকেই অনন্যভক্তি কহে। সৈনিক পুরুষেরা যেমন সেনানীর কথায় আত্ম সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না; তদ্রূপ সর্ব্ব-শক্তিমান সর্ব্বভূত হিতে রত, সেই পরমাত্মাতে মন প্রাণ নিবেদন করিয়া যে কার্য্য

কার্য্য মনে করিয়া কোন কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত বা ভীত হওয়া উচিত নহে। যাঁহার করুণায় গর্ভস্থ ভ্রূণের গর্ভে জন্ম হইলেই জননীর স্তনে দুগ্ধের ভাণ্ডার প্রস্তুত হয়, সেই শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে জগতের হিতকর কার্য্য করিলে কখনই কষ্ট পাইতে হয় না। সেই সর্ব্বান্তর্য্যামীর উপর নির্ভর করিতে শিখিলে আমার ভাত নাই, কাপড় নাই, এইরূপ তুচ্ছ বিষয়ের জন্য আবেদন নিবেদনের আবশ্যক হয় না। সেই সর্ব্বজ্ঞ শক্তির কাছে মনের দৌর্ব্বল্য বশতঃ ধন, মান প্রভৃতি প্রার্থনা করিলেও নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বিরা সেই প্রার্থনার সমস্ত ফল শ্রীকৃষ্ণকেই অর্পণ করিয়া থাকেন। তাঁহাতে মন ও প্রাণ অনন্য ভক্তির দ্বারা যুক্ত করিয়া রাখাই তাঁহার পূজা করা। সেই চিন্তার সংস্পর্শে অজ্ঞানরূপ মেঘ দূরীভূত হয় এবং আপনার নিত্য মুক্ত অবস্থা প্রকাশ পায়। আত্মোন্নতি করিতে হইলে পরামুখাপেক্ষি হইলে চলিবে না। সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, না প্রার্থনা করিলে মুক্তা পাওয়া যাইতে পারে, প্রার্থনা করিলে ভিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। সকলেরই জগতের হিতকর কার্য্যে আত্মসমর্পণ করা উচিত।

যে যত পরের উপকার করিবে, ততই তাহার মধ্যদিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় অনন্ত শক্তি প্রবাহিত হইবে। স্বার্থের জন্য বা বিলাসিতার জন্য শক্তির অপ-ব্যবহার করিলে আর নূতন শক্তি আসিবে না, এবং সেই স্বার্থপর মনুষ্য পঙ্কিল পুষ্করিণীর ন্যায় হইয়া যাইবে। পরের উপকারের জন্য ভিক্ষা করিতে দোষ নাই কিন্তু আপনার জন্য ভিক্ষা করিলে আত্মোন্নতি হইবে না, সেই জন্যই শাস্ত্রে লেখা আছে—"ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"।

ভগবানে নির্ভর ও আত্মনিবেদনই উন্নতির সোপান, তাঁহার কার্য্য মনে করিয়া যাহাই করিতে যাইবে তাহাতেই তাঁহার অমৃত হস্তের সাহায্য অনুভব করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান না হয়, ততদিন ভগবান বাসুদেবের পূজা পরায়ণ হইবে। আপনার দেহকে তাঁহার মন্দির বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। একজন অশ্বারোহী সৈনিক যেমন রাজপ্রদত্ত অশ্ব, বন্দুক, পোষাক প্রভৃতি যত্নে রাখে এবং রাজাজ্ঞা পালনের সময় হইলে সেইগুলি সুব্যবহার করে, সেইরূপ সাধক ভগবান বাসুদেব প্রদত্ত এই দেহ যত্নে রাখিবে এবং তাঁহার আজ্ঞায় সকল ভূতের হিতের জন্য ইহার সদ্ব্যবহার করিবে। অব্যভিচারিণী ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষকার আর নাই। অনন্যভক্তি সহকারে ভগবান বাসুদেবের কার্য্য মনে করিয়া-সকল জীবের উপকার করাই আত্মোন্নতির সোপান। তিনি অনুগ্রহ করিয়া মোহ দূর করিলে তবে অনন্ত ভক্তি তাঁহার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবে।

পরাভক্তি না হইলে ঐক্যজ্ঞান হয় না এবং ঐক্যজ্ঞান না হইলে আত্মোন্নতি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। একা সুখ বা উন্নতি লাভ করিব এমোহ থাকিতে কখনই আত্মোন্নতি হইবে না, অপরকে যে পরিমাণে সুখও শান্তি ভোগ করিতে শিখাইবে সেই পরিমাণে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াআপনাকে সুখ স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ জানিয়া সকল প্রকার পার্থক্যরূপ ভয় হইতে মুক্ত হইবে।

---

# কি উপায়ে আমাদের দেশীয় শিল্প, কৃষি এবং বাণিজ্যের প্রসারণ ও উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে।—

(চৈতন্য লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশনে "বিশ্বম্ভর সেন পদক" প্রাপ্ত)

লেখক—শ্রীবনমালী গোস্বামী এম, এ,।

কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বনীয় তাহা স্থিরীকরণ করিবার পূর্ব্বে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলে বোধ হয়, এথানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সার্ব্বজনীন উন্নতিসাধনের মৌলিক কারণ যে, শ্রম ও শিক্ষা তাহা আমরা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছি, এবং সেই জন্যই তাহাদের অবশ্যম্ভাবী ফল "সম্পদ" প্রাপ্তিতে আমরা বঞ্চিত। বর্ত্তমান সময়ে এই বিশাল বসুন্ধরায় বাণিজ্যের প্রবল তরঙ্গ যেরূপ বেগ ও বিস্তারের সহিত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের ভাগ্যতরণী ভাসিয়া গিয়া ভবিষ্যতের সুদূর সৈকতে কিরূপ অবস্থাপন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তি উভয়েই বিক্ষোভিত। কালধর্ম্মে ক্রমশঃ বাণিজ্যই দেশের শ্রীবৃদ্ধির ও পার্থিব উন্নতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে সর্ব্বদেশে এবং সকল জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়াছে। বাণিজ্যে উন্নতি করিতে না পারিলে আর কোন দেশের বা

বৃত্তিই সমস্ত জীবনের উদ্যম; চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার প্রায় একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। "বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস"—এই মহাজনোক্তির মৌলিক সত্যে সন্দেহ বা দ্বিধা না থাকিলেও স্বদেশের অভাব ও আবশ্যক মত সামগ্রী অগ্রে সঞ্চয় করিয়া উদ্বৃত্ত ও অনাবশ্যকীয় বস্তুর বিনিময়ে দেশান্তর হইতে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংগ্রহ করা বাণিজ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, বলিয়া স্বীকার করাই স্বভাবসিদ্ধ। যে দেশে যাহা প্রচুর ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহা অন্য দেশে প্রেরণ করিয়া তাহারই জন্য আবার তদ্দেশবাসীগণ যে পরামুখাপেক্ষী হয়, ইহা নিতান্তই তাহাদের অপরিণামদর্শিতার পরিচয় ও অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিফল। অপরঞ্চ উদরান্নের পরিবর্ত্তে বিলাসপণ্য ক্রয় করা অপেক্ষা বাতুলতা আর কি হইতে পারে? ধরিত্রী জননী মানবের প্রকৃত অভাবগুলি সকল দেশে সকল সময়ে স্বতঃই পূরণ করিয়া থাকেন, তবে যে দুর্ভিক্ষের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে বা নৈরাশ্যের সুদীর্ঘ উষ্ণশ্বাসে দিগন্ত প্রান্ত প্রতিধ্বনিত বা প্রধূমিত হয়, তাহা কেবল তদ্দেশবাসীর অতৃপ্ত বিলাস বাসনার বা স্বকল্পিত অভাব বোধের ফলে। আমাদের শ্রমজীবি কৃষকগণ নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, বর্ষার অবিরাম বারি ধারায় সিক্ত ও প্লাবিত হইয়া, শরতের শিশির সম্পাতে সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত করিয়া উদয়াস্ত অসীম পরিশ্রম করিয়া, সারানিশি জাগিয়া বসিয়া, কত অনশন নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, কত উদ্বেগ আশঙ্কায় দেহপ্রাণ শোষণ করিয়া, কত সাধ কত আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, যে শস্য উৎপাদন করিল, জমীদারের খাজনা দিতে বা মহাজনের সুদের দায়ে তাহার অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট সামান্য যৎকিঞ্চিৎ রহিল, তাহাতে কায়-ক্লেশে অতিকষ্টে অপূর্ণ জঠরে সম্বৎসর কোনরূপে কাটাইয়া নববর্ষারম্ভে নূতন ঋণ গ্রহণ করিয়া পুনরায় কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

এইরূপে তাহারা উত্তরোত্তর ঋণমগ্ন হইয়া পুষ্টির অভাবে, বিশ্রামের অভাবে, শান্তির অভাবে, সতত ভাবনা, চিন্তা ও কঠোর শ্রমে ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ ও ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় কোন বৎসর অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ শস্য না জন্মিলে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে তাহারা অনলে শলভের ন্যায় পুঞ্জে পুঞ্জে প্রবিষ্ট হয়, অথবা কোন মহামারী উপস্থিত হইলে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে আক্রান্ত ও লোকান্তরিত হয়। আর এদিকে তাহাদের মুখের অন্ন তাহাদের সতৃষ্ণ নয়নপথ হইতে অপসারিত হইয়া সুদূর দেশ দেশান্তরে প্রেরিত ও বিক্রীত হইতেছে; এবং তদ্বিনিময়ে লব্ধ ধন তথা হইতে তাহাদের উত্তমর্ণের অথবা ভূম্যধিকারীর জন্য বিলাসপণ্য সংগৃহীত ও আনীত হইতেছে।

কৃষিজীবিকা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যদি শিল্পজীবিকা অবলম্বন করে, তাহা হইলেও তাহারা এই বিংশ শতাব্দীর সুপ্রভাতে উদীয়মান বিজ্ঞান রবির ক্রম বিকীর্ণ কিরণজাল অতিক্রম করিয়া কিরূপে প্রান্তর সীমান্তে স্বীয় পণ্যকুটীরে বসিয়া বহ্নি বিজলীর বিক্রম চালিত যন্ত্রতন্ত্রের উৎপাদনশক্তির ক্ষিপ্রকারিতার বা পারিপাট্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ বা সমকক্ষ হইবে ? আর যদিও তাহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া আশাতীত পরিমান পণ্য জাত উৎপন্ন করে, তাহা হইলেও তাহা হয়ত, আমাদের মার্জ্জিত রুচি, বিলাস প্রিয় স্বদেশবাসী ও সম্ভাবিত পৃষ্ঠ পোষক বর্গের মনোমত অথবা বাণিজ্যের প্রয়োজনমত পর্য্যাপ্ত হইবে না। যদি তাহারা শ্রমজীবিকা গ্রহণ করে, তাহাতেও তাহাদের দুরবস্থার কোন বিশেষ তারতম্য হইতেছে না, কারণ এদেশের কুলি মজুরেরা সারাদিন খাটিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে তাহারা অতিকষ্টে অনাহার মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ পায় মাত্র, পরন্তু তাহাদের পরিবার ও পোষ্যবর্গের উদর পূর্ত্তির সঙ্কুলান হয় না।

এইত গেল নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের কথা :—মধ্য শ্রেণীর লোকেদের আধুনিক অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে একপক্ষে অধিকতর শোচনীয় বলিয়া বোধ হয় ; কারণ তাঁহাদের প্রকৃত অভাব অপেক্ষা কল্পিত ও উদ্ভাবিত অভাবের সংখ্যা এত অধিক যে তাঁহারা নিতান্ত প্রাণের দায়ে না হইলেও মানের দায়ে, সর্ব্বদাই মৃতপ্রায়। কৃষি শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় তাঁহাদের যুক্তিতে নিকৃষ্ট জীবিকা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের শরীরে খাটিয়া খাইবার শক্তি বা হৃদয়ে সৎসাহস নাই, কোন শুভ সঙ্কল্পে উৎসাহ উদ্যম নাই; কোন আরব্ধ কার্য্যে অধ্যবসায় বা সহিষ্ণুতা নাই। শুধু আভিজাত্যের অভিমানে অন্ধ হইয়া, অনুকরণ প্রিয়তায় মুগ্ধ হইয়া, সামাজিকতার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, নিত্য নূতন অভাব উদ্ভাবন করিয়া, লোকে কি বলিবে এই ভাবনায় অস্থির হইয়া, আয়ের অধিক ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়া, ঋণের জ্বালায় পাগল হইয়া, তাঁহারা "ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট" এক অদ্ভুত ও অভিনব সম্প্রদায় সৃজন করিয়াছেন।

আর যাঁহারা মা কমলার কৃপায় সমাজের শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভোগ বিলাস নিমগ্ন হইয়া, যশোলিপ্সায় লালায়িত হইয়া, মানব জীবনের মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া লোকহিতব্রতে যেন জলাঞ্জলি দিয়া, স্ব স্ব অবস্থায় কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বোধ বর্জ্জিত প্রায় হইয়া ধনরাশিকে ধূলারাশি অপেক্ষাও হেয় ও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে সতত বৃথাব্যয়ে নষ্ট করিতেছেন। আবার হয়ত

চিন্তন ও সংরক্ষণ করিতেছেন, প্রাণান্তেও তাঁহারা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হন না।

এই ত্রিবিধ শ্রেণীর লোক লইয়াই ভারতের জাতীয় জীবন সংগঠিত হইয়াছে। যেমন সাংখ্যের মতে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যেই প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা, যেরূপ বৈদ্যকের মতে বায়ু, পিত্ত ও কফের সাম্যেই দেহের স্বাস্থ্য, তাদৃশ এই ত্রিবিধ শ্রেণীর লোকের পরস্পর সাম্য, সহানুভূতি ও সমপ্রাণতাই তাহাদের জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ। তাহাদের পরস্পরের শুভাশুভ এরূপ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে, যে একের মঙ্গলে অপর দুইয়ের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

তাই বলি দেশের সকল শ্রেণীর লোক যদি তাহাদের আপন আপন স্বার্থ ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া, প্রাণের টানে সম্মিলিত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহাদের কাহারও আর সুখ সমৃদ্ধির অবধি থাকে না। ধনবানেরা যদি কৃষি শিল্পের উন্নতি কল্পে তাঁহাদের ধনাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করেন, মধ্যবিত্তেরা যদি তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দ্বারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ামতে কল কারাখানা স্থাপন ও পরিচালনা করেন; এবং শ্রম জীবিরা যদি তাহাদের শারীরিক শক্তিদ্বারা উভয় শ্রেণীর সহায়তা করে, তাহা হইলে পুনরায় ভারতের এই জরাজীর্ণ দেহে অবিলম্বেই নবজীবন সঞ্চারিত হয়।

সুখের বিষয় যে, আজকাল দেশের কৃষির প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই জানেন যে ভারত চিরদিনই একটী কৃষি প্রধান দেশ; কৃষির উন্নতি ভিন্ন ভারতবাসী বাঁচিবার উপায়ন্তর নাই। কিন্তু কৃষির উন্নতি কিরূপে হইতে পারে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই আছে। ভারত কৃষি প্রধান দেশ, একথা বলিলে যথেষ্ট হয় না; বস্তুত—আমাদের দেশে কৃষিই একমাত্র অর্থ উৎপাদনকারী ব্যবসায়। হাকিম উকীল ও জমীদার সকলেই অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন এবং অনেকে বহু অর্থ সঞ্চয়ও করিতেছেন। কিন্তু একমাত্র দেশের কৃষকই সেই অর্থ উৎপাদন করে। এই কৃষকের উৎপন্ন অন্নে এবং তাহার বিনিময়ে প্রাপ্তধনে সমগ্র ভারতবাসী জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কৃষক দেশের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ। এই হৃৎপিণ্ড হইতে অর্থরূপ শোণিত প্রবাহিত হইয়া ভারত মাতার সর্ব্বদেহ পোষণ করিতেছে। কৃষকের কল্যাণে, সকলের কল্যাণকৃষকের অকল্যাণে সকলের মৃত্যু। কৃষির উন্নতির কথা অতি গুরুতর। ইহা কিরূপে হইতে পারে এবং কেনই বা হইতেছে না এ বিষয়ে সকলেরই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক।

সভ্য জগতে প্রায় সকল বিষয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে এবং সুসভ্য ইয়ুরোপ ও আমেরিকা কৃষিক্ষেত্রে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেকে মনে করেন, মন্ত্রের মত বা ব্যাকরণের সূত্রের ন্যায়, কয়েকটা কৃষি বিষয়ক সূত্র রাইয়ত প্রজাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলেই কৃষির উন্নতি হইতে পারে। ইহা অতি ভ্রমাত্মক কথা। যাঁহারা কৃষি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ তাঁহারাই মনে করেন, ভারতীয় কৃষকেরা কৃষি জানে না, কিন্তু ভলকারের মত কৃষি তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ভারতীয় কৃষকেরা সাধারণতঃ কৃষি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী এবং সুবিধা ও সাধনের তুলনায়—তাহারা কৃষিদ্বারা যে ফল উৎপাদন করিতেছে ইয়ুরোপ আমেরিকার সুসভ্য কৃষকদিগের পক্ষেও সেরূপ করা সাধ্যাতীত। ভারতে কৃষির উন্নতি কৃষকদিগের সুবিধা ও শক্তি বৃদ্ধির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

যাঁহারা আমাদিগের গ্রাম্য কৃষকদিগের জীবন পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পাশ্চত্য লাভালাভ গণনা দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায়, ভারতের কৃষকেরা ক্ষতি সহ্য করিয়াও দেহ পোষণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, এই কৃষি ব্যবসায় চালাইয়া, সমগ্র জাতীয় দেহ পরিপুষ্ট রাখিতেছে। এই ক্ষতির প্রধান কারণ, প্রথমতঃ তাহাদের জোত জমি অতি সঙ্কীর্ণ ও দ্বিতীয়তঃ তাহাদের হাতে মূলধন নাই। পাঁচ সাত কাঠা জমি চাষ করিয়া আবার মহাজনকে শতকরা ৫০।৬০ টাকা বার্ষিক সুদ দিয়া, সাধারণতঃ আমাদের দেশের কৃষকদের কৃষিকার্য্য চলিতেছে। তাহাদের অর্থের এত অনাটন যে, তাহারা অতি সামান্য ব্যয়সাধ্য সার প্রস্তুত বা প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না।

কৃষিশিক্ষার জন্য অনেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং অনেক যুবক কৃষি পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন বটে, কিন্তু কেহই যে কৃষি জীবিকা অবলম্বন করিতেছে না, তাহার প্রধান কারণ জ্ঞানের অভাব বা শক্তির অভাব নহে। বস্তুতঃ মূলধনের অভাবই ইহার প্রকৃত কারণ। বিনামূলধনে যাহা করা যাইতে পারে, তাহা আমাদের দেশীয় কৃষকেরা, পারদর্শীতার সহিত সম্পাদন করিয়াও নিজের ও পরিবারের উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। শিক্ষিত যুবকেরা কৃষি বিজ্ঞানে যতই বিচক্ষণতা লাভ করুন না, তাঁহারা কৃষকদিগের অপেক্ষা সম্ভবতঃ কখনই ভাল ফল দেখাইতে পারিবেন না। যাঁহাদের ইয়ুরোপ আমেরিকা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন কোন্ শ্রেণীর লোক সে দেশে কৃষিজীবিকা অবলম্বন করেন। আমাদের দেশে পৌরণিক গল্প আছে যে জনক রাজা কৃষিকার্য্য

করিতেন, এবং আর্য্য কবিরা কৃষিজীবি ছিলেন। আজও ইয়ুরোপ আমেরিকাতে লক্ষপতি ও ক্রোড়পতিরা এই কৃষিজীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহার সত্যতা আমাদের দেশে চা কর ও নীলকর দিগের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে। প্রাজ্ঞ প্রবর প্লেটো বলিয়াছিলেন যে, তখনই রাজ্যের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে যখন রাজারা পণ্ডিত হইবেন; অথবা পণ্ডিতেরা রাজা হইবেন। আমরাও বলি তখনই ভারতের কল্যাণ হইবে; যখন কৃষকেরা ধনী হইবে, বা ধনীরা কৃষিজীবি হইবেন।

ক্রমশঃ ——

——০*০——

# রঙমহলের প্রেম।

## লেখক—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

### দ্বিতীয় স্তবক।

### যুবকত্রয়।

কাদিয়াস্কারের প্রতি যে দিন সুলতান সেলিমের সেই কঠোর আজ্ঞা প্রচার হইল, যে দিন জুলেকা পিতার জীবন রক্ষার জন্য সুলতানের প্রাসাদে গমন করিয়া, জানি না কি দৌত্যকার্য্য করিয়া আসিল, সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন সুপুরুষ তুর্ক যুবক কনষ্টান্টিনোপলের রাজপথে মৃদুমন্দ পাদনিক্ষেপে বিচরণ করিতেছিলেন। হিন্দুর কন্দর্প——খৃষ্টানের কিউপিড কতই রূপবান্ হইবে? ভ্রমণশীল তুর্ক যুবকের আকৃতি দেখিলে, কোনমতেই বোধ হয় না যে, পুরুষের মধ্যে তাঁহার অপেক্ষা অধিক সুশ্রী, অধিক অঙ্গসৌষ্টববিশিষ্ট নিখুঁত কেহ থাকিতে পারে! যুবকের বয়স আজিও দ্বাবিংশতির অধিক হয় নাই; আকারে দীর্ঘ অথচ স্থূলাকার নহে; মুখখানি সুগোল, বর্ণ ঈষৎ পাণ্ডু—অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে অতিরিক্ত মানসিক চিন্তার প্রভাবে যেরূপ হয়, এ যেন সেইরূপ পাণ্ডু। কেশগুচ্ছ ভ্রমর-বিনিন্দিত কৃষ্ণবর্ণ, চোক দুটি যেমন দীর্ঘ ও আয়ত, তেমনি কৃষ্ণবর্ণ, দেখিলে হঠাৎ রমণীনেত্র বলিয়া ভ্রম হয়। শ্মশ্রু উদ্গত হয় নাই, কেবলমাত্র ঈষৎ গোঁপের রেখা দিয়াছে,- দন্তপাতি অতীব সুন্দর ও শুভ্র।

যুবক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। কখন বা বিমনা হইয়াই চলিয়াছেন, কখন বা যেন কোন ব্যক্তির বা বস্তুর অন্বেষণার্থ সাগ্রহে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন ; সম্ভবতঃ এই সান্ধ্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যই হয় ত কাহারো অন্বেষণ করা। যুবক ক্রমে গ্রীক পল্লীতে উপস্থিত। সম্মুখস্থ কোন হোটেলের গবাক্ষ-পথ হইতে আলোক আসিতে দেখিয়া, কৌতুহলাবিষ্ট যুবক তথায় প্রবেশ করিলেন। গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া, তাহাতে উপবেশন করিলেন। ভৃত্য দৌড়িয়া আসিল, যুবক তাহাকে এক গ্লাস সরবত ও একটি চুরুট আনিতে কহিলেন। আমাদের এই সুপুরুষ তুর্ক যুবক যখন হোটেলের পূর্ব্বোক্ত গৃহে প্রবেশ করেন, তখন তথায় আরো দুইটী যুবক উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের আকার ও মনোরম পরিচ্ছদ দেখিলে, তাহাদিগকে গ্রীক বলিয়াই বোধ হয়। উভয়ই তুর্ক যুবকের সমবয়স্ক। গ্রীক জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে সকল লক্ষণ আদরণীয়, উভয়েতেই সে সকল পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান্। উভয়েই একখানি টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া বিশ্রাম্ভালাপ করিতেছেন। সম্মুখে সুরার বোতল ও পানপাত্র রহিয়াছে। আগন্তুকের ন্যায় তাঁহারা যে শুষ্ক সরবত পানে তুষ্ট নহেন, তাহা বেশ বুঝাগেল। গৃহে তৃতীয় ব্যক্তিকে উপস্থিত দেখিয়া ক্ষণকাল উভয়ে বাক্যালাপে নিরস্ত হইলেন এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত আগন্তুককে দেখিতে লাগিলেন।

কেন যে তাঁহারা আমাদের তুর্ক যুবককে এতদূর আগ্রহের সহিত দেখিতে ছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ স্থির করা কঠিন। হয় ত তাহাদের মনে কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে কিংবা হঠাৎ কোন রূপবান্ লোককে দেখিলে, কখন কখন কোন অজ্ঞাত কারণে লোকের মন যেমন তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়, উপস্থিত স্থলেও সেইরূপ ঘটিয়াছে। গ্রীক যুবকদ্বয় তুর্ক যুবককে দেখিয়া, একবার পরস্পর মুখ চাওয়চাহি করিলেন, আবার আগন্তুকের দিকে চাহিলেন, মৃদুস্বরে পরস্পর কি বলাবলি করিলেন, যেন তাঁহারা আগন্তুক সম্বন্ধে কি একটা বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন। এইরূপে কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল। অবশেষে উভয়ে আমাদের মুসলমান যুবকের নিকট আসিয়া, সাদর সম্ভাষণে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সুহৃদ্ ভাব জানাইয়া নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। তুর্ক যুবক বিনয় ও সৌজন্য দেখাইয়া, তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তিন জনে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। মুসলমান যুবক প্রথমতঃ গ্রীক দ্বয়কে সহোদর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বুঝিলেন, তাঁহার সে অনুমান মিথ্যা ;

যুবকদ্বয় সহোদর নহেন, তাঁহারা উভয়ে উভয়ের অকৃত্রিম বন্ধুমাত্র। উভয়ের নাম যথাক্রমে লুইকস ও জুলিয়ান।

জুলিয়ান অপেক্ষা লুইকস এক বৎসরের অধিক বয়স্ক; তাহার পরিচ্ছদ আলবানি দেশের লোকের ন্যায়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে চিত্রিত, দেখিতে অতি সুন্দর; স্কটলণ্ডের পার্ব্বতীয় জাতির পরিচ্ছদের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সোণার কাজকরা কোমর বাঁধে দুইখানি ছোরা ঝুলিতেছে, ছোরা দুইখানির মুষ্টিতেও সোণার কাজ। কোঁকড়ান কোঁকড়ান কাল চুলে যুবকের মস্তকের বড়ই শোভা হইয়াছে, সেই নিবিড় কেশরাশির উপর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি টুপি। তাঁহার সহচর জুলিয়ানের পরিচ্ছদ দ্বীপবাসী গ্রীকদিগের মত, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর অপেক্ষা অনেকটা বর্ত্তমান সময়ের অনুমোদিত উৎকর্ষবিশিষ্ট। জুলিয়ানেরও কেশ ভ্রমর-কৃষ্ণ কিন্তু তাঁহার বন্ধুর কেশের ন্যায় তত নিবিড় না হওয়ায় সৌন্দর্য্যেও তাহার সমান নহে। উভয়ের মধ্যে কাহারও শ্মশ্রু উদ্গত হয় নাই। উভয়েরই গোঁপ দেখা দিয়াছে, তবে জুলিয়ান অপেক্ষা লুইকসের গোঁপ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

পরস্পরের কথাবার্ত্তায় জানা গেল, লুইকস ও জুলিয়ান উভয়েই সহাধ্যায়ী, উভয়েরই সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম। উভয়েই পিতামাতার অনুমতি লইয়া, দেশ ভ্রমণে আসিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে কনষ্টাণ্টিনোপল দেখিতে বাসনা হওয়ায়, তাঁহারা প্রায় একপক্ষ হইল, এই রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন।

গ্রীক বন্ধুদ্বয়ের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, আমাদের মুসলমান যুবকও কতকটা আত্ম পরিচয় দিয়া, বন্ধুতা জানান সঙ্গত বলিয়া বোধ করিলেন। তিনি কহিলেন,—"এই বিশাল প্রাচীন নগরীতে আমি আপনাদের অপেক্ষাও অপরিচিত। আমি সবে আজ সকালে এই রাজধানীতে আসিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে আমার অবস্থা ঠিক আপনাদেরই মত, আমারও দেশ দর্শনের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য এখানে আসা। আপনাদের কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, আপনাদের নাম যথাক্রমে লুইকস ও জুলিয়ান। আমার নাম খালিদ।"

তুর্কের সরলতা দেখিয়া গ্রীকদ্বয় সন্তুষ্ট হইল। তাহারা অধিক আত্মীয়তা দেখাইবার জন্য তাহাদের মদের বোতল ও পানপাত্র খালিদের সম্মুখের নিকট আনিয়া রাখিল।

তুর্ক যুবক কহিলেন,—"আপনারা প্রায় পনর দিন এখানে আছেন। এই কাল মধ্যে এমত অনেক কথা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, যাহাতে সর্ব্বাগ্রে এই

নগরীতে আসিয়াছেন বলিয়া, আপনাদের পরিতাপ উপস্থিত হইতেছে। আমি এই কয় ঘণ্টার মধ্যে যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহার বিন্দু বিসর্গও যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই অভিশপ্ত নগরীতে প্রাণান্তেও পাদক্ষেপ করিতাম না।

"লুইকস উত্তর করিলেন,—আপনি যে বিষয় লক্ষ্য ক'রে বল্‌চেন, তা বুঝ্‌তে পেরেছি। ভয় ত আমরা পাই-ই নাই, বরং যদি ঘটনাক্রমে কোন সূত্রে কিছুমাত্র সন্ধান পাই, তাহা হইলে, নিশ্চিত এই ঘোর পাপাচারের অভিনেতা বা অভিনেত্রী-দিগকে বন্দী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। আপনি কি শুনেন নাই যে, গবর্ণমেণ্ট প্রচুর পুরস্কার দানের ঘোষণা দিয়াছেন? যে ব্যক্তি সে পুরস্কার পাইবে, তাহাকে আর শেষ জীবনে কোন কাজকর্ম্ম করিয়া খাইতে হইবে না। ঘরে বসিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে তাহার দিনপাত হইবে।" খালিল উত্তর করিলেন,—"হাঁ এইরূপই শোনা গিয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় আমার অর্থের বিশেষ অভাব নাই। এই বিষম লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের সন্ধান করিবার ত কোন ইচ্ছাই নাই, বরং কিসে নির্ব্বিঘ্নে প্রাণে প্রাণে দেশে ফিরিব, সেই ভাবনাই সর্ব্বক্ষণ অন্তরে জাগিতেছে।"

গ্রীক যুবকদ্বয়ের কেহই সহসা খালিলের কথার উত্তর করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে লুইকস একটু মৃদুস্বরে কহিলেন,—"যে দিন আমরা প্রথম কনষ্টাণ্টিনোপলে আগমন করি, সেই দিন সন্ধ্যাকালেই আমার অদৃষ্টে এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে—সে একটা দৈবঘটনাই বলিতে হইবে—যদি আমি পূর্ব্বে এই সকল হত্যা-ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতাম, তাহা হইলে কখনই সে অসম সাহসের সাগরে ঝাঁপ দিতাম না। এ সকল কথা পরদিন আমার কাণে উঠিয়াছিল।"

জুলিয়ান ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তোমার ভাগ্যে কাজটা অসম সাহসের হইলেও, অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

খালিল কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অসম সাহসের কাজ! কিরূপ অসম সাহসের কাজ মহাশয়? আপনাদের কথা আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে একদিনের পরিচিত বলিয়া, আপনারা আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবেন না বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

লুইকস উত্তর করিলেন,—"গোপন কেন করিব, আপনি আমাদের পরম বন্ধু, আপনার নিকট সকল কথাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। খালিল মহাশয়, আপনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন যে, প্রায় একপক্ষ হইল, আমরা দুইজনে কনষ্টাণ্টি-নোপলে আসিয়াছি। তুর্করাজধানীতে যখন আমরা উপস্থিত হই, তখন সন্ধ্যা-

কাল। আমার বন্ধু জুলিয়ান পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন, বিশেষ অশ্ব হইতে পতিত হইয়া সামান্য রকম একটু আঘাত পাইয়াছিলেন। বন্ধু এখানে পঁহুছিয়াই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমার কিন্তু সে ইচ্ছা হইল না। সন্ধ্যার সময় এই প্রাচীন নগরীর যতটা দেখিয়া লইতে পারি, সেই কৌতুহল প্রণোদিত হইয়া, একাকীই রাজপথে বাহির হইলাম। পথে যাইতেছি, এমত সময় একটী প্রবীণা রমণী আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমাকে কি একটা জিজ্ঞাসা করিল, আমি তাহাকে কোন সদুত্তর দিতে পারিলাম না; স্পষ্টই বলিলাম, আমি এই নগরীতে নিতান্ত অপরিচিত, এক ঘণ্টা পূর্ব্বে মাত্র এখানে পঁহুছিয়াছি। প্রবীণা প্রথমতঃ দু পাঁচটী বাজে কথা কহিয়া, শেষে আমার শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসা আরম্ভ করিল। আমার চোখ এমন, চুল এমন, রং এমন, কথাবার্ত্তা এমন মিষ্ট ইত্যাদি নানা রকম সুখ্যাতি করিতে লাগিল; আমি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। শেষ বৃদ্ধা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"আমার ভর্ত্রিণী আপনার মত সুরূপ যুবা পুরুষের সহিত আলাপ করিতে পাইলে কতই সুখী হন। আমি আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে তাহার ভর্ত্রিণী? আমি বৃদ্ধার কথায় বেশ বুঝিয়াছিলাম, সে কোন ব্যভিচারিণীরই দূতী, সে অভিসারের কথাই কহিতেছে। স্পষ্ট কথা বলিতে কি, আমিও প্রেম বাজারে নূতন নহি, এবং মনের মত সওদা মিলিলে, নারাজও ছিলাম না; কিন্তু খালিল মহাশয়! আমি তখন এ সকল হত্যাকাণ্ডের বিন্দু বিসর্গও শুনি নাই, শুনিলে আমি নিশ্চিত অপেক্ষাকৃত সতর্ক হইতাম।"

খালিল উত্তর করিলেন,—"আপনার এই অভিসারের সহিত, সেই ভীষণ রহস্যের কোন সংস্রবই নাই। তাহা হইলে,আজ আর আমাদের নিকট আপনার এ সকল কথা প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিত না, তাহা হইলে সেই দিনই আপনার ঐ সুন্দর দেহ বসফোরস্ নদীর জলজন্তুদিগের উদরে হজম হইয়া যাইত।"

লুইকল উত্তর করিলেন,—"সে কথা সত্য। আমরা এ সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহা সত্য হইলে, অবশ্য আমাকে আর ফিরিতে হইত না। কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল ভীষণ রহস্য ঘটিত চিন্তাকে অন্তর হইতে অন্তর করিতে হইবে। আমি যে বিষয়ের গল্প করিতেছি, তাহাতে ভয়ের কোন কারণই নাই, বরং আনন্দই পাইবে। আমি আপনাকে বলিয়াছি যে, কে তাহার ভর্ত্রিণী? দূতী কার্য্যে বৃদ্ধা বিশেষ নিপুণা, আমার প্রশ্ন শুনিয়া, সে ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি রক্ষা করিল এবং ঈষৎ হাসিয়া, আমাকে স্পষ্ট করিয়া জানাইল যে, অত কৌতুহলপর

হইলে, চলিবে না, তাহা হইলে আমাকে সে আর অধিক বিশ্বাস করিবে না। স্পষ্ট করিয়া বৃদ্ধা দূতীকে বলিলাম, সে যদি তাহার ভগ্নীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিব না; বরং সে যাহা যাহা বলিবে, বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই করিব—ইতিপূর্ব্বে দূতী কথাচ্ছলে আমাকে বলিয়া দিয়াছে যে, তাহার ভগ্নী পরমা সুন্দরী। স্বর্গ-বিদ্যাধরীরাও তাহার চরণ পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারে না—দূতী প্রথম একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আমার সামাজিক অবস্থা ও কনষ্টাণ্টিনোপলে আগমনের কারণ সম্বন্ধে দুই চারিটী প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল এবং সে বিষয়ে সন্তোষকর উত্তর পাইয়া, আমাকে একটু দূরে দূরে আসিতে কহিয়া, অগ্রে চলিল। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী; দূতী অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। আমি একটু দূরে থাকিলেও তাহাকে বেশ দেখিতে পাইতেছি, অনেকগুলি অন্ধকারময় গলি দিয়া যাইতে হইলেও একবারও বৃদ্ধা আমার দৃষ্টি-পথের অতীত হয় নাই। অবশেষে আমরা জলের কিনারায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দুইজন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া, তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। বৃদ্ধা আমাকে নৌকায় উঠিতে কহিল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে নৌকায় উঠিলাম। বৃদ্ধা আমার পশ্চাৎ নৌকায় আসিল। এবং তাহার ইঙ্গিত মাত্র ভৃত্যেরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। কেহ একটা কথাও কহিল না, মাঝিরা সবেগে নৌকা বাহিয়া চলিল। বসফোরস্ নদীর পশ্চিম তীরস্থ বহু সংখ্যক বাগান বাটী অতিক্রম করিয়া চলিলাম। তখন আমি কেবল আমার সেই অদ্ভুত অভিসারের কথাই ভাবিতেছিলাম।”

খালিল কহিলেন,—“অবশ্য ভয়ও হইয়াছিল। যদিও তুমি তখনও এই সকল অদ্ভুত হত্যার কথা শ্রবণ কর নাই, তথাপি ইহা অবশ্য জানিতে যে, কোন রঙ-মহলে প্রবেশ করা নিরাপদ নহে। আর ইহাও বেশ বুঝিয়াছিলে যে, কোন উচ্চ পদস্থ অন্তঃপুর বা রঙমহলেই তোমাকে লইয়া যাইতেছে।”

লুইকস কহিলেন,—“তুমি ভাই, ঠিক বলিয়াছ। তখন আমার মনে একটু ভয়ও হইয়াছিল। আর নির্ব্বোধের মত এই কাজটা করায় পরিতাপও জন্মিতে-ছিল, কিন্তু তখন অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি, ফিরিবার উপায় নাই। তখন বুঝিলাম, কোন বিশেষ বাটীতে যাওয়া বৃদ্ধার অভিপ্রায় ছিল। কথাবার্ত্তা কহিবার জন্যই সে ছল করিয়া, আমাকে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আরও ভাবিলাম, তুর্ক রমণীরাও—আপনাদের জাতির প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করা

তাহাদিগকে অন্তঃপুরে যেরূপে আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহাতে এইরূপ দূতার সাহায্য নিতান্তই আবশ্যক। এই সকল চিন্তা করিয়া, যাহা অদৃষ্টে থাকে, ঘটিবে বলিয়া, মনকে আশ্বস্ত করিলাম। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার এই অভিসারে কোন বিপদই ঘটে নাই। বরং পরম আনন্দই উপভোগ করিয়াছিলাম।"

জুলিয়ান কহিলেন,—"প্রিয়তম লুইকস, অত বাড়াবাড়ি কেন করিতেছ, সংক্ষেপে বলিয়া ফেল, কাজের কথা বল।"

লুইকস কহিলেন,—"শীঘ্রই বলিতেছি, আমাদের নূতন বন্ধু খালিল মহাশয়কে আমি আর অধিকক্ষণ উৎকণ্ঠায় রাখিব না। তার পর শুনুন,—আধ ঘণ্টা বস্‌ফোরস নদী বক্ষে বাহিয়া গিয়া, আমরা একটা শুঁড়ি খালের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তাহার উভয় তীরেই ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী, উভয় তীরস্থ বৃক্ষশ্রেণীর শাখা প্রশাখা লম্বমান হইয়া, খালের উপর আসিয়া পড়ায়, কুঞ্জের মত হইয়াছে। যেন আমরা শাখাপত্র-বিনির্ম্মিত তোরণের মধ্য দিয়াই যাইতেছি নৌকা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, একটী সোপান শ্রেণীতে লাগিল। বৃদ্ধা আমাকে সোপান পথে তীরে উঠিতে অনুমতি করিল। তীরে উঠিয়া দেখিলাম, আমরা একটী সুবিস্তৃত উদ্যান মধ্যে আসিয়াছি। পাছে শুষ্ক পত্রের উপর পাদ চালনা করায় শব্দ উত্থিত হয়। এজন্য বৃদ্ধা আমাকে সাবধানে অগ্রসর হইতে কহিল। উদ্যানের অপর প্রান্তে একটা বৃহৎ অট্টালিকা, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষরাজি, মধ্যস্থলে সুরম্য সৌধ যেন মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। আমরা অন্ধকারময় ক্ষুদ্র পথ দিয়া। ক্রমে অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই একটা দ্বার। আমরা কিন্তু এ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম না। বৃদ্ধা আমাকে অন্য পথ দিয়া, অট্টালিকার পশ্চাৎভাগে লইয়া গেল। সেখানে আর একটা দ্বার। ইহার চাবি বৃদ্ধার নিকটেই ছিল। দূতী দ্বার খুলিয়া, আমাকে গৃহ প্রবেশ করিতে কহিল। আমরা কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়া, উপরে উঠিয়াই। সম্মুখে একটা সুদীর্ঘ পথ দেখিতে পাইলাম। এই পথে একটু অগ্রসর হইয়াই পরস্পর সম্মুখীন দুইটী দ্বার দেখা গেল। ছাদ হইতে লম্ববান্ রৌপ্য নির্ম্মিত একটি দীপাধারে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছে, তাহার আলোকে সর্ব্বত্র আলোকিত হইয়াছে। বৃদ্ধা অন্যতর দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া, সহসা ভয় চকিত নেত্রে ও কম্পিত কলেবরে পিছাইয়া আসিল। কে যেন দ্বারের সম্মুখে বিস্তৃত মাদুরের উপর কি একটা ভয়জনক পদার্থ দেখিয়া সরিয়া আসিল। তাহার ভাব গতিক দেখিয়া, আমার মনে হইল। হয় ত সে মাদুরের উপর তীক্ষ্ণ বিষধর সর্প দেখিয়া থাকিবে।

সাগ্রহে আমিও মাদুরের উপর দৃষ্টিপাত করিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কেবল একটী জোড়া মোরক্কো চামড়ার চটি জুতা মাদুরের উপর রহিয়াছে দেখিলাম।”

খালিল একটু হাসিয়া কহিলেন,—“বুঝিয়াছি, আমি জানি, এইরূপ চিহ্ন দেখিলে কি বুঝিতে হয়। যখন স্বামী, পত্নীর গৃহে প্রবেশ করেন, তখন প্রায়ই তিনি চটি জুতা বাহিরে রাখিয়া যান, এরূপ চটি জুতা দেখিলে, অপরে বুঝে যে, বিনা অনুমতিতে সে গৃহে প্রবেশ করা নিষেধ।”

লুইকস কহিলেন,—“আমি ত তাহা জানি না। চটি জুতা দেখিয়া বৃদ্ধা যাহা বুঝিল, আমি তাহার কিছুই বুঝিলাম না, কাজেই মাদুরে একটা ভীষণ সর্প বা তদ্রূপ ভয়জনক কিছু না দেখিয়া, এবং তাহার পরিবর্ত্তে এক জোড়া চটি জুতা দেখিয়া, আমার বড়ই হাসি আসিতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তে ভিতরদিকের দরজায় কড়া নড়িল, কেহ যেন বাহিরে আসিতেছে। শব্দ শুনিবামাত্র বৃদ্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে আমার হাত ধরিল এবং নিঃশব্দে অপর দরজাটী খুলিয়া, আমাকে ধাক্কা দিয়া, সেই গৃহে প্রবেশ করাইয়া দিল। সম্মুখে যে, কোন না কোন বিপদ উপস্থিত সেটা অবশ্য বুঝিলাম। বুঝিয়াই স্ত্রীলোকের হাতে সেইরূপ ধাক্কা খাইয়াও চুপ করিয়া রহিলাম। গৃহ অন্ধকারময়। বৃদ্ধা দরজাটী ভেজাইয়া দিল। সেই দণ্ডে গৃহাভ্যন্তরে শব্দ না হইলে, এবং বৃদ্ধা সভয়ে আমাকে স্থানান্তরে প্রবেশ না করাইয়া দিলে, হয় ত আমি সেই চটি জুতা দেখিয়া, হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিতাম। কয়েক মুহূর্ত্ত এইরূপে অতিবাহিত হইল।”

লুইকসকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, খালিল কহিলেন,—“বৃদ্ধাও কি আপনার সঙ্গে গেল?”

গ্রীক উত্তর করিলেন,—“না, আমি একাই সেই অন্ধকারময় গৃহে রহিলাম। তখন মনে বড়ই ভয় হইতে লাগিল।”

খালিল কহিলেন,—“এই সকল ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কথা যদি তখন শুনিতেন—”

লুইকস কহিলেন,—“ভাগ্যে আমি শুনি নাই, শুনিলে সে ঘর হইতে পালাইবার জন্য হয় ত একটা বিষম কাণ্ড করিয়া ফেলিতাম। তাহা হইলে, এই ঘটনার পরিণাম যেরূপ মধুর হইয়াছিল, সেরূপ আর হইত না। সে সুখ আর আমার অদৃষ্টে ঘটিত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কয়েক মিনিটই এইরূপে কাটিল। গৃহ গাঢ় অন্ধকার—কোথায় আছি, কিছুই জানিতে পারিতেছি না।

কি করি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সেই সময় একটা শব্দ কাণে আসিল অনুধাবন করিয়া শুনিলাম, সম্মুখের ঘরের দরজা সজোরে কেহ খুলিল—যে দরজার সম্মুখে চটি জুতা পড়িয়াছিল, সেই দরজার কথাই বলিতেছি—এবং কেহ বজ্র গম্ভীরস্বরে কহিল,—"এনিমা" "এনিমা" সে পাজি মাগি কোথায় গেল? উত্তর কেন দেয় না, খাবার এখনও কেন আনিতেছে না।" ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, পাছে সে লোকটা এই ঘরেই আসিয়া পড়ে—সেই যে গৃহস্বামী তাহা বুঝিতে আমার বাকী রহিল না—ঠিক সেই সময়েই আমি যে ঘরে ছিলাম, সেই ঘরের ভিতরের দিকের দরজাটা খুলিয়া গেল। গৃহান্তরে একটা আলো দেখা গেল, অনন্তর এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি নেত্র-পথে পতিত হইল। রমণী পরমা সুন্দরী, স্বর্গবিদ্যাধরী কোথায় লাগে। রমণী যুবতী, মুখে অবগুণ্ঠন নাই, সে মনোমুগ্ধকর রূপরাশি দেখিয়া, আমি অবাক হইয়া গেলাম। পাদক্ষেপ করিবার শক্তি রহিল না, প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় সেই স্থানে স্থির ও অচল হইয়া রহিলাম।

রমণীও আমাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল, বিস্ময়ে তাহার মুখ হইতে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে যুবতী কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—

"কে তুমি? এখানে কিংকরিতেছ?" তাহার এই প্রশ্ন শুনিয়া অভ্যন্তর হইতে আর একটী নারী মূর্ত্তি তাহার নিকটে আসিল, সেও পরমাসুন্দরী, দেখিবামাত্র বুঝিলাম, তাহার সহোদরা। যেরূপে আমি তথায় আসিয়া পড়িয়াছি, অকপটে অতি সংক্ষেপে দুই চারি কথায় আমি তাহা জানাইলাম। উভয় ভগ্নিই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল, উভয়েই সাগ্রহে আমাকে দেখিতে লাগিল, যেন আমার সর্ব্বাঙ্গের গঠন প্রণালী অনুধাবন করিয়া দেখিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে যে যুবতী অগ্রে আমার নেত্র-পথে পতিত হইয়াছিল। যে উভয়ের মধ্যে বয়সে জ্যেষ্ঠা, সেই গিয়া দরজা বন্ধ করিল—যে দরজা দিয়া বৃদ্ধা দূতী আমাকে গৃহ প্রবেশ করাইয়া দেয়, সেই দ্বারটী বন্ধ করিল। যে গৃহ হইতে ভগ্নিদ্বয় বাহির হইয়াছিল, আমাকে সেই গৃহে তাহাদের সহিত আসিতে আজ্ঞা করিয়া, জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদের অনুসর করিলাম। যে ঘরে প্রবেশ করিলাম, সে ঘরটী অতি প্রশস্ত, বিবিধ চিত্তবিনোদন দ্রব্য সামগ্রীতে সুসজ্জিত; একপার্শ্বে একটী ফোয়ারায় মুক্তার ন্যায় স্বচ্ছ জল বাশি ক্রীড়া করিতেছে। ভগিনীদ্বয়ের বয়স যথাক্রমে সপ্ত-

দশ ও উনবিংশ হইবে। মুক্ত অবগুণ্ঠন টানিয়া আর তাহারা আমাকে সে মধু বদন দর্শন সুখে বঞ্চিত করিল না। হয় ত তাহারা ভাবিল, একবার যখন আমি সে মুখ দেখিয়াছি, তখন যে অনিষ্ট হইবার তাহা হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের আর কোন উপায় নাই। উভয়ের মধ্যস্থলে আমাকে বসিতে বলিয়া. জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আবার আমাকে প্রশ্ন করিল, কিরূপে আমি তথায় আসিলাম, আনুপূর্ব্বিক সত্য কথা কহিতে কহিল। আমিও অসঙ্কুচিতচিত্তে আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বর্ণনা করিলাম। ভগ্নিদ্বয় আরো বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা আমাকে জানাইল যে, তাহাদের পিতার পত্নী ইসমিলডার জন্তই আমি আনীত হইয়া থাকিব। বৃদ্ধা আমিনা ভয় পাইয়া, তাড়াতাড়ি আমাকে তাহাদেরই ঘরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, প্রভুর কোপ হইতে আপাতত নিজের মাথা বাঁচাইয়াছে। যুবতীদ্বয় যেভাবে ইসমিলডাকে তাহাদের পিতার পত্নী বলিয়া উল্লেখ করিল, তাহাতে আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইসমিলডা তাহাদের গর্ভধারিণী কি না ? তাহাদের উত্তরে বুঝিলাম, ইসমিলডা তাহাদের গর্ভধারিণী নহে, তাহাদের মাতার মৃত্যুর. পর জনক আবার বিবাহ করিয়াছেন এবং বিমাতার বয়স এক্ষণে ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। এই গুপ্ত কথা গোপনে জন্ত যুবতীদ্বয়কে বারবার বিনয় করিলাম। এ কথা প্রকাশ পাইলে, ইসমিলডা, আমিনা ও আমি এই তিন জনের যে নিশ্চিত প্রাণ যাইবে তাহাও কহিলাম। আমার দিকে সলজ্জভাবে চাহিয়া জ্যেষ্ঠা কহিল,—"সে ভয় নাই,প্রাণান্তেও আমরা এ কথা প্রকাশ করিব না।" সরলতার মূর্ত্তিমতী, যুবতী একটু ভাবিয়া আবার কহিল,—'তোমাকে ধরাইয়া দিলে, আমারা ত আর কখন তোমাকে লইয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিব না।'

যুবতীর কথা শুনিয়া যে আমি পরম প্রীত হইলাম, তাহা বোধ হয়, আর বলিয়া জানাইতে হইবে না। উভয়ের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, জ্যেষ্ঠার নাম গুলনেয়ার ও কনিষ্ঠার নাম থির্জা। তাহারা ইহাও জানাইল যে, যিনি ক্রুদ্ধস্বরে আমিনাকে ডাকিতেছিলেন, সেই তাহাদের পিতা, নাম ডলতানপাশা। আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমিনার সম্বন্ধে তাহারা কি করিবে, আমি কিরূপেই বা আবার এখানে আসিতে পারিব এবং সাক্ষাৎ লাভে পরম আনন্দ অনুভব করিব। গুলনেয়ার কহিল,—"সেজন্য ভাবনা নাই, আজিকার রাত্রের ঘটনায় আমিনা তাহাদের হাতে আসিয়াছে, এবং তাহারা যাহা বলিবে, তাঁহাকে তাহা করিতেই হইবে। আর আমার এই প্রাসাদে আগমনের

কথা, যদি ইসমিলডাই শুনিতে পায়, বা জানিতে পারে, তাহাতেও কোন ক্ষতি হইবে না। তিনিও এ কথা কোনমতে প্রকাশ করিতে বা সে জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে পারিবেন না।"

খালিদ একটু ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন,—"যুবতীদ্বয় ত খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী।"

লুইকস তাড়াতাড়ি কহিলেন,—"এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি কোনমতেই দোষের নহে। তাহাদের স্বাভাবিক সরল স্বভাবের গুণেই উপস্থিত ক্ষেত্রে, এইরূপ বুদ্ধি তাহাদের মাথায় জুগাইয়াছিল। আমি তাহাদের তোষামোদ করিতেছি, এরূপ মনে করিবে না। আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদের যেরূপ নিরন্তর একাকী একই গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহাতে আলাপ করিবার একজন কাহাকে পাইলে, মন সহজেই সেই দিকে ধাবিত হয়। আর আমাকে বোধ হয়, তাহাদের ভালও লাগিয়াছিল। ভাই খালিদ, আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি সহসা তাহাদের সম্বন্ধে একটা মন্দ সংস্কারকে মনে স্থান দিবেন না। সেরূপ সুন্দরীদের মনে কোন অপবিত্র ভাব আসিতেই পারে না।"

জুলিয়ান কহিলেন,—"কখনই না, অসম্ভব!"

কনিষ্ঠ গ্রীককে সম্বোধন করিয়া খালিদ কহিলেন,—"বুঝলাম। আপনিও তা হ'লে, সেই সুন্দরী মহলে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন?"

জুলিয়ান উত্তর করিলেন,—"কিরূপে আমারও ভাগ্যে সে সুখ ঘটিয়াছিল। তাহা আমার বন্ধু লুইকসই আপনাকে বলিবেন।"

লুইকস বলিতে লাগিলেন,—"গুলনেয়ারের প্রতি আমার মন বড়ই আসক্ত হইল। আমি তাহাদিগকে জানাইলাম যে, কনষ্টাণ্টিনোপলে আসিবার সময় আমার সঙ্গে আর একটী বন্ধু আসিয়াছেন, আমার ইচ্ছা, তাঁহাকে এখানে লইয়া আসি। তিনি আমা অপেক্ষাও রূপবান্। আমার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। অধিক আর কি বলিব, ভগিনী দ্বয় আমিনার সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, আমরা যে পনর দিন কনষ্টাণ্টিনোপলে আসিয়াছি, এই সময় মধ্যে ছয় সাত বার অন্ততঃ পাশার বাগান বাটীতে গিয়াছি এবং পাশার কন্যাদ্বয়কে দর্শন করিয়া, কৃতার্থ হইয়াছি। আমার শেষ কথা এই যে, গুলনেয়ার আমার অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে, এ জীবনে অন্য কাহারও পাণি গ্রহণ করিব না। জুলিয়ানও সেইরূপ আগ্রহের সহিত কহিলেন,—"আমিও বলি, মনোমহিনী থির্জাই আমার হৃদয়ের উপাস্য দেবতা, তাহার সন্তোষ বিধানই আমার জীবনের একমাত্র সংকল্প।"

খালিল কিয়ৎক্ষণ অনন্য মনে চিন্তা করিলেন, অনন্তর কহিলেন,—"বন্ধুগণ আমার নিকট এই সকল গুপ্তরহস্য প্রকাশ করার অবশ্য কোন উদ্দেশ্য আছে, নতুবা আপনারা আমার মত কয়েক মুহূর্ত্ত পরিচিত লোকের নিকট ডালতাবান পাশার অন্দর মহলের রহস্য কাহিনী কখনই এরূপ ভাবে প্রকাশ করিতেন না।"

লুইকস উত্তর করিলেন,—"উদ্দেশ্য যে একটা আছে, সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না। পরশ্ব দিন আমরা আমাদের প্রিয়তমাদিগকে দেখিতে গিয়াছিলাম, আজ আবার যাইবার কথা আছে। আজ সেখানে আর একটী যুবতীর আসিবার কথা—জানি না তিনি পাশার কন্যাদিগের বন্ধু কি কোন আত্মীয়—এই তৃতীয় রমণীর সহিত পাশার কন্যাদের এতই প্রণয় যে, তিনি যখনই ইচ্ছা সকল সময়ই তাহাদের মহলে যাইতে পারেন। তাহাতে কোন বাধাই নাই। এ অবস্থায় তাহাকে গোপন করিয়া, আমাদের সেখানে যাতায়ত একরূপ অসম্ভব। গুলনেয়ার বা খির্জা সাহস করিয়া এ গুপ্ত রহস্য তাহার নিকট সহসা প্রকাশও করিয়াছেন। কাজেই তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য কোন না কোনরূপে তাহাকে এইরূপ কোন কাজে লিপ্ত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, সে রমণী অতিশয় রূপবতী, তাহার মনও এখনো অনাসক্ত আছে। খালিল হাসিয়া কহিলেন,—"বুঝিয়াছি, এক জন তৃতীয় নাগরের প্রয়োজন হইয়াছে। তাহা হইলে সুখের স্রোতটা বিনা বাধার চলিতে পারে। লুইকস কহিলেন, "নাগর না হোক, এমত একজন মনের মত সঙ্গী দরকার যে, জুলেকা সুন্দরীর মন হরণ করিতে পারে।"

খালিল হাসিয়া কহিলেন, "তাহার নাম জুলেকা, অতি সুন্দর নাম। যাহাদের নাম সুন্দর, তাহারা প্রায়ই দেখিতে সুন্দর হয়। কে সে জুলেকা? সেও কি কোন পাশার কন্যা? ভগবান সাক্ষী। আমার ত বোধ হয় এটী বড় বিপদ-জনক কাজ। যাহাদের পিতা এত বড় ক্ষমতাশালী উচ্চ বংশীয় লোক, সেই সকল যুবতীদিগের সহিত এইরূপ গুপ্ত প্রণয় রাখিতে যাওয়া বড় সহজ কাজ নহে।"

লুইকস কহিলেন, "আমরা সেই তুর্ক যুবতীর সম্বন্ধে আর অধিক কিছুই জানি না। তাহার নাম জুলেকা আর সে পরমা রূপবতী, আমরা এই মাত্র শুনিয়াছি। তোমার তোষামোদ করা নয় ভাই, যখনই তুমি এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছ, তখনই আমরা উভয়ে তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছি,

তুমিই যে ভাই, জুলেকা সুন্দরীর উপযুক্ত পাত্র তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।"

খালিদ আবার খানিক চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন, "তাই হোক। জগদীশ্বরই যেন আমাকে তোমাদের সঙ্গে আনিয়া মিলাইয়া দিলেন। এই গুপ্ত ব্যাপারে আমি তোমাদের সঙ্গী হই, এই চাই, ইহাই যেন তাঁহার ইচ্ছা। তবে তাহা হোক, কখন কি অবস্থায়, সেই সুখের কুঞ্জে, সেই সুন্দরীগণের সমাগমের জন্য যাত্রা করিতে হইবে?"

লুইকস কহিলেন, "সময়ের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর—এই দণ্ডে, আর কি অবস্থায় যাইতে হইবে, তাহা এখনই জানিতে পারিবে।"

সুরা ও সরবত পান শেষ হইল। হোটেলের টাকা কড়ি মিটাইয়া দিয়া, বন্ধুত্রয় হোটেল হইতে বহির্গত হইলেন।

(ক্রমশঃ।)

---

# বিলাসিতা।

## লেখক—রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

এই বিশাল সংসার মধ্যে প্রতিজন কি বিলাসী? বিলাসিতা কি সকলের পক্ষে আয়ত্তাধীন? কদাচ নহে, বস্তুত তাহা সম্ভব পর হইতে পারে না। এ জগতে লক্ষ্মীদেবী সকল মানবের প্রতি সুপ্রসন্না নহেন। যে সূক্ষ্ম বিধি প্রণালী অনুসারে এই সংসার চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা দ্বারা বৈষম্য ভাব ও বিসদৃশ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, দেখা যায় একজন ধনী; অপর জন দরিদ্র, একজন অপরিমিত ব্যয়ী অপর জন ব্যয়কুণ্ঠ উপার্জ্জন করিয়া একজন সঞ্চয় করিতেছে, অপর জন পূর্ব্ব সঞ্চিত অর্থ নাশ করিতেছে; বিলাসিতা যেমন মনুষ্যের অবস্থা ও ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, সেইমত ইহা রুচি ও প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্লেটো তাঁহার "প্রজাতন্ত্র" নামক গ্রন্থে মনুষ্য জাতির চিত্তের অনুপাত করিয়া সমাজ মধ্যে বিলাসিতার তারতম্য করতঃ একটী সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কেবল মাত্র সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত আবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুলির সংগ্রহের সামর্থ্য আছে, এই শ্রেণীর সংখ্যা ১ নির্দ্দেশ করিয়া দ্বিগুণ, তিনগুণ,

চারিগুণ, অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বিলাসিতার পরিমাণ ২,৩,৪, নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মন্টেস্ কিউ প্লেটোর প্রথম শ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র্য দুঃখ না থাকিলে, ও বিলাসিতার অভাব হেতু এই শ্রেণীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং উত্তরোত্তর দ্বিগুণ, চারিগুণ, অষ্টগুণ, অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির বিলাসিতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ১, ৩,৭, ১৫, ৩১, ৬১, ২৭, শারীরিক ও মানসিক সৌকার্য্য ও পুষ্টি সাধন এবং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী আবশ্যকীয় বস্তু ব্যতিরেকে অতিরিক্ত দ্রব্যের উপভোগই বিলাসিতা। বিলাসিতা হেতু সুরম্য বিলাস দ্রব্যের আহরণও উহা উপভোগ করিতে হইলে,ইন্দ্রিয় সকল ও তাহার সহিত চিত্তরঞ্জিত কোমল মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি আবশ্যক, ধনীগণ না হইলে বিলাসীর ভোগ্য উপকরণ সংগ্রহ হয় না। দেশ, কাল, পাত্র ও রুচি ভেদে বিলাসিতার প্রকার ভেদ হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিলাসিতার প্রাদুর্ভাবও বিস্তৃতি এক প্রকার নহে। স্বতন্ত্র ভাব ও প্রভেদ লক্ষিত হয়, দারিদ্রতা বাহু বিস্তার পূর্ব্বক যে জাতিকে বেষ্টন করিয়াছে, তাহাদের বিলাসিতা কোথায়?

উহা আকাশ কুসুমবৎ। ধন সম্পত্তির সহিত বিলাসিতার অতি নিকট সম্বন্ধ, উভয়ে সম্মিশ্রিত। সভ্যতা সোপানে আরোহণ কালে ধন আহরণের নিমিত্ত মনুষ্য যত্নশীল হয়। একমাত্র সঞ্চয় দ্বারা অন্নচিন্তা বিদূরিত হইলে, নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানান্বেষণের ও জ্ঞানানুশীলনের সুযোগ সুগম হয়। সঞ্চয়ী ধনী শ্রেণীর সঞ্চিত অর্থে জাতি পরিপুষ্টতা লাভ করিয়া ও নির্ধন শ্রেণীর পরিশ্রম দ্বারা উন্নতিকর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সমাজকে সভ্যতা শৃঙ্গে উত্তোলন করিতে থাকে। শিল্প বিজ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতি এই প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে।

দুইটী কারণ হইতে কি কল্যাণকর ফল প্রসূত না হইতেছে; প্রথম ধন স্পৃহা দ্বিতীয় জ্ঞান স্পৃহা, জ্ঞান স্পৃহা অপেক্ষাকৃত অধিক সাধুভাবে পরিপূর্ণ। ধন স্পৃহা পূর্ণ মাত্রায় লোভে পরিণত হইয়া অশেষ দুঃখ ও অমঙ্গলের হেতু হইয়াছে, ধন স্পৃহা ন্যায়ানুসারে পরিগণিত করিলে, জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন হয়, ইহা শিল্প, বাণিজ্য, সুখ, সম্পদ ও বিলাসিতার আকর এবং জ্ঞান চর্চার বিশেষ উৎসাহ দাতা, দেখিতে পাওয়া যায় ধনাগম ও জ্ঞান চর্চা জাতীয় জীবনে এক-সময়ে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। জগতের প্রায় যাবতীয় ব্যক্তিই ধন স্পৃহায়ব্যস্ত কম ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষনে মনোযোগী আছেন। (It has produced all trade all industry and all the material luxuries of civilisation and

intellectual pursuits. Whoever will soberly examine the history of innovations of art or of the learned profession may soon convince himself of this. At all events the two pursuits will usually rise together. The great majority of mankind always desire material prosperity and a small minority always desire knowledge.

জনতাকীর্ণ নগরীতে বিলাসিতার বিশেষ প্রকোপ, জন সংখ্যা পরিমাণ নগর মধ্যে যে পরিমাণে অধিক, তথায় সেইমত অধিক মাত্রায় বিলাসিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, ঊষক্ কহেন, তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বস্তু, বিশেষতঃ পরিধেয় বস্ত্রগুলি নাগরীক দিগের আত্মাভিমান গর্ব্বের কারণ হইয়া থাকে, নাগরিকাদিগের মধ্যে আলাপ পারিচয় না থাকিলে আত্মাভিমান প্রতিদ্বন্দীতায় পরিণত হয়।

জনতাকীর্ণ নগরী যে কেবল বিলাসিতার লীলাস্থল তাহা নহে, ইহা যে উহার জন্ম স্থান এমত বলা যাইতে পারে। দেখা যায় যে নাগরীর নব নব আকাঙ্ক্ষা দ্বারা কাল্পনিক ও প্রকৃত অভাব কর্ত্তৃক উদ্বেলিত হয়। তথায় নানা প্রকার কত শত বিপনি ও পণ্যশালা রাশি রাশি মনোমুগ্ধকর দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া নগর বাসী দিগের চিন্তা বিকৃত করিতেছে, নগরে বাস করিয়া বিলাসিতায় অনাশক্তি প্রদর্শন করা দুঃসাধ্য, প্রত্যেকেই কিছু কিছু অল্প বিস্তর বিলাসের দাস। এডামস্মীথ জাতীয় সমৃদ্ধি নামক স্বকীয় প্রসিদ্ধ পুস্তকে-বিলাসই এজীবন নির্ব্বাহক প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় দ্রব্য" নামক প্রস্তাবে জ্ঞান গর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এক সময়ে বিলাসী দ্রব্য যাহা নিন্দনীয় হইয়াছে; কাল ধর্ম্মস্রোতে পরবর্ত্তী সময়ে পুনশ্চ তাহা আবশ্যকীয় বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র আচার, ব্যবহার ও সংস্কার নিবন্ধন যে পার্থক্য ও প্রভেদ হইয়া থাকে, এডামস্মিথ্ তাহার বিচার করিয়াছেন। জল, বায়ু, বাসভূমি। আহার্য্য বস্তু ও সাধারণ প্রাকৃতিক অবস্থা এই সকলের সহিত ইহা বিজড়িত আছে। গ্রীষ্ম ও শীত প্রধান প্রদেশে বিলাসেরও আবশ্যকীয় সামগ্রী ভিন্ন প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান প্রদেশে বরফ ইত্যাদি শীতল বস্তু আরাম জনক ও তৃপ্তি দায়ক। শীত প্রধান দেশে ইহা তদ্বিপরিত। এই নিমিত্ত গৃহ নির্ম্মান প্রণালী স্বতন্ত্র হইয়াছে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বায়ু সেবনের উপকরণ গৃহ মধ্যেরাখা আবশ্যক, এবং শীত প্রধান দেশে গৃহে অগ্নিস্থাপনের স্থান নির্দ্ধারণ সমীচান।

শাসন প্রণালির বিভিন্নতা অনুসারে দেশমধ্যে বিলাসিতার উপকারিতা অনুভব হইয়া থাকে। বিলাসিতার শুভাশুভ ফল বিচার করিতে হইলে ইহা নির্ব্ব-

বাদে বলা যুক্তিযুক্ত যে অধিক ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ও সুখ সম্পাদন করাই বিলাসিতার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রজা তন্ত্র প্রণালী যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি তথায় জন সাধারণ বিলাস স্পৃহ হইলে অচিরে ঐ রাজ্য অবনতি অবস্থায় পতিত হয়। প্রাচীন জাতির কার্য্যাবলীতে এই শিক্ষা প্রাপ্ত হই। মিতব্যয়ী ও পরিমিতাচার এই রাজ্য মধ্যে প্রচলন থাকিলে, সুখের কারণ হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, এই রাজ্যাধিবাসীগণ ব্যবসা বাণিজ্য কর্তৃক অতুল ধনশালি হইয়া থাকে। রাজ্যের বিধি ও নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ, পরিশ্রম, সৎসাহস, সুবুদ্ধি, বিজ্ঞতা, পরিমিতাচার এই গুলির প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন করিয়া ধন আহরণ ও সঞ্চয়ের কোন অপকার হয় না। ধন স্পৃহা যথায় আত্মাভিমানের কারণ হয় ও রাজ্যে সাম্যভাব নাশের হেতু হয়। প্রজাতন্ত্রপ্রণালি তথায় শ্রীহীন ভাব ধারণ করে। বিলাসিতা সেই স্থানে বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়। তথায় ভেদাভেদ পার্থ্যক্য সুদৃঢ় করিয়া নানা বিভাগে অধিবাসীগণ বিভক্ত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ দেশ হিতৈষিতা স্বজাতি প্রেমিকতা অন্তর্হত হইতে থাকে। আত্মস্বার্থ সিদ্ধি জাতীয় চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। মন্টেস্ কিউ বলেন, রোমান ও অপর প্রাচীন জাতি দিগের জীবন এইরূপে কলুষিত হইতে আরম্ভ হইলে, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা দুর্দ্দমনীয় হইয়া যায়। বিলাসিতার আর পরিসীমা থাকে না, এবং বিশিষ্ট ও প্রধান অধিবাসীগণ নিজ জীবনকে কলুষিত করিয়া জাতীয় জীবনকে কলুষিত করিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হয়। এই নীচ কলুষিত বৃত্তির প্রাবল্যে, উৎকোচ গ্রহণ জাতীয় সাধারণ কোশাগার হইতে অবাধে বিলাসিতার নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে কোন দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করেন না।

জাতি অর্থলোভে এই প্রকারে নিজ জীবন কলুষিত করিলে প্রজাতন্ত্র প্রণালী ধীরে ধীরে মলিন ও শ্রীহীন হইতে থাকে। ক্ষুদ্র নীচ প্রজাপীড়কগণ, দাম্ভিক ও আত্মম্ভরী হইয়া উঠেন। মন্টেস্ কিউ সোবোনহর মহোদয়, এতৎ সংক্রান্ত প্রস্তাব বিশদরূপে ধীরতা সহকারে আলোচনা করিয়া যুক্তিপূর্ণ মতবাদ প্রদান করিয়াছেন।

অধুনা সুসভ্য আমেরিকা ও ফরাসী রাজ্য মধ্যে পবিত্র নিস্বার্থতার ক্ষীণভাব অবলোকনে চিন্তাশীল সুধীগণ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সুবিজ্ঞ ব্রাইস্ মহোদয় স্বপ্রণীত "আমেরিকা শাসন প্রণালি" নামক পুস্তকে তথাকার নেতাদিগের উৎকোচ গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যপক ব্রাইস মহোদয় বীর ও সাধু চরিত পরকুৎসা বা পরশ্রী কাতরতা তাঁহার পুস্তককে কলুষিত করে নাই। আক্ষেপ সহকারে তিনি

বর্ণন্ করিয়াছেন, একটী রেলপথ নির্ম্মান বাবদ সিলিং ৪৮১৮০০০ মুদ্রার অধিকাংশ পরিমাণ উৎকোচ প্রদানে ব্যয় হইয়াছিল। গিলম্যান ( Gilman on Socialism and American spirit ) বলিয়াছেন যে আমেরিকার রাজকার্য্যের দায়িত্ব নানা ব্যবস্থাপকের প্রতি অর্পিত হওয়ায় উহা সাধারণ মঙ্গলের অন্তরায় হইয়াছে।

Diffusion responsibility and crowd of legislators have proved to be a decept tre method of seiv curing public wellfare. )

জনৈক চিন্তাশীল খ্যাতনামা লেখক বলেন, প্যানামা সংক্রান্ত কেলেঙ্কারী যে একমাত্র ফরাসী রাজ্যে প্রজা শাসন তন্ত্র প্রণালি দোষ প্রদর্শন করিয়াছে, এমত নহে। উচ্চ স্থান গভীর সার পবিত্র ভাব যে ফরাসী জাতিকে জগৎ মধ্যে আদর্শ জাতি করিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভাজন করিয়াছিল, এক্ষণে সেই জাতি রুষিয়ার সহিত মিলিত হইয়া অপর জাতির সাধিনতা বিলুপ্ত করিতে ও নিগ্রহ অত্যাচার করিতে কিরূপ বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। স্কায়ার ( Scherer La Democratic etla France ) কহিয়াছেন যে প্রতি ডেপুটী তাহার কার্য্যে নিযুক্ত বা অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের নিকট অশেষ প্রকারে ঋনী থাকিত। ইহাদিগের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্বাধিনতা অবশিষ্ঠ থাকে কিনা সন্দেহ। লিয়নসের ( Leonsay ) বাক্যে জানা যায় অধিকাংশ ডেপুটী দেশ মধ্যে অপব্যয়ের হেতু হইয়াছেন ( agents to instigating to expense ) এই সকল উপলক্ষ করিয়া জনৈক ইটালীর রাজনীতিজ্ঞ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। যে শতাব্দিতে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, কত শত সহস্র যন্ত্র ও প্রণালী বা মানব শাসনের কোন সুপন্থা ও সুরাহা নির্ণীত হয় নাই! ( How strange it is, that a century which has produced the telegraph and telephone, and has shown in ten thousand forms such amazing powers of the adoptation and invention should have discovered no more successful methods of governing mankind ( Democracy and Liberty ) শাসন তন্ত্র নীতির আলোচনা উদ্দেশ্য উপরোক্ত সুধী দিগের অভিমত গুলির অবতারণা হয় নাই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিলাসিতার সহিত শাসন প্রণালী সংক্রান্ত আলোচনা যাহা আবশ্যক তাহাই হইয়াছে।

অধিকাংশের ইহা অভিমত আড়ম্বরার বিহীন বিশুদ্ধ ভাবই সাধু চরিত্রের আকর। ইহাতে নিস্পৃহতা আছে এবং লোভ পরায়ণতার দ্বারা মনুষ্য চরিত্র

কলুষিত হয় নাই ; রলিন প্রাচীন ইতিবৃত্তে বলিয়াছেন যে, সুধীর ইতিবেত্তা প্রগাঢ় দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ সকলই এক বাক্যে অঙ্গিকার করিয়াছেন যে দেশ বা সাম্রাজ্য বিলাসিতা প্রবেশ করে, সেই দেশ বা সাম্রাজ্য অচীরে ধ্বংশ মুখে নিপতিত হয়। বিভিন্ন কাল ও নানা জাতির চরিত্র হইতে এই নীতি শিক্ষা লাভ ঘটে। গোল্ড স্মিথ স্বীয় কবিতায় বিলাসিতার ফলাফল এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন

( O Luxury thou curst by heaven's decree,
How ill exchanged tare things like these for thee !
How do thy portions, with invidious joy,
Diffuse their peeasure only to destroy !
Kingdoms by thee, to sickly greatness grown,
Boast of a florid vigour not their own.
At every draught more large and large they grow,
Afloated mass of rank unwieldy woe ;
Till sapped their strength. and every part unsound.
Down, down, they sink, and spread a ruin around.

বিলাসিতা অভিশপ্ত হয়ে অমরায়।
আসিয়াছ কুহকিনী নামিয়া ধরায় ॥
মোহিনী মায়ায় তব হইয়া মোহিত।
বিনিময়ে সুধা করি গরল সঞ্চিত ॥
আবদ্ধ হইয়া তব বাহুর ভিতর।
ধ্বংশ মুখে অবিরত হই অগ্রসর ॥
রাজ্য যত ভিত্তি শূন্য তোমা লাগি হয়।
তথাপি না জন্মে জ্ঞান একি ভ্রম হায় ॥
যে শক্তি প্রভাবে তারা গৌরবে গর্ব্বিত।
নিজস্ব কখন তাহা নহে কদাচিত ॥
যত তুমি সেই রাজ্য কর অধিকার।

রাজ্য মধ্যে ভিন্নভাগে পূর্ণ অনাচারে।
আশ্রয় করিয়া তুমি রয়েছ যাহারে ॥
পূর্ণত্ব বিকাশ তব হয় যথাকালে।
অচিরাৎ নিপতিত তোমার কবলে ॥

ফলতঃ আদর্শ পুরুষ দিগের চরিত্র বা দিন যাপন আড়ম্বর বিহীন। উহা সহজ ও নিস্পৃহ ভাবে পরিপূর্ণ। চরিত্র বল তাহাদিগের ছিল, এবং ধর্ম্ম নীতির দ্বারা তাহাদিগের জীবনের নির্ম্মলতা লাভ হয়। পর দুঃখে কাতরতা প্রদর্শন ও জীবের কল্যাণ, এই তাহাদিগের জীবনের ব্রত হয়। এ সংসারে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ এই গভীর তত্ত্বজ্ঞানে আমরা তাহাদিগের কার্য্যাবলীতে ও উপদেশে প্রাপ্ত হইয়াছি। গিবন পাঠে জানিয়াছি যৎকালে আবুবকের উচ্চ পদ গ্রহন করেন, এই মহাত্মা তাহার দুহিতা আয়েসাকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দেন যে, রক্ষিত সাধারণ ধন-সম্পত্তির সহিত নিজ সম্পত্তি মিলিত করিয়া উদর পুরণ না করা হয়। ফলতঃ এই মহাত্মা অতি দীনভাবে দিন যাপন করিতেন, এবং তিনি যে বিত্ত প্রাপ্ত হইতেন, তাহার উদবৃত্তাংশ প্রতি শুক্রবার যোগ্য ব্যক্তি ও দীন দরিদ্রকে বণ্টন করিয়া দিতেন। মৃত্যুকালে আবুবকের তাঁহার উত্তরাধিকারী গণকে সবে মাত্র পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা ও স্বীয় পরিধেয় জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্র খানি প্রদান করেন। খালিফ ওমার এইভাবে দিন কাটাইয়া ছিলেন ঈশ্বরের ভৃত্য ও মানবের দাস এই জ্ঞান তাহাদের বদ্ধমূল ছিল। দেশের উন্নতি কল্পে, গুণিগণের আদর ও পুরস্কারে, দরিদ্রের দুঃখ জ্বালা প্রশমনার্থ ধনের ব্যবহার হইত, যে আরব স্যারাসিন দিগের নাম অদ্যাবধি কির্ত্তিত দেখা যায়, এই সকল সবল ও তেজস্বী, আড়ম্বর শূন্য, ন্যায় নিষ্ঠ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সাধু ব্যক্তি দিগের দ্বারা মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। ইহাঁরাই জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কি প্রকৃত কথাই না গিবন কহিয়াছেন। যে আরব দিগের মহত্ব বিজিত নানা জাতির লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্য গুলির প্রতি নির্ভর করে না, অথবা নেতা-দিগের বুদ্ধি বিক্রম কল কৌশল ও পারদর্শিতার উপর ন্যস্ত নাই। একমাত্র জাতীয় মুল শক্তি হইতে আরব দিগের গৌরবে জগৎকে বিভাসিত করিয়াছিল। (Yet the spoils of the unknown nations were continually laid at the foot of their thrones, and the uniform ascewt of the Arabian greatness must be ascribed to the spirit of the nations rather than the abilities of their chiefs. Gicbon, vol. v.

প্রাচীনেরা বিলাসিতার আবির্ভাব দেখিলে দুঃখিত হইতেন। দরিদ্রতার আগমনে ভীত হইতেন ও বিলাসিতার প্রচলনে ক্লেশ অনুভব করিতেন। গ্রীক জাতির মধ্যে একসময় এই নিয়ম প্রচলন ছিল যে যাবতীয় সাধারণ আমোদ উৎসব ক্রীড়া সঙ্গীতের চর্চ্চা দেবদেবীর পূজা ও তদুপলক্ষে ভোজ ও অপর অনুষ্ঠান গুলির সমগ্র ব্যয়ভার ধনী দিগকে বহন করিতে হইত।

রাজ্য শাসন সংক্রান্ত ব্যয় ভার ইহারা বহন করিতেন। ধনের ব্যবহার ও আত্মীয় স্বজন মিত্র ইহাদিগের প্রতি আচরণ এইগুলি অবলোকন করিলে আর্য্য হিন্দুগণ মধ্যে ও যে, এই রূপ ধারণা ছিল এমত বোধ হয়।

জনৈক চীন সম্রাট যাহাতে নর নারি অলস ভাবে জীবন যাপন না করিতে পারে, এই ভাবে রাজ্য মধ্যে বিধি প্রচলন করেন। এবং সমগ্র মঠাশ্রমগুলি ধ্বংস করিবার আদেশ দেন, তাঁহার এই ধারণা যে, এই মঠাশ্রমে নর নারীগণ অলসভাবে জীবন যাপন করে; বিলাসিতা নির্ম্মূলই উদ্দেশ্য। তিনি অপর নানা বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। কোন এক সম্রাটের মন্ত্রীগণ একদা অশেষ যত্ন সহকারে মনোরম মূল্যবান রত্ন সকল সম্রাট সমীপে আনয়ন করেন। এইগুলি গ্রহণ না করিয়া যেখানি বহু-পরিশ্রম সহকারে সংগৃহীত হয়, সেই খনির দ্বার রুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন, নিরর্থক তাঁহারা প্রজা বর্গকে বিলাসি দ্রব্য আহরণে নিযুক্ত করা বা বিলাসিতার শিক্ষা প্রদান উচিত নহে এই মনোভাব চীন সম্রাট জ্ঞাপন করেন, কায়াভোণ্ট নামক জনৈক প্রসিদ্ধ চীন আক্ষেপ সহকারে বলেন বিলাসিতার কি প্রকোপ, যে অপগণ্ড শিশুদিগের নিমিত্ত রেশম নির্ম্মিত কারু কার্য্য খচিত মূল্যবান জুতা প্রস্তুত নিমিত্ত কতশত লোক নিযুক্ত থাকিতেছে, অথচ, বহু লোকের পক্ষে এমন কি একখণ্ড লজ্জা নিবারক আবরণ দুষ্প্রাপ্য ও উহার মূল্য কত মহার্ঘ হইয়াছে, এই শত সহস্র ব্যক্তি যদ্যাপি বস্ত্র নির্ম্মাণে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে বস্ত্রের মূল্য সুলভ হইয়া যায়, তিনি আরো কহেন ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে একজন কৃষি কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপন্ন করিতেছে, দশজন সেই পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতেছে, এরূপ অবস্থায় অধিকাংশ ব্যক্তি যে দুঃখ জ্বালায় নিগৃহীত হইবে ইহা স্বতঃ সিদ্ধ।

বলা হইয়াছে, বিলাসিতা সম্ভোগ সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠেনা। শ্রেণী বিভাগ করিয়া ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে, জাতি মধ্যে পৃথক অবস্থা ইহার একটী অন্তরায়। প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী রাজ্যে বিলাসিতা অমঙ্গলের হেতু ইহারও উল্লেখ হই

সুধী এরূপ স্থলে বিলাসিতাপ্রার্থনীয় বিবেচনা করেন। পণ্ডিত ট্যাকটিটাস বলেন, সিউ নেস ( বর্ত্তমান সুইডেন অধিবাসী ) জর্ম্মান জাতি সাতিশয় ধনস্পৃহ ও ধনাভিমানী বলিয়া আখ্যাত আছে। এই কারণপ্রযুক্ত এক নরপতির অধীনে এইজাতি বাস করিতে অভিলাষ করেন। চলিত কথায় আছে ধনী বিলাসি হইলে নির্ধনের উপজীবিকার সুবিধা হয়। একের অর্থ অপরের পরিশ্রমের সহিত মিলিত হইলে নৃপতি শাসিত রাজ্যে মঙ্গল দায়ক হয়।

অগষ্টাসের শাসন কালে বিজ্ঞ জ্ঞানী বহুদর্শী রোমান ব্যবস্থাপকগণ রোমিয় মহিলা দিগের বিলাসিতার উৎসন্নতা প্রতি বিধান কল্পে কৃত সংকল্প হয়েন। আপনারা অবগত আছেন আগষ্টস্ প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া স্বয়ং সম্রাট হইয়াছিলেন। সম্রাট আগষ্টস্ নৃপতি শাসিত রাজ্যে বিলাসিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া রোমীয় ব্যবস্থাপক দিগের বিধি গুলি প্রচলন রাজ্যে স্থগিত করেন। টাই বিরিয়াসের রাজত্ব কালে ইডাইলিন্ নামক জনৈক ব্যাবস্থাপক বিলাসিতার উচ্ছেদ হেতু সম্রাটকে পুরাকালের প্রতিষেধক বিধি গুলি পুনঃ প্রচলনের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। সম্রাট ইডাইলিনকে এই উত্তর প্রদান করেন পুরাকালে রোমীয়গণ সামান্য একটী রাজ্য শাসন করিত বিধি গুলি তদানীন্তন কালে উপকারে আসিয়াছিল রোমানগণ এক্ষণে জগতের অধিপতি সমগ্র জগতের উৎপন্ন ও নির্ম্মিত দ্রব্য সকল তাহাদিগের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিতেছে। অতএব প্রাচীন বিধি গুলি অধুনা ফলদায়ক হইবে না।

বিলাসিতা হইতে ধন স্পৃহা হয়, ধন স্পৃহা জাতীয় হৃদয়কে উত্তেজিত করিলে জাতি অবশেষে ধনশালী হয়। নৃপতি শাসিত রাজ্য দারিদ্র ধনী নির্ধনতা নিবন্ধন অবসন্ন হয়। এস্থলে বিলাসিতায় ধন উপার্জ্জনের প্রবৃত্তিদায়ক। প্রজাতন্ত্র শাসিত রাজ্যে পবিত্র নিস্বার্থ ভাব ( Virtue ) স্বদেশ প্রেমিকতার অধিবাসীকে উন্নত করে। পরিশ্রম বহুদর্শিতা বিধি ব্যবস্থা প্রণালী অনুবর্ত্তী [illegible] মিতাচার ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রাখিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিলে দেশের উন্নতি হয়। ( True is it that when a Democracy is founded on commerce private people may acquire vast riches without corruption of morals. This is because the spirit of commerce is naturally attended with that of frugality, economy, moderation, labour, produce tranquility order and rule so long as this spirit subsists, the

সর্ব্ব প্রকার ইতর প্রাণীর ন্যায় মনুষ্যগণ ও উলঙ্গ অবস্থায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। আদিম অবস্থায় জীব জন্তুর ন্যায় বোধ হয় মনুষ্যগণও স্ব স্ব দেহ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃতির বৈচিত্র, অর্থাৎ শীত গ্রীষ্ম বৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রচণ্ড ঝটিকা নির্ঝাত ইত্যাদির সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিত। প্রথমতঃ মনুষ্য দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা হইতে যাহাতে রক্ষা সাধন হয়, তৎপ্রতি মনোযোগ প্রদান করিত ও বিশ্ব নিয়ন্তার সৃষ্টি কৌশলে মুগ্ধ হইয়া মানববৎ ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন হয়।

নিজ পুষ্টি সাধন ও অভাব গুলির পরিপূরণে সচেষ্ট হইতেন। মনুষ্য মাত্রেই ভিন্ন ভাবাক্রান্ত সুতরাং এই ভিন্ন ভাব হইতেই ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকে। সমাজ গঠনের সূচনা এই স্থানে। প্রতি জন একত্র সম্মিলিত হইয়া স্বকীয় স্বার্থ অপরের স্বার্থের সহিত মিলিত করিলে সমাজ বন্ধন হয়। জ্ঞান বুদ্ধি অভিরুচি অনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। অপর এক কারণে সমাজের সৃষ্টি হইয়া থাকে, বিধাতার কি মধুর প্রণালী, মনুষ্যের পরস্পরের সহিত মিলন কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতিকর এবং প্রীতিভাব নর নারী মধ্যে শুভ সন্মিলনের কারণ হইয়া পবিত্র পরিণয় বন্ধন হইয়াছে। স্নেহ, মমতা, প্রীতি, অনুরাগ, দয়া বৃত্তি, বীজ সমূহ ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া মনুষ্য নিজ সমাজের উন্নতির সামাজিক, স্বত্ব, দায়িত্ব, ও কর্ত্তব্য তাহার সহিত নির্দ্ধারিত সভ্যতার ইহাই সূচনা এবং বিলাসিতার সূত্রপাত ও এই স্থানে, কৃত্রিম অভাব দূরীকরণ ও তজ্জনিত যে সুখ সম্ভোগ তাহাই বিলাসিতা, এই অভাব বৃদ্ধি করা বিলাসিতার কার্য্য ও এই অভাব দূরীকরণই শিল্প সভ্যতার ( Meterial civiligation ) উদ্দেশ্যে কোন সুসভ্য জাতির কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ কর, দেখিবে যে কত শত সহস্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর মনোতুষ্টি সাধক দ্রব্য প্রস্তুত উদ্দেশ্যে কত বিচিত্র অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, অনন্যমনা হইয়া কি চিন্তা বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ করিয়া অকাতরে দেহপাত পরিশ্রম করিতেছে, দেখ এই জগতকে কি রমণীয় বিস্ময়কারি প্রীতি ও সুখকর বাসস্থানে পরিণত করিয়াছে, আমাদিগের আহার্য্য দ্রব্য, পরিচ্ছদ, গৃহ, ও গৃহশয্যার উপকরণ, গতি সৌকার্য্যার্থ নানাবিধ জ্ঞান সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিত্র, সঙ্গীত ; কলা বিদ্যাগুলির, পর্য্যালোচনা করিলে, প্রতিয়মান হইবে যে বিলাসিতার কার্য্যকরী শক্তি কতদুর, ইহার প্রভাবই বা কি বিস্তৃত বা কত গভীর, দেশ ভ্রমণ একজাতির সহিত অন্য জাতির সংঘর্ষ ও ক্রমে মিলন, ব্যবসা বাণিজ্য সূত্রে

এক সময়ে পাশ্চাত্যের শিক্ষক ছিল, ড্রেপার তৎপ্রণীত ইউরোপে জ্ঞান বিস্তার পুস্তকে কহিয়াছেন যে, অনেক বর্ব্বর ইউরোপীয় জাতি মুসলমানদিগের সহিত প্লেসটাইন ক্ষেত্রে ধর্ম্ম যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত হইয়া মুসলমান জাতির শিষ্টাচার মার্জ্জিত রুচী ও অন্যান্য গুণ গ্রামগুলি ইয়োরোপ খণ্ডে প্রচার করিয়া সভ্যতার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল, মুসলমান গণ পাশ্চাত্য ইউরোপ খণ্ডে নানাবিধ বিলাসিতার সৃষ্টি ও বিশেষরূপে প্রচলন করেন।

এক সময়ে ভারতবর্ষ, মিসর প্রদেশ, চীন ও এসিয়ার অপর সভ্য প্রদেশ হইতে বিলাস স্রোত পশ্চিম ইউরোপ খণ্ডে পরিপ্লাবিত করিয়াছিল।

ইউরোপকে সভ্যতার দিকে প্রধাবিত করে। এই সামান্য ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত বিবরণ হইতে পারে না। তৃপ্তি দায়ক জীব জন্তু ও তৃণ, গুল্ম, লতা, শাক, সবজী, ওবৃক্ষরাজি হইতে নানা বিলাস দ্রব্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। এসিয়া হইতে এক সময়ে এই সকল দ্রব্য প্রেরিত হইত। রোমানেরা ইটালী ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে আপেল পাতিলেবু, বাদাম, পিচ, বেদানা, কমলালেবু, ইত্যাদি ফলকর বৃক্ষ লইয়া পাশ্চাত্য ইউরোপে প্রচলন করেন। হোমারের সময়ে সিথিয়া প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে দ্রাক্ষাফল উৎপন্ন হইত, সুরা প্রস্তুত বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকা প্রযুক্ত সিথিয়ানগণ দ্রাক্ষাফল হইতে সুরা প্রস্তুত করণে প্রয়াস পাইত না। ইহার এক শতাব্দী বৎসর পরবর্ত্তী সময় হইতে এই দ্রাক্ষা ফল দ্বারা অশেষ প্রকার সুরা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়।

গল রাজ্যের ( বর্ত্তমান ফরাসী প্রদেশ ) "নার বলিস" প্রদেশে প্রথম দ্রাক্ষা সুরার প্রচলন হয়। যার গাণ্ডির সুরা, সুরা পায়িগণের নিকট বিশেষ সমাদৃত। মিসর হইতে সুরা ইউরোপে আনিত হয়। কলি মিউনার এতৎ সংক্রান্ত পুস্তক ষ্ট্রাকের ভূবিদ্যা প্লিনির প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এই সমস্ত পুস্তকে প্রাচীন কালের এতৎ বিষয়ক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোমান দিগের বিলাসিতার চিত্রে শিক্ষনীয় বিষয় আছে, কোন সুসভ্য পরাক্রম শালী জাতির বিলাসিতা, কেবল নগর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। অচিরে উহা চতুর্দ্দিকে বিকির্ণ হইয়া যায়। দূর দেশান্তর জাত দ্রব্য রোমান দিগের ইষ্ট বর্দ্ধন করিতে থাকে। ইহাদিগের চিত্ত বিনোদনার্থ সিরিয়া প্রদেশের গহন বন হইতে পশুজাত লোম সংগ্রহ হইত, বল্‌টিক্ সমুদ্রের উপকূল হইতে চন্দনকাষ্ঠ আনিত হইত। আর্ফিকা দেশের ব্যাবিলন প্রদেশের কারপেট এবং গালিচা রোম নগরীতে বিশেষ সৌখিন বলিয়া সমাদৃত ছিল। দীক্ষনায়গের প্রাক্কালে ( জুন মাসে ) প্রতিবৎসর মিসর দেশ হইতে লোহিত

সাগরের উপকূলে স্থাপিত মায়াস হরমস্ বন্দর হইতে একশত বিংশতি অর্ণব পোত ভারত বর্ষ লঙ্কাদীপ অভিমুখে গমন করিত; এবং পৌষমাসে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিত। ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান হইতে নানাবিধ মূল্যবান মণি মুক্তাদি রোমান রাজ্যে প্রেরিত হইত। বঙ্গদেশের জামালপুর প্রদেশের হীরক রোমান দিগের বিশেষ প্রিয়বস্তু ছিল।

রেশমজাত বস্ত্রেরও বিশেষ আদর দৃষ্ট হইত। আগষ্ট মাসের ইতিবৃত্তে পাঠ করা যায়, রোমান মহিলাগণ ভারতের রেশমের বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন। পুরুষ দিগের তৎকালে রেশম ব্যবহার নিন্দনীয় ছিল। আরিয়ান পেরিপ্লাস হডসন বলেন যে, ইটালী প্রদেশ হইতে সুরা এবং অপর প্রদেশ হইতে তাম্র, রৌপ্য, সীসক, টিন, প্রবাল, শ্যাম বর্ণ এক প্রকার মণি ( chrysolite ) ( storan ) শিলা কুসুম ( Wilsoo ) ইহা হইতে সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, কাচ নানাবিধ পরিধেয় বস্ত্র Articles of dress ভারতবাসীগণ গ্রহণ করিতেন। রোম সম্রাট ক্লডিয়সের পরবর্ত্তী সময় হইতে রোমানেরা বিনা মধ্যবর্ত্তীতায় প্রকাশ্য ভাবে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। ইতঃপূর্ব্বে মিশরের এলেকজেন্দ্রিয়ার সওদাগারগণ সিউটোলিয়া বন্দর হইতে ভারতীয় দ্রব্য ইউরোপে প্রেরণ করিতেন। মিশররাজ্য রোমানদিগের করতলগত হইলে অগষ্টাস প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে সুব্যবস্থা করেন। রোমান ডিনারি বা স্বর্ণ মুদ্রা ভারতে আসিত ভারতীয় স্বর্ণ মুদ্রার রোম রাজ্যে প্রচলন ছিল, রোমিয় মহিলাগণ সাতিশয় অলঙ্কার প্রিয় ছিলেন। প্রতি বৎসর এক কোটী বিশলক্ষ মুদ্রার অধিক ইহারা ইহাতে ব্যয় করিতেন।

মুসলমান জাতি, বিলাসিতা কি সৌখিনতায় জাঁক জমকতার ও বাহ্যাম্বরের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সুখ প্রিয়তা হইতে এই জাতি বিজ্ঞানের অনুশীলন, বদান্যতার উৎকর্ষ ও অবশেষে ঈশ্বর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া পার্থিব পদার্থের ক্ষণ ভঙ্গুরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, চিবলিওথিয়া অ্যারাবিকা হিস্পানায় মুসলমানদিগের বাগদাদ নগরী কিরূপ জনাকীর্ণ সমৃদ্ধি শালী ছিল, তাহার অভিজ্ঞান হয়। ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ, চিত্রবিদ্যা ভাস্কর ও স্থপতি বিদ্যা, কৃষি, শিল্প বিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসা বিদ্যা, রাজনীতি ও অর্থ নীতির ইহারা সমাদর করিতেন। বাগদাদ নগরীতে আটশত ষাটজন ভীষক রাজকীয় শুল্ক প্রদান করিয়া চিকিৎসা করিতেন। বিনা শুল্কে যাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা নির্দ্দেশ নাই। বোখারার সুলতান রোগাক্রান্ত

হইলে, কোন হাকিমকে চিকিৎসার্থ আনিবার নিমিত্ত দূত প্রেরিতহয়। হাকিম বলেন সুলতানকে চিকিৎসা করিতে হইলে, এত গ্রন্থের আবশ্যক হইবে; তাহা লইয়া যাইবার জন্ত, চারিশত উষ্ট্র নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হয়। সুতরাং হাকিম মহাশয়কে সুলতানের চিকিৎসা করা স্থগিত করিতে হইল। বিদ্যালয় স্থাপন বা পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার বিবরণী পাঠ করিলে, এই জাতির উত্তম ও অনু-রাগের প্রশংসা করিতে হয়। হিন্দু গ্রীক ও রোমান দিগের গ্রন্থ সমূহ আপন ভাষায় অনুবাদ করেন। বগদাদ নগরীতে কোনও এক সুলতানের উজীর বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা কল্পে, এক কালীন দুই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা এবং পঞ্চদশ সহস্র ডিনারের আয়কর সম্পত্তি প্রদান করেন। ছয় সহস্র ছাত্র এই শিক্ষা মন্দিরে অধ্যয়ণ করিত। সম্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তির পুত্র এবং সামান্ত শ্রম জীবির পুত্র সকলেই এই শিক্ষাগারে শিক্ষালাভ করিত। দীন দরিদ্র ছাত্রগণও এই স্থানে শিক্ষা পাইত। অধ্যাপক দিগের পারিশ্রমিক উচ্চহারে ছিল। তাহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হইত। স্পেনীয় আরব দিগের একটী পুস্তকাগারে ছয় লক্ষ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। চুয়াল্লিশ খণ্ড পুস্তক এই পুস্তক গুলির তালিকা প্রস্তুত করিতে লাগিয়া-ছিল। কি পুস্তকালয় স্থাপন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কি লেখকদিগের সমাদর আরাবিয় মুসলমানদিগের রাজত্বকে উজ্জ্বল করিয়াছে।

আলমন্সার এই বাগদাদ নগরি স্থাপন করেন। এরূপ কিম্বদন্তি আছে, পারস্যাধিপতি দাদের বাগিচা হইতে বাগদাদ নাম করণ হয়। এই নগরি এত অধিক জনতাময় ছিল যে, কোন এক সাধুর কবর স্থলে ভক্তি প্রদর্শনার্থ ষাট হাজার স্ত্রী লোক ও আট লক্ষ পুরুষ তথায় গমন করিয়াছিল। এ স্থানের বিলা-সিতা আর আমি অপনাদিগের নিকট কি বর্ণন করিব, উহা অতুলনীয়। আলমান্সার বাগদাদ নগরি শোভা সৌন্দয্য সেতু গৃহ বাটীকা উদ্যান প্রসস্ত রাজ পথ সাধারণ কৌতুকাগার ও আরামস্থল, হাম্মামাগার ইত্যাদি নির্ম্মান করিয়া ৪৫ কোটি ( 30 Millions sterling ) মুদ্রা মজুত রাখিয়া দেহ ত্যাগ করেন। ইহাঁর পুত্র মাহদি ৬০ লক্ষ স্বর্ণ ডিনার মুদ্রা মক্কাযাত্রা উপলক্ষে ব্যয় করেন। সাতশত মাইল পথের উপযুক্ত পান্থশালা ও কুপ খনন করাইয়া দেন। মাহদির মক্কা যাত্রা এক অভাবনীয় দৃশ্য। দলে দলে উষ্ট্র পৃষ্ঠে দুর দেশান্তরের সুরা ফল, মুল রসনা তৃপ্তকর নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য বরফে আবৃত করিয়া তাহার সমভিব্যবহারে লইয়া যাওয়া হয়। বিলাস ভোগ্য অগনিত কত প্রকার দ্রব্য এই নিবন্ধন সংগ্রহ হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। মাহদির বিবাহ উৎসব ইতিহাসে একটি মহা আড়ম্বরের ঘটনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

৯১৭ সতর খৃঃ আন্টর মনিরবেল ও তৎসহ রুষিয়ার দূত সাহহোসেনের রাজ দরবারে আগমন করেন। ইহাঁরা হোসেনের আড়ম্বর ও সমৃদ্ধি অবলোকনে বিমোহিত হয়েন। আবুলকেতা বলেন যে,ইহাঁর একলক্ষ ষাট হাজার অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য সতত আদেশ প্রতিপালনে প্রতিক্ষা করিত। এবং দরবারস্থ অনুচর বর্গ অতি মনোহর মূল্যবান মণিমুক্তা খচিত পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া সাহহোসেনের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিত। সপ্তসহস্র খোজা ভৃত্য ছিল, তন্মধ্যে চারি সহস্র শ্বেত বর্ণের ও অবশিষ্ট তিন সহস্র কৃষ্ণ বর্ণের পরিচ্ছদ। নানাবিধ অপূর্ব্ব জলযান টাইগ্রীস নদীবক্ষে ভাসমান হইয়া নয়ন তৃপ্তিকর সাজে সজ্জিত থাকিত ও কারু কার্য্যে সুশোভিত বিবিধ বর্ণের পতাকা গগন মার্গে উড্ডীয়মান হইয়া নগর মধ্যে এক বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিত। রাজ প্রাসাদটী যেন অমরবতীকে উপহাস করিতেছে। উহা অপরূপ সাজে সজ্জিত, আটত্রিশ সহস্র কারু কার্য্যময় চিত্র যবনিকা ও প্রাচীর বিলম্বিত আলেক্ষ পট Tapestry দ্বার দেশে বিভূষিত করা হয়। উহা দ্বাদশ সহস্র স্বর্ণ মণ্ডিত মণি মুক্তা খচিত ও রেশমে নির্ম্মিত ছিল। দ্বাবিংশ সহস্র কারপেট দ্বারা গৃহের নিম্নভাগ আবৃত ছিল। একশত কেশরী বা সিংহ শাবক সহ গৃহ মধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমন করিত। মুসলমান দিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পরাভূত হইয়া এই হিংস্র প্রাণীগণ যেন নিজ মস্তক অবনত করিয়া অধিনতা জ্ঞাপন করিতেছে। আর একটী বিলাসী বস্তুর এস্থলে উল্লেখ করিতেছি উহা সৌভাগ্যবান সৌখিন সম্রাটের সম্মুখে স্থাপিত ছিল। একটী অপরূপ স্বর্ণ নির্ম্মিত বৃক্ষ। এই বৃক্ষটীর অষ্টাদশ প্রধান শাখা ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাও বিস্তর ছিল। প্রতি শাখা গুলি মণি মুক্তা, হীরক প্রবাল, দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এবং এই শাখাগুলিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ মূল্যবান প্রস্তরে নির্ম্মিত পক্ষীগুলিকে স্থাপন করা হয়। যন্ত্র দ্বারা ইহা চালনা হইলে বিহঙ্গম দিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বর বহির্গত হইয়া যেন প্রকৃত পক্ষীগুলিই স্বাভাবিক সুস্বরে গীত গাইতেছে এমত অনুভব হইত, কোন লেখক মিলটনের নিম্ন লিখিত কবিতাটী উপলক্ষে প্রয়োগ করিয়াছেন ঃ—

High on a thronc of Royal stae which far outshown.
The wealth of ar mur or of 1nd.
Or when the gor geous East with richest Land
Showtrs on her kings. harbaric peanls and gold'

সেই মহাসনে যার প্রদীপ্ত আভায়
ভারত অর্ম্মজ রত্ন রাজি লজ্জা পায়

সুদূর সে পূর্ব্বদেশে নৃপেয়ে যেথা বরষে
অমূল্য প্রবাল পদ্মরাগ মনিচয়
তাহারাও বুঝি লজ্জা পায়।

তৃতীয় আবদুল রহমানের কাহিনী ইহাপেক্ষা অধিকতর আড়ম্বর জনক। ইহাঁর প্রাসাদ ও নগরী ইতিহাসে কীর্ত্তিত, যাঁহার গর্ব্ব ও দোদ্দণ্ড প্রতাপ মানবকে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিয়া চিন্তিত করিয়াছে, সেই প্রবল প্রতাপশালী আবদুল রহমন স্বীয় কবরের উপর পার্থিব সুখের অনিত্যতা স্বীকার করিয়া, এই কএকটী বাক্য খোদিত করাইয়া ছিলেন ঃ—"পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল আমি রাজত্ব করিয়াছি। প্রজার নিকট শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। অপর রাজন্য বর্গ আমাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিত। শত্রুগণ আমার পরাক্রমে ভীত ছিল। ধন, সম্মান, পরাক্রম আনন্দ উপভোগ এগুলি আমার আয়ত্বাধীন ও ইচ্ছা সাক্ষেপ ছিল। ফলতঃ এমন কোন পার্থিব পদার্থ ছিল না, যাহাতে মা আমার তৃপ্তি সাধন করিয়াছে। বস্তুত এই জগতে কয়দিন আমি প্রকৃত ও নির্ম্মল সুখভোগ করিয়াছি। সবে মাত্র চৌদ্দ দিন! হে মানব! কদাচ পার্থিব সুখে আস্থা প্রদর্শন করিও না।"

আর্য্য হিন্দুগণ যে বিলাসী ছিলেন না, ইহা ঠিক নহে। ভোগ বাসনার বিশাল পরাক্রমে তাঁহারাও আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। ফলতঃ ভোগ বাসনা বর্জ্জিত মনুষ্য হইতে পারে না। শুক্র যৎকালে যযাতীকে—"দুর্জ্জয় জরা অচিরাৎ তামাকে আক্রমণ করুক" বলিয়া অভিসম্পাত দিলেন, তখন রাজা যযাতী শুক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন! আমি অদ্যাপিও যৌবন সুখানুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই" ইত্যাদি। অনুমান হয়, এক সময়ে হিন্দুজাতি বিলাসিতার বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। এই যে, নানা প্রতি ষেধক বিধিগুলি যাহা হিন্দু শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে, উহা বিলাসিতা প্রশমন উদ্দেশ্যে প্রণয়ন হইয়াছে। এই গুলি কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহা বলা দুরূহ, ফলতঃ বিলাসিতার আক্রমণ হইতে বেদধ্যায়ী পণ্ডিতগণ নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন নাই। ভোজ রাজার দানশীলতার বর্ণনে দৃষ্ট হয় যে, পণ্ডিতদিগের গৃহে আমোদ প্রমোদের সময় হার হইতে স্খলিত মুক্তা সকল প্রাতঃকালে সম্মার্জ্জনী দ্বারা হৃত হইয়া প্রাঙ্গন সীমান্তে যাইয়া পড়িত, এবং মন্থরগতি বালাদিগের পদালক্তক রাগে রঞ্জিত হওয়াতে ক্রীড়া শীল পক্ষিগণ দূর হইতে দাড়িম্ব বীজ ভ্রমে ঐ সকল মুক্তা আকর্ষণ করিত। বস্তুত কি বিলাসিতায় কি সৌখিনতায় সকল বিষয়ে ইহাঁদিগের সুসিদ্ধি লাভ ঘটে। অরণ্টন

সাহেব বুটিশ "ভারত মামধেয়" পুস্তকে লিখিয়াছেন, ইহা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুজাতি সকল জাতি অপেক্ষা অতি প্রাচীন ও সর্ব্বাগ্রে সভ্যতা শিখরে আরূঢ় হইয়াছিলেন! * * * প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও বিধিগুলি সভ্যতার সীমায় উপনীত হইয়াছিল। কেবলমাত্র ব্যবহার্য্য শিল্পাদির চর্চ্চা ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল এমত নহে; দ্রব্যাদি মাধুর্য্য সুঠামের পরিচয় দিয়াছিল। বিলাস ভোগ্য দ্রব্যাদির প্রচলন ছিল। ভাস্কর ও স্থপতি বিদ্যার চূড়ান্ত পরিচায়ক কীর্ত্তিস্তম্ভ গুলি শত সহস্র বৎসরের কঠোর বিপ্লবে বিলুপ্ত হয় নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মনুষ্যজীবনে জলবায়ু (Climate) বাস ভূমি (Soil) আহার্য্যবস্তু (Food) সাধারণ প্রাকৃতিক অবস্থা (General Aspect of nature) এই বস্তু গুলির প্রভাব আছে; এবং এই গুলির গুণাগুণ ব্যাখ্যায় ও ইহার ফলাফলের দিকে দৃষ্টিদান করিলে ইহা বেশ বুঝা যায়। সভ্য অবস্থা যে, কেবল অসভ্য অবস্থা ত্যাগ, এমত নহে; মনুষ্য সভ্য অবস্থায় কতকগুলি নূতন গুণে ভূষিত হয়েন। দুর্দ্দমনীয় রিপুগুলিকে বশীভূত করণ, উগ্রভাব ও দাম্ভিকতার পরিবর্জ্জন, মধুর প্রকৃতি অবলম্বন হইয়া থাকে। আর্য্যদিগের ব্যবহার আচরণ ও শিষ্টাচার শীলতার সহিত বিলাসিতার কি সম্বন্ধ ছিল, তাহাই দেখা যাউক। প্রথমতঃ বস্ত্র পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি দান করা হউক। ঋক্‌বেদ সংহিতায় ঊষা বর্ণনে দেবগনের উদ্দেশ্যে গীতসূত্র গুলিতে বিবিধ বর্ণের মনোহর বস্ত্র সকলের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। দাক্ষিণাত্য উড়িষ্যাধাম ও অপর স্থানের প্রাচীন প্রস্তরের মূর্ত্তি গুলি দেখিলে বুঝা যায় যে, কারুকার্য্য বিশিষ্ট পরিচ্ছদ তৎকালে প্রচলন ছিল। সীতাদেবী, সত্যভামা দ্রৌপদী বানররাজকন্যা ঊষার পরিচ্ছদ, সৌখিন মনোরম ও মূল্যবান ছিল। তুলা, বৃক্ষের আঁস, পশুর লোম, রেশমের বস্ত্র এই গুলির ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিবাহকালীন জনক রাজা স্বীয় কন্যাকে উৎকৃষ্ট শাল, রেশমি বস্ত্র ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি যৌতুক প্রদান করেন। কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ি দেবী বধুদিগকে রেশমি বস্ত্র ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি প্রদান করেন। বস্ত্র পরিধান করিবার রীতিমত প্রণালীর উল্লেখ (Style of dress) দেখিতে পাই। কেশবিন্যাস অলক্তাদি দ্বারা দেহ রঞ্জন, মাল্য ধারণ, গাত্রে চন্দনাদি লেপন ভারতীয় মহিলাদিগের বিলাসিতার অঙ্গ ছিল। পত্র ও পুষ্পের অতি বিশেষভাবে আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলন ছিল। আর্য্যগণ অলঙ্কার প্রিয় ছিলেন। মস্তকের কেশ হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ অবধি মনোহর স্থান বিশেষের উপযোগী বিবিধ গঠনের সৌখিন অলঙ্কা-

রের দ্বারা বিভূষিত হ'তেন। ঋগ্বেদেও অলঙ্কারের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এত অধিক ও নানা প্রকার গৃহ সজ্জার উপকরণের উল্লেখ আছে; তাহার তালিকা এ স্থলে প্রদান করা অসম্ভব। রাজা যুধিষ্ঠিরের স্ফটিক সভায় রাজা দুর্য্যোধনের স্থলকে জল ও জলকে স্থল ভ্রম ও স্ফটিক প্রাচীরে দ্বার ভ্রম হইয়াছিল। দ্বারাবতী নির্ম্মানে বিলাসিতার উপযোগী উপকরণ ও কৃত্রিম পর্ব্বত স্থাপনের উল্লেখ আছে। শিশুপাল বধ কাব্যে মর্ম্মর নির্ম্মিত কৃত্রিম পক্ষীর বর্ণনায় লিখিত আছে যে, মার্জ্জারগণ কৃত্রিম পক্ষীকে জীবন্ত ভ্রমে আক্রমন করিত। এই গুলির নির্ম্মাণ এরূপ সুনিপুন ও উৎকৃষ্ট ছিল। নন্দন-কাননের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পারিজাত পুষ্প দ্বারাবতীতে আনিত হইয়াছিল। অযোধ্যানগরীর বর্ণনে রামায়ণ আদি কাণ্ডের ৫ম সর্গে সুবিভক্ত মহাপথে শোভিতা এবং বৃহৎ বৃহৎ রাজপথ সকল সর্ব্বদা বারিসিক্ত পুষ্প বিকীর্ণ থাকিত।

তাহাতে ধ্বজশালী শত শত উচ্চ অট্টালিকা শত শত শতাঙ্গী উদ্যান ও আম্র-কানন ছিল। তাহাতে সমস্ত শিল্পবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি ও বহু সূত মাগধবাস করিত। তাহার সকল স্থানে সীমন্তিনীদিগের নাট্যশালা ছিল। সেই নগরীতে বহু সংখ্য অশ্ব ও বারণ, অনেক গো ও বহু সংখ্যক উষ্ট্র ও গর্দ্দভ বাস করিত। করপ্রদ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বহুদেশ নিবাসী বণিকগণ বাস করিত; পর্ব্বত তুল্য অত্যুচ্চ প্রাসাদ এবং যেরূপ ইন্দ্রের অমরাবতী নগরীতে স্ত্রীদিগের ক্রীড়াগার আছে, সেইরূপ অনেক ক্রীড়াগার ছিল। তাহাতে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ বীণাও পনব সকল মুহুর্মুহু বাদিত হইত। অধুনা কলিকাতা রাজ নগরীকে প্রাসাদে পূর্ণ ( City of palaces ) বলা হয়। তদ্রূপ অযোধ্যা রাজনগরী ও মহানগরী বলিয়া কথিত হইত। কলাবিদ্যার তৎকালে বিশেষ সমাদর ছিল। অস্ত্র শিক্ষালাভ করিয়া ইন্দ্র ভবনে পার্থ সুশিক্ষিত হইবার কামনায় নৃত্য গীত বিদ্যা আরম্ভ করেন। বিরাট রাজ ভবনে রাজ কুমারী উত্তরাকে বৃহন্নলা রূপে অর্জ্জুন নৃত্য গীতাদিশিক্ষা প্রদান করেন, যাদবগণ নটবেশে ব্রজপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্ন নায়ক শাম্ব বিদূষক গদ ও অন্যান্য যাদবগণ পারিপার্শ্বিক এবং বারবনিতা গন নটী বেশে গমন করিয়াছিলেন। তখনকার জলবিহার বন বিহার, বসন্ত উৎসব হোলিক্রীড়া প্রীতিভোজ এই আমোদগুলির বর্ণনায় বিলাসিতার পূর্ণ লক্ষণ দেখা যায়।

পান ভোজ বিষয়ে আর্য্যনারীদিগের যথেচ্ছাচারিতা লক্ষিত হয়। অপর জাতি অপেক্ষা ইহাদিগের বিলাসিতা অল্প ছিল না। ৺ ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্র

লাল মিত্র বলেন মন্থুর প্রতিশোধ বিধি—"ন মাংস ভক্ষণে দোষ নমদ্যে" ইত্যাদি হইতে জন সাধারণ মধ্যে এই গুলির বিশেষ প্রচলন এমত বুঝা যায়। বিশ্বামিত্র নাকি অতিথি বশিষ্ঠঋষিকে মৈরেয় সুরাদ্বারা আতিথেয়তা সম্পাদন করেন। ভরদ্বাজ ঋষি, রাজা ভরত ও তাঁহার সেনাদিগকে মদ্যমাংস দ্বারা পরিচর্য্যা করেন। রামায়ণে সীতাদেবীর মৈরেয় সুরাপানের উল্লেখ দেখা যায়। পাণ্ডব ও যাদবগণ বনবিহার বা জল বিহার উপলক্ষে সস্ত্রীক সুরাপান করিয়া আনন্দে রত হইতেন। বিরাট রাজ মহিষী সুদেষ্ণা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সখি সৈরিন্ধ্রী বেশী দ্রৌপদীকে কীচক গৃহে সুরা আনয়নার্থ প্রেরণ করেন। বেতাল পঞ্চ বিংশতির ভোজন বিলাসী ও শয্যা বিলাসির উপাখ্যানে তৎকালীন লোকের কল্পনার আদর্শ বিলাসির ইন্দ্রিয়কে কত তীক্ষ্ণ করা আবশ্যক তাহা বুঝা যায়। রাবণের পান ও ভোজন গৃহ এই ভাবে বর্ণিত আছে। মৃগ মহিষ ও বরাহ মাংস থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে, কোনস্থানে সুবর্ণময় বিশাল ভোজনে কুক্কুট ও ময়ূর মাংস ভক্ষিত হইয়াছে। কোন স্থানে কৃষ্ণগ্রীব রক্ত শীর্ষ শ্বেত পক্ষপক্ষী বিশেষের মাংস লবণ দ্বারা চর্চ্চিত হইয়া, স্বল্প পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে; কোন স্থলে অর্দ্ধ ভক্ষিত নানাবিধ ছাগ কুক্কুট শশক মহিষ মাংস; কোনও স্থানে সুপক্ক ছাগ মাংস ও মৎস্য নানাপ্রকার লেহ্যপেয় ভোজ্য দ্রব্য এবং জিহ্বার জড়তা নিবারক অম্ল ও লবণ রস প্রধান শর্করা ও মধু ও দ্রাক্ষামিশ্রিত কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য নানাবর্ণে রঞ্জিত ভক্ষদ্রব্য সকল স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে।

সেই পান ভূমি উপহার ভূত নানাবিধ পুষ্পে সুসর্জ্জিত, তাহার কোন স্থানে হার, কেয়ুর নুপুর প্রভৃতি মহামূল্য অলঙ্কার, কোনস্থানে পানপাত্র, কোন স্থানে নানাবিধ ফল পতিত থাকায়, তাহার অতিশয় সৌন্দর্য্য বিকাশ হইতেছে। রত্ন খচিত সুবর্ণময় সুনির্ম্মিত, পর্য্যঙ্ক ও আসন সকল স্থানে স্থানে আবৃত থাকায় সুরাপান সভা যেন, অগ্নি ব্যতিরেকে প্রদীপ্ত হইতেছে। নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মিত কটু কষায় প্রভৃতি ষড় রস যুক্ত ঘৃত ও কুঙ্কুমাদি গন্ধ দ্রব্য সংস্কৃত; সুনিপুন পাচক কর্ত্তৃক সুপক্ক মাংস ও বৃক্ষ হইতে স্বয়ং রক্ষিত নানা জাতীয় সুনির্ম্মল সুরা এবং শৌণ্ডিক কৃত বহুবিধ মদ্য সকল, স্থানে স্থানে সুসর্জ্জিত রহিয়াছে। মধু শর্করা পুষ্প ও ফল হইতে উদ্ভূত নানা জাতীয় আসব বিবিধ গন্ধ দ্রব্য সুবাসিত হইয়া সুসজ্জিত আছে। স্তরে স্তরে সজ্জিত নানা পুষ্প — গ্রথিত মনোহর মাল্য স্ফটিক রচিত পান পাত্র, স্বর্ণ রজত জাম্বুনদ প্রভৃতি নানা জাতীয় ধাতু নির্ম্মিত মদ্য পূর্ণ কলস সকল কমণ্ডলু দ্বারাচ্ছন্ন সেই

পান ভূমির শোভা হইয়াছিল। মনুষ্যজীবনে বিলাসিতার সম্বন্ধ অবচ্ছিন্ন; কারণ ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য সুখ সম্ভোগ, এবং এই সুখ সম্ভোগ প্রধানতঃ ঐন্দ্রিয়িক পান ভোজন, বিহার শয়ন, সৌন্দর্য্য উপভোগ মধুরালাপ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ এই গুলিতে ইহার পরিণতি হয়। যাবতীয় পদার্থকে ব্যবহার উপোযোগী করণ ও শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ ইহার উপাদান। একটি শিল্পোন্নতি, অপরটি শিক্ষা ও চর্চ্চা সাপেক্ষ অত্যাধিক বিলাসিতা ব্যসনে আইসে, মনুষ্য ব্যবসাক্রান্ত হইলে, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা প্রদর্শন করে। অবশেষে সমাজ অবসন্ন হইয়া অধঃপতিত হয়। অধুনা শ্রমজিবীদিগের সমাজে অধিকার বিস্তৃতি লাভ করিলেও অপর কারণ নিবন্ধন বিলাসিতা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা সমাজে দুঃখ বৃদ্ধি করিতেছে। বাণিজ্য নীতি বিভিন্ন জাতির পরস্পরে ব্যবহার শাস্ত্র ( International Law ) কর্ত্তৃক দুর্ব্বল জাতিকে প্রবল জাতির কবল হইতে সংরক্ষিত করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য অবাধে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছে। ইহা সত্য হইলেও আপামর সাধারণ ও দীন দুঃখি এবং অধিকাংশ মানবের স্বার্থ সাধন প্রকৃত পক্ষে হইতেছে কিনা তাহা বিবেচ্য। আপামর সাধারণ মধ্যে দুর্দ্দমনী বিলাস স্পৃহা অবশেষে পরিতাপের কারণ হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? অন্য পূর্ব্বতন সমাজের ন্যায় বর্ত্তমান সমাজের উন্নতি বা অবনতির কারণ এক নহে। ভীষণ স্ফোটক দ্রব্যের উন্নতি কর্ত্তৃক জগতের গতি অন্যরূপ হইয়াছে। বিজ্ঞান যন্ত্রের ব্যবহার ও প্রচলনে মনুষ্যের অবনতির কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়াছে। দেখা যায় ইউরোপীয়গণ বসুন্ধরাকে তৃণ জ্ঞান না করিয়া ভোগ্য ও রম্য স্থান করিয়াছে, পার্থিব বস্তুতে কি প্রগাঢ় অনুরাগ অসীম সাহসিকতা ও ক্ষমতা তাহাদিগের কার্য্য, বলিতে প্রকাশ পাইতেছে? আর্য্যদিগের মধ্যেও এক সময়ে এই ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা বিলাসিতাকে সম্পূর্ণ রূপে স্খালন করা বাঞ্ছনীয় নহে, এমত বিবেচনা করিতেন। দেবর্ষিনারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসাচ্ছলে উপদেশ দেন। অর্থ লুব্ধ হইয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জনে ত বিরক্তি প্রকাশ করেন না? ধর্ম্মানুরক্ত হইয়াও অর্থ চিন্তায় একান্ত নিবৃত্ত হয়েন না। পরিশ্রান্ত কামরসাস্বাদ দ্বারা আপনকার ধর্ম্মার্থের ত হানি হইতেছে না? উচিৎ সময়ে ত উহাদিগের যথাবিধি সেবা করিয়া থাকেন? ত্রিবর্গ সেবার বা তদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন? ( সভা পর্ব্ব পঞ্চম অধ্যায় ) Pour অধুনা ধর্ম্ম নীতির নিস্তেজ ভাব একটি প্রধান আশঙ্কার কারণ হইয়াছে, প্রকৃত কথা বলিতে কি ধর্ম্মের ক্ষীণতায় দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও

বিলাস স্পৃহা সর্ব্বসাধারণ মধ্যে ঘোরতর বৃদ্ধি পাইতেছে। সুখ স্বচ্ছন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখজ্বালা বিষাদ অভাব মনুষ্য হৃদয়কে নিষ্পেষিত করিতেছে। মনুষ্য মধ্যে সাম্য অভেদ ভাব কি যথার্থই স্থাপিত হইতেছে? এই যে শ্রমশীল দিগের মধ্যে এক দুঃখ বিষাদের দীর্ঘ নিশ্বাস শুনাযাইতেছে উহা কি আশঙ্কার বিষয় নহে? জগতে শ্রেণীও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় স্বকীয় স্বার্থ সাধন করিয়া মনোরথ পূর্ণ করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত কি মনুষ্য স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে না? বহু দুঃখেই রুশো ক্রন্দন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শিল্প বিজ্ঞান দ্বারা মনুষ্যের প্রকৃত উপকার সাধন হয় নাই। তাঁহার এই সংস্কার ছিল যে বিলাসিতা ব্যতীত শিল্পোন্নতি হয় না ও আলস্য ব্যতীত বিজ্ঞানের উন্নতিও হয় না ( Without luxury there would have been no arts and without idleness there would have been no sciences ) তিনি আরও বলেন কপটতা সন্দিহান চিত্ত এক প্রকার অসার ভদ্রতার ভাণ সকলের মধ্যে দেখা দিয়াছে। রুশোর এই আক্ষেপ অনেক স্থলে অধুনাতন সামাজের একটি প্রকৃত চিত্র, তাহা অনেক গুণিগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই যে সামাজিক বিপ্লব ( Socialism ) শনৈঃ শনৈঃ সমগ্র ইউরোপ খণ্ডকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছে; উহা অশেষে কিভাবে পরিণত হইবে তাহা চিন্তাশীল দিগের আতঙ্কের বিষয় হইয়াছে। এই সমাজ বিপ্লবকারীদিগের মতবাদ গুলি প্রদান করিতে হইলে দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক। এই সকল শ্রমজীবির দল বলিয়া থাকেন যে, কল কারখানা কর্ত্তৃক আপামর জন সাধারণের উপকার সাধিত হয় নাই। ধনবান ব্যক্তি বা বিশিষ্ট শ্রেণীবিশেষ কল কারখানা সূত্রে প্রভূত ধনশালী হইতেছে। অথচ প্রতিদিন কোটি কোটি শ্রমজীবি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত অবধি দেহপাত পরিশ্রম করিয়া অতি সামান্য যাহা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে জঠর জ্বালা নিবারিত হইতেছে না। সেই কোটি কোটি মানব মষলতার ন্যায় পৃথিবীতে ঘুরিয়া দুঃখ বহন করিতেছে; তাহাদিগের সেই দুঃখ সেই অভাব সেই দারিদ্রতা সমভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ কল কার খানার স্বত্বাধিকারীর ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষ কোটি কোটি মুদ্রা আহরণ করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। এই সমাজ বিপ্লব কারীগণ বলেন, অর্থের কি মোহিনী শক্তি? এই সকল কুবের সদৃশ মহাজনদিগের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হেতু জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ ইহাদিগের মনতুষ্টি সাধন মানসে কি অসম সাহসিক কার্য্য না করিতেছে।

জগতে কোটি কোটি লোকের দুঃখ হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই পাইতেছে। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সেইমত গহনবনে বৃক্ষছেদন করিতেছে ও কলসি কক্ষে লইয়া জলাশয়ে সেইমত জল তুলিতেছে, গড্‌উইন কুবিয়ার, রবাটওয়েল, রক্‌ডেল, পাওনিয়র্স বীর আন্‌জার জর্জস্তেও ল্যানানে লুইক্লাস্ক মারকস বাকুনিন্ গেব্রিয়েল্ ডেভিল জর্জকেরিয়ানের দল হিওম্যান্ বেবেল ইহাদিগের পুস্তিকা প্রবন্ধ বক্তৃতা সমগ্র ইয়োরোপ খণ্ডে ও মার্কিণ রাজ্যে কি আধিপত্যও প্রভাব বিস্তার হইতেছে এবং বিলাসিতা অধুনাতন সমাজে কিভাবে দুঃখ ও কষ্টের হেতু হইয়াছে তাহা উপলব্ধি হইবে। )

উপসংহারে বিলাসিতায় মানসিক ফল সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এতদ্বারা চিত্ত রঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, আনন্দ উপভোগের সামর্থ বৃদ্ধি করে। বিলাসিতা যথায়ব্য সনে পরিণত হয়; তথায় এই বৃত্তির স্ফূর্ত্তিতে চিত্তকে কলুষিত করে। লালসা বৃদ্ধি হয়, রিপু উত্তেজক হইয়া থাকে। নিস্পৃহ ভাবে সৌন্দর্য্যের উপভোগে চিত্তকে আনন্দে আপ্লুত করে; মধুর প্রকৃতি করায় ধর্ম্মের উচ্চতম স্থানে উত্তোলন করে। চিত্ত ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হয়। কঠোর তপস্যা প্রকৃত ধ্যান মগ্ন ভোগত্যাগী যোগী মহাদেব কন্দর্প প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন, সৃষ্টি কার্য্য মগ্ন ভগবান সয়ম্ভুও উৎকর্ত্তৃক বিচলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিস্পৃহ বিলাস সৌন্দর্য্য মাধুরী উপভোগ রত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাস লীলায় মগ্ন মইয়া কন্দর্প দর্প চূর্ণ করিরাছিলেন। গৃহত্যাগী বৈরাগী শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যদেব রাসলীলা বর্ণন পাঠ করিতে করিতে ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন। বিলাসিতা মধুর ভাবের উদ্রেক করিয়া নিস্পৃহ হইলেই ধর্ম্মোন্নতির প্রধান সহায় হয়। জয়দেব গোস্বামী গীত গোবিন্দের ভনিতায় বলিয়াছেন :—

"যদি হরি স্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলং"

এইরূপে উদ্দীপিত মাধুর্য্য ভাব ঈশ্বর সংলগ্ন করিয়া ধর্ম্মে পরিণত করিবার জন্য পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

জ্ঞান কর্ম্মাত্মক বৈরাগ্য ভক্তি সমালঙ্কৃত সনাতন নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক উপদেষ্টা ও আদর্শ ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত মণিরত্নাদি খচিত পারিজাত সুরভিত প্রাসাদে স্ত্রীগণ পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। সাধুদিগকে পুণ্যলব্ধ ঈশ্বর স্থাপিত বাসভূমি, গন্ধর্ব্ব অপ্সরা সেবিত সুখস্পর্শ সমীর প্রবাহিত নয়ন রঞ্জক নানা পুষ্প সুরভিত ষড় ঋতু বিরাজিত, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ অমরাবতীতে বিলাস দ্রব্যের অভাব ছিল বলিয়া কেহ আশঙ্কা করে নাই।

—:•:—

# আগমনী।

লেখক—শ্রীতারক নাথ মুখোপাধ্যায়।

মা আসিতেছেন। সময়ে অসময়ে, এ সময়ে নানা ভাবে কি যেন কি ঐ কথাটা স্মরণ করাইয়া দেয়। গাছের আগায় ঝকমকে শরতের রৌদ্র, মাথার উপর রৌদ্রোজ্জল এলোমেলো মেঘমালা বিজড়িত, স্থানে স্থানে বিস্ফারিত সুনীলাভ শারদাকাশ, পুকুরের জলে আলোকরা কমল কুমুদ কুল ; এ সময়ের বাতাসটী, যে কোন ও স্থানের সামান্য একটু বাদ্যভাণ্ড, ভিখারীর গান, দোকানীর পণ্য, খবরের কাগজের লোক ভুলান পয়সা কুড়ান বিজ্ঞাপন, আফিসের কাযের ভিড়, এমন কি রোগ শোকটি অবধি ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করাইয়া দেয়—মা আসিতেছেন, মা আসিতেছেন—ঐ বুঝি মা এলেন।

নিত্য বর্দ্ধমান দারিদ্র দুঃখভার পীড়িত রোগ শোক ক্লিষ্ট বাঙ্গালির শুষ্ক প্রাণে ক্ষণে ক্ষণে হতাশার দারুণ আক্ষেপোক্তি উত্থিত হয়, হায়! আমোদ আর নাই ; কি দিয়া, কি লইয়া মা তোমার পূজা করিব? গিরিবাণি! তোর সাধের কৈলাস ছাড়িয়া, আদরের জন্য পিতৃগৃহে আসিতেছিস্ সূর্য্যাদি দিকপাল বর্গ ষড়ঋতু, প্রকৃতি সতী সাহ্লাদে দিব্য বন্দীস্থল অধিকার করিয়া আমাদের কর্ণে সেই কথা ঘোষণা করিতেছেন, ঐ তোদের আদরের উমা,, আবার তোদের নিকট আসিতেছেন ; কৈলাসেশ্বরীকে কাছে পাইয়া যে ক-দিন আদর যত্ন করিতে পারিস্ মনের সাধে করিয়া লও।

কিন্তু মা, তোর পিতামাতার যে আর সেদিন নাই, কি দিয়া তোর আদর করিবে? দরিদ্রের ঘরে রাঙ্গা নটে শাকের ব্যবস্থা দেখিয়া রাগ করবি না ত! পাড়ার প্রিয়জন বিয়োগে কেহ হয় ত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে। এ সময়ে সে কান্না শুনিয়াও আমাদের মার কথা মনে আসে। হায় মা লীলাময়ি! উৎসবের মাঝে ব্যসন রাখিলি কেন? প্রাণে দারুণ শেলাঘাত কি করিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইবি? ব্যথিত মর্ত্ত্য, চোখেরজল ফেলিতে ফেলিতে কোন্ প্রাণেই বা তোকে অভ্যর্থনা করিবে? অথবা ভুলিয়া গিয়াছি, তোর পুরা মূর্ত্তিখানি ঠিক এরূপ নহে। যে মূর্ত্তিতে দেবতাদের মা হইয়াছিলি, মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ ত সে মূর্ত্তি দেখিল না। আসুর যখন শুম্ভ নিশুম্ভকে বড় করিয়াছিলি, তখন দেবতাদের কথাইবা তোর মনের কোন কোণে লুকান ছিল? লঙ্কেশ্বর গৃহে যখন অধিষ্ঠিতা

ছিলি, তখন রাবণ তোর একমূর্ত্তি দেখিয়া নিজেকে ধন্য ভাবিত। আবার যখন শ্রীরামচন্দ্রকে উপলক্ষ করিয়া জগতে অকাল বোধনের প্রবর্ত্তন করিলি, মধুময় বসন্তকালের ন্যায় শারদীয় পুজারও একটা যোগাড় করিলি, তখন রাবণের নিকট হইতে তোর সেই বহুদিনের পরিচিত মুর্ত্তিটা কি করিয়া লুকাইলি? অতদিনের আলাপ পরিচয় কি করিয়া ভাঙ্গিলি! না মা, তোর পুরামুর্ত্তিখানা দেখিতে আর আমাদের অভিলাষ নাই, আমাদের সে সামর্থ্য নাই, এখনও সে অধিকার আমাদের জন্মায় নাই। অর্জ্জুনের ন্যায় সাধক শ্রেষ্ঠকেও বিশ্বরূপ দেখিয়া যখন ভয়ে চক্ষু বুজিতে হইয়াছিল, "আর চাহিনা সম্বরণ কর" বলিতে হইয়াছিল, তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যাধম আমরাই বা কোন ছার! আমরা জানি মা, জানি তুই অতি সৌম্যা অতি রৌদ্রা। দেবগণের মুখেই তোকে নমস্কার করিতে শিখিয়াছি—

"অতি সৌম্যাতি রৌদ্রায়ৈ ন তাস্তস্যৈনমোনমঃ
নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ॥

যিনি অতি সৌম্যা অথচ অতি রৌদ্রা তাঁহাকে বিনত হইয়া নমস্কার করি। জগতের প্রতিষ্ঠারূপা, কৃতি অর্থাৎ ক্রিয়ারূপা দেবীকে নমস্কার।

কিন্তু দিব্য চক্ষু সম্পন্ন জ্ঞানী সাধক না হইলে, তোর ঐ পূর্ণ মূর্ত্তিখানি দেখিতে প্রয়াস পাইলে, চক্ষু ঝলসিয়া যায়। সেকালে দেবগণের যেরূপ আহ্বানে প্রসন্না হইয়াছিলি সাধারণ মর্ত্ত্যলোকবাসী আমরাও তোকে একবার সেই ডাকেই ডাকিয়া দেখিব :—

"দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ।
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোহখিলস্য॥
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং।
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য॥

মা তুমি চরাচরের ঈশ্বরী; জগদীশ্বরি সদয়া হইয়া জগৎকে রক্ষা করুন। মা তুমি জগতের মা; তুমি বিপন্ন দুঃখহরা; আমাদের উপর দয়া কর।

কিন্তু মা, সুখভোগে প্রায় পূর্ণ অধিকারী হইয়াও, দেবগণকেই যখন তোর আর্ত্তহরা অর্থাৎ বিপন্নাশিনী মূর্ত্তি দেখিবার জন্য, মা মা করিয়া কাঁদিতে হইয়াছিল, তখন দুঃখ সুখ সঙ্কুল এই মর্ত্ত্যদেহ ধারণ করিয়া এত কি পুণ্য করিয়াছি, সেই মুর্ত্তিতে তোকে সর্ব্বদা পাইব।

অথচ এমন জ্ঞান বল নাই, ভক্তি বল নাই বা অন্য কিছু নাই, যাহার জোরে দুঃখকে অগ্রাহ্য করিতে পারি। আছে মাত্র এক ভিক্ষাবল সম্বল। তাই এক

একবার তোর প্রিয় সন্তান রাম প্রসাদের সহিত সুর মিশাইয়া বলিতে ইচ্ছা যায়, "মা আমায় আর ঘুরাবি কত ?"

তুমি না মুক্তি দিলে, সে পথই বন্ধ যে মা! " সংমোহিতং দেবি সমস্ত মেতৎ। ত্বংবৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥"

কিন্তু মুক্তির অধিকারী হইতে, এখনও বহুবিলম্ব অনেক বাকি। এই জন্যই এ প্রার্থনায় হয়ত কর্ণপাত করিবি না। তবে এই খেলা ঘর পাতিয়া বসিয়া থাক ; আমরাও থাকি, তুমিও থাক। আর "সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে!" যখন সম্বন্ধ ঘুচিবার নহে, তখন ভাল করিয়া কাছে আয় মা, আর দূরে দূরে থাকিস না। তোকে মার ন্যায় ভাল বাসিব, মেয়ের ন্যায় যত্ন করিব। ছেলের মনে, পিতার মনে কষ্ট দিয়া মাতৃভাবের, তনয়ার ভাবের অপলাপ ঘটাইতে প্রবৃত্তি হইবে কি? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বাপ, মা, ছেলে মেয়ে, ভক্তি, স্নেহ প্রভৃতি কথা অনেক দিনই অর্থহীন হইয়া যাইত।

# শ্রীশ্রীদুর্গা।

মা দুর্গে! তোমার নাম দয়াময়ি! তোমার আগমনে আমাদের এই বঙ্গদেশে আনন্দ প্রবাহ প্রবাহিত হয়। সম্বৎসরের জন্য না হউক, তিন দিনের জন্য আনন্দ আইসে। মা, জান কি তুমি, এদেশে তোমার ভক্ত কতগুলি? জান কি তুমি? তোমার দয়া ব্যতিরেকে আনন্দ হয় না। মা তোমার সকল সন্তানের প্রতি তোমার কি সমান দয়া আছে? সকলকেই কি তুমি সমান আনন্দ প্রদান কর?

না মা, সকল সন্তানের প্রতি তোমার সমান দয়া নাই, সকলকে তুমি আনন্দ প্রদান কর না। বৎসরান্তে তুমি আসিতেছ, ভাগ্যবানের গৃহে—ভাগ্যবানের মধ্যে যাঁহারা তোমার ভক্ত, কেবল তাঁহাদের ভবনেই তোমার অধিষ্ঠান হয়, সকলে কি তোমার ভক্ত নয় মা! ভাগ্যবান ভক্তের গৃহে তোমার পূজা হয়, ভাগ্যবান ভক্তের হৃদয়ে এই আনন্দের সঞ্চার হয়, কেবল এই কথাই ঠিক নহে দুর্গে মা, তোমার দুর্গানাম সকল প্রতিমায়, মা তোমার বিশ্ববিমোহন মূর্ত্তি দর্শন করিবার আশায়, তোমার সমস্ত সন্তানেই তোমার আগমনে আনন্দে প্রফুল্ল হয়। কথাটা আজ আমি ঠিক বলিলাম কি না? মা তুমি বিচার কর! প্রাচীন কালে সকলেই আনন্দে প্রফুল্ল হইত, এখন তেমন হয় না কেন মা?

দুর্গে দুর্গতি হরা জননী আমার! আসিতেছ মা! এস আজ একবার তোমায় প্রাণ ভরিয়া "মা" বলিয়া ডাকি মা। শ্মশানের চিতা ধূমে আজ বঙ্গ তুমি ত সমাচ্ছন্ন জীবজগতে মা আজ মহা দুর্দ্দিন! জননী তাই আজ প্রাণ ভরিয়া তোমায় ডাকিয়া লই মা জগদম্বা! শৈশবকালে অর্দ্ধোচ্চারণের সময় হইতেই মা বলিতে শিখিয়াছি মা, সেই সময় হইতেই তোমায় ডাকিতেছি মা, মাগো দয়া করিয়া যদি আসিয়াছ, তবে দয়া করিয়া পদরেণু দিয়া দুঃখ দারিদ্রতা দুর করিয়া দাও মা! এই মহা দুর্দ্দিনে মহামারির সন্ত্রাসে প্রাণ সদাই ভীত, জননি তাই ডাকি দুর্গে—"রক্ষ রক্ষ সদা দুর্গে দুর্গে রক্ষ নমস্ততে"। জননি জগদীশ্বরী মা গো, দয়া করিয়া এই কোটি কোটি সন্তানের উপায় করিয়া যাও মা।

মাগো ঐ দেখ চারিদিকে বিপদের ভীষণ ভৈরব ত্রাস! দুর দুরান্ত মহামারির বিকট বিভীষিকা আমাদিগকে সন্ত্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে; ঐ দেখ মা, কত শত দীন দুঃখী অন্ধ আতুর অন্ন ভাবে রাজ পথে পড়িয়া কালের কবলে পতনোন্মুখ হইতেছে, ঐ দেখ মা, ঘরে ঘরে কত লোক রোগ শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া, তোমারই দুর্গানাম লইয়া তোমারে ডাকিতেছে জননি! মা আর নিদয় হইওনা? দুর্গমে রক্ষা কর, বলিয়াই মা তুমি দুর্গা, বিপদে রক্ষা কর বলিয়া মা তুমি অভয়া- সম্পদে বিধান কর বলিয়া মা তুমি শুভদা পাপাসুর নাশ কর, বলিয়া মা তুমি মহিষাসুর ঘাতিনী, শুভাদৃষ্ট প্রদান কর, বলিয়া মা তুমি শুভঙ্করী, অন্ন হীনে অন্ন দাও বলিয়া মা, তুমি অন্নদা, অন্নে তুমি ত্রিভুবন পূর্ণ রাখ বলিয়া মা তুমি অন্নপূর্ণা! জড় জনে জ্ঞান দাও বলিয়া মা তুমি চিন্ময়ী নিরানন্দকে আনন্দ দাও বলিয়া মা তুমি সদানন্দের গৃহিণী, মা তোমায় যে নামে কেন মনে করি না, মাগো সেই নামেই যে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হয়। ভগবতি তবে মা কেন আমাদের এ দুর্দ্দশা, আমরা তোমার পাতকী সন্তান, পাপে মতি জর জর, জরাজীর্ণ কলেবর, তা বলিয়া তুমি মা, নিদয়া হইবে কেন? সন্তানে দয়া মাতার যে নিসর্গ প্রবৃত্তি।

"কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়," এই ত মা আমাদের বিশ্বাস, জগদম্বিকে, ত্রিলোকপালিকে, ত্রিগুণ ধারিণী, বিশ্ব প্রসবিনী অমরা মহামহিমাময়ী রাজ রাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে—একবার হৃদয়াসনে সহস্রারে উপবেশন কর মা! একবার প্রাণ ভরিয়া সদানন্দময়ীর সদানন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া জীবন সার্থক করি মা! মাগো মা-বই আমাদের আর যে কিছু নাই, আমরা মাটীতে পড়িয়া গেলেও মা বলিয়া কাঁদিয়া থাকি! বিদেশ হইতে ঘরে আসিলে আগে যে মা মা, বলিয়া ডাকিয়া থাকি। ওগো সেই তুমি মা, কেন আজি এই অধম সন্তানদিগের উপর নিদয়

হইতেছ। কেন মা এই মহা সন্ত্রাসের মধ্যে আমাদিগকে আশায় আশ্বাস দিতেছনা? জননি চরণে ধরি ভিক্ষা করি কাতরে, করুণা কণা বিতরণ করিয়া আমাদিগের জীবন সার্থক কর।

এস ভাই হিন্দু আজ দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া যাও, আজ সকলেই আমরা এক মায়ের সন্তান এক স্নেহে লালিত পালিত, বর্দ্ধিত এস ভাই, সেই স্নেহ স্মরণ করিয়া, সকল দুঃখ সকল কার্য্য ভুলিয়া গিয়া মায়ের নিকট গললগ্নী কৃতবাসে বলিতে থাকি :—

মহিষঘ্নী মহা মায়ে চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী,
আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি, দেহি নমস্তুতে
আয়ুর্দ্দদাতু মে কালি পুত্রান দেবি সদাশিবে।
ধনং দেহী মহা মায়ে নর সিংহা যাশা সম।
শিরোমে চণ্ডিকা পত্তি কণ্ঠংপত্তি মহেশ্বরি।
হৃদয়ং পত্তে চামুণ্ডা সর্ব্বতং পাতু কালিকা।
প্রচণ্ড চণ্ড মুণ্ডা হর মুণ্ড মালা বিভূষিতে
নমস্তভ্যাং নিশুম্ভারে শুম্ভ সম্ভেদ ভীষণে
সংগ্রমে বিজয়া দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে।
পুত্রান দেহি ধনং দেহি দারান দরিদ্র হারিণী
কংসাসুর সুদেষু কৃষ্ণ রক্ষণ কারিণী।
রক্ষ রক্ষ সদা দুর্গে দুর্গে রক্ষ নমোস্তুতে
আক্ষং কুর্ব্বঞ্চ দারিদ্রঞ্চ রোগং শোকঞ্চ দারুণং
বন্ধু স্বজন বৈরাগ্যং দুর্ণেত্বং হরদুর্গতিং।
হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভং
হর দুঃখ হর ক্ষোভং হর দেবি হর প্রিয়ে।
রাজং তস্য প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্মীতস্য যদাস্থিরা
প্রভুত্বং তস্ত সামর্থং যমাত্বং মস্তকোপরি।
ধন্যোহহং কৃত কৃতোহহং সফলং জীবিতং মম
আগতাসি যাতা দুর্গে মাহেশ্বরী সদাশ্রয়াং
কায়েন মনসা বাচা কর্ম্মণাং যৎকৃতং ময়া
জ্ঞানাজ্ঞানং কৃতংপাপং স্ব দেবি হরপ্রিয়ে
যাত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরি

যদর্চ্চিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তমে

আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহিমে।

পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বাণ কামাশ্চ দেহিমে।

মায়ের কাছে প্রার্থনা করিতে সন্তানের লজ্জা কি? তাই আমাদের পার্থিব সুখের জন্য যাহা কিছু দরকার, তাহা প্রার্থনা করিয়া ভক্তিভরে মাতৃপদে প্রণত হইয়া বল—

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।

—*—

# আগমনী সংগীত।

লেখক—ডাক্তার শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাগিণী—বেহাগ থাম্বাজ

তাল—কাওয়ালী।

বল গিরি কবে আমার আস্‌বেন শঙ্করী।

কবে প্রাণ জুড়াব আমি উমা নিধি হৃদে ধরি॥

তিলেক না হেরিলে যায়, আঁধারময় হেরি হে ধরায়,

হোলো হে বৎসরেক প্রায়,

প্রাণ যায় হায় মরি মরি॥

এবার একবার পেলে উমায়, বিনয়ে বোল্‌বো আমার মায়,

"ওমা উমা আর মা তোমায় দিব না যেতে;—

চোখে চোখে রাখ্‌বো তোমায় হেরবো দিন রেতে;—

এবার যখন শূলপানি, আসিবেন নিতে শিবানী,

ধোরবো তার দুই পাণি, বিনয় করি॥

—:*:—




"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

## মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৫শ বর্ষ। | আশ্বিন, ১৩১৩ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

# বিজয়ার সম্ভাষণ।

জন্মভূমির সুসন্তান গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে যথাযোগ্য প্রণাম নমস্কার ও সাদর সম্ভাষণ করতঃ নবোৎসাহে শ্রীশ্রীজগদম্বার নাম স্মরণ করিয়া আবার আমরা জননী জন্মভূমির সেবায় নিযুক্ত হইলাম।

# স্মৃতিশক্তির উন্নতি।

লেখক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত।

( দোষ নহে গুণ। )

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন

"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং
বোধাদপি গরীয়সী।"

কথাটা অগ্রাহ্য নহে। এখনকার কালে দেখিতে পাই, গড্ডলিকাপ্রবাহই চারিদিকে। ধুয়া উঠিয়াছে, "এদেশের ছেলেরা কেবল মুখস্থ করে; বুঝিয়া পড়ে না।" এক মুখে ধুয়া উঠিল, লক্ষমুখে ধুয়া চলিল; বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈঠকেও এই ধুয়া, আবার বিদ্যালয়ের কমিশনেও এই ধুয়া। বিলাতের অধ্যাপকেরা এদেশের ছাত্রদিগকে খাট করিবার জন্য বলিতেছেন—"ভারতীয়—বিশেষতঃ বঙ্গীয় বালকদিগের মুখস্থ করিবার শক্তি অসাধারণ; তাহারা না বুঝিয়াও পাঠ্য মুখস্থ করিয়া রাখে।"

এটা যে দোষ নহে গুণ, তাহা আমাদের বাবু-পণ্ডিতেরাও এখন বুঝিতে চাহেন না। আর তাঁহারাই বাল্যকালে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। সকল মনোবৃত্তিরই কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। স্মৃতিবৃত্তির নির্দ্দিষ্ট প্রকৃষ্ট কাল—শৈশব ও বাল্য। বয়োবৃদ্ধিসহকারে চিন্তাচর্চ্চা যত বাড়িতে থাকে, স্মৃতিশক্তির সজীবতা তত কমিতে থাকে। কিন্তু শৈশবকালে যাহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া থাকে, যৌবনপ্রাচীন্যেও তাহা মুছিয়া যায় না। এই জন্যেই শৈশববাল্যে সর্ব্বদাই মুখস্থ করিতে হয়। বারংবার আবৃত্তি করিয়াই পাঠ্য, পাঠকের, অজ্ঞাতসারে অভ্যস্ত ও মুখস্থ হইয়া যায়। এই জন্যই শিক্ষারীতিবিশারদ প্রাচীন অধ্যাপকেরা বলিয়া গিয়াছেন,

"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।"

দুরূহ দুর্ব্বোধ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ বাল্যে বার বার আবৃত্তি করার নিয়ম ছিল; প্রথমে ছাত্র মুগ্ধবোধ "আউড়ে পড়িত।" এই "আবৃত্তি বা আওড়ান" বোধের পথ সুগম করিয়া দিত। একটু বয়স হইলেই ছাত্র মুগ্ধবোধ বুঝিত, আর আদ্যন্ত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তাহার কণ্ঠস্থ হইত।

বাল্যে অভ্যস্ত মুগ্ধবোধ বার্দ্ধক্যেও বিস্মৃত হইত না। এই জন্যই তখন লোকের ব্যাকরণজ্ঞান তত অধিক হইত। এখনও অনেক বৃদ্ধ পণ্ডিতকে মুগ্ধবোধ অনর্গল আউড়াইতে দেখা যায়।

সংক্ষিপ্তসার সুপদ্ম, কলাপ প্রভৃতি ব্যাকরণেও এই কথা। যে প্রদেশে সিদ্ধান্ত কৌমুদী প্রচলিত, সেখানেও এই রীতি। কেবল ব্যাকরণে নহে, ধাতু-পাঠ এবং অভিধানেও এই রীতিই প্রশস্ত রীতি বলিয়া চিরপরিচিত।

এখন যে সকল বাবু-পণ্ডিত সাহেব পণ্ডিতদিগের ধুয়ায় ধুয়া ধরিয়া স্মৃতি চালনার দোষ ধরিতেছেন, তাঁহারাও বাল্যে তোতার মত পড়া মুখস্থ করিয়াছিলেন, ক্রমে বয়োবৃদ্ধিসহকারে বুঝিতে শিখিয়াছিলেন, যাঁহারা বাল্যে অধিক মুখস্থ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরে অধিক শিখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বাবুদের বিচারে মুখস্থ করাটা দোষের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

মুখস্থ বিদ্যা শৈশবে ও বাল্যেই মুখস্থ থাকে, ক্রমেই বুদ্ধিস্থ হইয়া পড়ে;—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যাঁহারাই এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটাইতে চাহেন, তাঁহারা প্রকৃতির গতি উল্টাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত।

ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শ্রুতিধর ছিলেন, মুখস্থ করিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল; শৈশবেও তিনি না বুঝিয়া কেবল মুখস্থ করিতেন, হস্তলিপির দোষে দুই একটা ভুলও কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। একটা ভুলের কথা কহিতেছি;—জগন্নাথ বাল্যে শিখিত হইয়াছিলেন—"দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে।" হস্ত লিখিত পাঠে দৃঢ়ার দৃটী-হ-কারের মত ছিল। জগন্নাথ "হঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে"। মুখস্থ করিয়াছিলেন; যখন অতি প্রবীণ সেই সময় এক জনের মুখে "দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে" শুনিয়া তিনি নিজের ভ্রমের সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন।

কিন্তু এরূপ দুই একটা ভ্রমের জন্য জগন্নাথের পাণ্ডিত্য লোপ হয় নাই। আর, শৈশবে বাল্যে সর্ব্বশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া জগন্নাথ অপণ্ডিত হন নাই।

বাল্যে মুখস্থ করা দোষ নহে গুণ; মুখস্থ হইলেই বিদ্যা বুদ্ধিস্থ হইয়া যায় মুখস্থ করার শক্তি নিন্দনীয় নহে, প্রশংসনীয়। ইউরোপেও আজকাল স্মৃতিশক্তির গৌরব বাড়িতেছে, পূজা হইতেছে। কিরূপে হইতেছে তাহা দেখিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস আধুনিক বিজ্ঞমন্য পণ্ডিত বাবুদিগের মধ্যে অনেকের কিঞ্চিৎ জ্ঞান যোগ হইবে।

পেলমানের প্রথা

পেলমান জর্ম্মন। তাঁহার বয়স ৩২।৩৩ বৎসর। নিজে জর্ম্মনির মিউনিক সহরে থাকেন ; কিন্তু তাঁহার আফিস্ নানাস্থানে আছে বিলাতের লণ্ডনে আছে। অষ্ট্রেলেসিয়ার উপনিবেশের জন্য মেলবর্ণে আছে, অন্যান্য স্থানেও আছে।

বালক যুবক প্রবীণ সকলেরই স্মৃতিশক্তি পেলমান উত্তেজিত করিয়া দিতেছেন। পাঁচখণ্ড উপদেশপুস্তকেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। পাঁচ ছয় সপ্তাহেই স্মৃতি পুষ্টির পথ প্রদর্শিত হয়। লণ্ডনে পেলমান মেমারি আফিসে পত্র লিখিলেই পাঠক অবস্থা ব্যবস্থা জানিতে পারিবেন ; কিন্তু তিন গিনি অর্থাৎ ৪৮৲ টাকা ফি পাঠাইতে হয়! যাঁহারা ষ্টেড্ সাহেবের রিবিউ অব্ রিবিউ কাগজ লইয়া থাকেন, তাঁহারা মে মাস পর্য্যন্ত ১৬৲ টাকা ফি দিয়া ছাত্র হইতে পারিবেন।

ছাত্র, পেলমানের কম নহে, ফেব্রুয়ারি মাসে ( পঞ্চাশ হাজার ) ছাত্র দেখা গিয়াছিল, এখন আরও বাড়িয়াছে, কিন্তু একটা অসুবিধা দেখিতেছি।

জর্ম্মন পেলমান—জর্ম্মণ, ফরাসি, ওলন্দাজ, ইটালিয় এবং রুষ ভাষায় শিক্ষা দেন।

কিন্তু ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা দেন না। অথচ দেখিতেছি, ভারতেরও অনেকে পেলমানের ছাত্র হইয়াছেন, বোধ হয় ফরাসি ভাষার ছাত্র। অগ্রে ফরাসি শিখিয়া তবে পেলমানের ছাত্র হইলে স্মৃতি পুষ্টি করিতে হইবে, এইটাই কিন্তু অসুবিধা।

আমাদের মনে হয়, ইউরোপের যত ভাষার মধ্যে ইংরাজি ভাষাই একান্ত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ভাষা, ইংরাজি ভাষার ব্যাকরণও বিজ্ঞানসম্মত নহে। তাই পেলমান ইংরাজিকেই বাদ দিয়াছেন। বস্তুতঃ ইংরাজিটাই ভাষার মধ্যে একান্ত বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ-ভাষা।

সে যাহাই হউক, স্মৃতিচর্চ্চাটা যে অগ্রাহ্য নহে। সকল জ্ঞানেরই মনে করিয়া রাখা যে, দোষ নহে—তাহা দেখান আমাদের উদ্দেশ্য। যাঁহারা স্মরণশক্তির উপর দোষারোপ করেন, তাঁহারা একান্ত নির্ব্বোধ। যাঁহারা স্মৃতিশক্তির অভাব দেখাইয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহারা বাতুল।

# অনুশীলন ও গার্হস্থ্য আশ্রম।

লেখক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী।

পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে সভ্যতার প্রারম্ভ হইতে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এই বিবাহপ্রথা যে, সমাজগঠনের প্রধান উপকরণ, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তাই হিন্দু সমাজের পরিণীতা স্ত্রীকে 'গৃহ' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে; কেননা, সংসারাশ্রমের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে গেলে বিবাহসংস্কার দ্বারা প্রথম দীক্ষিত হইতে হয়। এক্ষণে বিচার্য্য যে, সংসার বা গার্হস্থ্য আশ্রমের ধর্ম্মসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য কি? - ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, (কামনা), মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ সিদ্ধির সাধনাই মানবের প্রধান ব্রত স্থির করিয়া আর্য্য ঋষিগণ বহুকাল হইতে জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন যে, গার্হস্থ্যাশ্রম ব্যতীত অন্য কোন আশ্রমে থাকিয়া মনুষ্য এই চারি প্রকার পুরুষার্থের সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না এবং অন্য কোন আশ্রমের কর্ম্মক্ষেত্রে মনোবৃত্তি সকলের সাম্যভাবে অনুশীলন করিতে কেহ কখনও সমর্থ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, গার্হস্থ্য আশ্রমের কার্য্য, সুচারুরূপে সম্পন্ন করাই মানবের মুখ্য সাধন। এই সাধনার প্রধান শক্তি প্রকৃতিরূপিণী স্ত্রী। পুরুষরূপী ভগবান্ যেমন এই বিশ্বসংসার প্রকৃতির সঙ্গ ব্যতীত কখন কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নহেন, তদ্রূপ পুরুষরূপী মানবের ক্ষুদ্র মানবীয় সংসারে প্রকৃতিরূপিণী স্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্যনির্ব্বাহ হইতেপারে না; স্ত্রীকে শক্তি বা প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। সংসারক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষ একে অপরের সাপেক্ষ, এই উচ্চনীতি জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য সস্ত্রীক কার্য্যের ফল অত্যধিক বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া হিন্দুদিগের মধ্যে গঙ্গাস্নান, গয়া, কাশী, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার তীর্থ কার্য্য ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক কার্য্যের অনুষ্ঠান সস্ত্রীক হইয়া থাকে, "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" সর্ব্বোপরি হিন্দু বিধবাগণ এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া স্বামীর পাপক্ষয়কামনায় আজীবন কঠোর সত্যাচার অবলম্বন করিয়া অনন্যমনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে, হিন্দুর স্ত্রী, সংসার-আশ্রমে এত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন যে তাহার সহিত পুরুষের দাম্পত্যবন্ধন অতীব পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ, এবং ইহাতে আরও বুঝিতে হইবে যে, স্ত্রীপুরুষ উভয়ে, উভয়ের

নিকট কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইলে এই সংসার-রূপ মহাপরীক্ষায় কখন কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না। কেন না, মনুষ্যের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ( আনন্দ-জনিত মত্ততা ), মাৎসর্য্য (পরশ্রীকাতরতা), এই ছয়টী বৃত্তি, সাংসারিককর্ম্মত্যাগী যোগী, সন্ন্যাসী, ইত্যাদি উচ্চধর্ম্ম সাধকদিগের নিকট ষড়রিপু অর্থাৎ শত্রু বলিয়া অভিহিত হয় এবং ইহাদিগকে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু সংসারাশ্রমী বা গৃহী এই ষড়রিপুর সহিত সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বসময় সম্মিলনে, ধর্ম্ম, এবং কর্ম্মের সামঞ্জস্য রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে স্ত্রীপুরুষের কর্ত্তব্য ধর্ম্ম বুঝিতে গেলে, আমাদিগের মনোবৃত্তিগুলির প্রকৃতি আর একটু বিশদরূপে বুঝা উচিত। ইহার জটিল বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবেশ না করিয়া বোধসৌকর্য্যার্থ, মোটা মুটী সাধারণ মনুষ্যের মনোবৃত্তিগুলি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয়, অপত্য-স্নেহাদি প্রাণিসাধারণের শরীররক্ষা এবং সৃষ্টিপ্রবাহরক্ষাসম্বন্ধীয় বৃত্তিসকল যেরূপ মনুষ্যেতর প্রাণিগণের ভিতর যেভাবে দৃষ্ট হয়, সর্ব্বাঙ্গ-পরিপুষ্টি আদর্শ মনুষ্যসৃষ্টিতেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় ; এজন্য এই সমস্ত বৃত্তিগুলিকে পাশব বৃত্তি বলিলে কোন প্রকার অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আবার—দয়া, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, কর্ত্তব্যজ্ঞান, প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বৃত্তিগুলি, মনুষ্যেতর প্রাণি-গণের মধ্যে পরিপুষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ হয় না। এজন্য বৃত্তিগুলিকে মনুষ্যের বিশেষ বৃত্তি বা ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা হইল। এস্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থ Inherent Property প্রকৃতিগত গুণ, অর্থাৎ বস্তুসকলের যে প্রকৃতিগত গুণ দ্বারা এক অপর বস্তু হইতে আপনাকে বিশেষ বা পৃথক্ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে তাহার ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করেন। ঘোড়া কিংবা গরুকে যে প্রকৃতিগত গুণ সকলের দ্বারা অপর প্রাণী হইতে তাহাদিগকে বিশেষ বা পৃথক্ করে, তাহাই ঘোড়া কিম্বা গরুর ধর্ম্ম, অন্য কথায়, ঘোড়ার ঘোড়াত্ব, গরুর গোত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্বকে ধর্ম্ম বলা যায়, সুতরাং মনুষ্যের যে সকল বিশেষ বৃত্তি দ্বারা মনুষ্যকে অন্যান্য প্রাণী হইতে বিশেষ করে, তাহা তাহার ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিলে কোন দোষ দেখা যায় না।

এক্ষণে যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতে বুঝা গেল যে, মোটামুটি হিসাবে দুই প্রকার মনোবৃত্তি আছে। প্রথমতঃ মনুষ্যের বিশেষ বৃত্তি বা ধর্ম্মের বৃত্তি। দ্বিতীয়তঃ প্রাণিসাধারণের বৃত্তি বা ন ধর্ম্ম এই অর্থে অধর্ম্মের বৃত্তি। ইহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, মনুষ্যসৃষ্টিতে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এই দুই প্রকার বৃত্তি একাধারে বিরাজিত

আছে। এক্ষণে অনুশীলনের অথণ্ডনীয় নিয়ম অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, এই অতীব জটিল সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে মনুষ্যের এই ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম বৃত্তি সকল যে ব্যক্তি যে প্রকারে যতদিন পর্য্যন্ত অনুশীলন করিবে, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবেই হইবে; ইহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। অথচ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি যে সমস্ত বৃত্তিকে সাধুগণ রিপু বলিয়া অভিহিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয়, আদি যে সমস্ত বৃত্তিকে পণ্ডিতেরা পশুবৃত্তি বলিয়া নিন্দা করিয়া অধর্ম্মের বৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা সংসারাশ্রমী বা গৃহী সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিলে তিনি গৃহাশ্রমের কর্ত্তব্য ধর্ম্ম (Duty) কখন প্রতিপালন করিতে সক্ষম হন না, অথবা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। এই বিষয়টী বিশেষ করিয়া বুঝাইবার কোন আবশ্যকতা নাই, সকলেই বুঝিতে পারেন যে কোন ব্যক্তির কাম, ক্রোধাদি ষড়রিপু বা বৃত্তির কোন একটী বৃত্তির অভাব হইলে লোকে তাহাকে রোগ বলিয়া নির্ণয় করে, এবং গৃহাশ্রমের সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ সামাজিক ধর্ম্ম সুচারুরূপে পালন করিতে পারে না। এইপ্রকার আহার, নিদ্রাদি পশুবৃত্তিগুলিকেও বুঝিতে হইবে। পশুবৃত্তিসকল শারীরিক বৃত্তি, এই বৃত্তিসকলের অনুশীলন না করিলে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না; সুতরাং এই সমস্ত বৃত্তির অভাব হইলে রোগ বলিয়া অভিহিত হয়।

এই প্রকার সংসার ক্ষেত্রে মনোবৃত্তিগুলির অনুশীলন না করিলে অর্থাৎ প্রবৃত্তিধর্ম্ম প্রতিপালন না করিলে কখন নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া যোগাদি নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনা হইতে পারে না। অতএব সংসার আশ্রমে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন করিতে হইবেই হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, অধর্ম্ম বৃত্তিগুলির অনুশীলনের অবশ্যম্ভাবী ফল যখন জীবের অধোগতি, তখন কি উপায় অবলম্বন করিয়া এই অধর্ম্ম বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিলে ইহারা অধঃস্রোতশীলা হইয়া, ঊর্দ্ধস্রোতঃশীল হইতে পারে, অর্থাৎ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও ধর্ম্মতঃ ধর্ম্মের কার্য্য হইবে। এই অতীব দুরূহ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, এই কর্ম্মের অভিপ্রায় একেবারে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হয়। উন্নতিশীল রাজা, দেশকালপাত্র বিচারে যে প্রকার কতকগুলি নিয়ম অর্থাৎ আইনের অধীন হইয়া তাঁহার সুবৃহৎ রাজ্য-

বিচারে গার্হস্থ্য শাস্ত্রের নিষেধ ও বিধি অনুসারে সংসার প্রতিপালন করেন। আবার দেখা যায় যে, কোন দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড দিবার সময় রাজা, প্রজার কার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া দোষী কিম্বা নির্দ্দোষ সাব্যস্থ করিয়া থাকেন। কোন একটী চিকিৎসক রোগীর প্রাণরক্ষার অভিপ্রায়ে, কোন প্রকার অস্ত্রচিকিৎসা করিলে, কোন কারণবশতঃ যদি তাহার মৃত্যু হয়, তবে সে চিকিৎসক কখন দোষী বলিয়া দণ্ডিত হয় না। এই প্রকার আততায়ীর প্রাণবধ করিলে কেহ কখন দণ্ডাহ হয় না। তদ্রূপ গৃহধর্ম্মপ্রতিপালন করিতে গিয়া সংসাররূপ কার্য্যক্ষেত্রে কর্ত্তব্যানুরোধে অধর্ম্ম বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন করিলে তাহাতে কখন জীবের অধোগতি হয় না। এই বিষয়টী একটু ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই পশুধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বৃত্তিগুলির এক একটী ধরিয়া, বুঝা আবশ্যক।

আহার :—যে সমস্ত ব্যক্তি, আহারের প্রলোভনে অর্থাৎ মোহে মোহিত হইয়া সর্ব্বদা, ঘোড়া, গরু, মহিষ, প্রভৃতি পশুর ন্যায় আহারের চিন্তায় আজীবন ব্যস্ত থাকে, তাহারা যে, নররূপী পশু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আবার আর একটু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, গৃহীর প্রথম পুরুষার্থ ধর্ম্ম অর্থাৎ সংসারধর্ম্মপ্রতিপালন এবং পারত্রিক মঙ্গল সাধন। দ্বিতীয় পুরুষার্থ; অর্থ উপার্জ্জন করা, এই অর্থের পরিমাণ এত অধিক হওয়া চাই যে, তৃতীয় পুরুষার্থ, কাম অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী বা স্বাধীন হইয়া লিপ্ত নির্লিপ্ত ভাবে সংসারপ্রতিপালন এবং পারত্রিক কার্য্য করিতে সক্ষম হইতে পারে। তখন মনুষ্যের আংশিক পশুত্ব দূর হইতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা নিজের এবং পরিবারগণের উদরান্ন সংগ্রহ করিবার জন্য আজীবন অনন্যমনে অর্থ উপার্জ্জন করিতে ব্যস্ত থাকে, স্বাধীন ভাবে ইচ্ছা অনুসারে পরমার্থ চিন্তা বা অন্য কোন স্বাধীন কার্য্য করিতে পারে না, তাহারা নররূপী পশু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অন্য দিকে আবার আর্য্য-ঋষিদিগের উপদেশ অনুসারে কায়, মনঃ এবং বাক্যে সংসার আশ্রমের লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া কেবল মাত্র নিজশরীর এবং পরিবারবর্গের শারীরিক সুস্থতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং মিতব্যয়ী হইয়া সাত্ত্বিকভাবে আহারবিহারাদি সমস্ত সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যথাসময়ে ধনসঞ্চয় করিতে যাহারা সমর্থ হন, অতি ধনীই হউন, আর স্বল্পধনীই হউন, তিনি নিশ্চয়ই আদর্শসংসারী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য কৃপণকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মাচারী বলিয়া

বুঝিতে হইবে। এক্ষণে আহার সম্বন্ধীয় যে সমস্ত উচ্চনীতিগুলি বর্ণনা করা হইল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া আর্য্যঋষিগণ কি প্রকারে সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, তাহা একবার শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে গৃহীমাত্রেই ভক্তি ভাবে, প্রসন্নচিত্তে প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, অর্থাৎ কোন আরাধ্য দেবতার সেবা, গো-সেবা, শত্রুমিত্রবিচার না করিয়া অতিথি সেবা, পশুপক্ষী, ইত্যাদি ইতর প্রাণিগণের আহার দেওয়া এবং মাতৃপিতৃর দৈনিক কার্য্য, এই পঞ্চপ্রকার কার্য্য যে গৃহস্থ প্রত্যহ আহারের পুর্ব্বে না করিত, সে সমাজে অত্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া অভিহিত হইত। ইহার উপরে আহার্য্য পদার্থে লোভ বিনষ্ট করিবার জন্য, আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে আহার্য্য স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া ভক্তি সহকারে অর্থাৎ ধর্ম্মবৃত্তি অনুশীলন করিত, গৃহী আহারের কার্য্য সমাপ্ত করিত। পাশ্চাত্যসংস্রবে আমরা ক্রমশঃই যে প্রকার স্বগৃহে পরগৃহে, নিমন্ত্রণে এবং হোটেলাদি অন্যস্থানে আহার সম্বন্ধে পথ্যাচারী হইতেছি, তাহাতে অনুমান হয়, কালক্রমে এই উচ্চ আহার নীতির সংস্কার দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিদুরিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা আজকাল স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন, যাঁহাদের সূক্ষ্ম বিচারশক্তি আছে, তাঁহারা বিচার করিয়া বুঝুন যে, পরিশুদ্ধ-সংস্কারান্বিত পাচক, পাচিকা এবং পরিচারক, পরিচারিকা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত আহারীয় ও পানীয় কদাচ গ্রহণ করা উচিত নহে। বিজ্ঞানানভিজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মূর্খতার দোষে এদেশের অনেক প্রকার ক্ষতি হইয়াছে। তাহার মধ্যে রন্ধন, গৃহমার্জ্জন, পান, ভোজন-পাত্র পরিষ্কার করা, কলসী কক্ষে জল উত্তোলন প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক গৃহকার্য্য গুলি পবিত্রভাবে করিতে আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীদিগকে যতটুকু শীত, উষ্ণ, আর্দ্রতা ( জল ) সহ্য করিতে হয়, তাহাতে তাহাদিগের স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। ডাক্তার-গণের এই উপদেশে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে। দেশ, কাল, এবং পাত্র বিচার করিবার ক্ষমতা অধিকাংশ চিকিৎসকের নাই, ইহাই বড় দুঃখের কথা। পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ স্থান আজকাল আমেরিকা দেশ ; সে দেশস্থ প্রধান চিকিৎসকদিগের মত অনুসারে আমেরিকার সম্ভ্রান্ত ধনবতী গৃহিণীগণ বুঝিয়াছেন, গৃহস্থলীর কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকার স্ত্রীলোকের শরীর সুস্থ রাখিবার সহজ উপায় নাই। মেম সাহেবদের অনুকরণ করিয়া অপরাহ্ণ সময় ফিটনে আরোহণ করিয়া বায়ুসেবনে বহির্গত হইলে, ব্যায়ামের কার্য্য হয় ; ইহা অজ্ঞ চিকিৎসক ব্যতীত কোন স্বাস্থ্যবিদ্যাবিদ্ কখন স্বীকার করিবেন না। প্রসঙ্গক্রমে কথায় কথায় অনেক আবশ্যকীয় কথার অবতারণা করা হইয়াছে। বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উপেক্ষিত হইবে না।

# পুরুষার্থ।

লেখক—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

"অর্থ"-শব্দে প্রয়োজন বুঝিতে হয়। মানুষের শরীরাধিষ্ঠিত চৈতন্যকে "পুরুষ" বলা যায়। কাজেকাজেই পুরুষার্থ-শব্দে পুরুষ বলাতে পুরুষ ত বুঝিতে হইবেই, স্ত্রীলোকও বুঝিতে হইবে। এস্থলে কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই পুরুষ। এই পুরুষের যাহা অর্থ, যে কিছুতে পুরুষের প্রয়োজন বুদ্ধি হয়, পুরুষ যাহা কিছু চাহিতে পারে তাহাই পুরুষার্থ।

পুরুষ চাহে কি? যাহা শুভ, যাহা ভাল তাহাই আমার হউক বা থাকুক, পুরুষ এই প্রকার ইচ্ছা করে। যাহা অশুভ, যাহা মন্দ, তাহা আমার না হউক, তাহা যদি থাকে তবে ঘুচিয়া যাউক, ভবিষ্যতে আর কখনও না হউক, পুরুষ এই প্রকার ইচ্ছা করে। শুভই পুরুষের ইষ্ট অর্থাৎ বাঞ্ছিত। অশুভই পুরুষের দ্বিষ্ট কেন না অশুভই অনিষ্ট অর্থাৎ অবাঞ্ছিত। যাহা শুভ তাহাতেই পুরুষের রাগ; যাহা অশুভ, তাহাতে পুরুষের দ্বেষ।

ইষ্টলাভ করিবার এবং অনিষ্ট পরিহার করিবার অভিপ্রায়েই পুরুষ কর্ম্ম করে। কেবল মনে মনেই যাহা করা যায়, তাহার নাম মানস কর্ম্ম; বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে, কথা কহিয়া, মনের ভাব প্রকাশ করাকে বাচিক কর্ম্ম বলে; স্থূল শরীরের দ্বারা অর্থাৎ হস্ত পদাদির দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা কায়িক কর্ম্ম। কর্ম্ম এই তিন প্রকার মাত্র। আর, কর্ম্মমাত্রেরই উদ্দেশ্য ইষ্টলাভ বা অনিষ্ট পরিহার।

কিন্তু পুরুষ ভ্রান্ত। কোন কর্ম্মে শুভ ফল ফলিবে, কোন কর্ম্মেই বা অনিষ্ট হইবে, সব সময়ে পুরুষ তাহা ঠিক করিতে পারে না। এই কর্ম্ম করিলে শুভ হইবে, এইরূপ মনে করিয়া পুরুষ একটা কর্ম্ম করিল কিন্তু সেই কর্ম্মের পরিণাম হইল অনিষ্ট; অনিষ্টপরিহার কামনায় পুরুষ একটা কর্ম্ম করিল, তাহাতে সে অনিষ্টের পরিহার ত হইলই না, বরং তাহার ফলে অধিকতর অনিষ্ট হইল, এমনও দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ নহে, পুরুষের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ। কর্ম্মফলের সহিত কর্ম্মের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ম্ম কারণ বটে; ফলও কার্য্য বটে কিন্তু কোন কর্ম্মফলের সহিত কোন কর্ম্মের নিয়ত অব্যভিচরিত কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে ভ্রান্ত পুরুষ তাহা কেমন করিয়া আবিষ্কার করিবে? কর্ম্মফল এবং কর্ম্ম অনন্ত শৃঙ্খলের ন্যায়

সম্বন্ধযুক্ত। সান্ত পুরুষ এই অনন্তের অন্ত বাহির করিতে যতই কেন চেষ্টা করুক না, কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

তবে, পুরুষ বড় অভিমানী। অনাদি কাল হইতে এই কার্য্য কারণ-শৃঙ্খলকে হস্ত-গত করিতে পুরুষ কতই না চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু অনন্ত শক্তি-শালিনী প্রকৃতি আজি পর্য্যন্ত ধরা দেন নাই, কখনই ধরা দিবেন না। কিন্তু তাহাতেও পুরুষের অভিমান খর্ব্ব হয় না, প্রকৃতির গুণেই সে অভিমান খর্ব্ব হইবার নহে। খেলা পাতিয়া রাখিবার জন্যে প্রকৃতি আপন লীলা রজ্জু যখনই কিঞ্চিৎ শিথিল করেন তখনই ভ্রান্ত পুরুষ উল্লাসে অধীর হয়, মনে করে যে, কার্য্য-কারণ-রূপ পরম তত্ত্বকে এইবার ধরিয়াছি, প্রকৃতির উপর আমার প্রভুত্ব এইবার প্রতিষ্টিত করিয়াছি, আমি ধন্য হইয়াছি, আমি কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু অনন্ত রাশি হইতে এক দুই বা কোটি মুষ্টি তুলিয়া লইলেও অনন্তের অনন্ত্য নষ্ট হইতে পারে না, আনন্ত্যের হ্রাসও হইতে পারে না, ভ্রান্ত পুরুষ মায়াচক্রে ঘূর্ণিত হইয়া তখন ইহা ভুলিয়া যায়। ভ্রান্ত পুরুষ এই অজ্ঞানের নাম দেয় বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের বলে ভ্রান্ত পুরুষ আপনাকে বলীয়ান্ মনে করিয়া এই বিজ্ঞানের সাহায্যে ইষ্ট ধরিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু যতই অগ্রসর হউক না কেন, আকাশস্থ রামধনুর ভুমিপ্রোথিতবৎ স্থল যেমন আরও দূরেই সরিয়া যাইতে থাকে কিম্বা কিছুকাল পরে আকাশেই লীন হইয়া যায়, ভ্রান্ত পুরুষের ইষ্টও তেমনই দূরেই রহিয়া যায়, অথবা একেবারে অদর্শন হইয়া পড়ে। হউক অদর্শন, কিন্তু ভ্রান্ত পুরুষ ইষ্টের অনুসন্ধানে বিরত হয় না, ক্লান্ত হয়, কাতর হয়, কত প্রকারের কত যাতনাই সহ্য করে, আবার সেইদিকেই অগ্রসর হয়।

ভ্রান্ত পুরুষ চাহে ইষ্ট, ভ্রান্ত পুরুষ চাহে না অনিষ্ট। কেহ বুঝাইয়া দিলে, কিম্বা মনে বিচার করিয়া দেখিলে, পুরুষ বুঝিতে পারে যে সুখই ইষ্ট আর দুঃখই অনিষ্ট। কিন্তু ইহা সূক্ষ্ম কথা; স্থূলবুদ্ধি সর্ব্বদা এ সূক্ষ্মের ধারণা করিতে পারে না। ভ্রান্ত পুরুষ মনে করে যে, যাহা কিছু ইষ্টের নিমিত্তমাত্র, ইষ্ট যাহাকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয়, ইষ্টের সেই নিমিত্ত, ইষ্টের সেই আশ্রয়ই যেন ইষ্ট, আর অনিষ্টের যাহা নিমিত্ত বা আশ্রয়, তাহাই অনিষ্ট।

পুরুষ ইন্দ্রিয়াধীন। কেন না, ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই পুরুষের সহিত জগতের সম্বন্ধ হয়। একদিকে পুরুষ, অন্যদিকে জগৎ, এই দুয়ের মধ্যে আছে জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্ম্মেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ লইয়াই জগৎ। এই শব্দ স্পর্শ রূপ,

চক্ষু, রসনেন্দ্রিয় অর্থাৎ জিহ্বা এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় অর্থাৎ নাসিকা———এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকৃত অথবা বিষয়ীভূত হয়। তাহার পর এই ইন্দ্রিয়গণ ঐ সাক্ষাৎকৃত বিষয় অন্তঃকরণকে দেয়, তখন পুরুষ তাহা গ্রহণ করে অর্থাৎ পায়। এই গ্রহণের একটা নাম, জ্ঞান। আর, ইন্দ্রিয়ের বিষয় যে জগৎ অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তাহার দিকে পুরুষের যখন প্রবৃত্তি হয়, তখন যে জাতীয় সেই প্রবৃত্তি পুরুষ তাহার অনুকূল ইন্দ্রিয়কে চালনা করে। কথনের প্রবৃত্তি হইলে যে ইন্দ্রিয়ের চালনা হয়, তাহার নাম বাগিন্দ্রিয়; গ্রহণের প্রবৃত্তিতে যে ইন্দ্রিয়ের চালনা হয়, তাহার নাম হস্ত, গমনের প্রবৃত্তিতে যে ইন্দ্রিয়ের চালনা হয়, তাহার নাম পাদ, ত্যাগের প্রবৃত্তিতে যে ইন্দ্রিয়ের চালনা হয়, তাহার নাম পায়ু আর আনন্দনের প্রবৃত্তিতে যে ইন্দ্রিয়ের চালনা হয়, তাহার নাম উপস্থ। এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে চালনা হয়, সেই চালনার নামই কর্ম্ম।

বলিলাম যে, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা নাসা এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর, বাক্ পাণি পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহা ছাড়া অন্তরিন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ বা মন আছে। এই অন্তঃকরণ উভয় ধর্ম্মাত্মক অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। মনকে একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া ধরিলে এগারোটি, আর মনকে দুইটি ইন্দ্রিয় বলিয়া ধরিলে বারোটি ইন্দ্রিয় হইল। এ হিসাবে জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়টি আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ও ছয়টি। জ্ঞানও ছয় প্রকার,—শব্দজ্ঞান, স্পর্শ-জ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান আর গন্ধজ্ঞান; আর এই পাঁচ প্রকারের মধ্যে যে কোনও প্রকারের মানস জ্ঞান। তবেই কর্ম্মও ছয় প্রকার,—কথন, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ আর আনন্দন আর এই পাঁচ প্রকারের মধ্যে যে কোনও প্রকারের মানস কর্ম্ম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কর্ম্ম তিন প্রকার,—মানস, বাচিক কায়িক, এখন অন্য প্রকারে ভাগ করিয়া ছয় প্রকার কর্ম্ম বলিলাম বটে কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ব কথার কোন বিরোধ হইল না। গ্রহণ, গমন, ত্যাগ আর আনন্দন এই চারিটিকে একত্র করিয়া কায়িক কর্ম্ম বলিলেই সেই তিন প্রকার কর্ম্মই স্থির রহিল। ফল কথা, যে প্রকারেই ভাগ করা যাউক না কেন, পদার্থ যদি স্থির থাকে, তাহা হইলে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

বলিতেছিলাম যে, ভ্রান্ত পুরুষ সুখকে ইষ্ট এবং দুঃখকে অনিষ্ট মনে না করিয়া, এ কথা যেন ভুলিয়া গিয়া, সুখের বা দুঃখের যাহা নিমিত্ত বা আশ্রয়মাত্র তাহাকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সুখ বা দুঃখ বলিয়া ধরিয়া লয়। ঠিক যেন, ধনই সুখ,

স্বজনই সুখ, স্ত্রীই সুখ,——এই-ধন-জন-রমণী-প্রভৃতির সহিত ঠিক যেন সুখের অভেদ সম্বন্ধ। দুঃখ বিষয়েও এইরূপ। কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া দেখিলেই এভাব দাঁড়ায় না বটে, কিন্তু ভ্রান্ত পুরুষ হয় ত, এ সামান্য বিচারই করিতে পারে না, না হয়, এ বিচার করিতে অবসর পায় না, না হয়, সিদ্ধান্ত স্থির রাখিতে পারে না। এই কারণে সুখভ্রমে ধন জন রমণী প্রভৃতির দিকেই নিয়ত ধাবিত হইতে থাকে।

বলিলাম ভ্রান্ত পুরুষ ধাবিত হইতে থাকে। ইহা এক প্রকার রূপক করিয়া বলা। রূপক ছাড়িয়া বলিতে হইলে, বলিতে হয় যে, মানুষ এই সকল পদার্থের জন্যেই কর্ম্ম করে। এই সকল পদার্থ লইয়াই তাহার মানস কর্ম্ম, এই সকল পদার্থ লইয়াই তাহার বাচিক কর্ম্ম আর এই সকল পদার্থ লইয়াই তাহার কায়িক কর্ম্ম। সমষ্টিতে এই সকল পদার্থেরই নাম

## অর্থ ও কাম।

বুঝা গেল যে, ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারাই জগতের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান সম্বন্ধ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ অথবা এই সকল গুণের আধার যে আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ এবং ক্ষিতি ——এইগুলির সমষ্টির নাম জগৎ; ইহারা স্থির থাকে না, চলিয়া যায়, তাহাতেই ইহাদিগকে বলে জগৎ। এখন যাহা আছে, কিছুকাল পূর্ব্বে তাহা ছিল না, আবার কিছুকাল পরে থাকিবে না, তাহাতেই জগৎ। এই জগৎ-ই অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শাদি; জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। পুরুষ মনে করে যে, বিষয় সকলেই সুখ এবং দুঃখ আছে। যাহাতে সুখ আছে মনে করে পুরুষ সেই বিষয়কে গ্রহণ বা সংগ্রহ করে এবং যাহাতে দুঃখ আছে মনে করে, সে বিষয়কে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। পুরুষের যত কিছু চেষ্টা তাহা এই গ্রহণ এবং ত্যাগেরই প্রকার ভেদ মাত্র।

ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল হইল অর্থ। আর এই বিষয় সকলের নিমিত্তে পুরুষের যে প্রবৃত্তি সেই প্রবৃত্তিগুলির সমষ্টিকে কাম বলে। আর একটি একটি প্রবৃত্তিকেও এক একটি কাম বলে। অর্থ মোটের উপর পাঁচ প্রকার হইলেও নানাপ্রকার যোগে অযোগে অর্থের সংখ্যা অসংখ্য। এইরূপে কর্ম্ম অসংখ্য সুতরাং কামও অসংখ্য মনেই কামের উদয় হয়, তাহার পর কামই আবার কর্ম্মরূপে অভিব্যক্ত হয়।

সম্বন্ধ হইয়া থাকে, এবং এক পুরুষের সহিত অন্য পুরুষের সম্বন্ধও এই অর্থ-কাম-যোগেই হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির যে সম্বন্ধ তাহার নাম ব্যবহার।

কোন্ অর্থের গ্রহণে সুখ, কোন অর্থেরই বা ত্যাগে সুখ, কোন্ কামের উপভোগে, কোন কামেরই বা দমনে সুখ তাহা কেহই নিশ্চয় করিতে পারে না। সময় বিশেষে অবস্থা বিশেষে, যাহা গ্রাহ্য বা ভোগ্য, সময়ান্তরে, অবস্থান্তরে তাহাই আবার অগ্রাহ্য বা ত্যাজ্য। পুরুষ সুখ চাহে, দুঃখ চাহে না; কিন্তু সুখ দুঃখ এমন অনিশ্চিত পারম্পর্য্যে উপস্থিত হয় যে, কোনও অর্থ কর্ম্ম করিবার কিম্বা কাম উপভোগ করিবার অব্যবহিত পরক্ষণেই সুখের কিম্বা দুঃখের উৎপত্তি হইয়া, দীর্ঘকাল পরে সেই কর্ম্মেরই বা সেই ভোগেরই ফলরূপে অন্য দুঃখের বা সুখের উদয় হইয়া থাকে। এই অনিশ্চিতকে পরিহার করিতে, ফলের সহিত কর্ম্মের অব্যভিচারী কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পুরুষ সততই যত্ন করিতেছে।

জগৎ অর্থময়, সুতরাং মনও অর্থময়। তাহার উপর মন আবার কামময়। জগতে থাকা আর অর্থকামের সহিত সম্বন্ধ রাখা একই কথা। নগরেই থাকি আর অরণ্যেই যাই, অর্থকামের সঙ্গ ছাড়াইবার কোনই উপায় নাই। আর অর্থ কামের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেই সুখের এবং দুঃখের সাক্ষাৎকার অপরিহার্য্য এবং অনিবার্য্য। কিন্তু দুঃখ কেহ চাহে না, সুখই সকলে চাহে; তবে এ বিপদের প্রতীকার কি?

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এ বিপদের প্রতীকার নাই। শুভাশুভ-মিশ্র কর্ম্মের সংসারে সুখ-দুঃখ মিশ্র-ফল ফলিবেই ফলিবে।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।"

শুভকর্ম্মের শুভ ফল, এবং অশুভ কর্ম্মের অশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অপ্রিয় ফলের ভোগ এড়াইবার কোনই উপায় নাই। ইহার তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, যে তত্ত্বের উপর এই মহাবাক্য প্রতিষ্ঠিত তাহাও ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক হয়। সে তত্ত্বের নাম

## জন্মান্তর বাদ।

শাস্ত্র বলেন যে, মৃত্যুতে পুরুষের ধ্বংস হয় না। মৃত্যুর পরে পুরুষের কর্ম্মানুসারে আবার জন্ম হয়। যে পুরুষের যেমন কর্ম্ম তাহার জন্মও সেই কর্ম্মের অনুরূপ হয়। কর্ম্ম অনুসারে পুরুষ উদ্ভিজ্জ হইতে পারে, মশকাদির

হইয়া পশু হইতে পারে, মানুষ হইতে পারে, মানুষের মধ্যে আর্য্য হইতে পারে, অথবা আর্য্যের ভিতর ব্রাহ্মণও হইতে পারে। পুরুষ আবার মরে আবার জন্মে; এইরূপে পুনঃপুনঃ জন্ম মরণের চক্রে ঘুরিতে থাকে। আর যতবার জন্মে ততবারই সুখ দুঃখ দুইই ভোগ করিতে থাকে। পুরুষ যদি আর্য্যকুলে জন্মলাভ করে অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অধীন হয়, তাহা হইলে-সে জন্মে পুণ্যকর্ম্ম এবং পাপকর্ম্ম করিতে পারে, পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বরূপ নূতন শুভাদৃষ্ট সংগ্রহ করে, পাপ কর্ম্মের ফলস্বরূপ নূতনঅশুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট সংগ্রহ করে, তাহার পর সে দেহের অন্ত হইলে উপযুক্ত কালে আবার সেই শুভ অশুভ অদৃষ্টের ফলস্বরূপ উচ্চ নীচ জন্ম, দীর্ঘ-মধ্য-অল্প আয়ু এবং সুখ দুঃখ ভোগ করে। সকল কর্ম্মের ভোগ একই জন্মে হয় না, এমনও কর্ম্ম আছে, যাহার ফল ভোগ করিতে বার বার জন্মের আবশ্যক হয়। অনার্য্য মানব কুলে কিম্বা পশ্বাদি যোনিতে জন্ম হইলে যে সকল কর্ম্মের দ্বারা শুভ বা অশুভ অদৃষ্ট হইতে পারে, পুণ্য এবং পাপ হইতে পারে সে সকল কর্ম্মে পুরুষের অধিকার থাকে না। প্রাক্তন যে সকল কর্ম্মের ফলে সে বারের জন্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সে জন্মের শরীরারম্ভক বলিয়া, সে জন্মে ফলদানে উন্মুখ হইয়াছে বলিয়া সে সকল কর্ম্মকে প্রারব্ধ বা প্রারব্ধকর্ম্ম বলে। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে পুরুষের সে জন্মের জাতি অর্থাৎ আর্য্য অনার্য্য পশু পক্ষী ইত্যাদি। যথাযোগ্য শরীর লাভ হয়, আয়ু অর্থাৎ ভোগের কাল নিয়মিত হয় এবং ভোগ অর্থাৎ সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার হয়। এইরূপে ভোগেই নিকৃষ্ট জন্মের অবসান হয়; কিন্তু প্রারব্ধের অতিরিক্ত বহুতর কর্ম্ম অর্থাৎ নানাপ্রকার শুভ অশুভ অদৃষ্ট তখনও রহিয়া যায়; সেই অভুক্ত কর্ম্মরাশিকে সঞ্চিত কর্ম্ম বলে। আর সেই সঞ্চিত কর্ম্ম রাশির ফলে পুনর্ব্বার নূতন শরীর লাভ হয়, পুনর্ব্বার সুখ দুঃখের ভোগ হয়, পুনর্ব্বার মৃত্যু হয়। আর পুরুষ যদি উৎকৃষ্ট জন্মলাভ করে, বর্ণাশ্রমের অধীন হয়, তাহা হইলে সে জন্মের সেই "ক্রিয়মাণ" কর্ম্মের ফলে নূতন নূতন অদৃষ্টের উৎপত্তি হয় এবং তাহা সঞ্চিত কর্ম্ম রাশিতে পড়িয়া থাকে। জন্ম-জন্মান্তর ভোগের দ্বারা কিছু কিছু করিয়া এইরূপে প্রাচীন কর্ম্মের ক্ষয় হয়; এবং জন্ম বিশেষে নূতন কর্ম্মের সংগ্রহ হয়। কিন্তু কর্ম্ম একবার ফলদানে প্রারব্ধ বা উন্মুখ হইলে ভোগ ভিন্ন সে কর্ম্ম ক্ষয়ের অন্য কোনও উপায়ই নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য।

দুঃখের প্রতীকার কি তবে একবারেই নাই? দুঃখের নিবৃত্তি কি কিছুতেই নাই, কখনই হইতে পারে না? শাস্ত্র বলেন প্রতীকার হয় না, কিন্তু নিবৃত্তি

## মোক্ষ বা মুক্তি।

মোক্ষ আর জন্মান্তর কারণ একই কথা। শ্রেষ্ঠ জন্মলাভ করিয়া পুরুষ যদি যথাবিধি কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিতে পারে, একেবারে রাগদ্বেষ পরিশূন্য হইতে পারে, যে অবিদ্যা হইতে অহঙ্কার মমতার উৎপত্তি সেই অবিদ্যা নাশ করিতে পারে, জ্ঞানের যদি উদয় হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের গুণে প্রাচীন কর্ম্ম রাশি সমস্তই দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং পুনর্ব্বার জন্মের যাহা কারণ হইতে পারিত তাহাই নষ্ট হইয়া যায়। পাঁচ প্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব ঘটিত যে "সূক্ষ্ম দেহ" বা "লিঙ্গ শরীর" পুরুষকে এক জন্ম হইতে অন্য জন্ম গ্রহণ করায় তাহা তখন ভগ্ন হইয়া যায়, নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তখনই সেই লিঙ্গ দেহরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা হয়। এই লিঙ্গ দেহকে 'ঘট'ও বলে। ঘট-ভঙ্গ না হইলে জন্ম নিবৃত্তিও হয় না। জন্ম নিবৃত্তি না হইলে দুঃখ নিবৃত্তিও হয় না।

কিন্তু কেবল দুঃখের নিবৃত্তিও সম্ভবে না। দুঃখের নিবৃত্তি হইলে সঙ্গে সঙ্গে সুখেরও নিবৃত্তি হইবেই হইবে। লিঙ্গ শরীর যদি না থাকে তাহা হইলে জন্মও হয় না, সুতরাং সুখ দুঃখের অনুভবও সম্ভবে না। লিঙ্গদেহ আছে বলিয়াই লিঙ্গদেহ দ্বারা সুখ দুঃখের ভোগ করিতে পারা যায়; কেননা লিঙ্গ দেহই ভোগের সাধন।

অতএব বুঝা গেল যে, মুক্তি লাভ করিতে পারিলে আগামী দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে বটে কিন্তু কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মজন্য যে দুঃখ তাহার প্রতীকার নাই। অত্যুৎকট পুণ্যের ফল এবং অত্যুৎকট পাপের ফল বর্ত্তমান দেহেই পাইতে হয় এ কথা শাস্ত্রে আছে সত্য, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। কেন না বর্ত্তমান জন্মে সামান্য কর্ম্মের ফল ত ফলেই না, উৎকট কর্ম্মের ফলও ফলে না; অত্যুৎকট কর্ম্মের বিচারে বৃথা প্রবৃত্ত হইয়া কি হইবে?

যত যাহাই করো না কেন, পুরুষ প্রারব্ধ জন্য সুখলাভ করিবেই করিবে, প্রারব্ধ জন্য দুঃখ পাইবেই পাইবে। বর্ত্তমান শরীরে যে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহা দৃষ্ট কারণে হয় না, তাহার কারণ অদৃষ্ট। সুতরাং সেই সুখ দুঃখের আশ্রয় যে অর্থ এবং যে কাম তাহারও কারণ অদৃষ্ট, দৃষ্ট কারণে তাহা হয় না। ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন,——"ধর্ম্মাৎ অর্থশ্চ কামশ্চ", ধর্ম্ম হইতেই অর্থ, ধর্ম্ম হইতেই কাম। এই যে ধর্ম্ম ইহা পূর্ব্বের কোনও জন্মের ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম প্রথমতঃ অদৃষ্টে পরিণত হইয়াছিল, সেই অদৃষ্ট হইতে প্রারব্ধ হইয়াছে, সেই প্রারব্ধ যেমন অর্থ লাভ ও তাহার অনুরূপ, কামও তাহার অনুরূপ!

কিন্তু এ কথায় তোমার আমার মতন মানুষের মন বুঝে না। সুখদুঃখ প্রারব্ধ জন্য, অর্থ-কাম প্রারব্ধ জন্য, যিনি সদ্‌ব্রাহ্মণ, যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, কেবল তিনিই অচঞ্চলভাবে, অকুণ্ঠিত চিত্তে ইহা মানিতে পারেন, এবং মানিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন। যাহারা অজ্ঞান, যাহারা অবিদ্যায় আচ্ছন্ন, তাহারা জানিয়াও বুঝিতে পারে না, বুঝিলেও মানিতে পারে না যে আমার সুখ দুঃখ আমার আয়ত্ত নহে, আমার অর্থ কাম আমার চেষ্টার গুণেই হয় না। আমি এত বুদ্ধি খাটাইলাম, আমি এত যত্ন করিলাম, আমি এত পরিশ্রম করিলাম, তাহার পর আমার টাকা কড়ি হইল, বিষয় বিভব হইল, কত কি হইল; তবু কেন বলিব, তবে কেমন করিয়া বলিব যে আমার অদৃষ্টে এ সব হইয়াছে, আমি ও সব কিছু করি নাই?

এই যে আমি-আমি- আমি ইহারই সংস্কৃত নাম অহঙ্কার! পুরুষের এই যে চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম, ইহারই সংস্কৃত নাম পুরুষকার। এখন কথা এই যে, অদৃষ্টই অর্থ কামের কারণ, না কি, পুরুষকারই অর্থ কামের কারণ।

বলিয়াছি যে অজ্ঞান হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি, আর অহঙ্কার হইতেই পুরুষকার। এই অহঙ্কারের নাশ হইলেই মুক্তি সুতরাং মুক্তি যত কাল না হইতেছে অহঙ্কার ততকাল থাকিবেই থাকিবে। আর অহঙ্কার থাকিলেই পুরুষকারও থাকিবে!

কিন্তু যদিও অজ্ঞানেই অহঙ্কারের উৎপত্তি বটে, পুরুষ ভেদে অজ্ঞানের তরতম ও আছে। কোনও পুরুষের অজ্ঞান খুব ঘন, জমাট, যেন কিছুতেই সে অজ্ঞানকে ভেদ করিতে পারে না; আবার কাহারও বা অজ্ঞান কিছু পাৎলা, যেন একটুকু ফিকা ফিকা গোছের, গোধুলির মতন যেন আঁলোতে আধারে মিশান। এই যে অপেক্ষাকৃত লঘু অহঙ্কারের পুরুষ ইহাঁরা পুরুষকারের দোহাই দেওয়া ছাড়িতে পারেন না বটে কিন্তু অদৃষ্টকেও অমান্য করেন-না। ইহাঁরা বুঝিতে পারেন যে অদৃষ্টে আর পুরুষকারে বাস্তবিক কোনও ভেদ নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যাহা পুরুষকার, পর পর জন্মে তাহাই ত অদৃষ্ট। অর্থাৎ পুরুষকার পিছাইয়া গিয়া ফল দেয় না, সঙ্গে সঙ্গে ও ফল দেয় না, আগাইয়া গিয়া জন্মান্তরে ফল দেয় তখন সে পুরুষকারকে আর পুরুষকার বলে না, অদৃষ্টই বলা যায়। এই সকল পুরুষ শাস্ত্রের নিকটেও আশ্বাস পান; ভোগের কারণে এবং কর্ম্মের কারণে প্রভেদ রাখিতে পারায় এই সকল পুরুষ সদ্‌গতি লাভ করিতে পারেন। ভোগ অর্থাৎ অর্থ কাম জন্য সুখদুঃখের যে প্রাপ্ত তাহা হয় অদৃষ্টের বশে, আর আগামী

বারের জন্যে যে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা আছে আমার হাতে; আমার অদৃষ্ট ভালই হউক আর মন্দই হউক, এ যাত্রা আমার অর্থ কাম যেমনই কেন হউক না, এবারের সুখ সম্পদ যতই কেন অল্প, আর দুঃখদারিদ্র্য যতই কেন অধিক হউক না, সে দিকে আমি আর ফিরিয়া তাকাইব না! সে ত যাহা হইবার তাহা হইয়াই আছে, এবার ভোগ করিতে হইবে; ভাল হইলেও ভোগ করিতে হইবে, মন্দ হইলেও ভোগ করিতে হইবে, যথা সম্ভব মনকে বুঝাইয়া, মনকে ঠাণ্ডা রাখিয়া তাহাই ভুগিব। হাতের ডেলা যাহা হাত ছাড়া করিয়া ফেলিয়াছি, যাহা একবার ছুড়িয়া ফেলিয়াছি, এখন আর তাহার ভাবনা ভাবা বৃথা; কিন্তু যে ডেলা এখন হাতে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া ছুড়িব। এখন যে কর্ম্ম করিলে শুভাদৃষ্টের সঞ্চার হয়, সেই কর্ম্মেই পুরুষকারের প্রয়োগ করিব, যে কর্ম্ম করিলে অশুভ অদৃষ্ট হয়, পুরুষকারের দ্বারা সে কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিব! যাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর পুরুষ তাঁহারা এই প্রকারের অদৃষ্টের আর পুরুষকারের সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন। যে সকল কর্ম্ম করিলে শুভ অদৃষ্ট হয়, যে সকল কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিলে অশুভ অদৃষ্টের করণ হয়, শাস্ত্রে তাহাকেই বলে—

ধর্ম্ম।

অর্থ আর কাম সাধারণ পুরুষার্থ ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কি ব্রাহ্মণ, কি ম্লেচ্ছ, কি আর্য্য, কি অনার্য্য সকলেই অর্থ-কামের প্রার্থী। তাঁহাতেই বলিতে হয় হে অর্থ এবং কাম সাধারণ পুরুষার্থ। কিন্তু ধর্ম্ম সাধারণপুরুষার্থ নয়, ধর্ম্ম অসাধারণ পুরুষার্থ। এ পুরুষার্থের অধিকারী হইতে হইলে সদ্বংশে অর্থাৎ আর্য্যকুলে জন্মলাভ করা আবশ্যক; অনার্য্যকুলে কিম্বা পশ্বাদি যোনিতে জন্ম হইলে ধর্ম্মের অধিকারী হওয়া যায় না। এই যে জন্ম ভেদ ইহাও অদৃষ্টভেদেই হইয়া থাকে। সদ্বংশে জন্মলাভ করিয়া, অসৎ কর্ম্ম করিলে, তাহারই ফলে নিকৃষ্ট বংশে কিম্বা নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হয়; ভোগের দ্বারা সে জন্মের অদৃষ্টের ক্ষয় হইলে, যথাকালে, যথাক্রমে, আবার শ্রেষ্ঠ জন্ম হইতে পারে, পুনরায় পতনও হইতে পারে।

এই যে আর্য্যকুলে জন্ম, ইহাও এক প্রকার নহে। অদৃষ্টের তরতম অনুসারে জন্মেরও তরতম হয়। অর্থাৎ কেহ বা জাতিতে ব্রাহ্মণ হন, কেহ বা জাতিতে ক্ষত্রিয় হয়, কেহ বা বৈশ্য হয়, কেহ বা শূদ্র হয় ইত্যাদি। জন্ম আর জাতি একই কথা! জন্ ধাতু হইতেই জন্ম শব্দ সিদ্ধ হয় ঐ জন্ ধাতু হইতেছে জাতি শব্দও সিদ্ধ হয়। অদৃষ্ট অনুসারেই জন্মভেদ বা জাতিভেদ হয়।

যাহার যে জাতিতে জন্ম, শাস্ত্রে তাহার তদনুরূপ ধর্ম্মেরও বিধানও আছে। মৃত্যুর পর যাহা হইবে; তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেই পারে না; মৃত্যুর পরপারে আমাদের কোনও ইন্দ্রিয়ই শক্তিচালনা করিতে পারে না। কাজেকাজেই মৃত্যুর পরের ঘটনা সম্বন্ধে, জন্মান্তর সম্বন্ধে, ত্রিকালজ্ঞের সাক্ষ্য ভিন্ন জানিবার অন্য উপায় আর নাই। আমাদের শাস্ত্র সকল সেই ত্রিকালজ্ঞেরই উক্তি। ঐ সকল উক্তিকে শব্দ-প্রমাণ বলে; অর্থাৎ সে উক্তিগুলি কেবল যে শব্দ মাত্র তাহাই নহে, প্রমাণও

বটে অর্থাৎ ঐ সকল উক্তি প্রমার অর্থাৎ সে উক্তিগুলি কেবল যে শব্দমাত্র তাহাই নহে, প্রমাণও বটে অর্থাৎ ঐ সকল উক্তিকে শব্দ প্রমাণ বলে ; অর্থাৎ জ্ঞানের করণ স্বরূপ। শব্দ প্রমাণের দ্বারা তথ্য অবগত হইয়া সুবুদ্ধি পুরুষে অনুমানের দ্বারা সেই শব্দ প্রমাণের দৃঢ়তা করিয়া লইতে পারেন।

অর্থকাম লইয়াই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পুরুষের জাতিভেদ অনুসারে যেমন ধর্ম্মভেদ, তেমনই একই পুরুষের অবস্থাভেদেও ধর্ম্মভেদ হয়। কোন্ অর্থ, কোন্ কাম, কোন্ অবস্থায়, কি প্রকারে, কোন্ পুরুষের দ্বারা সাধনীয় তাহাও শাস্ত্রের দ্বারাই জানা যায়। কিন্তু মোটামুটি বুঝিয়া রাখা উচিত যে, ধর্ম্মভেদ অমূলক বা অস্বাভাবিক নহে ; প্রকৃতিভেদে, বুদ্ধিভেদে, ধর্ম্মভেদও অবশ্যম্ভাবী। এই কারণেই অভ্রান্ত শাস্ত্র বলেন যে,

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

যাহার যাহা ধর্ম্ম, তাহার সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা উচিত। স্বধর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠানে যদি ত্রুটি হয়, তাহাও বরং ভাল, তথাপি ধর্ম্মান্তরকে সুখজনক মনে করিয়া সে ধর্ম্মান্তরকে অবলম্বন করা উচিত নয়।

বলিয়াছি যে অর্থ এবং কাম লইয়াই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অর্থ সম্বন্ধে দুইটি স্থূল কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক। এক কথা, অর্থের অর্জ্জন সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা, অর্থের বিনিয়োগ সম্বন্ধে, ধর্ম্মলঙ্ঘন না করিয়া সাত প্রকারে অর্থের অর্জ্জন হইতে পারে,—

(১) দায়, অর্থাৎ পিত্রাদি হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি।

(২) লাভ, অর্থাৎ অস্বামিক ধনের প্রাপ্তি।

(৩) প্রতিগ্রহ অর্থাৎ পূজা পূর্ব্বক পুণ্য বুদ্ধিতে দত্ত যে ধনাদি তাহার গ্রহণ।

(৪) জয় ; অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত ফলপ্রকাশ পূর্ব্বক অর্জ্জন।

(৫) ক্রয় ; অর্থাৎ বাণিজ্য বিনিময় ব্যাপার কুসীদ, কৃষি পশুপালন আদি ব্যাপার।

(৬) সেবা বা বেতন ; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের শুশ্রূষা এবং শিল্প কর্ম্ম বা অন্য শ্রমলব্ধ ধনাদির প্রাপ্তি।

(৭) যাচ্ঞা।

কিন্তু ইহার সকলগুলি সকলের ধর্ম্ম নহে। দায় লাভ যাচ্ঞা সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রতিগ্রহে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার ; জয়ে, ক্ষত্রিয়ের ক্রয়ে বৈশ্যের ; আর সেবায় শূদ্রের।

অর্থের বিনিয়োগ সম্বন্ধে সামান্য আকারে কিছু বলা কঠিন। আহার বিহার অর্থেরই বিনিয়োগ ; দেবার্চ্চনা, যোগাদিও অর্থসহ-যোগেই সম্পন্ন হয়। বিশেষ উপদেশ শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের নিকট গ্রহণ করা উচিত।

কামের সঙ্গে অর্থেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আবার জপ যোগাদিরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ বিষয়েও শাস্ত্রজ্ঞের নিকটেই উপদেশ লওয়া উচিত।

এ সব কথা মধ্যম শ্রেণীর লোক সম্বন্ধেই বলিলাম। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, এ সব কথা মানিবার লোকও অল্প। যাঁহাদের ধর্ম্ম আছে অর্থাৎ, শাস্ত্র অনুসারে কর্ম্মাধিকার আছে তাঁহারাই এ সব মানিতে পারেন; ধর্ম্মে ইতর মনুষ্যের অধিকার নাই, এসব কথা মানিবার শক্তিও নাই; অথচ ইতর মানুষও মানুষ। তাহাদেরও অর্থ কাম লইয়া ব্যবহার আছে; বোধ হয় জন্মান্তরীণ সংস্কার বশে অর্থ কামকে আশ্রয় করিয়া বিচার পূর্ব্বক লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রবৃত্তি তাহাদেরও আছে। এই কারণে তাহারা ধর্ম্মের অভাবে, উপধর্ম্মের এবং নীতির সেবা করিয়া থাকে। যে আচার ব্যবহার লোক হিতকর বলিয়া সাধারণ মনুষ্যের বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, সমষ্টিতে তাহারই নাম "নীতি"।

অর্থকে এবং কামকে আশ্রয় করিয়া যথেচ্ছ আচার ব্যবহার করিলে ভয়ঙ্কর উচ্ছৃঙ্খলতা, নানাপ্রকার সামাজিক উৎপাত, অশেষ প্রকারের ব্যক্তিগত অশান্তি এবং ক্লেশ ঘটিতে পারে ইহা সাধারণ মনুষ্যেরই বুদ্ধিগোচর।

সুতরাং স্বেচ্ছাচারের এবং যথেচ্ছ ব্যবহারের দমন করা, লোক ব্যবহার নিয়মিত এবং সুশৃঙ্খল করা সকলেই আবশ্যক মনে করে। ইহা হইতেই লৌকিক আইনের সৃষ্টি, কর্ত্তাশাস্ত্রের সৃষ্টি, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নয় অথচ ধর্ম্মবহির্ভূত সমুদয় বিধি—বিধানের সৃষ্টি। এই নীতিই ইতর মনুষ্যের পুরুষার্থের নিয়ামক।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিদ্যা-বুদ্ধির অভিমান যতই কেন হউক্ না, শাস্ত্রাধিকারী, কর্ম্মাধিকারী আর্য্য-পুরুষগণের নীতি মাত্র অবলম্বন করিলে কখনই কুলায় না। অজ্ঞান-প্রধান, পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি, ভ্রান্ত পুরুষের কল্পনা—কল্পনার উপর নির্ভর করিলে কর্ম্মাধিকারী আর্য্যের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। মৃত্যুর পরে যাহার কর্ম্ম অদৃষ্ট আকার ধারণ করিয়া সঙ্গে যায় না, সে যাহা করিবে করুক, তাহাতে ক্ষতি ও নাই, বৃদ্ধিও নাই, কিন্তু আর্য্যসন্তান যখন নিশ্চিতই জানিতেছেন যে, এবারের ভোগ্য অর্থ এবং কাম প্রাচীন কৃতকর্ম্মেরই ফলমাত্র এবং সে ফল অবশ্যই ভোক্তব্য তখন পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতিকে বিসর্জ্জন দিয়া আপাতরমণীয়ের কুহকে ভুলিয়া লাভের পরিবর্ত্তে কেবল নরকের পথ উন্মুক্ত করা কখনই কর্ত্তব্য নয়।

বুঝা গেল যে অহঙ্কারের ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষ কারের মোহ কাটাইবার নহে। তথাপি মোক্ষবর্গে এবং ধর্ম্মবর্গে দৃষ্টি না রাখিয়া, নিরপেক্ষ অর্থবর্গের এবং কাম বর্গের সেবা করিলে আর্য্যসন্তানের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না। ধর্ম্ম নিঃশ্রেয়সের সাধন হইতে পারে, অভ্যুদয়ের সাধন ত বটেই। সে ধর্ম্মবর্গে যাহার অধিকার নাই, সে দ্বিবর্গী হইয়াই এবারের দেহপাত করুক কিন্তু—তুরীয় বর্গে অর্থাৎ মোক্ষে সম্যক মনোনিবেশ সকলের সম্ভবপর না হইলেও আর্য্য সন্তান যেন অর্থবর্গকে এবং কাম বর্গকে ধর্ম্মবর্গের নিরন্তর অধীন রাখিতে কখনই বিস্মৃত না হন। ধর্ম্মই যেন আর্য্য সন্তানের পুরুষার্থের প্রধান আশ্রয় হন।

———:•:———

# ভুলের মাশুল।

লেখক—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

( ১ )

এফ এ পরীক্ষার পর দীর্ঘ ছুটী পাইয়া আমি বাটী যাইতেছিলাম। পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য একবৎসর বাটী যাওয়া ঘটে নাই, সুতরাং ছুটী পাইবামাত্র সেই দিন অপরাহ্নেই আমি বাটী রওনা হইলাম। বামাচরণ অনেক নিষেধ করিল, সে দিনটা থাকিয়া পরদিন যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, বারবেলা, মঘা, দিক্‌শূল, অপরাহ্নে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রভৃতি অনেক আপত্তি তুলিল; কিন্তু সুদীর্ঘ একটী বৎসরের পর স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি দর্শনের প্রবল উৎসাহের নিকট তাহার কোন আপত্তিই টিকিল না। বাস্তবিক, এমন কোন বাধাই নাই, যাহার নিকট প্রবাসীর জন্মভূমি, জনক-জননী, আত্মীয়স্বজনের দর্শনলালসা পরাভূত হইতে পারে। ( অবশ্য বড় সাহেব-গতপ্রাণ কেরাণী বাবুদের কথা স্বতন্ত্র। ) সুদীর্ঘ প্রবাসে কর্ম্মশ্রান্ত জীবনের মধ্যে যখন কোন নীরব মধ্যাহ্ন,—স্তব্ধ সন্ধ্যায় দূর পল্লীর স্নিগ্ধ-শ্যামল চিত্রখানি, জনকজননীর অনুপমেয় স্নেহধারা, বন্ধুবান্ধবগণের প্রীতি প্রফুল্ল মুখ একে একে মনে পড়ে, তখন তাহাদের বিরহে প্রবাসীর কি যন্ত্রণা, কি মর্ম্মকাতরতা; আবার সেই চিরপরিচিত জন্মভূমির সম্ভাবিত মিলন-কল্পনায় কি আনন্দ, কি উৎসাহ, তাহা প্রবাসী ভিন্ন আর কে বুঝিবে?

যথাসময়ে হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। দ্রুতগামী বাষ্পরথ আমাকে বহন করিয়া বদনগঞ্জ ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিল। এখান হইতে আমাদের বাড়ী হাঁটা পথে প্রায় তিনক্রোশ। আমি গাড়ী হইতে নামিয়াই কুলীর মাথায় মোট চাপাইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থানের উপক্রম করিতেছি, এমন সময় বিধাতা বাদ সাধিল। দেখিলাম, পশ্চিম আকাশে একখানা কালো মেঘ উঠিয়াছে, এবং বায়ুতাড়নে তাহা ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মেঘ দেখিয়াই তো আমার চক্ষু স্থির। অগত্যা তখনকার মত ষ্টেশনের বাহিরে একখানা দোকান ঘরে আশ্রয় লইয়া অপেক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত স্থির করিলাম।

দেখিতে দেখিতে সেই কালো মেঘখানা তাহার বিরাট দেহ লইয়া চারিদিক

গর্জ্জিল। ক্ষণমধ্যেই ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিল। বামাচরণের ভবিষ্যৎ বাণী ফলিল। কিন্তু সে জন্য তাহার সেই দূরদর্শিতার কোনরূপ প্রশংসা না করিয়া, অধিকন্তু তাহার সেই ভবিষ্যৎ বাণীর মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময় এক প্রৌঢ়া বিধবা একটী বালিকার হাত ধরিয়া সেই দোকানে আশ্রয় লইলেন। দোকানী, আমি যে ঘরে ছিলাম, তাহারই এক পাশে তাঁহাদিগকে স্থান দিল।

তা' আমার সহিত বিধাতার বিশেষ কোন বিসম্বাদ থাকিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও আমার জীবন নাটকের প্রথমাঙ্ক অদ্য একটী অভিনব দৃশ্যে পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়াই হউক, অথবা বিশ্বচক্রের কোনও অলঙ্ঘনীয় নিয়তি বশেই হউক, সে দিন আর বৃষ্টির বিরাম হইল না। অগত্যা আমাকে সেই দোকানের পার্শ্বেই একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে রাত্রিযাপনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। দ্বিতীয় ঘর না থাকায় সেই প্রৌঢ়া রমণীও বালিকার সহিত সেই ঘরেরই এক পাশে থাকিলেন।

( ২ )

এক ঘরে কিছুক্ষণ থাকিতেই ক্রমে আমাদের সঙ্কোচভাব অনেকটা দূর হইয়া আসিল; তখন সেই রমণী আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। শুনিলাম, অদ্য প্রভাতের গাড়ীতে তিনি কন্যার সহিত ( বালিকা তাঁহার কন্যা ) বৈদ্যবাটীতে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। সেখানে গঙ্গাস্নান করিয়া আহারাদি শেষে, আমি যে গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, সেই গাড়ীতেই ফিরিয়াছেন। আমি তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। ক্রমে কথায় কথায় তাঁহাদের সংসারের কথাও আসিয়া পড়িল। শুনিলাম, এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে ঝিকুরাগাছী গ্রামে তাঁহাদের নিবাস। ইহাঁর স্বামী একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমানে সংসার এক রকম কষ্টে সৃষ্টে চলিতেছিল। কিন্তু দুই বৎসর পূর্ব্বে সহসা একদিন তিনি কালের ডাকে স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে দারুণ দুঃখ দৈন্যের মধ্যে ফেলিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। বিধবা, বালিকা কন্যা শৈলর হাত ধরিয়া অকূল পাথারে ভাসিলেন, হৃদয়ভেদী তুমুল হাহাকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভীষণ দারিদ্র্যরাক্ষসীর সহিত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিলেন। কালে ইহাও সহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার সম্মুখে এক নূতন বিপদ বিকট মুখব্যাদান করিয়া দণ্ডায়মান। শৈল আর এখন বালিকাটী নাই, তাহার বয়স একাদশ উত্তীর্ণ হইতে চলিল। তাহার বিবাহ যে না দিলেই নয়। কিন্তু পাত্র কোথায়?

পাত্র থাকিলেও অর্থ কোথায়? বিনা অর্থে দরিদ্রা বিধবার এই সুন্দরী কন্যাকে গ্রহণ করিয়া কে সমাজের অভিশাপগ্রস্ত হইবে?

বিধবার অবস্থা শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল; সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উপর একটু রাগও যে না হইল এমন নহে। ছাত্রজীবনে সহানুভূতির মাত্রাটা, পরোপকারের প্রবৃত্তিটা কিছু বেশী থাকে। সুতরাং তৎকালে আমারও মনে নিঃস্বার্থ পরোপকাররূপ একটা সৎ (তা তোমরা সৎই বল আর অসৎই বল) প্রবৃত্তি আসিয়া দেখা দিল। আমি সেই রাত্রিকালে বিধবার নিকট প্রতিশ্রুত হইলাম যে, শীঘ্রই একটী সুপাত্র অন্বেষণ করিয়া বিনা ব্যয়ে তাহার হস্তে শৈলকে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার চিন্তাভার লাঘব করিব। বিধবা যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া আনন্দ গদ্গদকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"বাবা তুমি রাজ্যেশ্বর হও।"

আমাদের যতক্ষণ এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, ততক্ষণ শৈল ছিন্নপ্রায় মাদুরের একপাশে পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল। বায়ু কম্পিত ক্ষীণালোক রশ্মি তাহার সুপ্ত মুখখানির উপর পড়িয়া নাচিতেছিল, স্বপ্নাবেশে ঠোঁট দুটী ঈষৎ কাঁপিতেছিল। সেই ক্ষুদ্র কুটীরে ক্ষীণালোক মধ্যে সেই সুপ্ত-মনোহর মুখখানি দেখিয়া আমি বুঝিলাম, শৈলসুন্দরী। তা' তোমাদের নিরপেক্ষ সমালোচনার দৃষ্টিতে অনিন্দ্যসুন্দরী না হইলেও শৈল সুন্দরী।

প্রভাতে বিধবার নিকট বিদায় লইয়া আমি গৃহাভিমুখে চলিলাম। চলিলাম বটে, কিন্তু কালি যেমন ভাবে যাইতাম, আজি আর ঠিক তেমন ভাবে যাইতে পারিলাম না। যেন কোথা হইতে আমার মনের স্বাধীনতার উপর অজ্ঞাতে কে একটা সুবর্ণ শৃঙ্খল জড়াইয়া দিল; হৃদয়ের খানিকটা স্থান যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল; লক্ষ্যহীন জীবনপথের অনির্দ্দিষ্ট অন্ধকারের মধ্যে সহসা একটা আলোকের ক্ষীণছায়া ভাসিয়া উঠিল। কেন এ পরিবর্ত্তন? তোমরা হাসিও না; সত্যই আমি সেদিন বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, কেন এ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

এইখানে আমার একটু পরিচয় দিয়া রাখি। আমার নাম সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পিতার নাম রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়। বালিগড়া গ্রামে আমাদের বাস; সেখানে আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বলিয়া পরিচিত।

(৩)

ইহার পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে আমি

দুইবার বাটী গিয়াছিলাম। দুইবারই আসিবার সময় শৈলদের বাটী হইয়া আসিয়াছিলাম্। শৈলর মাতার অনুরোধে তথায় আমাকে দুই তিন দিন করিয়া থাকিতেও হইয়াছিল। এখনও শৈলর বিবাহ হয় নাই। তাহার মাতা আমারই আশ্বাসে সে বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত আছেন। তিনি স্থির জানেন, আমি অবিলম্বেই একটি সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুপাত্রে শৈলকে অর্পণ করাইয়া তাঁহার স্কন্ধ হইতে কন্যাদায়ের ভারী বোঝাটা নামাইয়া দিব। কিন্তু তাঁহার সেই বোঝাটা ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের স্কন্ধে লইয়া আমি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও মনোমত পাত্র তো পাইলাম না। সুপাত্র অনেক মিলিল, কিন্তু তাহারা বিবাহের বাজারে প্রথম নম্বর নিলামে সর্ব্বোচ্চ ডাকের বিক্রেয় পণ্য। তাহার পর দুই নম্বর, তিন নম্বর, চার নম্বরও দেখিলাম, কিন্তু সকলেরই গায়ে হাজারের টিকিট। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশ দ্বার হইতে বিতাড়িত, থিয়েটার কোম্পানীর সুপরিচিত পাত্রও কেবল পরোপকারের বশবর্ত্তী হইয়া বিনাশুল্কে পাণিপীড়ারূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে রাজি নহে।

এইরূপে যখন পাত্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে হতাশ্বাস হইয়া সমাজের মস্তকে অভিশাপের কঠোর কষাঘাত বর্ষণ করিতেছি, সেই সময়ে এক দিন সহসা আমার মনে হইল, এ আসরে আমি স্বয়ং পাত্ররূপে অবতীর্ণ হইলে দোষ কি? তাহা হইলে তো সকল গোলই চুকিয়া যায়। কথাটা মনে হইতেই বুকের ভিতর চন্ চন্ করিয়া উঠিল, হৃদয়ে একটা তুমুল ঝড় উঠিয়া আমাকে কেমন বিহ্বল করিয়া ফেলিল। সত্য বলিতে কি, সেই দিন হইতে আমি পাত্রের অনুসন্ধান ত্যাগ করিলাম, আপনাকেই শৈলর জন্য সুপাত্র স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু কথাটা আমার মনে মনেই থাকিল, কাহাকেও বলিলাম না বা বলিতে পারিলাম না। ইহার ফলে আমাকে বড় গোলে পড়িতে হইল, কথাটা চাপিয়া চাপিয়া দুশ্চিন্তার শত-তরঙ্গাভিঘাতে আমার হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িল। হৃদয়ে যে দুরাশার বীজ রোপণ করিয়াছি, এত দিন ধরিয়া যাহার মূলে আশাবারি সিঞ্চন করিয়া ক্ষুদ্র অঙ্কুরটাকে মহাবৃক্ষে পরিণত করিয়াছি, জানি না, তাহাতে কি ফল ফলিবে। আমার বিবাহে পিতার ইচ্ছাই বলবতী হইবে; তিনি যাহা করিবেন, তাহার অন্যথা করিবার শক্তি আমার নাই। আমার দুরাশা-কল্পিত এ বিবাহ যদি তাঁহার অভিপ্রেত না হয়, তখন কি হইবে? না না, তিনি অসম্মত হইবেন কেন? শৈলকে

পুত্রবধুরূপে পাইয়া কোন্ ব্যক্তি আপনাকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান না করে? কিন্তু কথাটা তো তাঁহাকে বলিতে পারিতেছি না। ছিঃ! এ কথা কি বলা যায়? তবে কি হইবে?

'তবে কি হইবে' এই কথাটা লইয়া কত দিন মনে মনে কত আন্দোলন করিয়াছি, চিন্তার অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গের প্রতিঘাত সহ্য করিতে করিতে আকুল প্রাণে কুলের অন্বেষণে ছুটিয়াছি; কিন্তু কুল কোথায়? কেবল শূন্যের পর শূন্য। সেই মহাশূন্যে নিরাশার অস্ফুটস্বরে হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়াছে, তবে কি হইবে? কিন্তু তখন আমি জানিতাম না যে, আমার উপর বহুদূরে বসিয়া আর একজন এই কথাটা একবার ভাবিয়াছিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে এই দুরূহ প্রশ্নের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া এমন একটা সঠীক উত্তর স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, যাহাতে আমার এত বড় একটা ভুল এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যাক্, সে পরের কথা পরে বলিব।

( ৪ )

এক বৎসর পরে আবার গ্রীষ্মাবকাশ আসিল। ছুটী পাইয়া আবার আমি বাটী চলিলাম। যে দিন বাটীতে উপস্থিত হইলাম, সেই রাত্রিতে আহার করিতে করিতে মাতার নিকট শুনিলাম যে, পিতা আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। শুনিয়াই তো আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সভয়ে কম্পিতকণ্ঠে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় স্থির হইয়াছে?"

মাতা বলিলেন,—"মাধবপুরে।'

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল; লজ্জাভয় ত্যাগ করিয়া উন্মাদের ন্যায় অস্থির কণ্ঠে বলিলেন,—"আমি বিবাহ করিব না।"

মাতা সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; আমি দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

সমস্ত রাত্রি কেবল ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইলাম। একবারও নিদ্রা হইল না। কেবল বালকের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

পর দিন মধ্যাহ্নকালে পিতা আহার করিতে করিতে মাতার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। আমি ঘরে শুইয়া তাঁহাদের কথার শেষ ভাগ টুকু শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া বুঝিলাম, কথাটা আমারই সম্বন্ধে। শুনিলাম, মাতা বলিলেন,—"তবে কি হবে?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পিতা বলিলেন,—"হবে আমার মাথা আর মুণ্ড, তাই যদি হয়, তবে আমারই মাথা হেট হবে; কথা দিয়ে কথা রাখ্‌তে পার্‌লাম না, লজ্জায় আমার মুখ দেখান ভার হবে। তারা পাত্র দেখ্‌লে না, বিষয় আশয় দেখ্‌লে না; বল্‌লে সে সব আমাদের দেখা আছে। মেয়ে দেখ্‌লাম, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা। যা চাইলাম, তাই দিতে স্বীকার হয়ে গেল। সব ঠিক, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমাকে জবাব দিতে হবে। বল্‌তে হবে যে, আমার কুলোজ্জ্বলকারী সু-পুত্র আমার বাধ্য নয়। এ হ'তে মরণই ভাল।

আর কিছু শুনিতে পাইলাম না, বোধ হইল, পিতা উঠিয়া গেলেন।

আমি পড়িয়া পড়িয়া সব শুনিলাম। ক্ষোভে, দুঃখে, নিরাশায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়, হায়, আমি কি তবে পিতার কষ্টের কারণ হইব? আমার জন্য তাঁহার মাথা হেট হইবে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের নিদারুণ কষ্টে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িবে, আর আমি এই অভিশপ্ত জীবন লইয়া সুখস্বপ্নে বিভোর থাকিব? কখনই না। সব ভুলিব, যাতনার সবিষদংশন বুক পাতিয়া লইব, বিস্মৃতির অতলসলিলে শৈলর স্মৃতি বিসর্জ্জন দিব।

কিন্তু পারিব কি? তখনই আবার সব মনে পড়িল। শৈলকে মনে পড়িল; তাহার সেই বালারুণ-রাগরঞ্জিত প্রস্ফুটনোন্মুখ নলিনীবৎ সুন্দর মুখখানি মনে পড়িল; রক্তিমরাগবিচ্ছুরিতা বাসন্তী উষার কোলে সহসা বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় বিম্বাধরের মধুর হাসিটী মনে পড়িল। মনে পড়িল, সেই যে একদিন স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্র পরিহিতা শৈল যেন সৌন্দর্য্যের রুদ্ধ শতদ্বার এক কালে খুলিয়া দিয়া আমার সম্মুখে দাড়াইয়াছিল; বর্ষণবিধৌত যূথিকাগুচ্ছের ন্যায় তাহার বারি সম্মার্জ্জিত সুকুমার লাবণ্যরাশি আর্দ্রবস্ত্র ফুটিয়া বাহির হইতে-ছিল; রাশীকৃত আলুলায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ সমস্ত পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছিল। কতকগুলা বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অংশে বাহুতে লুটাইতেছিল; তাহাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্নিগ্ধ লাবণ্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়া সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ দেখাইতেছিল, ললাটপতিত কুঞ্চিতালক-নিঃসৃত বারিবিন্দু কপোল বহিয়া মুক্তাফলের সৌভাগ্য লাভ করিতেছিল; সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া আমি সব ভুলিয়াছিলাম; সম্মুখে একখানি রূপের জীবন্ত প্রতিমা দেখিয়া, স্তম্ভিত হৃদয়ে অনিমিষনেত্রে সৌন্দর্য্যের সেই উন্মাদ লহরী-লীলা দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়াছিলাম, সে দৃশ্য কি জীবনে ভুলিব?

আবার একদিন বিদায়ের কালে শৈল তাহার স্বভাব সরল দৃষ্টিটী আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সপ্ত স্বরা-বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিয়াছিল,—"আবার আসিবে ?"

আমি একটু দুষ্টামী করিয়া বলিয়াছিলাম,—"কেন শৈল ?"

শৈল কোন উত্তর দেয় নাই। কেবল তাহার সলজ্জ দৃষ্টিখানি আমার মুখের উপর হইতে নামাইয়া লইয়াছিল; তাহার নিটোল কপোলে একটু রক্তিমা বিভাসিত হইয়াছিল। আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম;—"আসিব।"

অমনই একটু মধুর হাসি হাসিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়াছিল।

সে শৈলকে ভুলিব ? একটা অসহ্য যন্ত্রণায় বুকের হাড়গুলা মড় মড় করিয়া উঠিল। আমি দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলাম। কিন্তু আমার এ যাতনার জন্য দায়ী কে ? দায়ী আমি নিজে। হায়, আগে কেন সকল কথা প্রকাশ করি নাই ? অনুতাপের তীব্র কষাঘাতে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল।

রুদ্ধ যাতনার বেগ চাপিয়া আর ঘরে থাকিতে পারিলাম না। ঝটিকা-বর্দ্ধিত মহাসমুদ্রের ন্যায় তুমুল বিপ্লবান্দোলিত হৃদয় লইয়া বামাচরণের কাছে ছুটিয়া গেলাম। বামাচরণ আমাদের সমশ্রেণী ব্রাহ্মণ, প্রতিবাসী, আমার বাল্য-বন্ধু। আমরা উভয়ে এক কলেজেই পড়িতাম। গ্রীষ্মের ছুটীতে সেও বাটীতে আসিয়াছিল।

আমাকে দেখিয়াই বামাচরণ চমকিত ভাবে বলিল,—"একি সুবোধ! তোমার এমন চেহারা কেন ?"

আমি তখন তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। বলিতে বলিতে একটু কাঁদিয়াও ফেলিলাম। সমস্ত শুনিয়া বামাচরণ বলিল,—"ভাল কাজ কর নাই; আগে বলিলেই হইত।"

আমি তাহার হাত ধরিয়া সকাতরে বলিলাম,—"কিন্তু এখন—এখন কি আর কোন উপায় নাই ?"

বা। উপায় বড় সহজ নহে।

আ। তবে কি হইবে ?

বা। চেষ্টা করিয়া দেখিব। তবে ফল কত দূর হইবে বলিতে পারি না।

আ। পিতাকে সব কথা খুলিয়া বলিবে কি ?

বা। সব না হইলেও অনেক কথাই বলিতে হইবে।

কি সর্ব্বনাশ! আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম,—"না না, তবে বলিয়া কাজ নাই।"

বামাচরণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল,—"তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ!"

বামাচরণের সে তিরস্কারের মর্ম্ম আমি বুঝিলাম। একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম,—"কিন্তু যদি তিনি সম্মত না হন?"

বা। না হওয়াও একেবারে অসম্ভব নহে।

আ। তাহা হইলে কি হইবে?

বা। যেখানে তিনি স্থির করিয়াছেন, সেইখানেই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।

আমি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলাম,—"কখনই না।"

ঈষৎ হাসিয়া বামাচরণ বলিল,—"তবে কি করিবে?"

আমি বলিলাম,—"কি করিব বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় এ জীবন ভার দুর্ব্বহ হইবে।'

হাসিতে হাসিতে বামাচরণ বলিল,—"বোধ হয়, বীচিবিক্ষেপশালিনী সচন্দ্র-তারকা-প্রতিবিম্বিতা জাহ্নবীর সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া এ ভার নামাইতে হইবে, অথবা তীব্র হলাহলের সুমধুর আস্বাদনে কিম্বা শাণিত ছুরিকার সুকোমল আলিঙ্গনে এ জ্বালার অবসান করিতে হইবে। চলিয়া যাও, চলিয়া যাও প্রেম নাটকের এখনও অনেক অভিনয় বাকী। আমার যে ছাই সব মনে পড়ে না।"

আমি নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এমন সময়েও তাহার নিষ্ঠুর রহস্য!

বামাচরণ তখন মুহূর্ত্তে হাস্য সম্বরণ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "তুমি অতি মূর্খ। তাই একটা নভেলি প্রেমকে জীবনের সার জ্ঞান করিয়া পিতার আদেশের বিরুদ্ধে—তোমার একমাত্র কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে এরূপ হাস্যজনক সঙ্কল্পকে মনে স্থান দিয়াছ।"

আমি কি উত্তর দিব? দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। বামাচরণ তখন আমার হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিল, "অত উতলা হইও না। আমি তোমার পিতার নিকট চলিলাম। ভরসা করি, কৃতকার্য্য হইব।"

বামাচরণ আমার হাত ধরিয়া আমাদের বাটীতে আনিল। সেখানে পিতার

কাল পরে সে হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া বলিল,—"কালি তোমাকে আমার পথ প্রদর্শক হইতে হইবে।"

আমি বলিলাম,—"কোথায় যাইবে?"

বা। তাহা জানিতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তথাপি কেবল তোমার প্রতি দয়াপ্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে, আমার গন্তব্য স্থান ঝিক্‌রাগাছী নামক একখানি গ্রাম।

সাগ্রহে আমি বলিলাম,—"কেন?"

সহাস্তে বামাচরণ বলিল,—"আবার প্রশ্ন? সেখানে গমনপূর্ব্বক কোন নায়িকার কুলশীলাদি অবগত হওয়াই আমার উদ্দেশ্য। যদিও ইহা প্রেমনীতির বহির্ভূত কার্য্য, তথাপি দুর্ব্বৃত্ত সমাজের ভয়েই আমাকে এই নীতি বিগর্হিত কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এক্ষণে হে প্রেমিকবর! আমি তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।"

আমি সানন্দে বলিয়া উঠিলাম,—"তবে কি পিতা সম্মত হইয়াছেন?"

তীব্রস্বরে বামাচরণ বলিল,—"না হইয়া আর করেন কি? এ বয়সে কি তাঁহার পুত্রশোকে ভয় নাই?"

আমি তাহাকে একটা ধাক্কা দিলাম। সে হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল।

(৬)

পর দিন প্রাতে উঠিয়া আমি বামাচরণের সহিত ঝিক্‌রাগাছী যাত্রা করিলাম। বড় আনন্দে—বড় আশায় বুক বাঁধিয়া চলিলাম। আমি জানিতাম, তাঁহারা আমাদের করণীয় ঘর; সুতরাং আমার নিরাশ হইবার কোনই কারণ ছিল না। কিন্তু আসিয়া সেই বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষুস্থির হইল, বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। দেখিলাম, বাটীর দরজায় তালা বন্ধ; তালায় মরিচা ধরিয়াছে; দ্বারের সম্মুখে কতকগুলা ঘাস গজাইয়া, সে স্থান যে সম্প্রতি মনুষ্য সমাগম-বর্জ্জিত, তাহাই প্রমাণ করিতেছে। আমি তো মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলাম; নিরাশার একটা দমকা বাতাসে আমার তত আনন্দ—তত উৎসাহ মুহূর্ত্তে কোথায় উড়িয়া গেল।

বামাচরণ এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল,—"রকম কি?"

বা। বোধ হয় কোন আত্মীয়ের বাটী গিয়াছে।

আ। অসম্ভব। আমি জানি, তাঁহাদের সেরূপ কোন আত্মীয় নাই।

এমন সময়ে সেই পথ দিয়া পাড়ারই একটী লোক যাইতেছিল। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া শৈলর মাতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। লোকটী বলিল,—"প্রায় দুই মাস পূর্ব্বের শৈলদের বাটীতে কোথা হইতে একটী লোক আসে। শুনিলাম, শৈলর মাতার এক দূর আত্মীয় ছিল, সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আত্মীয়টী ধনী এবং নিঃসন্তান; শৈলর মাতাই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারীণী; কয়েক দিন পরে তাঁহারা সেই লোকের সঙ্গে তথায় চলিয়া গিয়াছেন।"

বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কোন্ গ্রাম বলিতে পার?"

লো। তা বলিতে পারি না।

বা। এখানকার আর কেহ জানে?

লো। বোধ হয় না।

লোকটী চলিয়া গেল। আমি তখন সেই রুদ্ধদ্বার পার্শ্বে তপ্তশ্বাসের একটী চিহ্ন রাখিয়া উঠিলাম। পাড়ার আরও দুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু জানা গেল না। অগত্যা আমরা হতাশ চিত্তে বাটি ফিরিলাম।

ইহার পর পিতা আর কোন আপত্তি শুনিলেন না, আমিও কিছু বলিতে পারিলাম না। বিবাহের দিন স্থির হইল; গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেল। তিন দিন পরে বিবাহ। বাটীর সকলে আনন্দোৎসবে মগ্ন। কিন্তু এ আনন্দে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। হায়, আর তিন দিন পরেই জন্মের মত শৈলকে হারাইব। সে সরলা বালিকা হয়তো আমার পথ চাহিয়া রহিয়াছে, কিন্তু আমি চির জীবনের মত তাহার কোমল হৃদয়ে হতাশ—অশান্তির তীব্র বাড়বানল জ্বালাইতে উদ্যত হইয়াছি; এক সঙ্গে এক দিনে দুইটী হৃদয় বলি দিতে যাইতেছি।

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আমার হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইল, ক্রমে আমি যেন উন্মাদ হইয়া পড়িলাম। স্থির করিলাম, যাহা হয় হউক, যত অধর্ম্ম—যত কর্ত্তব্যচ্যুতিজনিত মহাপাপ ঘটে ঘটুক, আমি কিছুতেই এ বিবাহ করিব না। পিতা রুষ্ট হইবেন হউন, সংসার ত্যাগ করিব। যদি শৈলকে না পাইলাম, তবে সংসারে আমার প্রয়োজন কি? আমি গৃহ ছাড়িব, শৈলকে

( ৭ )

ক্রমে চিন্তা সংকল্পে পরিণত হইল, সংকল্প দৃঢ় হইল। কিন্তু একটু ভাবনা, যে পাত্রীর সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে, তাহারও গাত্র হরিদ্রা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের জাতি, কুল, মান সমস্তই আমার উপর নির্ভর করিতেছে। আমি চলিয়া গেলে, তাহাদের কি হইবে? তাহারা তো মহা-বিপদে পড়িবে? অনেক চিন্তার পর শেষে একটা মতলব স্থির করিলাম। পর দিন প্রভাতের পূর্ব্বেই সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিয়া একেবারে বামাচরণের বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

বামাচরণ তখনও উঠে নাই। অনেক ডাকাডাকির পর সে উঠিয়া দরজা খুলিল। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"একি, তুমি এ সময়ে যে? ব্যাপার কি?"

আমি তখন স্থির গম্ভীরস্বরে তাহাকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা বলিলাম। শুনিয়া সে বলিল,—"তুমি কি পাগল হইয়াছ?"

আমি বলিলাম,—"মনে কর তাই। কিন্তু এ পাগলামী হইতে কেহই আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।"

বামাচরণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"বুঝিয়াছি, নিতান্তই ঔপন্যাসিক প্রেমের ভূত তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছে। তা' এ ভূতকে লইয়া চন্দ্রকর সুশোভিত পিক কণ্ঠ মুখরিত মলয়ানিলসেবিত কল্পনার সংসার বেশ চলে; কিন্তু সুবোধ! বাস্তব সংসারে এ ভূতকে টানিয়া আনিলে একদিনও চলে না।"

আমি বলিলাম,—"তোমার যাহা ইচ্ছা হয় বল, যত পার তিরস্কার কর, কিন্তু জানিও, আমার সংকল্প অটল।"

আমার স্বর শুনিয়াই বামাচরণ আমার সংকল্পের দৃঢ়তা অনুভব করিল; তাহার যে শ্লেষবাক্য চিরদিন আমার উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে, এবার যে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিকট তাহা নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে, ইহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। সুতরাং সে আর শ্লেষ বা উপহাসের অবতারণা না করিয়া বলিল,—"তবে কি নিশ্চয়ই গৃহত্যাগ করিবে!"

আমি বলিলাম,—"করিব কি করিয়াছি। কিন্তু ভাই! তোমাকে আমার একটী শেষ অনুরোধ রাখিতে হইবে।"

বামাচরণ বলিল,—"বলিতে পার, রাখা না রাখা আমার বিবেচনা সাপেক্ষ।"

আমি তাহার অভিমান বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু এখন আর অন্য উপায় নাই। সুতরাং আমি তাহার উভয় হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম,—"বিবেচনা নহে, তাহা তোমাকে করিতেই হইবে।"

বা। ভাল দেখা যাবে। এখন অনুরোধটা কি শুনি।

আ। তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।

বা। আমার উপর এত অযাচিত অনুগ্রহ কেন?

আ। তুমি ভিন্ন আর কে আমার অনুরোধ রাখিবে?

বা। আমি বিবাহ করিলে তোমার লাভটা কি?

আ। আমার লাভ—কর্ত্তব্য পালন।

বা। হেঁয়ালি ছাড়িয়া সোজা কথায় বল।

আ। তবে শুন, যে পাত্রীর সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে, তাহাকেই—

বা। আর বলিতে হইবে না, বুঝিয়াছি।

আমি কাতরস্বরে বলিলাম,—"কিন্তু বল ভাই, আমার এই শেষ অনুরোধ রাখিবে কি না।"

রামাচরণ অনেকক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল,—"স্বীকার করিলাম। কিন্তু জানতো আমি তোমার মত প্রেমিক নই, সুতরাং নিঃস্বার্থ পরোপকার করিতে আমি অক্ষম।"

আমি ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "বল আমার কি করিতে হইবে।"

বা। তোমাকেও আমার একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে।

আ। কি অনুরোধ?

বা। তুমি গৃহত্যাগ করিতে পারিবে না।

আ। কিন্তু গৃহে থাকিলেই তো আমাকে বিবাহের জন্য সকলে পীড়ণ করিবে।

বা। তুমি যদি একান্তই বিবাহে অনিচ্ছুক হও, তবে সে জন্য কেহই তোমাকে বিরক্ত করিবে না।

আ। কিন্তু সকলে আমার উপর বিরক্ত ও দুঃখিত হইবেন।

বা। তুমি গৃহত্যাগ করিলে তাঁহাদের বিরক্তি ও দুঃখের মাত্রা বাড়িবে না কমিবে?

অ। কিন্তু যদি সকলে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করে ?

বা। কোন চিন্তা নাই, আমার কথায় বিশ্বাস কর। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহই কোন কাজ করিবে না।

অগত্যা আমাকে সম্মত হইতে হইল, তখন বামাচরণ আমাকে সঙ্গে লইয়া আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইল এবং পিতাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। পিতা প্রথমে ক্রোধ ও দুঃখ প্রকাশ করিলেও শেষে তাঁহাকে অগত্যা এই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। মাতা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বামাচরণ তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল।

তখন পিতা সমস্ত কথা সবিস্তারে লিখিয়া কন্যাপক্ষীয়ের বাটীতে এক লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেখান হইতেও সম্মতি সূচক উত্তর আসিল। আমি এ যাত্রা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

( ৮ )

যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট দিনে শুভলগ্নে বামাচরণের বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহে আমার আনন্দ ও উৎসাহের সীমা নাই। বামাচরণের বিধবা মাতা ও এক মাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। তাড়াতাড়িতে আত্মীয় কুটুম্বগণকেও সংবাদ দিবার অবসর হয় নাই। সুতরাং আমিই এক প্রকার বরকর্ত্তা সাজিয়া যথাসম্ভব সমারোহ সহকারে তাহার বিবাহ দিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া আমার বড় লজ্জা হইল। যদিও আমাকে কেহ চিনে না, তথাপি আমার মনে হইল, হয়তো ইহারা আমাকে তাহাদের নির্দ্ধারিত বর বলিয়া চিনিতে পারিবে; হয়তো আমার উপর কতই বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইবে। সুতরাং আমি যথাসম্ভব ফাঁকে ফাঁকে থাকিয়া পরদিন অতি প্রত্যূষে পলাইয়া আসিলাম।

পরদিন মধ্যাহ্নকালে বরকন্যা বাটীতে আসিল। অপরাহ্নকালে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া বামাচরণ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কি হে, এত করিয়া আমার বিবাহ দিলে, কিন্তু বৌ দেখিলে না ?"

বাস্তবিক আমি সেই উদ্দেশে না আসিলেও আমাকে বলিতে হইল,—"সেই জন্যই তো আসিয়াছি।"

তখন বামাচরণ আমাকে বাড়ীর ভিতর টানিয়া লইয়া চলিল, এবং যে ঘরে নববধূ বসিয়া একটী সমবয়স্কা বালিকার সহিত গল্প করিতেছিল সেই ঘরে উপস্থিত হইল। সহসা আমাদিগকে উপস্থিত দেখিয়া নববধূ মাথার ঘোমটাটা

আরও টানিয়া দিল। কিন্তু বামাচরণ ছুটিয়া গিয়া অবগুণ্ঠনবতীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ফেলিল। আমি চকিতে বধূর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। কিন্তু—কিন্তু একি! পদতলে পৃথিবীটা এত নড়ে কেন? চারিদিকে এ কিসের শব্দ? সর্ব্বশরীর যে অবশ হইয়া আসিতেছে? মাথাটা এত ঘুরিতেছে কেন? কে—এ কিশোরী, আমার সম্মুখে নববধূরূপে বসিয়া? শৈল না? ঐ যে আমার মুখের দিকে চকিতে চাহিয়া শৈল দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। হা ভগবান! একি করিলাম? কিন্তু এই কিশোরী কি সত্যই শৈল? দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রলয় নিনাদে কে যেন উত্তর দিল,—"শৈল, শৈল।" আমি উন্মাদের ন্যায় "শৈল! শৈল!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইলাম; ছুটিতে ছুটিতে শুনিতে পাইলাম, তখনও বিবাহ বাটীর দ্বারে বসিয়া একটা শানাই বিদায় সঙ্গীত গাহিতেছে,—

যুগ যুগ পরে পাঁওনু সজনি;
যব হাম নিধি করতলে,—
আপনা খাইয়া তব শ্যাম-পরশমণি,
ডারনু যমুনা সলিলে।

হায় হায়, মানুষে বুঝি এত ভুল করে না। জীবনে যে একটি ভুল করিলাম, এ জন্মে তাহার আর সংশোধন হইবে না।

* * * *

তাহার পর কত দিন চলিয়া গিয়াছে! শৈলকে পরের হাতে বিলাইয়া দিয়াও আবার আমাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে, সংসারী হইতে হইয়াছে। সকলই হইল, কিন্তু সে ভুলটার তো আর সংশোধন হইল না? হইবার আশাও নাই। একটা ভুলের মাশুল সমস্ত জীবনে ভোগ করিলেই কি শেষ হইবে? জানিনা, জন্মান্তরেও এই নিদারুণ ভুলের মাশুলটা ভোগ করিতে হইবে কি না।

---

সমাপ্ত।

## তুইরে নির্ম্মলা ।

লেখিকা—শ্রীমৃণ্ময়ী দেবী ।

শরতের প্রফুল্ল নলিনী,
হেমন্তের সাধের নীহার,
শীত মাঝে তুই সে গোলাপ,
জগতের সৌন্দর্য্যের সার।
বসন্তের প্রথম জোছনা,
বাঁশরীর শেষ মধুতান,
কোকিলের প্রথম কাকলী,
পূর্ণিমায় পাপিয়ার গান।
সোহাগের ফুটন্ত কলিকা,
নিদাঘের তুই বেল ফুল,
প্রণয়ের অমিয় নির্ঝর,
বরষায় তুই যে বকুল!
বিরহের ব্যথা ভরা রাতে,
মিলনের তরঙ্গ উচ্ছ্বাস,
ভাদরের ভরা নদী কূলে,
তুই যে রে কেতকী সুবাস।
প্রণয়ীর প্রেমের স্বপন,
নিরাশের হৃদয়ের আশা,
আঁধার রাতের পরপারে,
তুই যে রে আলোময়ী ঊষা!

---

## বার্ডসাই ।

লেখিকা—
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ঘোষ ।

ধন্য ধন্য বাড্‌সাই কি গুণ তোমার!
শিশু, যুবা-বৃদ্ধ বশ কি বলিব আর?
মিষ্টান্নের পরিবর্ত্তে তোমায় কিনিয়া
গোপনে সেবন করে অমৃত ভাবিয়া,
পিতা মাতা-গুরুজনে প্রথম দশায়
লুকায়ে সেবন করে শাসন শঙ্কায়,
শেষেতে তোমার বশ হয়েন যখন
ত্যজিয়া সবার ভয় স্বাধীন যে হন,
তোমার সেবায় কত ধনীর সন্তান
অকাতরে ধন দিয়া রাখেন সম্মান।
দরিদ্র সন্তান চুপে থাকিতে পারে-
তারাও নিযুক্ত এবে তোমা সেবিবারে,
পিতার কষ্টের ধন করিয়া হরণ
দুঃখীর সন্তান করে তোমায় সেবন।
কি বলিব তব গুণ এক মুখে হায়
একাধিক মুখ বিধি না দিল আমায়,
রাশি রাশি অর্থ হায় পূজায় তোমার
প্রতি বর্ষে দিতেছে যে ভারত কুমার,
হৃদ্‌রোগ, চক্ষুবসা তোমারি কল্যাণে
অধরে কলঙ্ক রেখা পায় ভক্তগণে,
যেরূপ তোমার ভক্ত ক্রমে বৃদ্ধি পায়-

এবার হইতে বুঝি ত্যজি অন্ন জল,
তোমার সেবায় মগ্ন রবে ভক্ত দল।
ধন্য ধন্য বাড সাই মহিমা অপার
প্রণাম তোমায় মম কোটী কোটী বার॥

---

# গান।

লেখক—শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চি।

গত আয়ু বেলা, ছাড মন খেলা,
আঁধারি দেহ ভব জীবন রবি তব
অস্তাচল শিরে নামিছে ধীরে ধীরে
বাসনারাজি শুধু ছায়াবাজি
যত বেলা বিগত দীর্ঘ দীর্ঘ তত
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন
মুণি মানস ধন মধু মুর কৃন্তন। ১

জঠর মাঝারে ওঁ কার আকারে
সাধন নিমগন ছিলে সর্ব্বক্ষণ
সংসারে আসিলে পাথারে ভাসিলে
হাসিলে কাঁদিলে হারায়ে জ্ঞান ধন
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন
মুণি মানস ধন মধু মুর কৃন্তন। ২

আগত-যৌবন প্রেম পরি রম্ভণ
কান্তাধর সুধা পান মুখচুম্বন
বিলাস বিভ্রম মরি দিবা মনোরম
সদাই আকিঞ্চন কামিনী কাঞ্চন
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন
মুণি মানস ধন মধু মুর কৃন্তন। ৩

প্রৌঢ় সমাগত সদা কুমতি রত
বিষয় বিষধর দংশন জর জর
অর্থ অর্থ করি দিবা বিভাবরী
কুসুম তেয়াগি কণ্টক চয়ন
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন
মুণি মানস ধন মধু মুর কৃন্তন। ৪

জরাজালজড়িত সতত মৃত্যু ভীত
শক্তিহীন নিষ্ক্রিয়, রুদ্ধ দশ ইন্দ্রিয়
মায়া মোহ মমতায়, বাঁধা সদা পায়পায়
মুখে সুধু হায় হায় চেতনে অচেতন
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন
মুণি মানস ধন মধু মুর কৃন্তন। ৫

কি ভাবনা ভাব মরি ভাবনায় পরিহরি
ভাব ভব কর্ণধারে যদিরে যাইবিতরি
ডাকরে পরাণ ভরি হরি হরি হরিহরি
শম দম দুয়ে শুধু রাখ রাখরেপ্রহরী
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন
মুণি মানস ধন মধু মুথ কৃন্তন। ৬

---

# অতীত।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

ভুলে যাই সুখ দুঃখ হেরি বর্ত্তমানে,
হে অতীত! তব কথা ভাবিব না আর;
কোথা হ'তে আন-অশ্রু এ শুষ্ক নয়ানে,
রহস্য আঁধারে স্মৃতি নিমগ্ন আমার!
আমারে ঘেরিয়ে তব ছিল বনবাস;
ছিলে সুধু সর্ব্বত্যাগী উদাসীর মত;
কখনো হে সাথীমোর দাওনি আভাষ,
বাহিতে জীবন মোর হয়ে কর্ম্মরত।
বৃথা আমি নিন্দি তোমা;—জড় পিণ্ড সম,
এখন নীরব তুমি নির্ব্বাক পাষাণ!
অতীত!—অতীত তুমি!—চিরসঙ্গী মম,
তোমাতে মিশিব আমি লয়ে বর্ত্তমান!
নশ্বর স্মৃতির মালা মাটীর এ ভবে,
অলক্ষ্যে তোমার কণ্ঠে জড়াইয়ে রবে।



---

# জ্যোতিষ তত্ত্ব।

লেখক—শ্রীযুক্ত কালিনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল।

## তারাকাহিনী।

### কৃত্তিকা-নক্ষত্র।

### দেবতা—অগ্নি।

২য় অনুবাক।

মহাভারতের বর্ণিত কৃত্তিকাগণের নক্ষত্র পদপ্রাপ্তির উপাখ্যান পাঠে কেহ মনে করিবেন, যখন মহাভারতে লিখিত আছে, তখন উহা খাঁটী বৃত্তান্ত; আবার কেহ বা মনে করিবেন, যে নক্ষত্রগণ অচল অটল ও গতি হীন সুতরাং

অভিজিৎ নক্ষত্রের বন বন-গমন ও গগণচ্যুতি অসম্ভব কথা-উপাখ্যানটি শুধু উপকথা মাত্র। কৃত্তিকাগণের নক্ষত্র চক্রে গমনও তদ্রূপ। কিন্তু উপাখ্যানটীর মূলে অন্তর্নিহিত কিছু জ্যোতিষিক তত্ত্ব আছে। মহাভারতের মূল উপাখ্যানের ন্যায় এই শাখা উপাখ্যানের ভিত্তিতে কিছু জ্যোতিষ তত্ত্ব নিহিত আছে। সেই তত্ত্ব অতি বিস্তৃত ও অতি রঞ্জিত হইয়া কবি কল্পনা-প্রসূত অর্থবাদ আচ্ছাদনে উপাখ্যানরূপ ধারণ করিয়াছে।

জ্যোতিষ তত্ত্বজ্ঞ তারা দর্শক জানেন যে (১) নক্ষত্র চক্রের ২২তম বিভাগ (নক্ষত্র) অভিজিৎ নামক ক্ষুদ্র তারাপুঞ্জ হইতে অভিজিৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র তারাপুঞ্জের যোগ তারার (প্রধান তারার) নাম নীলমণি (vega)। তারাটী স্থূলত্বে রোহিণী (জ্যেষ্ঠা) নক্ষত্রের যোগ তারার প্রায় দ্বিগুণ। (২) নক্ষত্র চক্রের সংস্কার কালে তাহার ২৮ বিভাগের পরিবর্ত্তে ২৭ বিভাগ হইল। এবং অভিজিৎ নামক ক্ষুদ্র তারাপুঞ্জ নক্ষত্র চক্রের বহুদূরে স্থিত বলিয়া অভিজিৎকে পরিত্যাগ করা হইল। এবং রক্তবর্ণ গুণে রোহিণী নামে দুইটী নক্ষত্র ছিল বলিয়া ২য় রোহিণীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে জ্যেষ্ঠা নাম দেওয়া হইল। কারণ ঐ নক্ষত্রের দেবতা ইন্দ্র গুরফে জ্যেষ্ঠা (ক)। ফলে বৃহত্তর তারা পরিত্যক্ত হইল এবং ক্ষুদ্রতর তারার জ্যেষ্ঠ হইল। এই জ্যোতিষ তত্ত্বের উপর অভিজিতের অভিমান বনগমন ও স্বর্গচ্যুতির উপাখ্যান গঠিত হইল। (৩) বশিষ্ঠ ভার্য্যা অরুন্ধতী সপ্তঋষিমণ্ডলে অবস্থিত। কিন্তু মরীচি আদি ষট ঋষির ভার্য্যা সংভূতি আদি তারা সপ্তঋষিমণ্ডলে অবস্থিত না হইয়া নক্ষত্র চক্রে মাতৃমণ্ডলে অবস্থিত। মাতৃমণ্ডলের ষটতারায় কৃত্তিকা নক্ষত্র গঠিত হয়। এই জ্যোতিষ তত্ত্বের উপর কৃত্তিকাগণের নির্ব্বাসন ও নক্ষত্র চক্রে আরোহণরে উপাখ্যান গঠিত হয়।

উপাখ্যান ২টী মূলে ব্যাসদেবের স্বকপোল কল্পিত নহে শত পথ ব্রাহ্মণে (২।১।২।৪) লিখিত আছে ঃ—

১। "কৃত্তিকা নক্ষত্রে যাজ্ঞিক অগ্নিদ্বয় প্রজ্বলিত করিতে পারেন। কারণ কৃত্তিকাগণ অগ্নি দৈবত্। অতএব অগ্নি নক্ষত্রে অগ্নি জ্বলিলে বেশ মিলন হইল, এই হেতু কৃত্তিকানক্ষত্রে যজ্ঞাগ্নি জ্বালা প্রশস্ত।

২। বিশেষতঃ অপর নক্ষত্রগণ ১, ২, ৩ বা ৪ তারাত গঠিত। কেবল

(ক) শত পথ ব্রাহ্মণ ৫।৩।৩।৬।

কৃত্তিকার ভূয়িষ্ঠ ( ৬ ) তারা ( খ ) এ কারণ যাজ্ঞিক বহু ফল পাইতে পারেন। এই হেতু তিনি কৃত্তিক তক্ষত্রে অগ্নিদ্বয় জ্বলিতে পারেন।

( ৪ ) প্রতিপক্ষে বলা হইবে কৃত্তিকার অগ্নিদ্বয় জ্বালিবার নিষেধ আছে। কৃত্তিকাগণ সপ্তঋষিগণের ভার্য্যা, সপ্তঋষিগণ ঋক্ষমণ্ডলে ( The great Bent ) অধিষ্ঠিত তাহারা স্বামী সহবাসে বঞ্চিত। ঋষিগণ উত্তরে, তাহারা ( কৃত্তিকাগণ ) পূর্ব্বে। (গ) ( ৫ ) সে যাহা হউক কৃত্তিকায় অগ্নি স্থাপন করা যায়। কারণ অগ্নিই তাহাদের সখা এবং তাহারা অগ্নির সহবাসে থাকে। এই হেতু কৃত্তিকায় অগ্নি স্থাপন প্রশস্ত।"

মাতৃমণ্ডল গ্রীসে তারা জগতের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। মহাভারত মতে ( ৩।২২৫।২৩ ) কৃর্ত্তিকাগণ সোম ধারার কেন্দ্র। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ মড্লার ও ইদানীন্তন কালে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কৃত্তিকাগণ সোম-ধারার প্রস্রবণ। এই জন্যই কৃত্তিকাগণ দেবমণ্ডলের ধাত্রী মাতা! এবং মাতৃমণ্ডল নামে অভিহিত এবং এই জন্যই মাতৃত্যক্ত স্কন্দদেবের ধাত্রীত্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ কৃত্তিকাগণকে বরন করিয়াছিলেন। ( বাল্মীকি ৫।৩৭ ) মাতৃমণ্ডলের সর্ব্বপ্রধান তারার নাম দেবসেনা বা ষষ্ঠীদেবী। স্কন্দদেবের অনুমতি মতে দেবসেনা মাতৃমণ্ডলে বিনতার পার্শ্বে অবস্থিত। মহাভারত ( ৩।২২৯।১৩ ) ষষ্ঠীদেবীর বাহন বিড়াল এবং মাতৃমণ্ডলের সন্নিহিত তলদেশে বিড়াল পদাকৃতি মৃগশিরা নক্ষত্র অবস্থিত।

———:০:———

---

( খ ) এই জন্য কৃত্তিকার প্রাচীন নাম "বহুলা"। এবং বঙ্গকৃষকগণের প্রদত্ত নাম "তিৎপুটীর ঝাক!" তুলনীয় :—

Sem :-Aritum ( The chester )

Heb :-**Kimah** ( The family )

Gr :-Pleiades ( The numerous )

( ঘ ) এতাঃ ( কৃত্তিকা ; ) হবৈ প্রাচৈঃ দিশঃ ন চ্যবন্তে।
সর্ব্বাণি অন্যানি নক্ষত্রানি প্রাচৈঃ দিশঃ চ্যবন্তে ।।
শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।৩।৬।

# সমালোচনা।

## THE EARLY HISTORY AND CROWTH OF CALCUTTA,

এই নামের একখানি ইংরাজী পুস্তক আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। কলিকাতার আদিম অবস্থার ইতিহাস ও বর্ত্তমান উন্নতি এই পুস্তকের বর্ণিত বিষয়। শ্রীযুক্ত রাজা-বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইহার প্রণয়ন কর্ত্তা। কলিকাতার আদিম অবস্থা-সংস্থান, অধিবাসী সংখ্যা, ইংরাজাধিকারে দেওয়ানী ফৌজদারি বিচার বিভাগ, ইউরোপীয় সমাজ ও হিন্দু সমাজ, এই ইতিহাসের নির্ঘণ্ট। ভূমিকা মধ্যে রাজা বাহাদুর স্বীকার করিয়াছেন, সুপণ্ডিত বারিষ্টার মিষ্টার এন, এন, ঘোষের লিখিত মহারাজা নবকৃষ্ণের জীবন-চরিত হইতে এই পুস্তকের বর্ণিত প্রাচীন তত্ত্বের প্রচুর উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা কলিকাতার ঐতিহাসিক বিবরণ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে জানিতে চাহেন, এই পুস্তক পাঠে তাঁহারা সবিশেষ প্রীতি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। এক এক প্রসঙ্গে যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে, তৎসমস্তই রাজা বাহাদুরের নিজের। পাঠকেরা আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন, অভিপ্রায় গুলি ভ্রান্তি শূন্য ও পক্ষপাত শূন্য। পুস্তকের ভাষাও ইতিহাসোচিত সুললিত। এদেশের বড় লোকের সন্তানেরা এতাদৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে একান্তই বিমুখ, রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর এই জ্ঞাতব্য ইতিহাস খানি প্রচার করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কলিকাতার ইতিহাস প্রকাশ করিয়া রাজা বাহাদুর যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন; বঙ্গের ও ভারতের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিলুপ্ত ঘটনাবলি সংগ্রহ করিতে তিনি যত্নবান হন। অপরাপর সুশিক্ষিত ধনবান সন্তানেরা এই আদর্শে পূর্ণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন; ইহা আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়। কলিকাতার ইতিহাসের মূল্য ভারতে ৫৲ টাকা, বিলাতে ৭৲ টাকা, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের বেঙ্গল প্রিণ্টিং কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রে উৎকৃষ্ট কাগজে পরিপাটিরূপে মুদ্রিত; এই ইতিহাস পাঠে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু পাঠকের বিস্তর উপকারে আসিবে। এখন আমাদের শেষ কথা এই যে, বাঙ্গালী দ্বারা কলিকাতার ইতিহাস ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইল, সাহেবেরা ইহা পাঠ করিয়া কলিকাতার পূর্ব্বাপর অবস্থা বুঝিবেন। এদেশে যাঁহারা ইংরাজী শিখিয়াছেন, তাঁহারাও আমোদ পাইবেন। কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদের জন্য ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলে অনেক উপকার হয়।




"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৫শ বর্ষ। কার্ত্তিক, ১৩১৩ সাল। ৪র্থ সংখ্যা।

# অহং তত্ত্ব।

লেখক—শ্রীসিদ্ধেশ্বর শর্ম্মা।

"আত্ম-জ্ঞানাৎ পরং নাস্তি"।

সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে "আমার" সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত "আমি কে" বা "আমি কি" তাহার মীমাংসা হইল না! কোন কালে যে কেহ "আমাকে" চিনিবে বা "আমার" পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে, তাহাও বিশ্বাস হয় না। তবে কাহা বলিয়া কেহ নিশ্চিন্ত ও

দেবী সকলকেই যথাসাধ্য "আমাকে" সন্ধান করিতে উত্তেজিত করেন; এবং সেই জন্যই দর্শনকার ভগবৎকল্প কপিল, কণাদ, পতঞ্জলি প্রভৃতি মহাপুরুষেরা যাহাকে অচিন্তনীয়, অব্যক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহাকে চিনিতে হারি মানিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার ন্যায় মূর্খের আবার কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, কলম্বস্ হইতে সাধ হইয়াছে!

যাহার সংজ্ঞা নাই বা হয় না, তাহাই "আমি" সেই জন্য প্রকৃতির অনুগত শিষ্য শিশুগণ পুনঃ পুনঃ "কি" "কেন" ইত্যাকার প্রশ্ন দ্বারা সংসারস্থ তাবৎ পদার্থের, তাবৎ ঘটনার পরিচয় জানিয়া লয়। কিন্তু "আমি" জ্ঞান তাহার স্বাভাবিক বলিয়া কদাচ সে প্রশ্ন তাহার মুখে শুনিতে পাই না। অন্তর্নিহিত প্রকৃতিই তাহা শিক্ষা দেন। নতুবা "আমি" কি, কিবা জ্ঞান, কার বা জ্ঞান, আর দর্শন জ্ঞান জন্মে কার, কেমন করিয়া, ইহা কি হট্টগোল নয়? কার কি সংজ্ঞা দিবে, বল দেখি?

"ময্যেব দৃশ্যতে রূপং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমং" (শিবগীতা)

"আমি কে" বুঝিতে হইলে, অপর প্রাণী দেখিবামাত্র মনোমধ্যে কল্পনা করিতে হয়,—সেই শরীর, সেই প্রাণ যেন আমারই, যেন সে যাহা করিতেছে, আমি ঐ অবস্থায় ঐরূপ করিতাম। এইরূপ ভাবনায় উহার সহিত চিন্ময়ত্ব ঘটিলে মনে হয়, আমিই ঐরূপ ধরিয়া তদুপযোগী কার্য্য করিয়াছি, আমিই আবার অন্তরীক্ষে থাকিয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি? বর্ত্তমান ঐ "আমি" ও কল্পিত "আমি" ক্রমে অভিন্ন হইয়া এক দেহে বিলীন হইয়া যায়। ঐই যে জ্ঞানময় ভাব, যাহা জ্ঞানেই উদ্বোধিত ও জ্ঞানেই বিভাসিত হয়, তাহাই "আমি"। তখন বাহ্যদর্শন ঠিক থাকে না, যাহা চক্ষুতে দেখি, তাহা হৃদয়ে দেখি না। যেন নিখিল সংসার এক হইয়া যায়, একাকার, এক ভাব; সর্ব্বত্রই এক "আমি" সংসারময় "আমি", শূন্যমণ্ডল "আমি", যাহা না দেখিতেছি, তাহাও "আমি", আমিও "আমি"। কি চমৎকার মিলন! দেখিতে দেখিতে হরিহর মিলিয়া গেল! ছায়াবাজীর এক দৃশ্যাপহরণ করিয়া দৃশ্যান্তর প্রদর্শন কালে যেমন পূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্যমধ্যে নূতনটী অলক্ষিতে মিশিয়া যায়, দেখিবার বা বুঝিবার অবকাশ পাই না; সেইরূপ আমিই যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছি, নাচিতেছি, খেলিতেছি! এইমাত্র অন্য বলিয়া দেখিতে দেখিতে সে "আমাতে" লীন হইয়া গেল! আর পাইলাম না! মরি মরি,

নিমগ্ন হইয়া যে রত্নোত্তোলন করিয়াছেন। আজ কল্পনাতেও তাহা দেখিতে পাইতেছি না! এই যে আমি সহসা এই চিন্তা করিলাম; কল্য হয়ত আমিই আবার ইহা বুঝিতে পারিব না, তবে আমিই বা "আমাকে" চিনিলাম কৈ? নিজেই যে "বহুরূপ"?

যেমন দেহের আবরণ, অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি, রক্ত-সঞ্চালনাদি ক্রিয়া, বহিশ্চক্ষুকে দেখিতে দিতেছি না, তেমনি মায়াবরণে সংসারকে আচ্ছাদন করিয়া "আমাকে" চিনিতে দিতেছে না। পার্থিব তাবৎ পদার্থ অপেক্ষা আমার দেহ, আমার অধিক প্রিয়, উহার উপর আমার কর্তৃত্বও অপরিমেয়; তৎসত্ত্বেও যখন এই জড়দেহের অভ্যন্তরস্থ তাবৎ বিষয়ই আমার জ্ঞানাতীত, তখন ভাব-রাজ্যের প্রধান কর্ত্তা যে "মন" সে "আমাকে" চিনিতে বাধা দিবে, বিচিত্র কি? গীতায় স্বয়ং ভগবানেরই উক্তি আছে যে, যখন "আমি" থাকিবে না, তখনই আমাকে চিনিতে পারিবে। কথাটী ভাবিয়া না দেখিলে, বুঝা যায় না, আবার কেমন করিয়া ভাবিতে হয়, তাহারও পথ পাই না; কাজেই উহা বুঝিতে পারি না!

সকলকে অভিন্ন ভাবনা করিতে করিতে ভগবানের কথার ধারণা করিবার পথ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই অভেদ জ্ঞান কি সহজে হয়? সংসারের কথা, এমন কি; নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, দেহের সচেতনত্ব বিস্মৃত হইয়া, যখন সেইরূপ ভাবিতে পারিব, তখনই সেই অভেদ-জ্ঞান আসিবে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম; যে কোন প্রাণী দেখিয়াই মনে করিবে; ঐ আমি, 'ঐ কার্য্য আমিই করিতেছি।' ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাইবে, উহার মধ্যে যেন কেমন 'চেনা' ভাব লাগিতেছে। উহার অভ্যন্তরে "আমিই" বসিয়া রহিয়াছি, যেন ঐ মূর্ত্তি ধরিয়া আমিই বেড়াইতেছি। যেন সে চৈতন্য, সে শক্তি, সে ঈশ্বর, সে প্রভারূপে আমিই বিদ্যমান। এই চেনা ভাব কেন হয়? অভেদ চিন্তায় তন্ময়ত্ব জন্মে ও তাহা হইতেই প্রতীত হয় 'সংসার ভাবময়' ও উহা হইতেই চৈতন্যময়, 'কল্পনাময়' 'স্বপ্নময়' ভাব উদ্বুদ্ধ হয়। তত্তৎ দেহ ধারণ করিয়া, তত্তৎ কার্য্য জন্মজন্মান্তরে আমিই করিয়া আসিয়াছি, তাই এই "চেনা" ভাব। উহার অস্থি, উহার মজ্জার মধ্যে যেন "আমি" প্রবেশ করিয়া সব দেখিয়াছি, সব খেলিয়াছি। যখন যে লীলা করিয়াছি, তাহা ঠিক "আমার" যোগ্য হইয়াছে; "আমি" প্রত্যেক বারে তন্নতন্নভাবে দৃষ্টি [illegible]

আপনাকে অপরের সহিত বিনিময় করিতে, বা সংসার ছাড়িতে মন সরে নাই। সূক্ষ্ম বিচারে "আমার" এই স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ "আমার" অস্তিত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব মীমাংসিত হয়। বর্ত্তমান প্রকটনেই ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, বিদ্যাসাগরই হন, আর গুরুদাস হন, কি সুরেন্দ্রনাথ, পরাঞ্জপে হন, কাহাকে পাইয়া ত "আমাকে" ছাড়িতে পারি না। ছাড়িলে কি আর "আমি' থাকি? আর না থাকিলেই বা সেরূপ করিতে যাই কেন? বস্তুতঃ আমিই সংসার ব্যাপিয়া আছি, অনন্ত কাল ধরিয়া "আমার" বিকাশও চলিতেছে।

শাস্ত্রীয় "অশীতি লক্ষ যোনি" ভ্রমণের ছায়া হৃদয়ে মুকুরে যখন প্রতিভাত হইবে, তখনই "আমার" পরিচয় একটু পাইবে; নতুবা সহস্র যুক্তি তর্ক, সহস্র শাস্ত্রানুশীলনে তাহার সন্ধান হইবে না। সমস্তই যে কল্পনায় সৃষ্ট, ও এই সৃষ্টিই যে সেই কল্পনা। ক্রমে মানস-পটে জাগিয়া উঠিবে। তখন অবিদ্যার প্রভাব অনুভূত হইবে না, মৃত্যু বলিয়া একটা ভয়ের ঘটনাও থাকিবে না, এক বিশাল অনন্তে "আমি" পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইব।

"আমাকে" চিনাইবার প্রধান অন্তরায়ও আমি। আমি বোধ কে করিবে? চক্ষুঃ চক্ষুকে দেখিতে পায়? দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব, বা তোমাকে দেখিয়াই তাহার সত্বা মানিতে হয়। সুতরাং "আমাকে" দেখিতে হইলে বিশ্বময় "আমি" ভাবিয়া দেখিতে হয়, নতুবা দেখিবার প্রয়াস বৃথা! "আমি" যে কোথায়, কি অবস্থায় আছি, তাহা শরীর দ্বারা অনুভূত হয় না। এই ক্ষুদ্র অসীম দেহ "আমার" আধার নহে। এই শরীর ছাড়া অতীন্দ্রিয় কিন্তু "আমি"; দেহের নাশে "আমার" নাশ নাই। আমি কার্য্য আমিই কারণ. আমি ভাব, আমিই ভাবুক, আমি চিত্ত, আমিই চিন্তা। আমি স্রষ্টা, আবার আমিই সন্ন্যাসী বেশে "আমার" সন্ধান করি। "আমাকে চিনিলে ত সিদ্ধ হইলাম।

মস্তক, বক্ষঃ, হস্ত পদাদি সর্ব্বত্র সন্ধান করিয়া "আমাকে" পাইবে না। সকলই "আমার" এই মাত্র পরিচয় দিয়া সরিয়া দাঁড়াইবে। আমাকে কেহই দেখাইতে পারিবে না। কি আশ্চার্য্য! রাত্রি দিন যাহাকে লইয়া "ঘরকন্না" করিতেছি, যাহাকে এত ভালবাসি, যাহার সহিত এত পরিচয়, যাহাকে ছাড়িয়া এক তিলও তিষ্ঠাইতে পারি না, তাহাকে দেখিলাম না, তাহার সন্ধান পাইলাম না, অথচ বলিতেও ছাড়ি না "এই আমি"! একটী অঙ্গুলি, একটী চক্ষুঃ কি একটী কর্ণকে জিজ্ঞাসা কর

কোথায়? দৈহিক অণুগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ কর, কোথায়ও পাইবে না। বস্তুতঃ আমার সম্বন্ধে "গোড়াতেই গলদ"; আগুন কি আগুনকে দগ্ধ করিতে পারে? না; সহস্র চেষ্টা করিলে চক্ষুঃ নিজেকে দেখিতে পায়? যখন আমিই "আমি", তখন আবার "আমাকে" চিনাইবে কে? দেখিবে কে, দেখাইবে কে? কেই বা দেখিবে? সেই জন্য আমাকে চিনিতে হইলে সংসারে আমাকে ছড়াইয়া ফেলিতে হয় ও তৎসহ দ্রষ্টব্য ও দ্রষ্টার সৃষ্টি, করিয়া; সেই খণ্ড খণ্ড "আমি" গুলিকে কুড়াইয়া আনিতে হয়, তবেই "আমার" বোধ হয়। একটী চক্ষুকে উঠাইয়া হস্তে করিয়া, অপর চক্ষুঃ দিয়া দেখিলে নিজের চক্ষুর আকারাদি দর্শন পথে আইসে! নতুবা পরের মুখে "পদ্মনেত্র" শুনিয়া বা পরের গাত্রে (দর্পণে) নকল অর্থাৎ ছায়া দেখিয়া তৃপ্ত হইতে হয়। কাজেই আমাকে চিনিবার জন্য ২য় ও ৩য় পুরুষের সৃষ্টি করিতে হয়, ও সেই জন্য সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান করা তত্ত্ব-জ্ঞানীর সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠান। অপরের সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিজের ভাবিতে শিখ, শুধু অনুরোধে বা মৌখিক ভাষায় নহে, অন্তরে সেইরূপ কল্পনা করিয়া অভিন্ন জ্ঞান কর; সেই ভাব স্থায়ী হইলেই "আমাকে" পাইবে, সিদ্ধ হইবে।

পাঁচ জনে মিলিয়া উৎসব দেখিতে গেল। আসিবার সময় গণনা করিয়া দেখে, একজন নাই। প্রত্যেকে নিজেকে ছাড়িয়া গণে। শেষে "আমি কৈ" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। বস্তুতঃ "আমাকে" দেখিতে সেইরূপ ধাঁধাঁই বটে! আমি কোন স্থান বিশেষের অধিবাসী নই; সংসারময়ই "আমি"। অব্যয়, অনাদি, অনন্ত "আমি"। কতকাল যে এই পরিদৃশ্যমান জড়-সংসারে আমার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, জড়ের সহিত মিত্রতা হইয়াছে, তাহা আমি জানি না, জানিবার উপায়ও নাই। এই আবর্ত্তে পড়িয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রবর হিউম বলিয়া ফেলিলেন—"আমি ভাবও ধারণামাত্র।" কেহ বা আত্ম-বোধে সন্দিহান হইয়া, শেষে স্বীয় চিন্তাশক্তি দেখিয়া আপনার অস্তিত্ব মানিলেন। কিন্তু সেই ভাব কে ভাবে, বা কোথায় থাকে, তাহা ভাবিলেন না! চার্ব্বাক্ যদিও তাহা দেখিয়া আপনাকে স্বয়ম্ভু ভাবিলেন। তাহার অনাদিত্ব, অনন্তত্ব মানিলেন না। এক যাত্রাতেই সব শেষ। "গতোজীবনস্ত পুনরাগমনং কুতঃ" বলিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন।

প্রকৃতিও "আমাকে" ধরাইয়া দিতে বড় নারাজ। মুক্তি-বিভিন্নতা, রুচি

সেই সমষ্টির অন্তরে "আমি" রূপে পরমাত্মা নিহিত। বস্ত্রান্তরালে থাকিয়া ছায়া-বাজীকর যেমন অলক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন পুতুলের নর্ত্তন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে, দর্শকগণ পুতুলের খেলা দেখিয়াই মুগ্ধ, অভ্যন্তরের সন্ধান লইতে উৎসুক নহে, সেইরূপ সেই মহা "আমি" বিশ্ব-সংসারে অন্তর্নিহিত থাকিয়া খণ্ড খণ্ড এই 'আমি' গুলি লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, নানারূপ খেলায় মনের সাধ মিটাইতেছেন! তিনি এক "আমাকে" দিয়াই কত রূপ অভিনয় দেখাইলেন, ভাবিলে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। মনে কর, বাল্যকালের আমি, আর যৌবনের আমি, এক হইয়াও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে বিভাসিত! সেরূপ নাই, সে গুণ নাই, সে চিন্তা নাই; সে সব গিয়া অভিনব গুণ, চিন্তা, শক্তি হৃদয়কে দখল করিয়াছে। কিন্তু সকল সময়েই সংসার তুল্যরূপ "আমার হইয়াছে, কোনরূপে অশান্তির স্থল বা অযোগ্য হয় নাই। "আমি যে নির্ব্বিকার, তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। তখন জনক জননীর ক্রোড়ে ছিলাম, এখন পিতা হইয়া পুত্র কোলে করিয়া বসিয়াছি। সে পিতা মাতা নাই, সে সংসার নাই; কয়েকজন নূতন লোকে ঠিক সেই ভাবে "আমাকে সংসারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। বাল্যে যে কার্য্যে আমোদ পাইয়াছি, এখন তাহা স্মরণ করিতেও লজ্জা। এখন অন্যবিধ কার্য্য সুখদ হইয়াছে। বাল্যের ছবি ৩০।৪০ বৎসর পরে মিলাইলে যেমন বিভিন্ন দৃষ্ট হয়, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ যুগান্তর ঘটিয়াছে। সব গিয়াছে, কিন্তু "আমি" অবিচলিত, অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে,—"আমি" এমন কিছু, যাহার বিনাস নাই, হ্রাস বৃদ্ধি নাই। "আমি জড় সমবায়ের ফল বলিয়া যাহারা বিতর্ক করেন, তাহারাও নিরস্ত হইবেন। নতুবা নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের সহিত "আমার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; তাহা না হইয়া তুল্যরূপ স্বার্থবোধ লইয়া উন্মত্ত রহিয়াছি, 'আমি' 'আমার' করিতেছি! তবে স্থূল দর্শনে যে পার্থক্য লক্ষিত হয়, তাহা কাল দেশ পাত্রজাৎ। কর্দ্দম-মণ্ডিত অবস্থা। বাল্যের কার্য্য-কলাপ সেই জন্য এখন অনুমোদন করিতে আপত্তি। সে পৃথিবী আর এখন নাই। কিন্তু সে 'আমি' চিরকালই দেহ-পিঞ্জর হইতে তুল্যরূপ "আমি "আমার— বোল বলিতে ছাড়ে নাই। অথচ সেই পিঞ্জরের কোন স্থানে তাহার অবস্থিতি, নিজেই তাহা জানে না! তাপ জড় পদার্থের একটি গুণ, ঘর্ষণে উৎপন্ন ও

সেইরূপ 'আমি' শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যক্ষ না হইলেও আছি। অনন্ত কাল ধরিয়াই থাকিব। সাকার; নিরাকার দুই ভাবেই থাকিব। আমি অমর, অব্যয়। রুচি ভেদবশতঃ বাল্যকালের কার্য্য অন্যরূপ হইলেও, সম্বন্ধ-বিচারের সময় অভিন্নই আছে। তখনও যাহা 'আমি', এখনও তাহাই 'আমি'। সে অহং জ্ঞানের বিন্দুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। দেহ বিনশ্বর, তদাশ্রয়ী আত্মা বা "আমি" অপরিবর্ত্তনীয়। তোমার অঙ্গুলিটা, হস্তখানি পদখানি গেল, আমিত্ব টুকু কমিল না। তখন তাহার পরিচয় দিতে হয় "আমার", দুই দিন পরে-ঘৃণ্যই হয়। জড়দেহের সহিত "আমার" পার্থক্য, তাহাও ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে। বলিতে কি, জগতের সহিত আমি মিশিয়া আছি সত্য, কিন্তু উহার সহিত "আমার অভেদ বন্ধুত্ব জন্মে না। যতই আপন করিতে যাই, কেমন একটু ফাঁক ফাঁক ভাব যায় না। যে দেহকে লইয়া এতকাল নাচাইতেছি, খেলাইতেছি, তাহাতেও আমি মিশিয়া এক হইতে পারিলাম না! আমি চিরকালই "আমার" বলিয়াই পরিচয় দিতেছি। ইহা হইতে আর একটু প্রতীত হয়, যে জগতের সকলকে "আমার করিতে ইচ্ছা, অথচ চিরকালই "আমি স্বতন্ত্র থাকিয়াই ঘুরিতেছি। কামলা রোগীর চক্ষে সমস্ত পদার্থই পীতবর্ণ, অথচ প্রত্যেকের বর্ণ বিভিন্ন, যাহার যাহা তাহা অপরিবর্ত্তিত, সেইরূপ "আমি' চিরদিন সংসারকে সমভাবে আমারই দেখিয়া আসিতেছি; প্রত্যুত সংসার আমাকে লক্ষ্য না করিয়া, তাহার বিভিন্ন-লইয়া গন্তব্য পথে ছুটিতেছে। আমার বর্ত্তমান শরীর যা পিঞ্জরের ন্যায় মনে হইতেছে, আমার অসদ্ভাবে এই সংসারে যেন হুলুস্থুল পড়িয়া যাইবে! কত উলটপালট হইবে! বাস্তবিক, আমাকে আমিই চিনিলাম না, তোমাকে কিরূপে চিনাইব?

নিত্য নিত্য নব নব দর্শনের গুণে শিক্ষা দীক্ষা, রীতি নীতি, অভ্যাস প্রভৃতি নূতন ছাঁচে গঠিত হয়। কাজেই দেহাধীন ইচ্ছাও অভিনব মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া নূতন নূতন খেলার অভিনয় দেখায়। কিন্তু যে সেই ইচ্ছার রুচি পার্থক্য দেখায়, সে চিরকাল একভাবেই থাকে, ও তাহা হইতেই তাহার নিত্যতা প্রতিপন্ন হয়। স্থূল-দর্শনের সহিত সূক্ষ্ম-দর্শনের এই বিরোধ হওয়াতেই অবিদ্যাবরণ ভেদ করিয়া 'আমি' বাজীকরকে প্রত্যক্ষ করা এত ক্লেশ-সাধ্য হইয়াছে। 'আমাকে' চিনাইতে প্রকৃতির এত আপত্তি কেন?

দময়ন্তী স্বয়ম্বর-ঘোষণা করিয়া স্বীয় পতি নলের সন্দর্শন লাভ করেন।

মৃত্যু যেমন নিশ্চিত হইয়াও অনিশ্চিত, 'আমি' তেমনি পরিচিত হইয়াও অপরিচিত। সৃষ্টির সৌকর্য্যার্থ বুঝি বিধাতা উভয়কে অজ্ঞাত রাখিয়াছেন। যখন এই সৃষ্টি বিকাশের সীমা পড়িবে বোধ হয়, তখনই 'আমার' প্রকৃত সন্ধান হইবে।

'আমি' জ্ঞান স্বাভাবিক ও নিত্য, তাহার আরও দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর রহিয়াছে। শিশু ক্ষুৎ পিপাসা ভিন্ন অন্য অভাব জানে নাই, তাহারও 'আমি' বোধ জন্মিয়াছে। কোন বস্তু সন্দর্শনে তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে, বাধা পাইলে রোদন করে। আবার তাহা হস্তগত হইলেই সুস্থির হয়। মুখ চিনিয়াছে সুতরাং ভাল মন্দ, খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া মুখে দিয়াই তাহার সুখ উপভোগে সচেষ্ট হয়। যদি আমি বোধ তাহার স্বাভাবিক না হইত, তবে তাহার সংস্কার বিহীন চিত্ত তদধিকার আকাঙ্ক্ষা স্থান পাইত কি? না, তল্লাভার্থ-হস্ত-প্রসারণ করিত?

যে রথ-খানিতে আরোহণ করিয়া অহোনিশ ভ্রমণ করিতেছি, সে যে 'আমার' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; তথাচ যখন আমার অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছাতে আজ তাহার চাকা ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, কল্য দন্তটী ভগ্ন হইল, দেখিতেছি, তখন 'আমি' যে ইহাদের কেহই নহি, তাহা বুঝিতে বাকি কি? আমার না চিনিতে পারিলেই বা সন্ধান কাহার করিব? না চিনিয়া সন্ধান করিতে যাওয়াও নিতান্ত বিড়ম্বনা। কি আশ্চর্য্য! কোন্ যুগে ম্যাষ্টিডিয়ন, ম্যামথ জগদ্দলন করিয়া গিয়াছে, তাহা ভূ-স্তর পরীক্ষায় স্থির হইল, ভূ-মধ্য-সাগরে কত পৌণ্ড জল আছে, তাহার পরিমাপ হইল, কোন্ ধূমকেতু কত দিনে আবার নেত্রগোচর হইবে, তাহাও গণিত হইল, আর যাহাকে লইয়া সর্ব্বদা ঘরকন্না করিতেছি, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কত খেলাই খেলিতেছি, তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। চেনা দূরের কথা, তাহার সংজ্ঞাই পাইলাম না! অন্য কথা কি, যে ঘর খানিতে অবস্থান করে, তাহারই বাহিরের রোমাবলী ভিন্ন, অভ্যন্তরের কণামাত্রও সংবাদ রাখি না! খেলয়ারের বাহাদুরী বটে!

আমরা মূলতঃ ইহাই বুঝিয়া সন্তুষ্ট আছি যে, জগতে জল ও স্থল আছে, স্থানভেদে বিভিন্ন নাম। অথচ মূলত সর্ব্বত্রই অভিন্ন। আদিতে জল, পরে স্থলের উদ্ভব। সেইরূপ "আমিময় সংসার"। একই 'আমি' খণ্ডগরূপে প্রকটিত।

তাই। * স্থলকে আশ্রয় করিয়া জলের স্থিতি ও গুণ-প্রকাশ, জড়কে আশ্রয় করিয়া "আমার বিকাশ। উভয়েরই আদি দুর্জ্জ্যেয়।

জড় ও চেতন পদার্থের পার্থক্য "আমা" কর্ত্তৃকই দৃষ্ট হয়। সহস্র কল কারখানা করিয়া একটা মনুষ্য প্রস্তুত কর, কদাচ "আমিত্ব" দিতে পারিবে না। এই স্থূলদর্শনের "আমি" সেই সূক্ষ্মদর্শনের চিৎসত্তার প্রতিবিম্ব। বিচক্ষণ ব্যক্তি এই ছায়া দেখিয়া সেই সর্ব্ব শক্তিময় "মহা আমির স্বরূপ বুঝিতে পারেন।" সে জ্ঞান দুর্ল্লভ। যে মহাজন এই "আমিত্ব" দিয়া মুর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি জ্ঞানাতীত, ধারণাতীত। হীরককে খণ্ড খণ্ড কর প্রত্যেক খণ্ডই, হীরকের ধর্ম্মই প্রকাশ করিবে। অগ্নি-কুণ্ড হইতে অগ্নিকণা স্বতন্ত্র করিলে, প্রত্যেক কণাই খাণ্ডব-দাহনে সমর্থ। মূল প্রকৃতি অক্ষুন্ন থাকে। এইজন্যই সেই "মহা আমির" খণ্ডগুলিও "আমি করি" "আমি করিতে পারি" ইত্যাদি সর্ব্বদা বলিতে ছাড়ে না। উহা উহার নিত্য ও মৌলিক ধর্ম্ম। "অহঙ্কার' "আমার অবিচ্ছেদ্য গুণ। গুণ ভিন্ন জড় বা বিনা জড়াশ্রয়ে শুধু গুণের বিকাশ অসম্ভব, সেইরূপ "অহঙ্কার ছাড়িলে "আমার অস্তিত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেইজন্য বলিতে হইতেছে,—সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মই নিজের অব্যয় অনন্ত রূপ হইতে "আমার অবতার করিয়া নিজেরই রূপ ও গুণ প্রকটন করিতেছেন।" "আমিত্ব দিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার শক্তি তাহারই একচেটিয়া মৌলিক ধর্ম্মবশতঃ "আমার স্বাধীন ভাব যতই থাক্, ঐ শক্তিটুক্ পাইবার যো নাই। বলা বাহুল্য, ঐ স্বাধীনভাবের অপত্য পুরুষকার।

এতদূর আলোচনা করিয়া আমরা জানিলাম, যাহাকে ভিন্ন করিয়া চিন্তা করা যায় না তাহাই "আমি।" প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ ইহাকে চিন্তাতীত এই জন্যই বলিয়াছেন। যে চিন্তা করায়, ভোগ করায়, জীবাত্মা বা চৈতন্য সমন্বিত দেহযন্ত্রকে পরিচালন করে, সেই "আমি বা পরমাত্ম।" আর যে সেই সমস্ত করে, সে জীবত্মা প্রকৃতির অধীন। অহংজ্ঞান সাধনা-সাপেক্ষ। যখন জীবাত্মার এই সন্ধান, নেশাস্বরূপ হয়, তখনই "আমাকে পায়।" তাবৎ জলের ন্যায় (কখন বাষ্প, কখন মেঘ) সংসারে আসা যাওয়ারূপ আবর্ত্তনের অধীন থাকিতে হয়।

---

* নদ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তর মাশুতে ব্রজন্তো জন্মনোজন্ম লভন্তে

উপসংহারে "আমাকে" চিন্তা করিবার একটা সহজ উপায় মাদৃশ সামান্য বুদ্ধি মানবের মনে এই হয়, যে, যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, পঙ্গু, এমন কি, যাহার অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের সামান্য চেষ্টা করিবারও উপায় নাই, আলাপ করিবার সহচর নাই; মোটের উপর, কোন ইন্দ্রিয়েরই ক্রিয়ার পথ নাই, তাদৃশ ব্যক্তির মনোভাব, যিনি স্বীয় মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে পারেন, তিনিই "আমার" তত্ত্ব পান। দিগাকাশাদি অসীম বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিশ্চল ভাবে আসনে দৃঢ় থাকা চাই। তখন বুঝিতে পারিবেন চিন্তা, চৈতন্য ও "আমি" অভিন্ন। "আমি" অসীম, অনন্ত, অব্যয়। পলাণ্ডুর আবরণ ফেলিলে যেমন শেষে কিছুই থাকেনা। চিন্তাকে ত্যাগ করিলে "আমাকে" পাওয়াও তেমনই দুঃসাধ্য হয়। বস্তুতঃ "আমিই" চৈতন্য জগতের কেন্দ্র। আমি স্থির আছি বলিয়াই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড স্থির আছে। সেই জন্যই বলিতেছি, পূর্ব্বোক্ত পঙ্গু ব্যক্তিই যোগী-ঋষি অন্বেষিত সেই "অহং" চিনিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

যখন দেখিতেছি, যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাদি দেহান্তর ধারণ করিয়া বিভিন্ন জীবাখ্যা পাইতেছে, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গ চক্ষের উপরই সেই অভিনয় দেখাইতেছে, তখন যে "আমি বর্ত্তমান জরা-মরণাধীন দেহের স্থায়ী ও যোগ্য অধিবাসী নই, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। আবার পুনরাবৃত্তি যে নিত্য ধর্ম্ম, তাহাও সূচিত হইতেছে। এতদূর স্থির হইলেও, যে নিত্য ধর্ম্ম, তাহাও সূচিত হইতেছে। এতদূর স্থির হইলেও, "আমার স্বরূপ ও স্থিতিস্থান অজ্ঞাত রহিয়াছে। হস্ত পদ, কি হৃদয়, কর্ণ সমস্তই যেন আমা হইতে দূরে। প্রকৃত-যোগীর ভাষায় বলিতে গেলে, "ভ্রূ-মধ্যে আজ্ঞাচক্রে দ্বি-দল পদ্মে বিদ্যুৎবর্ণ অবস্থায় অবস্থিত," নিতান্ত উড়াইবার কথা নহে। চক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলেই যেন "আমাকে" ধর ধর করি। আমরা এই দ্বি-দল হইতে জড় ও চৈতন্য, বা প্রকৃতি ও পুরুষ বা জীবত্মা ও পরমাত্মা যাহাই বল, উভয়ের মিলনে যে "আমার" বিকাশ এইরূপ বুঝি। অসীম অনন্ত বিরাট বিশ্বই "আমার" আধার।

—:০:—

# উত্তররামচরিত ও শকুন্তলা।

## লেখক—শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

ভবভূতি এ বিষয়ে একটু অগ্রসর। লব রামচন্দ্রের অশ্বমেধীয় অশ্ব বন্ধন করিল। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ-পুত্রগণ বিস্ফুরিতশস্ত্রশালী অস্ত্রধারিগণ কুমারকে তর্জ্জন করিতেছে, এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে, লব বলিল ঃ—

"কিং নাম বিস্ফূরন্তি শস্ত্রাণি ?

জ্যাজিহ্বয়া বলয়িতোৎকটকোটিদংষ্ট্রমুদ্গারি ঘোরঘনঘর্ঘরঘোষমেতৎ।

গ্রাসপ্রসক্ত-হসদন্তকবক্ত্রযন্ত্র জৃম্ভাবিড়ম্বি বিকটোদর মস্তু চাপম্।"

"কি কহিলে ? অস্ত্র সকল বিস্ফুরিত হইতেছে। আমার ধনু-জ্যারূপ জিহ্বা দ্বারা সম্বদ্ধ ভীষণ-অগ্ররূপ-দন্তযুক্ত এবং ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনবৎ ঘর্ঘরধ্বনি উদ্গিরণকারী অতএব গ্রাসপ্রকাশক হাস্যসম্পন্ন যমমুখজৃম্ভনের অনুকরণকারী সুতরাং বিকট গর্ত্ত হউক।"

পাঠক! ইহা ইক্ষুচর্ব্বণে রসগ্রহণ হইলেও ইহাই বীররসের চরম দৃষ্টান্ত *।

---

* সাহিত্য-দর্পণের অষ্টম পরিচ্ছেদে বীররসে ওজোগুণ প্রয়োগের নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে ;—

"ওজশ্চিত্তস্য বিস্তাররূপং দীপ্তত্ব মুচ্যতে।

বীর-বীভৎস-রৌদ্রেষু ক্রমেণাধিক্য মস্যতু॥"

"চিত্তের বিক্ষেপকারী উগ্রতা বিশেষের নাম ওজোগুণ। বীর বীভৎস ও রৌদ্ররসে ক্রমে ইহার আধিক্য হইবে। অর্থাৎ বীররসে যেরূপ ওজোগুণ প্রযুক্ত হইবে, বীভৎস রসে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক হওয়া উচিত। এবং রৌদ্ররসে তাহা অপেক্ষাও আর একটু মাত্রা চড়ান আবশ্যক।"

সাহিত্যদর্পণকার ওজগুণপ্রকাশক বর্ণগুলিরও হিসাব দিতে ক্রটী করেন নাই।

"বর্গস্যাদ্যতৃতীয়াভ্যাং যুক্তৌ বর্ণৌ তদন্তিমৌ

উপর্য্যধোদ্বয়োর্ব্বা সরেফটঠডঢৈঃ সহ॥"

"বর্গের প্রথম ও তৃতীয়বর্ণ দ্বারা যুক্ত দ্বিতীয় ও চতুর্থবর্ণ ওজোগুণের প্রথম দৃষ্টান্ত। এবং উপরে রেফ, নিম্নে অন্য কোনও বর্ণযুক্ত করিয়া ট ঠ ড ঢ এই বর্ণ

আবার প্রসাদগুণে কালিদাসের কৃতিত্ব দেখুন ; অজ্ঞাত পুত্রের অঙ্গস্পর্শ-জনিত সুখ অনুভব করিয়া রাজা দুষ্মন্ত বলিতেছেন :—

"অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ স্পৃষ্টস্য গাত্রে সুখিতা মমৈবম্।
কাং নিবৃতিং চেতসি তস্য কুর্য্যাৎ যস্যায় মঙ্গাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ।"

"কোনও অনির্দ্দিষ্ট নামা ব্যক্তির বংশের অঙ্কুরস্বরূপ এই শিশু কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট আমার শরীরে এমন অনিন্দনীয় সুখ সমুদ্ভূত হইতেছে। জানি না যে মহাত্মার অঙ্গ হইতে এই বালক প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহার অন্তরে কত সুখই উৎপাদন করে?"

উত্তর রাম চরিতে রামচন্দ্র লবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন:—

"পরিণত-কঠোর-পুষ্কর-গর্ভচ্ছদপীন-মসৃণ-সুকুমারঃ।
নন্দয়তি চন্দ্রচন্দন-নিস্যন্দ-জড় স্তব স্পর্শঃ॥";

"বৎস! সম্যক্ প্রস্ফুটিত কঠোর পদ্ম মধ্যস্থ দলের ন্যায় ঈষৎ কর্কশ অথচ মধুরতাপূর্ণ এবং চন্দ্র ও চন্দনের রসস্রুতির ন্যায় সুশীতল তোমার স্পর্শ আমাকে আনন্দিত করিতেছে।"

এই দুইটি শ্লোক পাঠ করিলে বেশ প্রতীত হইবে যে প্রথম শ্লোকটী সরল লেখনী মুখে পরিস্ফুট * আর দ্বিতীয়টী কষ্ট কল্পনাদ্বারা লিখিত। পাঠক এই খানেই কালিদাসের উৎকর্ষ।

---

* ইহাকেই প্রসাদগুণ বলে। সাহিত্যদর্পণে লিখিত হইয়াছে:—

"চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধন মিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসুচ।"

"অগ্নি শুষ্ককাষ্ঠকে যেরূপ সহসা আক্রমণ করে সেইরূপ যে গুণ মনকে অতি সত্বর পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে তাহার নাম প্রসাদ। এইগুণ সমস্ত রস ও রচনাতে প্রশস্ত।"

এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ বলেন:—

"কালিদাস কবিতা নবং বয়ঃ মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ।
ঐণমাংস মবলা চ কোমলা সম্ভবন্তু মম জন্মজন্মনি।"

"কালিদাসের কবিতা, নূতন বয়ঃক্রম, মহিষ দুগ্ধের দধি, শর্করাযুক্ত দুগ্ধ, হরিণের মাংস, এবং কোমলা নায়িকা যেন আমি জন্মে জন্মে লাভ করিতে পারি।"

পাঠক! ইহার মধ্যে সকল পদার্থগুলিই অতি কোমল। কালিদাসের

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## নায়ক চরিত্র বিশ্লেষণ।

উভয় নাটকের নায়কই অমিত পরাক্রমশালী ও বহুগুণসম্পন্ন। তবে রাম চরিত্র অপেক্ষা দুষ্মন্তচরিত্র অনেক বিভিন্ন। স্বভাব গম্ভীরতা উদার চিত্ততা কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও বিনয়নম্রতা প্রভৃতি সদগুণরাশি রামচরিত্রে যত বিকাশপ্রাপ্ত হই-য়াছে দুষ্মন্তচরিতে তত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

প্রথমে স্বভাব গম্ভীরতার বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। পূর্ব্বকালীন সাধারণ জনগণের বিশ্বাস ছিল যে, মৃগয়া রাজধর্ম্ম। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, উহা রাজধর্ম্ম নহে—কিরাতধর্ম্ম। কটুতিক্তকষায় বন্য ফলমূল ভোজন ও শুষ্কপ্রায় পর্ব্বততরঙ্গিণীর পত্রসঙ্করকষায় পূতিগন্ধময় জলপান করিয়া কখনও বা অশ্বারোহণে, কখনও চরণচরণে, ম্লানমুখে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, অশেষ দায়িত্ব পূর্ণ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করা যদি রাজধর্ম্ম হয়, তবে জানি না পাষণ্ডধর্ম্ম আর কাহাকে বলে? এহেন অপরি-ণামদর্শী কেবল আমোদ প্রিয় রাজা যদি জগতের আদর্শচিত্র নাটকের নায়ক হইতে পারেন, তবে জানি না পিশাচ কোন অপরাধে গ্রন্থের নায়কত্বলাভে অনধিকারী হয়?

ভগবান্ মনু এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াই মৃগয়াকে অষ্টাদশ প্রকার ব্যসন মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন :—

"মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যাচ কামজো দশকো গণঃ।

---

বাধ্য। তবে ইহাও বলিব যে এতদ্দেশীয় লোকের এই কোমলতা প্রিয়ত্বই আমাদের অধঃপাতের মূল কারণ। কোমল পদার্থ সেবনে মানব বিলাসী হয়। ভারতেত মরু প্রান্তরে যে জাতির অভ্যুত্থান তাহারা অতি কঠোরকর্ম্মা; কিন্তু সেই দুর্দ্ধর্ষ জাতির অধঃপতনের মূল কারণ বিলাসপরায়ণতা। আবার

পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণং।
বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ॥ *

৭ম অধ্যায় ৪৭।৪৮ শ্লোক।

"মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবা নিদ্রা, লোকের দোষকীর্ত্তন, অবিরত স্ত্রীবিষয়ক কথোপকথন; আমোদ-প্রিয়তা, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বৃথাভ্রমণ, এই দশ প্রকার কামজ ব্যসন। খলতা, অতিরিক্ত-সাহস, পরাপকারপ্রবৃত্তি, ক্ষমাশূন্যতা, পরশ্রীকাতরতা, লোকের কার্য্যে দোষোদ্ঘাটন, কর্কশ বাক্যপ্রয়োগ ও কঠোর দণ্ড প্রদান, এই প্রকার ক্রোধজ ব্যসন।"

রাজা ব্যসনে লিপ্ত হইলে তাঁহার যে দুর্গতি হয়, মনু তাহা প্রদর্শন করিতেও ত্রুটী করেন নাই।

"কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু॥"

"কামজ ব্যসনে প্রসক্ত রাজা ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন। আর ক্রোধজ ব্যসনে লিপ্ত হইলে আত্মশক্তি অর্থাৎ রাজশক্তি হইতে স্খলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।"।

---

* বি অস্ করণে অনট। যাহা দ্বারা মানবগণ কুপথে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার নাম ব্যসন! অর্থাৎ যাহাতে আসক্ত হইলে মনুষ্যের কাণ্ডাকাণ্ড বিচারের ক্ষমতা তিরোহিত হয়, তাহাকে ব্যসন বলে। ইহার একটী মহাদোষ এই যে ইহার আকর্ষণী শক্তিতে বড়ই প্রসক্ত হইয়া পড়িতে হয়। আমরা ইহার ভুক্তভোগী। ৪টা বাজিলে ঝড়-বৃষ্টি ঝঞ্ঝা প্রভৃতি গ্রাহ্য না করিয়া শত কার্য্যও পরিত্যাগ করিয়া পাশাখেলার আখড়ায় ছুটিয়া থাকি। মৃগয়া কেবল পশুহত্যা নহে। মাছধরাটীও ব্যসন মধ্যে পরিগণিত। ইহার আসক্তিও পশুহত্যা হইতে অল্প নহে। আসন্ন মৃত্যু পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কোনও ভদ্রলোককে মাছ ধরিতে যাইতে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এইরূপ তাসখেলা দাবাখেলা প্রভৃতি সকলই ব্যসনমধ্যে পরিগণিত। নৃত্য গীত বাদ্য মাত্রেই ব্যসন নহে। উহা শাস্ত্রে মহতী কলাবিদ্যা বলিয়া গণ্য। অল্প অল্প জানিয়া কেবল উহাতেই লিপ্ত থাকা কিংবা আধুনিক পল্লীগ্রামবাসী থিয়েটারী

"দশকাম-সমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।"

মনুসংহিতা সপ্তম অধ্যায় ৪৫ শ্লোক।

রাজা দশ প্রকার কামজ ব্যসন, এবং আট প্রকার ক্রোধজ ব্যসন, যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন। কারণ উহার পরিণাম অতীব ভীষণ।

মৃগয়াপরায়ণ রাজা দশরথের অন্ধমুনিপুত্রহত্যার পরিণাম, ও রাজা প্রভঞ্জনের সন্তানকে স্তন্যদায়িনী হরিণীবধের শেষ ফল পাঠ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি এই অশেষ অমঙ্গল বিধায়িনী মৃগয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবে ?

পাঠক! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন! এক্ষেত্রেও যদি ঐ আশ্রম মৃগ রাজা কর্ত্তৃক নিহত হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে ঋষিগণের কোপানলে পতিত হইয়া অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত না কি ? *

আরও একটী কথা আছে। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য বলেন্ :—

"মৃগয়াসু হিংস্রশ্বাপদাদীনামেব বধঃ।
মৃগয়াতে হিংস্র পশুগণেরই বধ করা কর্ত্তব্য †।"

এই মহা বাণীটীকে আমরা সতত শিরোধার্য্য করি। প্রজারক্ষাই রাজধর্ম্ম। হিংস্র পশুবধ তাহার একটী অন্যতম উপায় † কিন্তু রাজা দুষ্মন্তের এ মৃগয়া

---

‡ শাস্ত্রে বলে "অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনি গতেষ্বপি ;" পশুপক্ষি-প্রভৃতির মধ্যেও স্ত্রীজাতি সতত অবধ্য। রাজা প্রভঞ্জন এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া বহু বর্ষ পর্য্যন্ত ব্যাঘ্রযোনিতে পরিভ্রমণ করেন্।

* মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ভট্টিকাব্য প্রণেতা শ্রীরামচন্দ্রকে মৃগয়া ব্যবসায়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে এবং কবিকুলশেখর কালিদাসের রঘুবংশে রামচন্দ্রের মৃগয়া প্রসঙ্গও বর্ণিত হয় নাই।

†মৃগশব্দে কেবল হরিণ নহে। পশু মাত্রকেই বুঝাইতে পারে। মেদিনী কোষে লিখিত আছে "মৃগশব্দেঃ কুরঙ্গেচ পশুমাত্রেচ বর্ত্ততে।" অর্থাৎ হরিণার্থে ও পশুমাত্রার্থে মৃগশব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে।" মৃগেন্দ্র বলিলে সকল পশুরই অধীশ্বর সিংহকেই বুঝায়। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় ঋজুপাঠ ১ম ভাগে "তব একেনৈব মৃগেণ তৃপ্তির্ভবতি" এ স্থলে পশুমাত্র এইরূপ অর্থে মৃগশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রবৃত্তি হিংস্র পশুবধার্থ নহে। আশ্রম প্রান্তবাসী নিরীহ হরিণ শিশুর প্রতি অত্যাচার স্পৃহাই ইহার মূলীভূত কারণ। আমরা এ বিষয়ে ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত হরিশ্চন্দ্র নাটকে উৎকৃষ্ট নীতির অনুসরণ দেখিতে পাই। অমৃতবাবু লিখিয়াছেন যে একটী বরাহ বন-প্রান্তে বনচরগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছে এই সংবাদ পাইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগয়ার্থে বহির্গত হয়েন। † লেখক আজ রুচির উৎকর্ষে কালিদাসকেও জয় করিয়াছেন একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যাহা হউক আমরা ত এরূপ মৃগয়া-ব্যবসায়ীকে নিতান্ত তরলপ্রকৃতি বলিয়াই বিবেচনা করি। নাটক-লেখক দুষ্মন্তকে ঐ বর্ণে চিত্রিত করিয়া একটী বিশেষ পঙ্কিল চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিতে হইবে। যদি নায়ককে বনভ্রমণ করানই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে আমাদের আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। তবে ভবভূতি শূদ্রতপস্বীর মস্তকচ্ছেদোপলক্ষে শ্রীরামচন্দ্রকে বনভ্রমণ করাইয়া যে একটী উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন * তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে

---

তাই বলিয়া হিংসামাত্রই পাপজনক নহে। যে হিংসাদ্বারা সমাজের উপকার হইতে পারে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীরামচন্দ্রের রাবণবধ শ্রীকৃষ্ণের কংসবধ প্রভৃতি ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। অত্যাচারীকে দমন করিবার জন্য কৌশল অবলম্বনেও দোষ হয় না। মগধাধিপতি ও বহুসংখ্যক রাজগণের হত্যাকরণোচ্ছুক রাজা জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিশেষ কৌশলই অবলম্বিত হইয়াছিল। এই কারণেই শ্রীরামচন্দ্রের বালিবধ দোষাবহ হইতে পারে না। বালী কনিষ্ঠ সহোদর সুগ্রীবকে দূর করিয়া দিয়া তদীয় সম্পত্তি ও পত্নী অবাধে ও নিঃশঙ্ক চিত্তে উপভোগ করিতেছিল। এ সকল বিষয়ের সুমীমাংসার জন্য আমি পাঠকবর্গকে পূজ্যপাদ স্বর্গগত বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

‡ দুটী কয়েক অনিবার্য্য দোষ সংশোধন করিলে অমৃতবাবুর হরিশ্চন্দ্র নাটক খানি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে পারে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আধুনিক রুচির বৈপরীত্য বশতঃ উহা সাহিত্যসংসারে স্থান পাইবে বলিয়া বোধ হয় না। তবে মহাত্মাগণ নিন্দা বা প্রশংসার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নিজ কর্ত্তব্য পথেই অগ্রসর হইয়া থাকেন।

* বনবাস বর্ণন এদেশীয় উপাখ্যান গুলির একটী প্রধান অবলম্বন;

স্বীকার করি। ইহাতে যে কেবল স্বভাব গম্ভীরতা রক্ষা করা হইয়াছে তাহা নহে, কর্ত্তব্য পরায়ণতারও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

এখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। শকুন্তলা তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী কিনা? তাহা তিনি আড়ি পাতিয়া পরীক্ষা করিতেছেন।

রাজার কথাতেই প্রকাশঃ—

"পৃষ্টা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা
নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগত মাধিহেতুম্। †
দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোঽপ্যনয়া সতৃষ্ণ
মত্রান্তরে শ্রবণ কাতরতাং গতোঽস্মি॥"

"এই বালিকা সমদুঃখ সুখ সখীজন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া নিজের মনঃ ক্লেশের কারণ প্রকাশ করিবে না কি? অবশ্যই করিবে। এক সময়ে শকুন্তলা পুনঃ পুনঃ মুখ ফিরাইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি এ সময়ে ইহার উত্তর শ্রবণ করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছি।"

আমরা জানি, এরূপ আড়ি পাতিয়া প্রেম পরীক্ষা করা পল্লীগ্রামের তরল প্রকৃতি বালকদিগের পক্ষেই শোভা পায়। সসাগরা ধরার একমাত্র অধীশ্বর রাজার পক্ষে ইহা নিতান্ত লজ্জাকর।

তবে তাঁহার অনুকূলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি আধুনিক ভূপতি-বৃন্দের ন্যায় বলপূর্ব্বক শকুন্তলার ধর্ম্মনাশ করেন নাই। এবং তাহার মনোবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ধর্ম্মপত্নী করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন।

ইহার উপরে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। বলপূর্ব্বক রমণীর ধর্ম্মনাশ

---

পর্য্যটীতে পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব অব্যাহত। না হইবেই বা কেন? এমন সুখসেব্য বন ত আর কোনও দেশে ছিল না। জগতের সার বস্তু যে জ্ঞান, তাহা এই বনমধ্যেই ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে নিহিত ছিল।

† আধিশব্দের অর্থই মনোব্যথা। অমরকোষে লিখিত আছে, "পুংস্যাধি-র্মানসী ব্যথা।" মনোগত মনঃক্লেশের কারণ কিরূপ প্রয়োগ? তবে মনোগত শব্দটী ক্লেশ শব্দের বিশেষণ করিয়া কোনও রূপে সমাধান করা

কন্যা পিশাচের বৃত্তি *। তিনি যে এই পৈশাচিক ব্যাপারের অনুসরণ করেন নাই ইহা তাঁহার প্রশংসার কথা নহে। আবার ইহাও বলা যাইতে পারে যে তিনি পৈশাচিক বৃত্তি পরিশূন্য নহেন। এ ব্যাপারটী কেবল অভিশাপ ভয়েই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

তৎকালে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে ব্রহ্মশাপ দিগন্তব্যাপী ভীষণ অনল কুণ্ড অপেক্ষাও অধিকতর তেজস্বী। কালিদাস দুর্ব্বাসার অভিশাপে স্বয়ংই তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এক্ষণে কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইতেছে।

শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কে লিখিত হইয়াছে :—

"বেত্রবতি! মদ্বচনাদার্য্য মমাত্যাপিশুনং ব্রূহি চিরপ্রবোধাৎ † ন সম্ভাবিত মদ্য ধর্ম্মাসন মধ্যাসিতুম্। যৎপ্রত্যবেক্ষিতং পৌরকার্য্যমার্য্যেণ তৎ পত্রমারোপ দীয়তা মিতি।"

---

* ভগবান্ মনু এই বৃত্তিটীকেও বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। তবে ইহাকে পৈশাচিক অধম বিবাহ বলিয়াছেন।

"সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যোহনুপগচ্ছতি।
——— পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ॥"

অশেষ জ্ঞান বিজ্ঞানশালী মনু অধম ও পিশাচ বৃত্তি বলিয়া ইহা হইতে সাধারণকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। আবার ভ্রূণহত্যা ভয়ে ইহাকে বিবাহ বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যদি এতাদৃশ সংসর্গে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে তাহা নহে। ইহাই ইহাকে বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিবার তাৎপর্য্য। এই সংসর্গেই ভারতবর্ষে সঙ্করজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই যে জিতেন্দ্রিয় হইবে, তাহা নিতান্তই অসম্ভব। মানব সমাজ থাকিতে ব্যভিচার যে কখনও নিবৃত্ত হইবে এরূপ আশা করাও বাতুলতা। এ অবস্থায় সঙ্করজাতির পুনঃ প্রবর্ত্তন ভিন্ন ভ্রূণহত্যা পাপে উৎসন্ন প্রায় হিন্দু সমাজের আর মঙ্গল নাই। এ ব্যাপার ইউরোপ সমাজেও বিরল নহে।

† সোজা কথায় বলিলেই হইত যে আমার বিরহ বেদনা বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল সেই জন্য প্রথমবারে ঘুম [illegible] পারি নাই, তাই উঠিতে বেলা

"বেত্রবতি! তুমি আমার কথানুসারে আর্য্য অমাত্য পিশুনকে বলিও যে অদ্য চিরপ্রবোধ বশতঃ (বেলা হইলে উঠিয়াছি বলিয়া) ধর্ম্মাসনে উপবেশন আমার পক্ষে সম্ভাবিত নহে। তিনি পৌরকার্য্য যাহা প্রত্যবেক্ষণ করিবেন তাহা যেন পত্রে লিখিয়া আমার নিকট প্রেরণ করেন।"

এই কি রাজার কথা? যে রাজধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য হিন্দুরাজগণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন, যে প্রজারঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র পূর্ণগর্ভা অগ্নিপরিশুদ্ধ প্রভাবা প্রাণাধিক প্রিয়তমা পত্নীকেও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, সেই রাজা—দেশের আদর্শ পুরুষ সেই রাজা—প্রজাসমষ্টির ভৃত্যস্বরূপ একমাত্র পরহিতব্রতী সেই রাজা—বিরহবেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া সেই অশেষদায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না? †

---

† ভারতের শূদ্ররাজা চন্দ্রগুপ্ত বলিয়াছিলেন;—

"পরার্থানুষ্ঠানে জড়য়তি নৃপং স্বার্থপরতা
পরিত্যক্তস্বার্থো নিয়ত মযথার্থঃ ক্ষিতিপতিঃ।
পরার্থশ্চেৎ স্বার্থাদভিমততরো হন্ত পরবান্
পরায়ত্তঃ প্রীতেঃ কথমিব রসং বেত্তি পুরুষঃ।'

মুদ্রারাক্ষস।

"স্বার্থপরতাই রাজাকে পরার্থানুষ্ঠানে বিজড়িত করে। অর্থাৎ যে রাজা যত পরার্থপর তিনি তত স্বার্থান্বেষী। কারণ পরার্থ ই রাজাদিগের স্বার্থ বলিয়া গণ্য। যে রাজা পরার্থের প্রতি উদাসীন তিনি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এরূপ অবস্থায় যখন পরার্থ ই স্বার্থ অপেক্ষা অধিকতর অভিমত হইল, তখন রাজা নিশ্চয়ই পরাধীন! পরাধীন মানব কি প্রকারে প্রীতিরসসম্ভোগে অধিকারী হইবে?।'

পাঠক! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন এই চন্দ্রগুপ্ত একজন আদর্শ ভূপতি কি না? অশেষ জ্ঞানশালী চাণক্য যাহার মন্ত্রী, সে যদি এরূপ না বলিবে তবে আর কে বলিবে? এই চন্দ্রগুপ্তই একদিন ভুবনবিজয়ী আলেক-জেণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যদি বিদেশীর হস্তে ইতিহাস প্রণয়নের ভার না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় আজ তাহাকে

পাঠক! একবার ভবভূতির রামচরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

তমসার কথায় প্রকাশঃ—

"অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাক প্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥"

"গভীর প্রকৃতিবশতঃ রামচন্দ্রের শোকরাশি বহির প্রকাশিত। কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তলে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। পুটপাক (গোময়াদি প্রলিপ্ত পাত্রমধ্যস্থ দ্রব্যবিশেষ) যেমন ধীরে ধীরে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে থাকে, রামচন্দ্রের আত্মাও সেইরূপ সীতা শোকে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছে।"

পাঠক! বুঝিয়া দেখুন! 'অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছে' বাহিরে কিন্তু কর্ম্মপ্রবণ।

রামচন্দ্র শূদ্রতপস্বীর মস্তকচ্ছেদ উপলক্ষে পঞ্চবটী বনে গিয়া সীতা সহবাস সাক্ষী কাননের চিরপরিচিত ভাবগুলি পরিদর্শন করিয়া শোকাভিভূতচিত্তে বলিতেছেন,—

"হে ভবন্তঃ পৌরজানপদাঃ।
ন কিল ভবতাং স্থানং দেব্যাগৃহেঽভিমতং তত
স্তৃণমিব বনে শূন্যে ত্যক্তা ন বাপ্যনুশোচিতা।
চিরপরিচিতা স্তে তে ভাবাঃ পরিদ্রবয়ন্তি মা
মিদ মশরণৈ রদ্যাপ্যেবং প্রসীদত রুদ্যতে।'

"হে পৌরজানপদগণ! দেবী সীতার গৃহে অবস্থান তোমাদিগের অভিমত হইল না। সেই জন্য তাহাকে তৃণের ন্যায় জনশূন্য অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়াছি; একটী বার অনুশোচনাও করি নাই। কিন্তু আজ সীতাসহবাস সাক্ষী কাননের চিরপরিচিত সুখস্মৃতিগুলি আমাকে দ্রবীভূত করিতেছে! এই সময় তোমরা একবার অনুমতি কর আমি প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লই।'

জনশূন্য অরণ্য বলিয়াই আজ রোদনে প্রবৃত্তি, নগরে কিন্তু তাহা ছিল না। এই রোদনের উপকারিতা ও তমসার কথায় প্রকাশঃ—

"পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।
শোক-ক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে॥

জলাশয়ের জলাধিক্য হইলে পয়ঃপ্রণালীই তাহার প্রতিকারোপায়! আর শোক কিম্বা ক্ষোভদ্বারা হৃদয় উৎপীড়িত হইলে প্রলাপ দ্বারাই তাহার শান্তি

বাস্তবিক আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে শোক উপস্থিত হইলে উচ্চতর রোদন করে, তাহার সত্বরই শোকের শান্তি হইয়া থাকে! আর গম্ভীরতা অবলম্বন করিয়া চুপ করিয়া থাকিলে, তাহার হয় উন্মত্ততা, নতুবা অন্য কোনও মানসিক ব্যাধি উপস্থিত হয়।

অনেকে আবার এরূপ বলিয়া থাকেন যে শ্রীরামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতার সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার পক্ষে এ প্রকার রোদন কখনই সুসঙ্গত হয় নাই। এ কথার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই যে তিনি ভগবান্ বাল্মীকি কর্ত্তৃক কোনও স্থানে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হয়েন নাই. রামায়ণের দুই একটী স্থানে যদি সেরূপ এক আধটী কথা থাকে আমরা তাহার কৈফিয়ত রামায়ণ তত্ত্ব নামক পুস্তকে পরিষ্কাররূপে বিবৃত করিব।

এই রোদন সম্বন্ধে আমাদের আর একটী বক্তব্য আছে। পূজ্যপাদ অশেষ জ্ঞানশালী স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকবর্গ দয়া করিয়া একবার তাহা পাঠ করিবেন। তিনি বলেন যে 'শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হইলেও মানব। তিনি মানবোচিত কার্য্যই করিবেন। অলৌকিক কার্য্য করিলে তাঁহার মানব-দেহ ধারণ অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং মানব শরীরে যাহা সম্ভব তাহাই তিনি করিতে পারেন। রামচন্দ্রও সেই কারণে প্রেমিকের ন্যায় শোকার্ত্ত হৃদয়ে রোদন করিয়াছেন, তবে প্রকৃত মানবের ন্যায় যেখানে সেখানে হা হুতাশ না করিয়া গোপনে নিভৃতে অশ্রুভারের সহিত শোকভার অপনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়া মহাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন।

---

# রঙমহলে প্রেম।

## লেখক—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

### তৃতীয় স্তবক।

### রঙমহল।

তিন জনে পদব্রজে চলিয়াছেন; নানা রকম গলি পথ—কোনটী সরু; কোনটী বা বক্র—অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। নিউকস সকলের অগ্রে

সঙ্গে করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। পথে বহু সংখ্যক প্রহরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ছদ্মবেশী বহুল পুলিস কর্ম্মচারী রাস্তায় একাকী ভ্রমণ করিতেছে। যদি কে নরূপে সন্ধান পাওয়া যায়, এই বিষম হত্যাকাণ্ডের যদি কোন একটা কিনারা হয়, এই উদ্দেশ্যেই ভ্রমণ করিতেছে। সমগ্র কনষ্টাণ্টিনোপল অধিবাসীবৃন্দ ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল। ছদ্মবেশী পুলিস কর্ম্মচারীরা মধ্যে মধ্যে পথিকদিগকে এই বলিয়া, সতর্ক করিয়া দিতেছে, 'সাবধান যুবকগণ, একাকী পথ চলিও না।' ইহাতে এই বুঝায় যেন অনেকে এক সঙ্গে ভ্রমণ না করিলে, আর প্রাণ বাঁচাইবার পথ নাই

যুবকত্রয় ক্রমে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। একখানি ক্ষুদ্র নৌকাও তথায় বাঁধা রহিয়াছে, তদুপরি তিন জন কৃষ্ণকায় মাঝি। এক এক করিয়া, তিন জনই নৌকায় উঠিলেন, মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৈশ গগনে পূর্ণচন্দ্র বিমল কিরণ বিস্তার করিয়া, চতুর্দ্দিক দিবসের ন্যায় আলোকিত করিয়াছেন, রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র বারিধারা প্রবলবেগে পতিত হইয়া, বসফোরস নদীর স্বচ্ছ বারিরাশিকে স্বচ্ছতর করিয়াছেন। উত্তর তীরস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদয় অট্টালিকা নদী বক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া, স্রোতস্বতীর অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। মন্দির বা মসজিদের উত্তুঙ্গ চূড়া, দুর্গ, ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যসমূহের সুক্ষ্ম গম্বুজ বা তীর তরুরাজি সমস্তই যেন একখানি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে তরণী সেই পূর্ব্ব কথিত শাখা প্রশাখাদিত ক্ষুদ্র খালের মধ্যে প্রবেশ করিল। সোপান শ্রেণীতে নৌকা লাগিলে, তিন জনেই অবতরণ করিলেন; উপরে আমিনা—তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

খালিলকে দেখিয়া বৃদ্ধাদূতী কহিল,—"তোমরা আজ তিন জন।"

নিউকস উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আমরা একটী বন্ধুকে লইয়া আসিয়াছি, আসিবার কথাই ছিল, এই পুরস্কার লও, বৃথা বাক্য-ব্যয় করিও না।"

স্বর্ণমুদ্রার শব্দ আমিনার কর্ণগোচর হইল, সে হস্ত প্রসারণ করিয়া, পুরস্কার গ্রহণ করিল এবং নিউকসকে অভিবাদন করিয়া, কৃতজ্ঞতা জানাইল জুলিয়ানও দূতীকে পুরস্কার দিলেন। খালিলও পুরস্কার দানে বঞ্চিত করিলেন না কিন্তু তিনি বৃদ্ধাকে যাহা দিলেন। তাহা তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের প্রদত্ত পুরস্কার অপেক্ষা তিন গুণ অধিক। খালিল হয়ত ভাবিয়াছিলেন, তিনি এই প্রথম বার আসিয়াছেন, তাহার এবার একটু মুক্তহস্ত হইয়া, দূতীকে তুষ্ট রাখা নিতান্ত

করিল। তখন সে—প্রকৃত মনের ভাবই প্রকাশ করুক বা ভাণ করিয়াই সেইরূপ করুক—সে আনন্দে বলিয়া উঠিল,—কি সুন্দর চেহারা, মরি মরি কি সুন্দর চেহারা, যাঁহারা ইহাঁকে আনিয়াছেন, তাঁহাদের উপযুক্ত সঙ্গী বটে!"

দূতী অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। ময়দানে পঁহুছিয়া, বৃদ্ধা একটু ঘুরিয়া চলিল। প্রফুল্ল কুসুমসমূহের সুরভিগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। যুবকত্রয়ের এইরূপ প্রায় সমগ্র উদ্যানটাই ভ্রমণ করা হইল। গুপ্তদ্বারে পঁহুছিয়া, আমিনা পূর্ব্ববৎ দরজা খুলিল। যুবকত্রয়কে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া, আমিনা অতি সাবধানতা সহকারে পুনর্ব্বার দ্বার রুদ্ধ করিল। সেই কার্পেট মোড়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সকলে উপরে উঠিলেন। আমিনা উৎকণ্ঠিতভাবে ইসমিলতার গৃহের দরজার সম্মুখে গেল এবং চটিজুতা আছে কিনা দেখিতে লাগিল। খালিল দূতীর সেই ভাব দেখিয়া, মনে মনে হাসিলেন। পথ আজ পরিষ্কার। কোন বিঘ্নের চিহ্নই দেখা গেল না! মাদুরে আজ চটিজুতা দৃষ্ট হইল না। ইসমিলতার গৃহের বিপরীত দিকের গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, আমিনা একটু সরিয়া দাঁড়াইল। যুবকত্রয় সে ইঙ্গিত বুঝিয়া, অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এই দ্বার উদ্ঘাটনের শব্দ পাইবামাত্র মাঝে ভিতর হইতে আর একটী দ্বার উন্মুক্ত হইল। অনন্তর ভগ্নিদ্বয় তাহাদের স্ব স্ব প্রিয়তমকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য অগ্রসর হইল। খালিল দেখিলেন যে, যুবতীরা সুন্দরী বটে, নিউকস ও জুলিয়ান তাহাদের রূপের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা কিংবা অতিরঞ্জিত নহে। গ্রীকদ্বয়ের সহিত একজন অপরিচিত তৃতীয় যুবাকে দেখিয়া, ভগ্নিদ্বয় প্রথমতঃ থমকাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহাদের প্রিয়তমের খালিলের আগমনের কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিতে না করিতে তাহারা বুঝিল, কি উদ্দেশ্যে তাহাকে আনা হইয়াছে! খালিল প্রকৃত ভদ্রলোকের ন্যায় বিনয় ও নম্রতার সহিত মস্তক অবনত করিয়া, যুবতীদ্বয়ের সম্মান রক্ষা করিল। ভগ্নিদ্বয় খালিলকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। নিউকস তাহার প্রাণাধিকা গুলনেয়ারকে আলিঙ্গন দান করিল, জুলিয়ানও থির্জ্জাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। যুবতীরা কিন্তু অপরিচিত খালিলের সমক্ষে প্রিয়তমদিগকে প্রেমালিঙ্গনে একটু কুণ্ঠিত ও মুগ্ধভাবে গ্রহণ করিল। নিউকস ও গুলনেয়ারের ও জুলিয়ান থির্জ্জার কাণে কাণে কি বলিল। উভয়

পাশের ঘরের দরজা অর্দ্ধেক খোলা ছিল, গুলনিয়ার সেই দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"আমাদের ভগিনী জুলেকা এখানে আসিয়াছে। আমি ঠিক বলিতে পারি, আমরা তাহার জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহা দেখিলে, সে যেমন আনন্দিত হইবে, তেমনি বিস্মিতও হইবে। অনন্তর খালিলকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া, ঐ কক্ষে প্রবেশ করুন এবং আমার ভগ্নিকে আপনার পরিচয় প্রদান করুন; আপনারা তিন জন একেবারে তথায় যাইবেন না। কারণ তিন জন যুবা পুরুষকে একেবারে এই রঙমহলে দেখিলে, প্রাণাধিকা ভগ্নী জুলেকা বড়ই ভয় পাইবে, আর বিস্ময়ের ত কথাই নাই।"

গুলনিয়ারের এই অনুরোধে খলিল একটু উৎসাহিত হইয়া, অসঙ্কোচে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। অপরিচিত যুবাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, জুলেকার মুখ হইতে অস্ফুট চীৎকার বাহির হইয়া পড়িল। ফলতঃ এরূপ বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণও ছিল। সেই সকল গৃহে সে কখন তাহার মাতুল ভিন্ন অন্য পুরুষকে দেখে নাই! জুলেকার চীৎকার শব্দ গৃহান্তরে ভগিদ্বয় ও প্রেমিকদ্বয়ের কর্ণে পঁহুছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আমিনা যুবকদ্বয়কে গৃহে প্রবেশ করাইয়া দিয়াই সে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে সে ভগ্নিদ্বয়ের গৃহে প্রবেশ করে নাই। গুলনেয়ারও পূর্ব্ববারের সেই দরজা বন্ধ করিতে ভুলে নাই।

ভগ্নিদ্বয় ও তাহাদের নাগরেরা সহসা জুলেকার গৃহে প্রবেশ করিলেন না। খালিল অগ্রে গিয়াছেন, তিনি যেরূপ রূপবান, যেরূপ সুরসিক, তাহাতে জুলেকার মন হরণ করিতে যে, তাহার অধিকক্ষণ লাগিবে না। তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন জুলেকাকে যাহা কিছু তাঁহার বলিবার থাকে, তাহা বলিবার সুযোগ দিবার জন্যই—তাহার মত আরো দুই জন পুরুষকে যে জুলেকা এই দণ্ডেই দেখিতে পাইবে। সে কথা পূর্ব্বে জানাইবার জন্য তাহারা খালিলকে অগ্রে পাঠাইয়াছেন। ভগ্নিদ্বয় এখনো নিজ নিজ গুপ্ত প্রণয়ের কথা জুলেকাকে বলিতে সাহস পান নাই ইত্যবসরে প্রণয়াবদ্ধ পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গন আবদ্ধ হইতে লাগিলেন। খালিলের সম্মুখে প্রথম লজ্জাবশতঃ যুবতীরা তাহাদের প্রণয় পাত্রদিগকে ইচ্ছানুরূপ সমাদর করিতে পারেন নাই, এই অবসরে তাহারা সে অভাবটুকু পূরণ করিয়া লইলেন। সকলেরই মুখ আনন্দ উৎফুল্ল। সকলেরই

অবশেষে সকলে জুলেকার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন জুলেকা একখানি সোফায় অর্দ্ধাবনত অবস্থায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে খালিল জানু পাতিয়া উপবিষ্ট। প্রণয়ী বৃদ্ধ বুঝিলেন, খালিল জুলেকার মনস্তুষ্টি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জুলেকার সলজ্জনেত্রে প্রণয়রাগ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, ভগ্নিদ্বয় তাহাও লক্ষ্য করিলেন। সমাগত যুবকদ্বয়কে দেখিয়া, জুলেকার বদনে কুমারী জনসুলভ লজ্জা প্রকাশ পাইল বটে; কিন্তু সে বদনে কোন প্রকার বিস্ময়ের চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। খালিল জুলেকার করধারণ করিয়া, তাহাকে পুনর্ব্বার আশ্বাস ও অভয় প্রদান করিলেন। ক্রমশঃ।

---

# ভারতবাসীর রসায়ন সেবনের আবশ্যকতা।

লেখক—ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি।

দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
প্রভাবর্ণস্বরৌদার্য্যং দেহেন্দ্রিয়বলোদয়ম্।
বাক্‌সিদ্ধিং বৃষতাং কান্তিমবাপ্নোতি রসায়নাৎ।
লাভোপায়ো হি শস্তানাং রসাদীনাং রসায়নম্।

( রসায়নাধ্যায় ১ম হইতে ২য় শ্লোক, অষ্টাঙ্গ হৃদয়। )

রসায়ন দ্বারা দীর্ঘায়ুঃ, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, বয়সের তারুণ্য, প্রভা, বর্ণ, স্বর, উদারতা, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল, বাক্‌সিদ্ধি, বৃষতা ও কান্তি লাভ হয়। রসাদি শুক্রান্ত শ্রেষ্ঠ ধাতু সকল যে উপায় দ্বারা লাভ হয়, তাহার নাম রসায়ন।

আজ কাল আমাদের দেশে চিত্তের বল জগতের সকল জাতি অপেক্ষা অনেকাংশে হীন, একথা বুঝিতে কাহারও বাকি নাই। দেহের বলের সহিত স্মৃতি, মেধা ও বুদ্ধি বর্দ্ধন করিবার অনেক প্রক্রিয়া আছে। তন্মধ্যে রসায়ন সেবনই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এই জন্য যাহাতে সকলে রসায়ন সেবন

করিয়া দেহের ও চিত্তের বল বৃদ্ধি করিতে পারেন, তজ্জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিবার প্রবৃত্তি।

মুনিগণ রসায়ন প্রয়োগের দুই প্রকার নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

(১) কুটীপ্রাবেশিক (বাতাতপবর্জ্জিত) এবং (২) বাতাতপিক। (বাঁধা সালসা ও খোলা সালসা।

রসায়নসেবী যে গৃহে থাকিবেন, সেই গৃহে ধূম, রৌদ্র, ধুলী, সর্প, স্ত্রীলোক ও মূর্খাদি প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রসায়ন সেবন কালে সর্ব্বতোভাবে বীর্য্য ধারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,—

"শুক্রায়ত্তং বলং পুংষাং"

অর্থাৎ দেহে যে পরিমাণে শুক্র থাকিবে, সেই পরিমাণে সেই পুরুষের বল হইবে। পুনশ্চ লেখা আছে,—

"শুক্রধাতু র্ভবেৎ প্রাণঃ"

অর্থাৎ শুক্র ধাতুই প্রাণ। রসায়ন সেবনেচ্ছু ব্যক্তি শুদ্ধাচারী, স্ত্রীসংসর্গ রহিত, ধৃতিযুক্ত, শ্রদ্ধালু, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল এবং দয়া, সত্যব্রত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া, অতি নিদ্রা ও অতি জাগরণ ত্যাগ করিয়া ঔষধের প্রতি অনুরাগী ও মধুরভাষী হইয়া রসায়ন সেবন আরম্ভ করিবেন।

আমাদের দেশীয় লোকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া, আমি কতকগুলি সুলভ ও বিশেষ উপকারী রসায়নের বিষয় উল্লেখ করিব।

শাল্মলী রসায়ন—আমাদের দেশে সকল স্থানেই শাল্মলী (শিমুল) বৃক্ষ পাওয়া যায় সুতরাং ইহার বিশেষ বিবরণের আবশ্যক নাই। ইহার রক্তবর্ণ পুষ্প ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে পুরুষের মেহ এবং স্ত্রীলোকের প্রদর রোগ আশু আরোগ্য হয়। ইহা শৈত্যকারক বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং পুষ্টিকারক। পিত্তজনিত ব্রণরোগ এবং রক্তদুষ্টি রোগে ইহা সেবন করিলে আরোগ্য হয়। ইহার মূলের রস মিছরির সহিত সেবন করিলে মনুষ্য দীর্ঘায়ুঃ হয় এবং স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। মুসলমানদিগের চিকিৎসা গ্রন্থে একটী হাকিম ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"আমি ভারতবর্ষের একটী নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়ি, এমন সময় এক বৃদ্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, আমি এই বৃদ্ধের নিকট একটু জল প্রার্থনা করি। এই বৃদ্ধকে

দেখিতে বিশেষ বলবান বলিয়া বোধ হইল, ইহার সমীপে একটী অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনি এই স্ত্রীলোকটীকে আমার জন্য জল আনিতে পাঠাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। স্ত্রীলোকটী কি আপনার কন্যা? তখন বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, উনি আমার স্ত্রী এবং আমার আরও তিনটী পত্নী আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার বয়ঃক্রম কত? তাহাতে বৃদ্ধ বলিল যে আমার বয়স ১১০ বৎসর আপনার এত বয়সে দেহ এরূপ সুদৃঢ়—কি প্রকারে হইল? একথা জিজ্ঞাসা করাতে বৃদ্ধ বলিলেন, আমার বয়স যখন ৫০ বৎসর তখন আমি জরাজীর্ণ হইয়াছিলাম। এমন কি কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে উঠিতে পারিতাম না। ঘটনাক্রমে একটী ফকির আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অসুখ কি? আমি বলিলাম যে রোগে ও জরাতে আমি শীর্ণকায় হইয়া পড়িয়াছি। ফকির আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া একটী ঔষধ শিখাইয়া দেন এই ঔষধের প্রভাবে আমার দেহ এরূপ হৃষ্টপুষ্ট। সাধু আমাকে এই ঔষধ সেবনকালে অম্লদ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি এখনও অম্লদ্রব্য খাই না। আমার পুত্রের বয়স ৮০ বৎসর ইনিও ফকিরের ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন কিরূপ বলিষ্ঠ রহিয়াছেন। আমি বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বৃদ্ধের নিকট এই ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী যেরূপ শিখিয়াছি, সেইরূপ জনসাধারণে প্রকাশ করিলাম। বৃহৎ শিমুল গাছের শ্বেতবর্ণ মুলের কোমলাংশ গ্রহণ করিবে, উহা ছায়ায় শুকাইয়া চূর্ণ করিবে, পরে সেই চূর্ণ ছাঁকিয়া লইবে। চিনির সহিত এই চূর্ণ পাক করিয়া হালুয়া প্রস্তুত করিবে। এই হালুয়া অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা নিত্য সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে অম্ল একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। কটু অম্ল লবণ, ক্ষার ( চুণ প্রভৃতি ) অধিক মাত্রায় সেবন করিলে কোন রসায়নই ফলপ্রদ হয় না। বৃদ্ধের আদেশে পুত্রটী আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনে তিনি পিতার সমস্ত কথাই সমর্থন করিলেন, এবং বলিলেন, যে আমি এই ঔষধ দুই বৎসরকাল ব্যবহার করিতেছি, দেখুন আমার দেহ কিরূপ বলিষ্ঠ। আমি বৃদ্ধের ছেলেটীর মস্তকে একগাছিও পক্ককেশ দেখি নাই।

মহামতি বাগভট তাঁহার রসরত্ন সমুচ্চয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শিমুল মুলের রস, কদলী মুলের রস, কেশুরের রস ও অশ্বগন্ধা রসের সহিত মকরধ্বজ,

চূর্ণ সেবন এবং অঙ্গে মর্দ্দন করিলে ধাতুক্ষয়জনিত ব্যাধি হইতেই পারে না। ঔষধ ব্যবহার করিয়া ঔষধের ফলাফল বুঝা উচিত।

জ্যোতিষ্মতী রসায়ন—বঙ্গদেশে জ্যোতিষ্মতী শব্দে লতাফটকী নামক লতা বুঝায়; পশ্চিমে জ্যোতিষ্মতী শব্দে মালকাঙ্গনী নামক একপ্রকার তৈলাক্ত ফলের বীজ ব্যবহার হয়। আমি অনেক অনুসন্ধানে সাধুদের নিকট অবগত হইয়াছি যে সরস্বতীকল্পে যে জ্যোতিষ্মতী তৈল ব্যবহার হয়, তাহা মালকাঙ্গনী তৈল লতাফটকী তৈল নহে। পরে আমি আয়ুর্ব্বেদীয় প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে মালকঙ্গানী তৈলকেই জ্যোতিষ্মতী তৈল স্থির করিয়াছি। মুসলমানেরা মালকাঙ্গনী তৈল স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি ও পুরুষত্ব বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করেন। ইহার বীজ হইতেও অনেক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। ধন্বন্তরীর নিঘণ্টুতে জ্যোতিষ্মতী সম্বন্ধে লেখা আছে,—

কটভী তিক্তভীক্ষোষ্ণা কফজিচ্চ বিরেচনী।
মেধাকরী বর্ণকরী ব্রণ্যা জ্বরবিনাশিনী॥
জ্যোতিষ্মতী কটুস্তিক্তা সরা কফসমীরজিৎ।
অত্যুষ্ণা বমনী তীক্ষ্ণা বহ্নিবুদ্ধিস্মৃতিপ্রদা।

রাজনিঘণ্টুতে লেখা আছে,—

জ্যোতিষ্মতী স্বর্ণলতা, নলপ্রভা
জ্যোতির্লতা সা কটভী সুপিঙ্গলা।
দীপ্তাচ মেধ্যা মতিদাচ দুর্জ্জরা
সরস্বতীস্যাদ মৃতার্ক সংখ্যয়া।
জ্যোতিষ্মতী তিক্তরসা চ রুক্ষা কিঞ্চিৎ কটুর্বাতকফাপহাচ।
দাহপ্রদা দীপন কৃচ্চ মেধ্যা প্রজ্ঞা চ পুষ্যাতি তথা দ্বিতীয়া।

জ্যোতিষ্মতী তৈলসম্বন্ধে লেখা আছে,—

কটু জ্যোতিষ্মতী তৈলং তিক্তোষ্ণং বাতনাশনং।
পিত্তসংতাপনং মেধা প্রজ্ঞা বুদ্ধি বিবর্দ্ধনং॥

মহামতি বাগ্‌ভট্ট রসরত্নসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে জরারোগ চিকিৎসা নিরূপণ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—

জ্যোতিষ্মতী নামলতা পীতা পীতফলোজ্জলা।
আষাঢ়ে পূর্ব্বপক্ষেস্তাৎ গৃহীত্বাবীজমুত্তমং॥

এই প্রমাণেও জ্যোতিষ্মতী জরারোগ নিবারণের জন্য ব্যবহার করিতে উপদেশ আছে।

পুনশ্চ ঐ অধ্যায়ে লেখা আছে,—

জ্যোতিষ্মত্যাস্তৈলমাজ্যং সগব্যং
শুশ্রাবৃদ্ধ্যাসেবয়েৎ মাসমাত্রং।
যাবচ্চন্দ্রাৎ যস্তু স প্রাপ্তমূর্ত্তি-
মেধাযুক্তো দিব্যদৃষ্টি র্নিযম্মা॥

এই প্রমাণে জানা গেল যে এই তৈলে মেধা বৃদ্ধি হয়, এমন কি দিব্য দৃষ্টিও হয়। মালকাঙ্গনী Celustraceæ জাতীয় Celostpus Paniculotus নামক লতার বীজ। মুসলমানেরা ইহার তৈল বাতে, বেরিবেরি ( beriberi ) রোগে ও পক্ষাঘাতে ব্যবহার করেন! ইহাতে ঘর্ম্ম হয় এবং ইহা বিশেষ বলকারক। সাধুদিগের মধ্যে সরস্বতী কল্প নামক একটি অতি আশ্চর্য্য রসায়ন ব্যবহৃত হয়। এই কল্পে এই ঔষধ এবং অন্যান্য এইরূপ বীর্য্যবান্ ঔষধ লাগে। আমাদের দেশে চিত্তের বল যেরূপ অল্প তাহাতে এই কল্প সকলেরই ব্যবহার করা উচিত। বাল্যাবস্থায় এই কল্প সেবন করাইলে স্মৃতি, মেধা ও বুদ্ধি বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। যুবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ব্যবহার করিলে অতি আশ্চর্য্য ফল পাইতে পারেন। লবণ ও অম্ল যত কম ব্যবহার হইবে ততই ইহার উপকার অনুভূত হইবে। যিনি স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি ও আয়ুঃবর্দ্ধন করিতে ইচ্ছা করেন তিনি নিয়ম করিয়া এই রসায়ন ৪০ দিন ব্যবহার করিয়া দেখুন। শত শত স্বদেশী বিষয়ক বক্তৃতা শুনিলে যাহা না হইবে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এ রসায়ন সেবন করিলে ভারতের বিশেষ উপকারী সন্তান হইতে পারিবেন। দরিদ্র ব্যক্তি যদি নিয়ম পালন করিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে ইচ্ছুক হন, আমি বিনামূল্যে এই ঔষধ দিতে স্বীকার করিতেছি। চিত্তে বল না হইলে আমাদের দ্বারা কিছুই শুভকার্য্য হইবে না। বাল্যাবস্থা হইতে মনের বল যাহাতে বাড়ে এইরূপ সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

( ৩ ) এক বৎসর কাল ঋতু হরিতকী সেবন করিতে বিশেষ কিছুই অর্থ ব্যয় হয় না কিন্তু কয় জন লোক ইহা ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইয়াছেন ?

( ৪ ) ত্রিফলা অতি সুলভ বস্তু ইহা নিয়ম করিয়া ব্যবহার করিয়া কয় জন

এইরূপ অতি সুলভ অনেক রসায়ন আছে। মন্দভাগ্য লোকেরা ইহাদের ত্যাগ করিয়া "সোমলতা," "মেদা," "মহামেদা" প্রভৃতি পাওয়া গেল না বলিয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট।

ভগবান্ উত্তর গীতায় বলিয়াছেন—

"দেহে নষ্টে কুতো বুদ্ধির্বুদ্ধিনাশে কুতোজ্ঞতা।"

দেহ নষ্ট হইলে বুদ্ধিই বা কোথায় থাকিবে এবং বুদ্ধি না থাকিলে জ্ঞান কিরূপে হইবে।

মহামতি বাগ্ভট্ট রসরত্নসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

নহি দেহেন কথঞ্চিদ্ জরামরণ দুঃখ বিধুরেণ।
ক্ষণভঙ্গুরেণ সূক্ষ্মং তদ্‌ব্রহ্মোপাসিতুশক্যং॥
নামাপি দেহসিদ্ধেঃ কোগৃহ্ণীয়াৎ বিনা শরীরেণ।
যদ্‌যোগগম্যমমলং মনসোহপি ন গোচরং তত্ত্বম্॥

জরাজীর্ণ দেহ দ্বারা সেই ব্রহ্মোপাসনা কিছুতেই হইতে পারে না। শরীর না থাকিলে দেহসিদ্ধির কথা কে গ্রহণ করিবে।

আয়তনং বিদ্যানাং মূলং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং।
শ্রেয়ঃ পরং কিমন্যচ্ছরীরং মজরামরং বিহায়ৈকং॥

সুস্থ দেহই সমস্ত বিদ্যার আয়তন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল। অজর অমর শরীর ভিন্ন আবার অন্য কি শ্রেয়ঃ আছে।

যজ্জরয়া জর্জ্জরিতং কাসশ্বাসাদি দুঃখবিবশং চ।
যোগ্যং তন্ন সমাধৌ প্রতিহতবুদ্ধীন্দ্রিয়প্রসরং॥

যে দেহ জরাতে জর্জ্জরিত কাস শ্বাসাদি দ্বারা বিবর্ণ সে দেহ সমাধির উপযুক্ত নহে, কারণ সে দেহে বুদ্ধীন্দ্রিয় প্রসর প্রতিহত।

অস্মিন্নেব শরীরে যেষাং পরমাত্মনো ন সংবেদঃ।
দেহত্যাদূর্দ্ধং তেষাং তদ্‌ব্রহ্ম দূরতরং॥

এই দেহতেই যাহাদের পরমাত্মজ্ঞান না হইল দেহত্যাগের পর তাহাদের পক্ষে ব্রহ্ম অনেক দূরতর।

আমি বিচার করিয়া স্থির করিয়াছি যে, সুস্থ দেহে, স্মৃতি, বুদ্ধি ও চিত্তের বল না বৃদ্ধি হইলে, আমাদের চিরকালই পদদলিত হইয়া থাকিতে হইবে। আমার পরামর্শ এই যে সকলেই নিয়ম করিয়া সুলভ রসায়ন সেবন করিয়া বলবান হইতে যত্ন হইবার চেষ্টা করুন।

রসায়ন সেবন সম্বন্ধে অনেকের মনে হয় যে রসায়ন ব্যবহার করিয়া ইন্দ্রিয় সকল প্রবল হইলে আমরা কুপথগামী হইয়া যাইব।

ইহা নিতান্ত ভুল; রসায়ন সেবনে ইন্দ্রিয় প্রাবল্যের সহিত মনের বল বৃদ্ধি হয় বলিয়া মন কুপথগামী হয় না।

মনের বলেই ইন্দ্রিয় সংযম করা যায়। যাহাদের ধাতুক্ষয় হইয়া গিয়াছে তাহাদেরই মন দুর্ব্বল। বীর্য্যবর্দ্ধক ঔষধ বলিষ্ঠেরই ব্যবহার করা উচিত। নপুংসক বা বীর্য্যহীন লোকের চিত্তে বলই হইতে পারে না। আপনার নিজস্ব ক্ষয় করিয়া ছাগলের অণ্ডকোষ, কুম্ভীরের শুক্র, পক্ষীর ডিম্ব প্রভৃতি খাইবার আবশ্যক কি? অনেকে অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কেহ ঋষিদের রসায়ন প্রয়োগের কথা সত্য কি মিথ্যা, পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন? আমরা না প্রসব করিয়া "কানাইয়ের মা" হইতে ভালবাসি!

---

# দৈনিকে রমণী।

লেখক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

## ( সম্পাদিকা অভিনেত্রী। )

মাসিকে ত কথাই নাই—সাপ্তাহিকেও রমণীর সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের এদেশেও রমণীর মাসিক প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছে। যদি রমণীর দৈনিক দেখিতে চাও তবে ফরাসিরাজ্যে যাও, যদি রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীকে সংবাদ-পত্রের সম্পাদিকারূপ দেখিতে চাও, তবে ফরাসির প্যারীস সহরে গিয়া লা ফ্রান্সে পত্রের আপিশে অবতীর্ণ হও, দেখিবে,—

মেদাম মাদম ডুরান্দ লা-ফ্রান্সে পত্রের সম্পাদন করিতেছেন; ইনি পূর্ব্বে রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতেন, প্রথমে "কমেডি ফ্রাসে" নামক বিখ্যাত

তেমনই মলীয়ার রঙ্গকার্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু নাট্য রচনায় মলীয়ার ফরাসীর গ্যারিক নহেন—ফরাসীর তিনি সেক্সপীয়র। মলীয়ারের নাটকই ফরাসীর শ্রেষ্ঠনাটক। সেই মলীয়ারের নাম এখনও থিয়েটারে বিরাজ করিতেছে, প্যারীসে মলীয়ার—থিয়েটারেই মলীয়ার অমর হইয়া রহিয়াছেন।

বিবাহের পর মাদম-ডুরান্দ থিয়েটার ছাড়িয়া সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন; ফরাসীর 'ফি গারো' পত্র তাহার নানাবিধ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে পরিশোভিত হয়। সে শেষে ১৮৯৭ অব্দের ৯ই ডিসেম্বর মাদম-ডুরান্দ নিজেই "লা-ফ্রান্দে" পত্র বাহির করিয়াছেন।

লা-ফ্রান্দে দৈনিক। মাদম-ডুরান্দ সম্পাদিকা। মাদম কোনীয়া সহ-কারিণী! বিখ্যাত লেখিকা মাদম দদেত লা-ফ্রান্দের জন্য প্রবন্ধ লেখেন। জগদ্বিখ্যাতা সঙ্গীত সরস্বতী অভিনেত্রী সারাবার্ণার্ড "লা-ফ্রান্দে" পত্রে প্রবন্ধ লেখেন, মদাম নোবে, রোসালিন্দ রোসেল, আগষ্টা হোম, এবং মাদাম রোয়েৎ লা-ফ্রান্দে পত্রের সম্পাদনে সাহায্য করিয়া থাকেন। সম্পাদিকা ডুরান্দের সাহায্য করেন, ৩০টী বিদুষী। এ পত্রে পুরুষের সম্বন্ধ নাই।

সম্পাদনে পুরুষের সম্বন্ধ নাই—পরিচালনেও পুরুষের সম্বন্ধ নাই। সম্পাদন প্রকোষ্ঠে রমণীর একাধিপত্য—আপিশে রমণীর একাধিপত্য, কম্পোজ ঘরেও রমণীর একাধিপত্য—আপিশে পরিচারক নাই—সবই পরিচারিকা—পিয়ন নাই, কেবল পিয়নী—দ্বারবান্ নাই—দ্বারবতী! আর্দ্দালী নাই, আর্দ্দালিনী!

কাগজের লেখা, কম্পোজ, ছাপা, বিলি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই কোমল কামিনী হস্তে সম্পন্ন হইতেছে। কার্য্য অতি কমনীয়রূপেই নির্ব্বাহিত হইতেছে। সম্পাদন প্রকোষ্ঠ যেন অমরাবতীর শচী-প্রকোষ্ঠ। আপিশ গৃহ দেখিলে, মুনিকেও মুগ্ধ হইতে হয়। যে বাড়ীতে লা-ফ্রান্দে পত্রের কার্য্য হয়, সে বাড়ীর মত সুন্দর সুগঠিত সুসজ্জিত সুদৃশ্য বাড়ী প্যারী সহরে আর আছে কি না সন্দেহ। ভাল ভাল টেবিল, চেয়ার, সোফা, কউচ পর্য্যঙ্কাদি প্রকোষ্ঠের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সুন্দর সুরঞ্জিত ভিত্তি গাত্রে সুন্দর সুন্দর চিত্র শোভা পাইতেছে। সম্পাদন প্রকোষ্ঠে, আপিশ গৃহে কম্পোজের কামরায়—সর্ব্বত্রই কামিনীকুল কুলকুল করিতেছে। পোষাক পরিচ্ছদও সকলেরই অতি মনোহর; গুণে সকলেই সরস্বতী, রূপে—অনেকেই রতি; সম্পাদিকা মাদম ডুরান্দ সকল

প্রকোষ্ঠে বসিয়া সম্পাদিকার সাহায্য করিতেছেন, আপিশে বসিয়া যাঁহারা আয় ব্যয়াদির উপর দৃষ্টি রাখিতেছেন, কম্পোজ গৃহে বসিয়া যাঁহারা সংবাদ পত্র প্রস্তুত করিতেছেন, প্রেস ঘরে যাঁহারা মুদ্রণ-কার্য্যে সাহার্য্য করিতেছেন, সকলেই কামিনী—অনেকেই কমনীয়া। মাদম দুরান্দের দৃষ্টি সকলের উপর। পরিচারিকা প্রভৃতির প্রতিও ঔদাসীন্য নাই। কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

আপিশে পুস্তকালয় আছে,—মজলিস ঘর আছে,—নাচ ঘর আছে,—বৈঠকখানা আছে,—কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমোদ চলে—মধ্যে মধ্যে মাইফেল হয়—নাচ গান হয়—সভাসমিতি হয়—বক্তৃতা হয়।

কাগজের গ্রাহক অনেক, কমনীয় কামিনী পত্রের গ্রাহক অনেক,—গ্রাহিকা কম। লা-ফ্রান্দে পড়িবার জন্য পুরুষই লালায়িত। কামিনীকরস্থ এরূপ পত্র এরূপ দৈনিক জগতে দুর্লভ। সত্যই পত্রখানি জগদ্দুর্লভ। অভিনেত্রীর সম্পাদিত বলিয়া লা-ফ্রান্দ এত উৎকৃষ্ট!

---

# বুদ্ধি তিন প্রকার।

## লেখক—শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

তেঁতুল খাইলে জিহ্বা হইতে জল বাহির হয়। এই জন্য তেঁতুল লালা নিস্বারক ঔষধ। তেঁতুলের নাম করিলেও জিহ্বা দিয়া জল পড়ে; কেন ইহা হয়? কারণ তেঁতুলকে পূর্ব্বে জানিয়াছি অথবা তেঁতুলের নিরাকার ভাব যেন জিহ্বায় আসিয়া লাগিল, তাই জল পড়িল। এক খানা পাৎলা কাগজে "ফু" দিলে কাগজখানা শব্দ হয়। এই শব্দটা শুনিতে পাওয়া গেল, কিন্তু "ফু"র বাতাস দেখা গেল না। সেইরূপ "তেঁতুলের নাম করাতে" জিহ্বার স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া জল পড়িল, কিন্তু এক্ষেত্রে "তেঁতুলকে" দেখা গেল না। তবেই জানা গেল যে, স্নায়ু জগতের দ্রব্য ব্যবহার করিয়া যে কার্য্য করে, এবং উহার অব্যবহার অর্থাৎ জিনিসের সঙ্গে খোঁজ নাই—কেবল নাম বা শব্দ লইয়াও খেলা করিতে পারে।

স্নায়ু কেবল শব্দ লইয়া যে খেলা করে, তাহাই হইল মানসিক অংশ বা মনের কর্ম্ম। এই মানসিক কর্ম্মের অপর নাম বুদ্ধি। পরন্তু স্নায়ু যখন জগতের

যখন জড়-জগতের যে কোন দ্রব্য যে অঙ্গ দ্বারা ব্যবহার করে, সেই সকল অঙ্গকে ইন্দ্রিয় বলে। যাহা হউক স্নায়ু "দ্রব্য লইয়া" খেলা করা হইল, "সাকার কার্য্য" এবং দ্রব্যের ভাব লইয়া খেলা করা হইল, "নিরাকার কার্য্য।"

সাকার এবং নিরাকার কার্য্য কি বোধ হয় বুঝিয়াছ! যেমন আমার হস্ত দিয়া তোমার কাণটি মলিয়া দিলাম, ইহা হইল সাকার কার্য্য। নচেৎ আমরা তোমার কাণ মলিলাম না, মুখে বলিলাম, "কাণ মলিয়া দিব।" ইহা হইল নিরাকার কার্য্য। বস্তুতঃ তোমার কাণ মলিয়া দিলেও যেমন তোমার অপমান বা অভিমান হয়, এবং উহা না দিয়া মুখে বলিলেও তোমার ঐরূপ অপমান বা অভিমান বোধ হইয়া থাকে। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি তেঁতুল খাইলেও জিহ্বা দিয়া জল পড়ে, এবং না খাইয়া উহার নাম করিলেও জিহ্বা দিয়া জল পড়ে। জগতের সমুদয় দ্রব্যই বাষ্প, তরল এবং কঠিন এই তিনাবস্থা প্রাপ্ত। কিন্তু উক্ত তিনাবস্থার উপলব্ধি এক। জিনিষের বাষ্পাবস্থা নিরাকার এবং তরল ও কঠিনাবস্থা সাকার।

পুষ্পে যে তৈল থাকে, সেই তৈলই পুষ্পের সৌগন্ধ বা আতর। কিন্তু ঐ তৈল এত সূক্ষ্ম যে আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না। বায়ুতে যখন ঐ তৈল কণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া, উড়িতে আরম্ভ করে, তখন সেই স্থানের বায়ু তৈলমাখা হইয়া যায়, এই জন্যই ঘরে একটী সুগন্ধি পুষ্প রাখিলে ঘরটি উহার গন্ধে আমোদিত হয়। যাহা হউক যখন যখন পুষ্প তৈল সংগ্রহের জন্য উহাকে বকযন্ত্রে ফেলিয়া চোলাই করা হয়, তখন ঐ তৈল কণা সাকারমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়,— তাহাকে বলে আতর।

বুদ্ধি কি? স্নায়ুর পাত্রে যখন যে শব্দ "বাহির" হইতে যায়, তখন উহা উপলব্ধি করার নামই বুদ্ধি। শব্দ ব্রহ্ম। এই শব্দকে সীমাবদ্ধ অঙ্গের মধ্যে রাখিয়া কার্য্য করাকেই বুদ্ধি বলে।

বুদ্ধি তিন প্রকার। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বুদ্ধি। ভূত বুদ্ধিকে "স্মৃতি' কহে; ভবিষ্যৎ বুদ্ধিকে "পরিণাম চিন্তা" কহে; এবং বর্ত্তমান বুদ্ধিকে "কার্য্য" বলা হয়। পরন্তু বর্ত্তমান বুদ্ধিকে স্থির বুদ্ধি বা নিঃশঙ্কচিত্ত অথবা উপস্থিত জবাব ইত্যাদি বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বুদ্ধি কার্য্যে জন্মদাতা পিতা, ভূতবুদ্ধি কার্য্যের শরীর; এবং ভবিষ্যৎ বুদ্ধি কার্য্যের গর্ভ। বুদ্ধির এক অংশের নাম ইচ্ছা এবং কার্য্যের অপর নাম ক্রিয়া।

এঞ্জিন সক্রিয় হয় অর্থাৎ চলে। সেইরূপ আমাদের ইচ্ছা শব্দ দ্বারা নড়িয়া উঠে। তৎপরে বুদ্ধির চাকাখানি ঘুরিয়া পড়ে। তাহার পর সঙ্গে সঙ্গে কত বৃত্তি প্রবৃত্তির চাকা ঘুরিতে থাকে,—তাহার পর দেখ এক দিক দিয়া ময়দা, এক দিক দিয়া ভূষি, এক দিক দিয়া আটা-ময়দা এবং ইহার সঙ্গে তৈলের কল প্রভৃতিও চলিতেছে। আমাদের অবস্থাও সেইরূপ দেখিবে, এক দিক দিয়া শব্দ যাইতেছে, এক দিক দিয়া উষ্ম বাহির হইতেছে, একদিক দিয়া গন্ধ যাইতেছে, এক দিক দিয়া আলোক যাইতেছে। এক দিক দিয়া বায়ু যাইতেছে এক দিক দিয়া উষ্ম বাহির হইতেছে পরন্তু এই যন্ত্রের যে কার্য্য হইতেছে তাহাই "মনুষ্যত্ব।"

তবে, ভাল মন্দ মানুষ হয় কেন ?

অমুক কলের ময়দা অপেক্ষা অমুক কলের ময়দা যে কারণ বশতঃ ভাল মন্দ হয়। মানুষও সেই কারণ বশতঃ ভাল মন্দ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ বৃত্তি প্রবৃত্তির চাকাগুলির তারতম্য থাকে। নানাবিধ খেলার নানাবিধ নিয়ম। প্রত্যেক খেলার নিয়মে চলিলে, তবে খেলা ঠিক হয়। নচেৎ সে খেলা ঠিক নয়। খেলার নিয়ম মতে যে মানুষ বৃত্তি প্রবৃত্তির চাকা ঠিক করে, সেই হইল খেলুড়েদের নিকট ভাল, নচেৎ মন্দ। এই ভাল মন্দের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত "মনুষ্যত্ব" আটকাইয়া থাকে না।

এখন কথা হইতেছে, জীবনের কার্য্যই যদি মনুষত্ব হয়, তবে ইতর প্রাণীদিগেরও প্রাণ আছে, কিন্তু তাহারা প্রাণত্ব দেখাইতে পারে না কেন? তাহার কারণ আছে। ইতর প্রাণীর ভূত এবং ভবিষ্যৎ বুদ্ধি নাই। উহাদের কলের কতকগুলি চাকা কম! ঘড়ির কলও চলে, এবং ময়দার কলও চলে। তাহা বলিয়া ঘড়ির কলের দ্বারা ময়দা হয় না।

পশুদের ভূত ভবিষ্যৎ বুদ্ধি নাই, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ উহা ধরা যায়। যেমন কোন শস্যক্ষেত্রে প্রত্যহ একটা পশু শস্য আহার করিয়া আইসে। উহাদের এ বুদ্ধি আছে যে, অমুক স্থানে ক্ষেত্র এবং তথায় খাবার পাওয়া যায়, ইহা বুঝিতে পারে, তাই তথায় যায়। কিন্তু এটা বুঝে না যে, ইহা দ্বারা আমি অমুকের ক্ষতি করিতেছি। সে আমাকে ধরিবে বা মারিবে। ওদিকে প্রত্যহ শস্য ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করে বলিয়া ক্ষেত্র স্বামী উক্ত পশুকে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিল। পশুর পরিণাম বুদ্ধি থাকিলে, সে ফাঁদে পড়িত না। কাজেই উপস্থিত বুদ্ধি লইয়া যেমত তথায় যাওয়া, অমনি ফাঁদে পড়িয়া গেল। পশু ধরা দিল।

# স্বর্গীয় নলিনবিহারী সরকার।



## পরলোকে।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "কারতারক" কোম্পানীর অন্যতম অংশী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব শেরিফ, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ও পোর্ট কমিশনারের অন্যতম কমিশনার নলিনবিহারী সরকার আর ইহলোকে নাই। প্রায় বৎসরাবধি পীড়াভোগ করিয়া গত ২৪শে আশ্বিন ইংরাজী ১০ই অক্টোবর বুধবার প্রাতঃকালে বেলা: নয়টার সময় নলিনবিহারী সরকার মহাশয় বৃদ্ধাজননী, রুগ্ন অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার এবং আত্মীয়-পরিজনবর্গকে শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া যোগ্য-ধামে গমন করিয়াছেন।

নলিনবিহারী বাবু সুবিখ্যাত "কারতারক" কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় তারকচন্দ্র সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয়পুত্র। নলিনীবিহারী বাবু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জেলী ২৪পরগণা-নৈহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ২৪পরগণা-নৈহাটি গ্রামে বিদ্যা-শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে হেয়ার স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান ইংলিশম্যান সম্পাদক সার রোপার লেথব্রিজ সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। অসম্ভ সাধারণ প্রতিভার

জন্য নলিনবিহারী বাবু সার রোপারের (তখন মিঃ লেথব্রিজ) অত্যন্ত স্নেহ-ভাজন হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নলিনবিহারী বাবুর পিতার পরম বন্ধু ছিলেন। সেই জন্য কেশববাবু নলিনবিহারী বাবুর চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের পাঠশেষ হইবার পূর্ব্বেই নলিনবিহারী বাবু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া পিতার কার্য্যালয়ে সহকারীরূপে প্রবেশ করেন এবং অবশেষে "কারতারক" কোম্পানির অন্যতম স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। কলিকাতার ইংরাজ বণিক সমাজও নলিনবিহারী বাবুর গুণগ্রাম দর্শনে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি "চেম্বার অফ কমার্স বা" বণিক সভার প্রতিনিধিরূপে একাধিকবার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ও পোর্ট ট্রষ্ট সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতার ধনবান ও শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতায় "ইণ্ডিয়া ক্লব" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সভা স্থাপনে নলিনবিহারী বাবু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সভায় অবৈতনিক সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হইয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে নলিনবিহারী বাবু কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল সভায় কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই সৎসাহস স্পষ্টবাদিতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা গুণে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তিনি করদাতৃগণের প্রকৃতবন্ধু ছিলেন। শ্বেতাঙ্গের মনস্তুষ্টি অপেক্ষা স্বদেশবাসীকে অন্যায় অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করাই তিনি কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তিনি মিউনিসিপ্যাল সভায় এত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার আলেকজণ্ডার মেকেঞ্জির মিউ-নিসিপ্যাল বিল পাস হইলে নলিনবিহারী বাবু এবং আরও ২৭ জন স্বাধীনচিত্ত কমিশনার কর্পোরেশনের সদস্য পদ পরিত্যাগ করেন। সার আলেকজণ্ডার নলিনবিহারী বাবুর পদত্যাগের সংবাদ পাইয়া বলিয়াছিলেন যে "নলিনবিহারী বাবু পদত্যাগ করিবেন জানিলে তিনি কখনও নূতন বিল বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন না।" নলিনবিহারী বাবু পদত্যাগ করিলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে "বিল্ডিং

কমিশনের" অন্যতম সদস্য পদে মনোনীত করেন এবং সি, আই, ই, উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। ঐ সময় তিনি কালিকাতার সেরিফ হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি "কৈসর-ই-হিন্দ" পদকও লাভ করিয়াছিলেন।

নলিনবিহারী জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন। কলিকাতায় যতবার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছে, ততবারই তিনি প্রাণপণে জাতীয় মহাসমিতিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি নীরবে, বিনা আড়ম্বরে কার্য্য করিতে বড় ভাল বাসিতেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি মিউনিসিপ্যালিটি হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই নলিনবিহারী বাবুর কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান হইল, ইহা আমাদের দেশের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। আমরা আর কি বলিব, তাঁহার অগ্রজ বিপিন বাবু এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এই দারুণ শোকে শান্তিলাভ করুন ইহাই আমাদের ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

নলিনবিহারী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ সরকার এবং নলিনবিহারী বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় পুলিনবিহারী সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র সরকার বি, এ, এক্ষণে উত্তরাধিকারী হইয়া পিতৃ পিতামহের স্থাপিত "কারতারক" কোম্পানির কীর্ত্তি বজায় রাখিবার ভার স্ব স্ব মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, জগদম্বার কৃপায় ইহাঁরা উভয়ে সুস্থ শরীরে পিতৃপিতামহের আদর্শে স্বধর্ম্মে মতি রাখিয়া স্বজাতির ও ধর্ম্মের উন্নতিসাধনে পূর্ণমনোরথ হউন ইহাই আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

# অন্তিম-বিদায়।

"Go where gternal peace qrevails."

লেখক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ।

সাঙ্গ করি' ধরা-কার্য্য, হে প্রবাসি নর!
চলি'ছ আনন্দে আজি—নিজ-নিকেতনে।
এসেছিলে এতকাল এ বিশ্ব-প্রবাসে,
যে কার্য্য সাধিতে, তাহা সাঙ্গ এতদিনে।
কিন্তু, কেন ঝরে অশ্রু অপাঙ্গ-যুগলে?
'নিজস্ব' বলিয়া কিবা আছে এ সংসারে!!
প্রাণাধিক পত্নী পুত্র ভ্রাতা মিত্র সবে
আপনার বস্তু বলি' যত্নে যাহাদের
করিতে অশেষ সেবা—দিবা বিভাবরী,
নহে তা'রা কেহ তব—এ নশ্বর ভবে।
পথিকে পথিকে মাত্র পথে পরিচয়;
ভিন্ন গতি সবাকার—কর্ম্ম-অনুযায়ী।
খেলে বহু বিহঙ্গম সুরম্য আরামে
পলায়ন করে ক্রমে দুই এক করি'
না হেরে পশ্চাতে পুনঃ কেহ একবার;
সেইরূপ কেহ কা'র নহে মহী-মাঝে।
অলীক কল্পনা, বিশ্বে সম্বন্ধ-স্থাপন;
মায়ার প্রপঞ্চ মাত্র পঞ্চভূত-ধরা।
শোক দুঃখ সুখ শান্তি স্বপ্নবৎ লেখা'—
অসত্যে সত্যের সত্তা কভু না সম্ভবে।
বিধির বিধানে—বিশ্ব-কার্য্য-সমাপনে
যায় জীব শান্তি-ধামে, মৃত্যু মুখ দিয়া।
হে প্রবাসি! হাস্যাননে হও অগ্রসর,
ভুঞ্জিতে অনন্ত শান্তি নিজ-নিকেতনে।

# অসময়ে কুহুধ্বনি।

লেখিকা—শ্রীমতী মৃণ্ময়ী দেবী।

নীরব হয়েছে বীণা, থামিয়া গিয়াছে গান,
তার মাঝে কেন আর তুলিস্‌রে ভাঙা তান?
বরষা গিয়াছে থেমে, চ'লে গেছে মেঘদল;
শরত গিয়াছে চ'লে, রেখে ম্লান আঁখি জল।
কুয়াসা ভরিয়া গেছে, জোছনা গিয়াছে ডুবে;
যা' কিছু সুন্দর ছিল, সব ত গিয়াছে নিভে।
ফুল ত' ঝরিয়া গেছে, শুকায়ে গিয়াছে পাতা;
শীর্ণ কায় প'ড়ে আছে, লুণ্ঠিত মাধবী লতা।
সকলি গিয়াছে চ'লে. যাহা কিছু মনোহর,
এর মাঝে কেন আজ তুলিস্‌রে কুহুস্বর?
তুই যে বসন্ত সখা, অসময়ে এলি কেন;
জীর্ণ শুষ্ক ধরামাঝে ঢালিতে প্রেমের গান!
নিস্তব্ধ প্রকৃতি রাণী—শীত ব্যাধি জরা ভারে,
তুলিবি কি জাগাইয়া তোর সুধা কণ্ঠস্বরে?
কি নিয়ে জাগিবে বল, কি আজ আছেরে আর;
ম্লান মুখ হিম কায়া, কিছু আজ নাহি তার।
নহে তো বাসন্তী নিশা, নহে তো শারদ ঊষা;
নহে তো উচ্ছ্বাস ভরা-ঘন ঘোর সে বরষা!
তবে আজ কোন ভুলে, জাগাইতে ধরাখানি,—
মাঝে মাঝে আকুলিয়া, তুলিস্‌রে কুহুধ্বনি?
প্রশান্ত বিশ্রাম ভরা, তোর শান্ত সুপ্ত নীড়ে,—
সহসা কি অভিমানে, প্রিয়া বুঝি গেছে উড়ে?
তাই কি ফিরাতে তারে, নিদ্রাহীন-রক্ত আঁখি,
ব্যাকুল হৃদয় তোর, ক্ষণে ক্ষণে উঠে ডাকি;
ডাক্ তবে ডাক্ পাখি, ধরণী প্লাবিত ক'রে,
অসময়ে তোর ডাকে, বসন্ত আসুক ফিরে!

—•—



দ্বারবঙ্গাধিপতি

মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর




"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"


মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৫শ বর্ষ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ সাল। | ৫ম সংখ্যা।


# ৺তারকেশ্বর তথ্য।

লেখক—শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ তীর্থ ৺ তারকেশ্বর ধামের * নাম অনেকেরই সুপরিজ্ঞাত। শিবশম্ভু তারকনাথদেবের শিলাময়ী মূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। এ মূর্ত্তি হস্ত পদাদি বিশিষ্ট নহে। স্তম্ভাকৃতি মাত্র তারকেশ্বর ও তারকনাথ উভয় নামেই এ দেবশিলা আখ্যাত হইয়া থাকে; বলা বাহুল্য সেই দুই সংজ্ঞানুসারে তীর্থেরও নামকরণ হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন তারকেশ্বর নাম আধুনিক তারকেশ্বর সংজ্ঞাই প্রাচীন। পরন্তু আমরা উভয় প্রকার সংজ্ঞারই বহুকাল হইতে ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছি। প্রত্যুত সংজ্ঞাদ্বয়ের প্রচলনও বহু দিন হইতে হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা

কারণ বহুকাল পূর্ব্বের বিরচিত বন্দনা গীতাদিতেও উভয় নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা:—

(১) বাবা মক্কায় মক্কেশ্বর, কাশী বিশ্বেশ্বর,
কলিতে পাতকী তরাতে তুমি তারকেশ্বর ; ইত্যাদি

(২) এসেছিলাম তারকনাথ হে তোমার চরণে ইত্যাদি

যাহা হউক শিলাময় তারকনাথ যে কলির জাগ্রত দেবতা এবং সাক্ষাৎ শিবশম্ভুর অংশসম্ভূত তাহাতে কোনও সংশয় নাই। যেরূপ উৎকট উৎকট রোগগ্রস্ত রাশি রাশি লোক আসিয়া "হত্যা (ক) দিয়া মহৌষধ লাভপূর্ব্বক রোগ মুক্ত হইয়া যাইতেছে তাহাতে কে বলিতে পারে "তারকনাথ রোগহারী মৃত্যুঞ্জয়ের অংশোৎপন্ন শিলামূর্ত্তি নহে? জানি বটে শত শত জাল জুয়াচুরি বা পঞ্চ-ম কারের সেবায় তারকেশ্বর ধামপূর্ণ রহিয়াছে ; কিন্তু তবুও বলি তারকনাথের দেবত্ব যায় নাই! তারকেশ্বরের অমেয় প্রতাপ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে ও থাকিবে। তুমি ভক্তির শূর্প বায়ুতে বা একাগ্রতার ফুৎকারে ভস্মস্থানচ্যুত করিতে পার সে প্রতাপ দেখিতে পাইবে। মনপ্রাণ শান্তি লাভ করিবে।

আমরা শিবশম্ভু তারকনাথ বাবার করুণা বিষয়ক অনেক গল্প শ্রুত আছি। সে সকল প্রকাশ করিতে গেলে, একখানি স্বতন্ত্র কলেবর পুষ্ট গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং সকল বৃত্তান্তের উল্লেখ না করিয়া মাত্র অল্প দিন জাত দুই পাঁচটী ঘটনার উল্লেখপূর্ব্বক অন্যান্য কথার অবতারণা করিব।

(১) কালীঘাটে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দারুণ অম্লরোগাক্রান্ত হইয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়েন। চিকিৎসায় কিছুই হয় না তখন রোগীর ৺তারকনাথ বাবার দয়ার কথা মনে পড়িল। হরিদাস শয়নে স্বপনে বাবাকে ডাকিতে লাগিলেন! দূরে থাকিয়া বাবার প্রতি ভক্তি রাখিয়া হরিদাস শুভফল লাভ

---

* তারকেশ্বর হুগলী জেলার অন্তর্গত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির একটী ব্রাঞ্চ বাহির হইয়া তারকেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছে। শিবরাত্রির সময় এখানে অনেক ধূমধাম হয়। চৈত্রমাসে অনেক লোক এখানে আসিয়া সূত্র নির্ম্মিত পাটা গলায় লইয়া সন্ন্যাসী ভাবে থাকে। তারকেশ্বরের অদূরে প্রসিদ্ধ দামোদর নদ। এখানে থানা ও ডাকঘর আছে।

(ক) স্বপ্ন বাবা তারকনাথের আদিষ্ট ঔষধ প্রাপ্তির আশায় তারকনাথ মন্দিরে অনাহারে শয়নাদির দ্বারা অবস্থানকে হত্যা বা ধন্না ইত্যাদি বলে।

করিল। স্বপ্নে দেখিল তারকনাথের তামাকু সেবার পর কলিকায় যাহা থাকিবে তাহা লইয়া ধারণ করিলেই রোগমুক্ত হইবে। তাহাই হইল, তারকনাথের ভোগ রাগের পর যে তামাক সাজিয়া দিয়া দ্বারবদ্ধ করা হয়, সেই তামাকের পোড়া গুল আনিয়া ধারণ করান হইল। রোগী ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে।

(২) কলিকাতায় একটী স্ত্রীলোকের যক্ষ্মাকাস রোগের উপক্রম হইলে সে তারকনাথে আসিয়া হত্যা দেয়, প্রথম প্রথম বাবা ভয় দেখাইয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—কিন্তু রোগগ্রস্তা রমণী তাহা মানিল না, সে নিরাহারে নিরাধারে পড়িয়া রহিল। ৮ দিনের পর স্বপ্নযোগে ঔষধ পাইয়াছে। ধারণ করিয়া রোগের অনেক উপশম হইয়াছে।

(৩) হুগলী জেলার বন্দীপুর গ্রামের আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এক দিন মধ্যাহ্নে আহারে বসিয়াছেন এমন সময়ে একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্টান্ন ভিক্ষা করিল, জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল তাহারা তারকনাথে হত্যা দিয়াছিল, শিবশম্ভু তারকনাথ বাবা মহারোগী পুরুষটীর ঔষধ আশুবাবুর পাতের ভাত নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আশুবাবু এঁটো ভাত দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন কিন্তু আগন্তুকদ্বয় তাহা শুনিল না। পুরুষটী প্রসাদ পাইয়া চলিয়া গেল।—ইত্যাদি

একণে—তারকনাথ দেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে দুই চার কথার আলোচনা তাহার করা যাউক। পরে ছড়া দেওয়া যাইবে তাহা হইতেই তারকনাথের উৎপত্তি বৃত্তান্ত যদিও অনেকাংশে অবগত হওয়া যাইবে তথাপি এস্থলে সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া অসঙ্গত মনে করি না।

যে ভূখণ্ডে একণে ৺তারকনাথ বাবার সুধাধবলিত শ্রীমন্দির, নাটবাঙ্গালা সম্বলিত শ্রীশ্রীমহাপুরী বর্ত্তমান এবং যে ভূভাগে এখন শঙ্কর সেবক মোহান্ত মহারাজের রম্য সৌধ-হর্ম্ম্য দেদীপ্যমান—আর যে সকল স্থানে উপস্থিত মুদি ময়রা মণিহারী ওলাকর প্রভৃতির দোকান বর্ত্তমান সেই সকল ভূভাগ এককালে বন জঙ্গল পূর্ণ প্রান্তরে পর্য্যবসিত ছিল। উলুঘাস একটী প্রধান বনোপকরণ হইয়াছিল। অন্যান্য কণ্টকাদি বৃক্ষেও বনটী তখন দুরধিগম্যাবস্থায় পড়িয়াছিল। কোল ভিল সাঁওতাল প্রভৃতি ভিন্ন দেশাগত বন্য জাতি কচিৎ কদাচিত এ মহারণ্যে গতায়াত করিত। অন্য লোকে প্রায় তথায় যাইত না।

নিকটে—চাস ভূমি ও গোচারণ ক্ষেত্র। রাখাল বালকগণ এই সকল ভূভাগে গরু চরাইত। যখন প্রচণ্ড কিরণমালা তাহাদের কঠিন মস্তকত্বালা-

শালা করিয়া দিত; তখন তাহারাও পূর্ব্বোক্ত কান্তারে গিয়া আশ্রয় লইত। কখন বা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া গোপাল সহ জঙ্গলে প্রবেশ পূর্ব্বক গরুগুলিকে বনপালা খাওয়াইত। রাখাল বালকগণের মধ্যে স্বর্গীয় মুকুন্দরাম ঘোষের গোচারকের সংখ্যাই অধিক ছিল। স্বর্গীয় মুকুন্দরাম তৎকালের একজন প্রসিদ্ধ গোয়ালা ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান লইয়া এক্ষণে অনেক মত ভেদ হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি ৺মুকুন্দরামের বাসস্থান তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ভঞ্জপুরে ছিল। অন্য পক্ষ তাহা অস্বীকার করেন।

যাহা হউক মুকুন্দঘোষের বাসস্থান লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার বাস যেখানেই থাকুক তিনি যে নিকটবর্ত্তী রামনগর গ্রামের স্বর্গীয় ভারামল্ল রাজার গোশালার তত্ত্বাবধারক ছিলেন, একথা সর্ব্ববাদি সম্মত। রাজার গোরক্ষার ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল;—বিশ্বাসী-ভৃত্য মুকুন্দরাম—গো-শালার এক প্রকার অধিপতি হইয়া পড়িয়াছিলেন, রাখাল নিয়োগ গোধন ক্রয় ইত্যাদি সকলই তাঁহার ইচ্ছানুসারেই হইত, কথায় কথায় মহারাজের আজ্ঞা আনিতে যাইতে হইত না। এই জন্যই আমরা ইতঃ পূর্ব্বে রাখাল বালকগণকে মুকুন্দরামের গোচারক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

মুকুন্দরামের প্রতিপালিত এই সমস্ত গোচারক বালক পূর্ব্বোক্ত জঙ্গলে যাতায়াত করিতে করিতে কিছুদিন পরে, এক স্থানে মৃত্তিকা প্রোথিত একখণ্ড শিলা দেখিতে পায়; অজ্ঞ বালকগণ তাহার উৎকৃষ্ট তাপকৃষ্টতানুভব না করিয়া মুষল সংযোগে তাহার উপর শস্য পেষণ আরম্ভ করে। ধান্য ক্ষেত্রাদি হইতে কর্ত্তৃত শস্যাদি কৃষকগণ লইয়া গেলে কিছু কিছু ধান্যাংশ (ধানের শীষ) পড়িয়া থাকে। রাখাল বালকগণ এই সকল ধান্য শীর্ষ আনয়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত শিলায় পেষণ করতঃ তণ্ডুল বাহির করিত। তাহাদিগের সে তণ্ডুল কখন বা প্রান্তর মধ্যে রন্ধন হইয়া উদরসাৎ হইত, কখন বা ভিজাইয়া তাহারা ভক্ষণ করিত।

এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হয়। তৎপরে দৃষ্ট হইল অবিরত পেষণের ফলে শিলাখণ্ডের এক পার্শ্ব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ নিম্ন হইয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে এক অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া গোরক্ষকগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠেন; এক দিবস তাহাদিগের নেত্রপথে সমুদিত হয় যে গোপালের মধ্য হইতে একটী কৃষ্ণকায় গাভী (কপিলা) গিয়া এই শিলা খণ্ডে দুগ্ধ ত্যাগ করিতেছে। আপনা আপনি দুগ্ধ স্রোত তাহার স্তন বৃন্ত হইতে নিঃসৃত হইয়া শিলা খণ্ডের উপর নিপতিত হইতেছে। ঘটনা দৃষ্টে গোপালকগণ কতকটী আশ্চর্য্যান্বিত হয় বটে কিন্তু

ব্যাপারটীর অলৌকিকতা তত অনুভব করিতে পারে নাই, পারিলে অবশ্যই প্রথমেই প্রকাশ করিত।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইতে লাগিল, যথা সময়ে গো-দল গো-শালায় উপস্থিত হইলে দেখা যাইত, মহারাজ ভারামল্লের কৃষ্ণকায় কপিলা গাভীর আদৌ দুগ্ধ হয় না। রাজা কপিলার দুগ্ধ বড় ভাল বাসিতেন। স্বভাবতই দেখা যায় কৃষ্ণকায় পয়স্বিনীর দুগ্ধ কিছু স্বাদু ও ঘৃতাংশ বহুল। ভারামল্লের সেই গাভীর দুগ্ধ অবশ্য সেইরূপই ছিল। সন্দেহ নাই।

ভারামল্ল যখন প্রায়শঃ শুনিতে লাগিলেন—কপিলার দুগ্ধ হয় নাই তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক দিবস গোশালারক্ষক মুকুন্দকে ডাকিয়া অতিশয় তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, "তুমি যত অযোগ্য রাখাল নিযুক্ত করিয়াছ তাহারা ভালরূপে গোরক্ষা করে না সুতরাং বৎস্য দুগ্ধ খাইয়া ফেলে।" অথবা তাহারাই দুগ্ধ চুরি করিয়া পান করিয়া থাকে নচেৎ প্রায় কপিলা দুগ্ধ দেয় না কি জন্য ?

রাজার তিরস্কারে মুকুন্দ অতিশয় অপমান বোধ করিলেন, এবং রাখালগণকে সমুচিত তিরস্কার করিয়া সাবধান হইতে আদেশ দিলেন, কিন্তু কয়েক দিন পরে আবার সেই ঘটনা। আবার নিরপরাধী রাখালগণ তিরস্কৃত হইল। এইরূপ কয়েক দিন ভৎসনা সহ্য করিবার পর রাখালগণ সমবেত হইয়া কপিলার দুগ্ধ না হইবার কারণ ব্যক্ত করিয়া দিল। স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া কপিলা শিলাখণ্ডে দুগ্ধ দান করে একথা মুকুন্দ প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; অবশেষে এক দিবস জঙ্গলে গিয়া যখন রাখালগণের কথিত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন তখন সকল সন্দেহ দূর হইল। বিস্ময় তরঙ্গে মুকুন্দের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল কিন্তু আপাততঃ তিনি কোন কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। প্রস্তর খণ্ডের প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য মুকুন্দ পাগল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, অবশেষে, একদিন স্বপ্নযোগে মুকুন্দ ঘোষ জানিতে পারিলেন।

মস্তকের বেদনায় শম্ভু হইলেন কাতর।
কহিলা মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেশ্বর॥
তারক নাথ শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়ে বাছা আমার উৎপত্তি॥

যদি আকাশের তারা পাতালের বাসুকি স্বর্গের পারিজাত সম্মুখে আসিয়া

উপস্থিত হইত, তাহা হইলে মুকুন্দ ঘোষ যতনা আনন্দিত হইতেন, একমাত্র স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ে তিনি ততোধিক চমৎকৃত হইলেন।

স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবিলম্বে ভারামল্লের শ্রুতিগোচর হইল, তখন শত শত কর্ম্মচারি সজ্জিত হইল। মহারাজ ভারামল্ল স্বদল বলে পরিবেষ্টিত হইয়া যেস্থানে তারক নাথ দেবের শিলামূর্ত্তি প্রোথিত আছে সেই স্থানে গিয়া হাজির হইলেন। তখনই জঙ্গল কর্ত্তনের ব্যবস্থা হইল তখনই মহারাজ শিলা খানিকে নিজের বাটী লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বন্ধ্যার পুত্রাশার ন্যায় বামনের চন্দ্রধারণেচ্ছার ন্যায় পঙ্গুর পর্ব্বতোলঙ্ঘন বাসনার ন্যায় তাঁহার সে আশা বিফলতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র লোকে বহুদিন ধরিয়া মৃত্তিকা খনন করিল কিন্তু শিলাখণ্ডের শেষ প্রান্ত কিছুতেই নয়ন গোচর হইল না।

"কেবা ন স্যুঃ পরিভব পদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ"

অবশেষে একদিন মহারাজ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া দেখিলেন বাবা

"সন্ন্যাসী হইয়া মূর্ত্তি কহেন স্বপন।
শুন রাজা ভারামল্ল আমার বচন॥
অকারণে দুঃখ পাইয়া মোরে কেন খোড়।
গয়া গঙ্গা বারানসী এখানে সে জড়॥

নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে ভারামল্লের মোহনিদ্রাও ভঙ্গ হইল। তখন তিনি শিলা আনয়নের আশাত্যাগ করিয় মৃত্তিকা খনন বন্ধ করিয়া দিলেন যে পরিমাণ মৃত্তৎসারণ হইয়াছিল তাহাতেই দুইটী পুষ্করিনী হইয়া গেল! বর্ত্তমান সময়ের দুধ পুকুর বেলপুকুর সেই মৃত্তোলনের ফল বলিয়া প্রবাদ।

তৎপরে রাজা শিবশম্ভু তারক নাথ বাবার দিব্য মন্দির নির্ম্মান করাইয়া দিলেন। জঙ্গল নগরে পরিণত হইল যেস্থানে শৃগাল শূকরাদি হিংস্র প্রাণীর বাস ছিল, এখন তথায় শিবভক্তগণের লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়িল। মহারাজ ভারামল্ল এই সময় হইতে শিব সেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপন করেন।

ভক্ত মুকুন্দ ঘোষও তারক নাথ বাবার ভোগাদির দুগ্ধ যোগান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কিছু কাল মধ্যে দেহত্যাগ করেন। তারক নাথ শিলার সম্মুখে তাঁহাকে সমধিস্থ করা হয়। সে সমাধির উপর এখনও একখণ্ড শিলা দেদীপ্যমান।

তারকনাথের যে মন্দির এখন পরিদৃষ্টমান তাহা মহারাজ ভারামল্লের কৃত নহে। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দির আছে তাহাই তাহার প্রস্তুত। সেই মন্দিরের উপরিভাগে অন্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

এইবার আমরা তারকনাথ দেবের ইতিবৃত্ত মূলক পৌরাণিক ছড়ার উল্লেখ করিতেছি। ছড়ার মতে তারকনাথ দেবের আবির্ভাব কাল সন ৪১ সাল।

## ছড়া।

বন্দিব বিলের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি।
চারিদিকে উলু থাকড়া বেনার বসতি॥
চৌদিকে জঙ্গল জল গহন কানন।
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি আম্রবন॥
কৃষাণে কাটয়ে ধান্য রাখালে কুড়ায়।
আনন্দে শম্ভুর শিরে ধান্য ভেনে খায়॥
কপিলায় দিচ্ছে দুগ্ধ একচিত্ত হৈয়ে।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে বসিয়ে॥
মস্তকের বেদনায় শম্ভু হইলেন কাতর।
কহিলেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেশ্বর॥
তারকনাথ শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়ে বাছা আমার উৎপত্তি॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মৃত্তিকা খুড়িয়া দেখে অপূর্ব্ব পাথর॥
হস্তে খোঁড়ে মাটী কেহ খোঁড়ে দিয়া বাড়ী।
পাষাণে দেখিয়া বলে হৈল ছিয়া গাড়ী॥
রাহুত বাহুত ঘোড়া সাজল লস্কর।
তারা সব প্রবেশল জটার ভিতর॥
জটাধারী ত্রিপুরারি দেখিয়ে নিজে রড়ে।
রাজা বলে লয়ে রাখি রামনগরের গড়ে॥
শত কোড়া দিয়ে দিল কাটিবারে মাটী।
যত কোড়ে শম্ভু বাড়েন দুষ্কণীর বাটী॥
বারমাস কোড়ে শম্ভুর অন্ত নাহি পায়।
তবু শম্ভু নিয়ত পাতাল দিকে ধায়॥
ভক্তের দুঃখ পাইয়া ভব জানিয়া অন্তরে।
নিশি রাত্রে গিয়ে বসেন রাজার শয্যরে॥

সন্ন্যাসী হইয়া মূর্ত্তি কহেন তখন।
শুন রাজা ভরামল্ল আমার বচন ॥
অকারণে দুখ্যু পাইয়ে মোরে কেন খোড়।
গঙ্গা গঙ্গা বারানসী এখানে সে জড় ॥
শুনিয়া নৃপতি হইলা আনন্দে অস্থির।
জঙ্গল কাটিয়া দিল অপূর্ব্ব মন্দির ॥
আম জাম রুহিলেন গোয়া নারিকেল।
ডানভাগে সরোবর সিদ্ধিমাখা জল ॥
পাথরে বান্ধিয়া দিলেন মরীচির গড়া।
জলেতে কুম্ভীর ভাসে ডাকে কড়াকড়া ॥
বিচিত্র মন্দিরের মাঝে মহামায়ার সঙ্গে।
প্রেম ভরে তাল লয়ে নাচে কত রঙ্গে ॥
নীল দিনে সরোবর গঙ্গার জোয়ার।
পাতকী তারিতে ভবে হৈলা অবতার ॥
মধ্যিখানে তারকনাথ চারিদিকে জল।
ভক্তগণে দিয়ে পূজে কালা ফুলের মালা ॥
মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় হইলেন একচল্লিশ সালে।
বৃষধ্বজে পূজলেন গিয়ে শ্রীফলের মূলে ॥
বাঘছাল আসন বিভূতি মাখা গায়।
নিবাসী নন্দন বাটী কখন না যায়।
গাহিল সকল দ্বিজ শঙ্কর ভাবনা।
নিবাসী নন্দন বাটী জলগড় পরগণা ॥

---

(১) মহারাজ ভারামল্লের বাটী তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রামনগর গ্রামে ছিল। সেবাটীর ভগ্নবিশেষ বর্ত্তমান ছিল, ইষ্টকাদি অন্যে লইয়া গিয়াছে স্থানটী এক্ষণে বন জঙ্গলময়। গড় প্রভৃতির চিহ্ন এখন আর নাই ভারামল্ল তারকেশ্বর আনিয়া বাটীতে স্থাপন করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন যখন অকৃতকার্য্য হন, তখন স্বীয় গ্রামে অনেকগুলি শিবস্থাপনা করেন। তখন এক শিবলিঙ্গ রাজ বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বর্ত্তমান সময় রাম নগরে একটী বৃহদাকার শিব নিপাতিত অবস্থায় দৃষ্ট হয়, অনেকে অনুমান করেন এইটাই ভারা-

ছড়াটীর সকল অংশ পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া যায় তাহাও বহু অসংবদ্ধ পাঠে আবদ্ধ একজন অশীতিপর বৃদ্ধার মুখ হইতে শুনিয়া আমি ছড়াটী সংগ্রহ করিয়াছি। ৺তারকেশ্বর ধাম হইতে আমার নিবাস ভূমি কৈকালা গ্রাম ন্যূনাধিক তিনক্রোশের মধ্যবর্ত্তী। সুতরাং তারকনাথদেবের মাহাত্ম্য ও ইতিবৃত্ত বিষয়ক অনেক বৃত্তান্ত আমি অবগত আছি। শ্রুতি অর্থাৎ বেদের ন্যায় এ বৃত্তান্তগুলি বহুদিন হইতে লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়া আসা যাইতেছে। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সে সকল বৃত্তান্তেরও কিছু কিছু সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

ছড়ায় আছে ৪১ সালে শিবশম্ভু তারকনাথবাবার আবির্ভাব বা লোকে প্রকাশ এক্ষণে এই ৪১ সাল লইয়া বহুমত ভেদ আছে। কেহ বলেন ১১৪১ সাল, কেহ বলেন তাহা নহে ১৯৪১ সাল। অন্যপক্ষ উভয় পক্ষই অস্বীকার করিয়া বলেন মাত্র ৪১ সালে তাহা যদি হয় তাহা হইলে তারকনাথের আবির্ভাব বহুদিন হইয়াছে বলিতে হইবে। বহুদিন পূর্ব্বে তারকেশ্বর ধাম হইতে একখানি ইতিবৃত্ত মূলক গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল, আমি এই পুস্তক সংগ্রহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই শুনিয়াছি এ পুস্তকে মাত্র ৪১ সালে তারকনাথের আবির্ভাব লিখিত আছে। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে এ একটা বিষম সমস্যা ১০।১২ জন মাত্র মোহান্তের কর্ত্তৃত্বাধীনে এত শত বৎসর অতীত হইল কিরূপে? উত্তরে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোহান্তগণের নামাদি বিস্মৃতির গর্ভে নিহিত অথবা পরিজ্ঞাত মোহান্ত কতিপয়ের পূর্ব্বে তারকনাথ সেবার অন্য প্রকার ব্যবস্থা ছিল।

আমি বহুদিন হইতে সচেষ্ট আছি যাহাতে তারকনাথ দেবের যাবতীয় প্রাচীন বন্দনা গীত সমুদায় ছড়া এবং সমগ্র ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারি। এজন্য বহুগ্রামে হাঁটিয়াছি, বহুলোকের উপাসনা করিয়াছি কিন্তু দেখিলাম সকল কথা কেহই বলিতে পারে না, তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রামনগরের স্বর্গীয় অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রার দলে তারকনাথ নামে একটি পালা বা নাট্যাভিনয় অভিনীত হইয়া থাকে। মনে করিয়াছিলাম পালাটী কোন প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে সংগৃহীত। কিন্তু শেষে জানিলাম আমাদের পূর্ব্বোলিখিত ছড়াই উক্ত নাটকের ভিত্তি। যদি তারকনাথ বাবা শক্তি দেন সুস্থ রাখেন তাহা হইলে অচিরে আমি তারকেশ্বরের অন্যান্য তথ্য প্রকাশে সমর্থ হইব সন্দেহ নাই।

মহারাজ ভারামল্লের আবিষ্কৃত তারকনাথ শিলা এখন আর লোক লোচনের

অন্তর্ভূত হইবার উপায় নাই। প্রকৃত শিলার শীর্ষভাগ বাদ রাখিয়া সমুদার অংশকে কোন প্রকার কঠিন দ্রব্যে ( কড়ায় ) সমাবৃত করা হইয়াছে। যে তাহাও আবার রৌপ্যাবরণীতে ( ডেকে ) অনবরত ঢাকা থাকে। এই আবরণী খুলিলে যে অর্দ্ধচন্দ্র দেখা যায় তাহা উক্ত কঠিন জমাটের উপর স্থাপিত কৃত্রিম স্বর্ণ বা তাম্র নির্ম্মিত অর্দ্ধচন্দ্র মাত্র।

বহুদিন পূর্ব্বে আমরা একবার তারকনাথ তীর্থে শিবশম্ভুর পূজা দিতে গিয়াছিলাম। তখন তারকেশ্বরের সভাপণ্ডিত কাইত শ্রীরামপুর নিবাসী পণ্ডিত তারিণী চরণ ভট্টাচার্য্য জীবিত ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আমার পিতা ঠাকুরের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল, তিনি আমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত পূজাদি করাইয়া উপরের রৌপ্যাবরণী খুলিয়া স্বহস্তে আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তারক নাথ বাবার মস্তকদেশ স্পর্শ করাইয়াছিলেন, তাহাতে এ কলুষিত হস্ত অতি মসৃণ শীলাফলকের স্পর্শ পবিত্রতা অনুভব করিতে পারিয়াছিল, আমার বেশ মনে আছে, তখন আমি শিলা ফলকের এক পার্শ্ব ঈষৎ নিম্ন অনুভব করিয়াছিলাম পূজনীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন, রাখাল বালক গণের ধান্য ভানায় ঐ স্থান ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে তারক নাথ দেবের যে মন্দির পরিদৃষ্ট হয়, তাহা মহারাজ ভারামল্লের নির্ম্মিত নহে। ইহার নিম্নে আর একটী মন্দির আছে। সেইটী ভক্ত ভারামল্লের প্রস্তুত, এই মন্দিরের উপরে বর্ত্তমান সময়ের পরিদৃষ্টমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

যে দুইটী পুষ্করিণী বাবার মন্দিরের নিকট বর্ত্তমান সেই দুইটী পুষ্করিণী স্বর্গীয় ভারামল্লের কিয়ৎকর্ত্তিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, তবে পরিষ্করণ পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি অপরে করিয়াছে সন্দেহ নাই। দুইটী সরোবরের মধ্যে কোনটীর জলই ভাল নহে, বেল পুষ্করিণীর জল কতক ভাল, পুরীসংশ্লিষ্ট দুধ পুকুরের জল একেবারে অপেয়, ভক্তগণ তাহাতেই অবাধে স্নানাদি করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই দুই পুকুরের অগাধ সলিল কখন অল্পতা প্রাপ্ত হয় নাই; চিরকাল সম ভাবেই আছে।

যে কপিলা গাভী জঙ্গল মধ্যস্থিত শিলাখণ্ডে স্বেচ্ছাবশে পয়ঃ বর্ষণ করিয়াছিল, সে গাভীর অধস্তনী গবী এখনও পর্য্যন্ত তারকেশ্বর ধামে বর্ত্তমান আছে বলিয়া প্রবাদ। এই গাভীগণের দুগ্ধ না হইলে বাবার ভোগের পরমান্ন হয় না, শিব শম্ভু তারক নাথ বাবা নাগা সন্ন্যাসীর উপর বড় সন্তুষ্ট। তাই তারকেশ্বরধামে

অতিথি সন্ন্যাসীর প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। অন্যান্য ব্রাহ্মণ ভোজনের ন্যায় প্রতিদিন কতকগুলি সন্ন্যাসী ভোজনের ব্যবস্থাও আবহমান কাল তারকেশ্বরধামে প্রচলিত তারকেশ্বর প্রধান সেবাইত মোহান্ত আখ্যায় আখ্যাত, অকৃতদার বিষয় বিরক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোহান্তের প্রধান শিষ্য বা চেলারাই এপদ প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র। মোহান্তদিগের মৃত্যুর পর দাহ করিবার রীতি নাই। কবর দিবার পদ্ধতি, তারকনাথ মন্দিরের পার্শ্বে যে কতকগুলি শিব স্থাপনা দৃষ্ট হয় এগুলি এক একজন মোহান্তের কবরের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির পূর্ব্ব মোহান্ত কলিকাতায় লীলা সম্বরণ করিয়া ছিলেন রেলওয়ে ট্রেণ দ্বারা তাঁহার মৃতদেহ আনিয়া কবর দেওয়া হয়।

*মোহান্তগণ—

১। ৺রঘু গিরি

২। ৺গোলক গিরি

৩। ৺মাধব গিরি

৪। শ্রীমন্ মহারাজ সতীশ চন্দ্র গিরি

মোহান্তের পদ অতি দায়ীত্ব পূর্ণপদ তাঁহাকে কখন আমীর কখন ফকীর কখন সন্ন্যাসী কখন বিষয়ী ভাবে থাকিতে হইবে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে বিবেচনাশীল লেখা পড়া জানা। লোক ভিন্ন এ পদের উপযুক্ত পাত্র অন্য কেহ হইতে পারে না। ভক্তগণ প্রদত্ত অজস্র টাকায় শিবশম্ভু বাবা তারকনাথদেবের বিষয় সম্পত্তি অগাধ। জমীদারী বিস্তর মোহান্ত যখন রাজকার্য্য জমীদারের কর্ত্তব্য পালন করিবেন, তখন তাঁহাকে রাজ ভাবে থাকিতে হইবে, আবার যখন শিব সেবায় মনোনিবেশ করিবেন বা বিষয় কার্য্য হইতে বিমুক্ত থাকিবেন তখন তিনি কৌপীন চিমটাধারী গৈরিক বিমণ্ডিত ভস্মলিপ্ত গাত্র নাগা ফকীরের বেশে থাকিবেন।

তারকেশ্বর সম্বন্ধে জানিবার ও জানাইবার কথা অনেক আছে। এত নিকট থাকিলেও আমরা সমুদায় তথ্যের সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। চেষ্টায়

* তারকেশ্বরের মোহন্ত বা সেবাইত হইবার পর গিরি উপাধি হইয়া থাকে। পৌরাণিক মতে শঙ্করের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহে যে শ্বশুর হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল গিরি ( কেননা হিমালয় ) বোধ হয় সেবাইতগণের নামের সহিত শ্বশুর নাম

আছি যাহাতে যাবতীয় ইতিবৃত্ত সংগৃহীত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারি! যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। একছড়া লইয়াই নানামতভেদ ও বাক্য ভেদ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক অদ্য যাহা প্রকাশিত হইল ইহাদ্বারাও সকলে ৺তারকেশ্বর ধামের অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন আশা করাযায়।

—:•:—

# কি উপায়ে আমাদের দেশীয় শিল্প, কৃষি এবং বাণিজ্যের প্রসারণ ও উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে।—

লেখক—শ্রীবনমালী গোস্বামী এম, এ।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অর্থ দেশের শোণিত স্বরূপ, যে দেশে যে পরিমাণ অর্থ উৎপন্ন হয় সে দেশ সেই পরিমাণেই সজীব থাকে। এই অর্থরূপ শোণিত উৎপাদন করা রাজাপ্রজার উভয়েরই সমান কর্ত্তব্য। কারণ ইহার অভাবে দেশের বিপদ অনিবার্য্য। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই আমাদের দেশের অর্থ কে উৎপাদন করে? তাহার উৎপত্তিস্থান কোথায়?

উকীল ব্যারিষ্টারগণ অর্থসঞ্চয়েই পটু, অর্থ উৎপাদনে তাঁহারা একান্ত অক্ষম। জমিদার, তালুকদার. মহাজন প্রভৃতি সকলেই অর্থশোষণে নিয়ত রত। দেশের অর্থ উৎপাদনের প্রতি তাঁহাদের একবারেই দৃষ্টি নাই। শিক্ষাভিমানী যুবকগণ কেহ রাজকর্ম্মচারী হইবার জন্য, কেহ উকীল ব্যারিষ্টার, কেহবা জমিদার, তালুক-দার হইবার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিতেছেন। অর্থ শোণিত উৎপাদনের প্রতি ভ্রুক্ষেপও নাই। আইন কানুন, বিধি ব্যবস্থা যত কিছু হইতেছে কিছুই অর্থ উৎপাদনের সাহায্য করিতেছে না, বরং তাহা কেবলই অর্থ শোষণের অনুকূল। বিদেশীয় বাণিজ্য খরস্রোতা নদীর ন্যায় ভারত মাতার বক্ষ হইতে এই অর্থ-শোণিত

নিঃসারিত করিয়া সহস্র যোজন দূরে নিয়ত নিক্ষেপ করিতেছে, এইরূপে শত-প্রবাহে ভারত মাতার দেহের শোণিত হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। যতদিন সহস্র স্রোতে সেই পরিমাণে অর্থ উৎপন্ন হইয়া এই নিঃসরণের ক্ষতিপূরণ না করিবে ততদিন আমাদের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

রাজা প্রজা সকলেই যে শুধু অর্থ উৎপাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন তাহা নহে, অর্থ উৎপাদন কার্য্যকে তাঁহারা নিতান্ত হেয় মনে করেন। নিরন্ন অজ্ঞানী কৃষক-দিগের হস্তে এই গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া সকলেই আপন আপন সুখ বিলাসের সুবিধা করিবার জন্য ব্যস্ত। পৃথিবীর অপরাপর স্থানে লক্ষ-পতিরা নানাপ্রকার কলকৌশল করিয়া নিজ নিজ দেশের অর্থবৃদ্ধি করিতেছেন, আর ভারতবাসীরা নিরুপায় দরিদ্র লোকদিগের হস্তে এই গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া বিংশ শতাব্দীর জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতরে কিরূপে দাঁড়াইবেন? মুখে আমরা কৃষির উন্নতি উন্নতি বলিয়া চীৎকার করিতেছি, কৃষি বিদ্যালয়ও স্থাপন করিতেছি কিন্তু কাজে কিছুই করিতেছি না। চাকরির সুবিধা হইবে এই আশায় অনেকে কৃষি বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের অধ্যয়ন মাত্রই সার। কৃষিজীবিকা অবলম্বন করিবেন এরূপ স্বপ্নেও কেহ ভাবেন না। ভাবিয়াই বা কি করিবেন?—যাঁহাদের হাতে উপযুক্ত মূলধন নাই কৃষিকার্য্য করিয়া জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে তাঁহারা কৃষিকার্য্যে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না।

কৃষকেরা চাষ করে নিতান্ত পেটের দায়ে; মজুরি সকল সময়ে জোটেনা। দুই চারি কাঠা জমি চাষ করিলে পরিবারের অন্নের জন্য কতক পরিমাণে নিশ্চিত হওয়া যায়, এই জন্যই তাহারা চাষ করে। একারণেই কোন মহাজন কুলিমজুর দ্বারা কৃষিকার্য্য করিয়া লাভবান হইবার আশা করিতে পারেন না। যদি পাশ্চাত্য-হিসাবে কুলির বেতন ৪০।৫০ টাকা ধরাযায় তাহা হইলে লাভ না হইয়া ক্ষত হইবারই প্রায় পোনের আনা সম্ভাবনা। বৈজ্ঞানিক কৃষি কলখানার সাহায্য ভিন্ন হয় না, কল খরিদ করা ব্যয়সাধ্য—গরিব কৃষকের পক্ষে তাহা একপ্রকার অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষা দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থাতে ভারতের বিশেষ উপকার হওয়া কঠিন। ধনী মহাজনেরা এ বিষয়ে স্বয়ং হস্তক্ষেপ না করিলে কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু মহাজনেরা কৃষকের নিকটে টাকা ধার দিয়া যে পরিমাণে টাকার সুদ লাভ করিতেছেন, নিজেরা কৃষিকার্য্য করিয়া সে পরিমাণে লাভ করিবার আশা নাই। যদি দেশে কৃষির উন্নতির জন্য যথার্থই আমাদের বলবতী আশা থাকে, তবে হয় কৃষকের হস্তে যাহাতে উপযুক্ত ধনাগম, হয় অন্ততঃ যাহাতে

কৃষক বিনাসুদে অথবা অত্যল্প সুদে কৃষির উপযোগী অর্থসংগ্রহ করিতে পারে, এবং স্ব-স্ব জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়া সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। যদি ইহা করা নিতান্ত অসাধ্য হয়, তবে কৃষকদিগের হস্ত হইতে সমস্ত জমি ক্রয় করিয়া লইয়া উপযুক্ত বেতনে তাহাদিগকে মজুর খাটাইয়া জমিদারগণ স্বয়ং যাহাতে দেশের কৃষিকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহার সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। একথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে দেশের জমি কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের ভোগ বিলাসের জন্য নয়, এবং কি রাজা কি জমীদার, কি প্রজা, কাহারও জমির যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। জমি সমস্ত ভারতবাসীর অন্নভাণ্ডার; যে ইহার সদ্ব্যবহার করিবে এবং জাতীয় জীবন পোষণোপযোগী অন্ন উৎপাদন করিবে, তাহারই জমিতে অধিকার থাকা কর্ত্তব্য। জমিতে যে পরিমাণে অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে, বৈজ্ঞানিক উপায়েই হউক কিম্বা যেরূপেই হউক যদি সেই পরিমাণে অন্ন উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে ভূম্যধিকারীই দায়ী। যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইহার অন্তরায় হয় অথবা কৃষককে জমিদার করিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তদ্দিকে আমাদের ও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিকরা কর্ত্তব্য।

শিক্ষিত লোকদিগের এক্ষণে চক্ষু ফুটিয়াছে। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, উদরে অন্ন না থাকিলে কি ইহকালের কি পরকালের কোন কাজ করিতে পারা যায় না। দেশের ভদ্রলোকদিগের অবস্থা দিন দিন কিরূপ অবনীত হইতেছে, তাহা ও সকলে দেখিতেছেন। দেশের ভদ্রলোকেরা হয় নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, না হয় তাঁহাদের পুত্র পৌত্রগণকে কুলিগিরি করিয়া দিনপাত করিতে হইবে সেইরূপ লক্ষণ চারিদিকে প্রতীয়মান হইতেছে।

ইহার উপায় কি তাহাই এক্ষণে সকলে ভাবিতেছেন। সাম্রাজ্য শাসন সম্বন্ধীয় খরচের নিমিত্ত প্রতিবৎসর এদেশ হইতে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার চাউল, গম তুলা প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য বিলাতে প্রেরিত হয়। ইহার বিনিময়ে বিলাত হইতে এদেশে কোন দ্রব্য প্রেরিত হয় না। তাহা ব্যতীত প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে আমরা প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকার শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করি। এই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে বিদেশীয় দিগকে আমরা চাউল, গম প্রভৃতি দ্রব্য প্রদান করি। যে সকল বস্তু এক্ষণে আমরা বিদেশ হইতে ক্রয় করি, তাহার অনেকগুলি পূর্ব্বে এদেশে প্রস্তুত হইত। কিন্তু অন্যান্য দেশের লোক রসায়ন, তাড়িত প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি করিয়া ও নানারূপ কলকব্জা আবিষ্কার

করিয়া সেই সমুদয় বস্তু এত সুলভ মূল্যে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে যে আমরা আর তাহার সহিত সমকক্ষতা করিতে পারি না।

যদি আমরা সেই সমুদয় বস্তু প্রস্তুত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কোটি কোটি টাকা মূল্যের চাউল, গম এদেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যাইত না! সেই সমুদয় কৃষিজাত দ্রব্য দেশে থাকিলে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি পালিত হইত।

দেশের ধন যাহাতে দেশে রহিয়া যায় সে নিমিত্ত অনেকে এক্ষণে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছেন যে, যে বিদ্যার প্রভাবে অন্যান্য দেশের লোক আমাদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে, যে বিদ্যা না শিখিতে পারিলে আমাদের আর অন্য গতি নাই এ দেশে সে সমুদয় বিদ্যা শিখিবার উপায় নাই শিখিতে পারিলেও সে বিদ্যা কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয় এদেশে তাহা জানিবার উপায় নাই।

জাপান একথা অনেকদিন পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে জাপান দেখিলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র সমূহ শিক্ষা করিয়া কার্য্যে পরিণত না করিলে তাঁহাদের জাতীয় জীবন একেবারেই লোপ হইবে। এইরূপ ভাবিয়া জাপান বিদেশে ছাত্র পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই সমুদয় লোক দেশে প্রত্যাগমন করিয়া নানারূপ নূতন নূতন কারুকার্য্য সংস্থাপন করিয়াছেন জাপানের ঐশ্বর্য্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

যাঁহারা ভারতের হিতকামনা করেন, জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে আমাদের যুবকগণ নানাদেশে গমন করিয়া নানাবিদ্যা শিখিয়া আসিতে পারে সে জন্য তাঁহারা যত্ন করিতেছেন।

বিদেশে গিয়া মোটামুটি বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করা বড় কঠিন কথা নহে। সেই বিজ্ঞান শাস্ত্র কত কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া অর্থোপার্জ্জনের নূতন নূতন পথ কিরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই কার্য্যে করা কঠিন। বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে কাঁচ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। রেঃ নামক ক্ষার পদার্থ ও বালির সংযোগে অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে কাঁচ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু গরুর গাড়ির তুলনায় যেরূপ রেলগাড়ী সে কাচের তুলনায় বর্ত্তমান কালের বিলাতি কাঁচ। বিলাত ও অন্যান্য দেশের লোক নূতন প্রণালীতে কাঁচ প্রস্তুত করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন। সে বিদ্যা অন্যকে শিখাইলে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে। সহজে অন্যকে তাঁহারা সে বিদ্যা শিখাইবেন কেন? বোম্বাইয়ের ব্রাহ্মণ ওয়াগলে মহোদয় বিলাতে কাঁচ প্রস্তুত প্রণালী শিখিতে গিয়া এইরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন।

তাহার পর, সে স্থানের এক একজন লোক অনেক টাকা খরচ করিয়া তবে নূতন একটী বিষয় আবিষ্কার করিতে পারেন। মাসে দুই হাজার টাকা বেতন দিয়া কেহ দুইজন রাসায়নিক পণ্ডিতকে নিযুক্ত রাখিলেন। অর্থোপার্জ্জনের নূতন উপায় বাহির করিবার নিমিত্ত নানাবস্তু লইয়া তাঁহারা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কুড়িবৎসর তাঁহারা কিছু আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। কুড়ি-বৎসর বসিয়া তাঁহারা মাহিনা খাইলেন। কুড়িবৎসর পরে তাঁহারা যদি কোন একটী নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে ধনী সে আবিষ্কার গোপন রাখিতে কেন না চেষ্টা করিবেন? যে খাঁকি রংদ্বারা গোরাদের কাপড় রঞ্জিত হয়, তাহা এইরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। জার্ম্মানি দেশের একজন ধনী লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রাসায়নিক বিদ্যার প্রভাবে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ওয়াগ্‌লে মহোদয় দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে যেরূপ কাঁচ প্রণালী শিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আমাদের যুবক-গণকেও অনেক সময়ে সেইরূপ অধ্যাবসায় সহকারে কলে কৌশলে নানাবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে।

অনেক বিষয়ে বিলাতের লোককে প্রথম এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অনেকগুলি তন্তুবায় ধর্ম্মের জন্য ফরাশি দেশ হইতে তাড়িত হইয়া ইংলণ্ডে গিয়া বাস করে। তথায় তাহারা রেশম বয়নের কাজ আরম্ভ করে। নরউইচ নগরে লোম্ব নামক এক ব্যক্তি রেশম বয়নের কারখানা সংস্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার কারখানায় ভাল রেশমের কাপড় কেহ প্রস্তুত করিতে পারিত না, এরূপ বস্ত্র ইতালি দেশ হইতে ইংলণ্ডে আমদানি হইত। এই কাজে লাভ অধিক হইত। সেজন্য লোম্ব সাহেবের পুত্র মনে করিলেন যে ইতালির লোক কি রকম কল ব্যবহার করে তাহা আমাকে দেখিতে হইবে। লোম্ব সাহেবের পুত্র ইতালি গমন করিলেন। তিনি ধনবান লোক ছিলেন কিন্তু তাঁহার সব চেষ্টা বৃথা হইল। লেগহর্ণ নগরের রেশমের কারখানার স্বত্বাধিকারী তাঁহাকে কারখানায় ভিতর প্রবেশ করিতে দিলেন না। আরও বড় বড় লোকের পত্র লইয়া তিনি ইতালি গমন করিলেন।

কারখানার ভিতর প্রবেশ করিতে এবার অনুমতি পাইলেন বটে, কিন্তু কল ভালরূপ দেখিতে পাইলেন না। কারখানার স্বামী তাঁহাকে তাড়াতাড়ি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গেলেন। ছোট লোম্ব অবশেষে বুঝিতে পারিলেন

যে, এরূপে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধি হইবে না। তিনি সামান্য একজন ভিখারীর বেশ ধারণ করিলেন। ছিন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অতি মলিন বেশে তিনি পাদরির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অন্ন বিনা আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি পাদরিকে তিনি এইরূপে পরিচয় প্রদান করিলেন। পাদরির মনে দয়া হইল, পাদরি তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অবশেষে পাদরির সহায়তায় রেশমের কারখানায় তিনি মজুর রূপে নিযুক্ত হইলেন। অনেকদিন কুলির কাজ করিয়া নানারূপ কষ্টভোগ করিয়া তিনি সেই রেশম কলের গূঢ়তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। দেশে প্রত্যাগমন করিয়া সেইরূপ কল প্রস্তুত করাইলেন। সেই কলের সহায়তায় লোম্ব পরিবার কোটিপতি হইয়া পড়িল।

আমাদিগকে এইরূপ নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে।

নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কারের জন্য এদেশেও চেষ্টা করা আবশ্যক। এই দেখুন ইয়ুরোপের লোক আজকাল নারিকেল হইতে চমৎকার মাখন প্রস্তুত করিতেছে। নারিকেল তৈল এ দেশের সামগ্রী। ইহা লইয়া আমরা মাখন অথবা ঘৃত প্রস্তুত করিতে পারি না, পচা চর্ব্বি হইতে প্রস্তুত ঘৃত নামধারী জঘন্য দ্রব্য খাইয়া আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। কিন্তু এই নারিকেল তৈল বিজ্ঞান বলে কেমন সুন্দর মাখমে পরিণত হইয়াছে। নারিকেল তৈল হইতে যাঁহারা মাখম প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, অন্য লোককে সে বিদ্যা তাঁহারা শিখাইবেন না। সেজন্য এ উপায় আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যিনি কৃতকার্য্য হইবেন টাকা রাখিতে তাঁহার ঘরে স্থান হইবে না। এই কলিকাতার বিজ্ঞান সভা আছে, পরীক্ষা করিবার জন্য বিজ্ঞান সভায় নানারূপ যন্ত্র আছে, কিন্তু পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত লোক নাই। মোট কথা যাহাতে দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা হয় ও নবাবিষ্কৃত জ্ঞান সমূহের সহায়তায় যাহাতে লোক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই যাঁহারা পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা অবশ্য চারিদিক বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে এরূপ আশা করা যায়।

আমাদের দেশের শিল্প কর্ম্মের রীতি ও প্রণালী অধুনা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শিল্প কার্য্যের অভ্যন্তরে প্রাচ্যভাব অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। দেশ ইংরাজ অধিকৃত হইবার পর হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা, আচার, রীতি নীতি প্রভৃতি খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া আমাদের চিরাগত পদ্ধতি, আচার ব্যবহার সকলই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এতদ্দেশীয় শিল্পী ও কারিকরগণ

পৈতৃক ব্যবসায় এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছে। তাহারা প্রাণধারণের উপায়ান্তর না দেখিয়া এক্ষণে এক মাত্র কৃষির উপরেই আপতিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কেবল কৃষিও স্থূল বস্ত্র বয়ন কার্য্যই তাহাদের উপজীবিকা হইয়াছে। বৈদেশিক কলকারখানাতে দেশ ছাহিয়া ফেলায় কারিকর ও শিল্পকর হস্তোৎপন্ন উৎকৃষ্ট বস্ত্রজাত আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে স্থির থাকিতে পারিতেছে না। কল, কারখানা এবং নানাবিধ যন্ত্র নানা কার্য্যের জন্য দেশে সংস্থাপিত হইয়াছে। খনিজবস্তুও আবিষ্কৃত, পরীক্ষিত এবং অবশেষে প্রভূত উপার্জ্জনের সহায় হইতেছে। এই সকল কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত যন্ত্রাদি ইংলণ্ড, আমেরিকা বা জার্ম্মানি দেশ হইতে আসিতেছে। ঐ সকল কর্ম্মের আদত উপাদান গুলি যদি ভারতে উৎপন্ন না হইত, তবে ভারতীয় নামে ঐ কর্ম্মগুলিকে অভিহিত করাই চলিত না। বহুবিধ কৃষি, শিল্প এবং কারুকার্য্যে ভারত আবার পররাষ্ট্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। বোম্বাইয়ের কার্পাস বস্ত্র, বাঙ্গালার পাট মান্দ্রাজ ও যুক্তরাজ্যে আগ্রাও অযোধ্যার চিনি এক্ষণে কেবল ভারতেই বিক্রীত হয় না, প্রভূত পরিমাণে ঐ সকল জিনিষ বিদেশেও প্রেরিত হয়। কাগজের কল, করাত কল, ময়দার কল, চাউলের কল, রেশমের কল পশমের কল, অস্থিচূর্ণ করিবার কল, সাবানের কারখানা, ভাঁটী, গব্যাগার, মৃৎপাত্রের কারখানা, চর্ম্মের কারখানা এবং গালিচার কারখানা প্রভৃতি ভারতের অনেক স্থানে পরিদৃষ্ট হইতেছে। খনির কার্য্যও বেশ চলিতেছে। কয়লা, লোহা, সোণা, সীসা, ঘুটীং, লবন প্রভৃতি নানাবিধ পণ্যদ্রব্য ভারতের খনি হইতে উৎপন্ন হইয়া বিক্রয়ার্থে দেশ বিদেশে যাইতেছে। কৃষিজাত চা, কফি এবং নীলের কার্য্যও বিলাতের কুবের প্রতিম ধনীগণের বিলক্ষণ লাভজনক ব্যবসায়। কিন্তু রত্নপ্রসূ ভারতবর্ষের রত্নভাণ্ডার সমুত্থিত রত্নরাজি সন্তানগণের ব্যবহারে লাগিতেছে না; তাহারা দূর দুরান্তরে নীত হইয়া তদ্দেশবাসীগণের অর্থকোষ পূর্ণ করিতেছে। খনিজ, জমিজ, জনজ আদত উপকরণগুলি আমাদের দেশ হইতে বিলাতে যায় আবার তথা হইতে কলকারখানার সাহার্য্যে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পণ্যে পরিণত হইয়া বিক্রয়ার্থ আমাদের দেশেই আসে আবার কতকগুলি বা এই দেশেই বিলাতি লোকের দ্বারা পরিচালিত বিলাতি কলে সুন্দর দ্রব্যে পরিণত হইয়া ভারতের বাজারেই বিক্রীত হয় এবং তলব্ধ ধন বিলাতে চলিয়া যায়। ভারতীয় শ্রমজীবিগণের হস্তোৎপন্ন দ্রব্য যাহা এককালে জগতের প্রশংসনীয় ছিল, এক্ষণে উৎসাহের অভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে এখনও যে সকল দ্রব্য ভারতে হস্তে প্রস্তুত হয়, তাহাও যদি দেশের লোকে ক্রয় করে এবং রাজকীয় উৎসাহ প্রাপ্ত হয়, তবে আর প্রত্যেক ব্যবহার্য্য জিনিষের জন্য আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষা করিতে হয় না।

(ক্রমশঃ।)

যুবক যুবতাগণ এই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারী হইয়া ভোগ করিতে থাকিবে রাজার বা সমাজের তাহার প্রতিকূল আচার করিবার অধিকার নাই, বরং অবস্থানুসারে তাঁহারা তাহাদের সহায়তা করিতে বাধ্য হন। পাশ্চাত্য দিগের আইনানুসারে যথাক্রমে ২১।১৮ বৎসর বয়সে, যুবক যুবতীগণ অভিভাবকগণের অধীনতা হইতে মুক্ত হয়। এক্ষণে বিচারক্ষম পাঠক বিচার করিয়া বুঝুন যে, এইপ্রকার নবযৌবনের সময় যখন যুবক যুবতীগণের হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্তি জন্মে নাই; কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যাদি সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কতদূর দুষ্কার্য্য, তাহা পাশ্চাত্য সমাজের প্রতি দৃষ্টি করিলে সহজে বুঝা যায়। এই পাশ্চাত্য সমাজে বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীলোক দিগকে স্বাধীনতা দিয়া তাহাদের সমাজের কি প্রকার বীভৎস দৃশ্য হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যুবক যে কোন প্রকার কুসংসর্গে পতিত হউক না কেন, মান, সম্মান, অর্থ যশ প্রভৃতি অর্জ্জন করিবার জন্য—বাধ্য হইয়া নানাবিধ সংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয়, এজন্য—তাহাদের মনের কুবৃত্তিগুলি সর্ব্বতোভাবে একনিষ্ঠ হইতে পারে না; কিন্তু যুবতীগণের যুবকদিগের ন্যায় অন্যান্য কার্য্যে লিপ্ত হইবার আবশ্যকতা না থাকায় সদাসর্ব্বদা, রূপ, যৌবন, বিলাসিতাদিতে মত্ত হইয়া নানাপ্রকার কুপ্রবৃত্তির অনুশীলন অপ্রতিহত ভাবে করিতে থাকে। তাহার ফলে তাহাদের সংসার একেবারে অরণ্যবৎ হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বত্র নানাবিধ কারণে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক আজীবন অবিবাহিতাবস্থায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, ইহার বিষময় ফলে হতভাগিনীদিগের যে কি প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, পাঠকদিগকে কিঞ্চিৎ আভাষদিবার জন্য Dr. Naphey's, M. D. কৃত Physical life of women নামক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত বিখ্যাত পুস্তক হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করা হইল :—

"Of those unfortunate ( unmarried ) who out of despair and disgust of the world jump from bridges or take Arsenic or hang themselves, or in other ways rush unbidden and unprepared before the great judge of all, nearly two third are unmarried, and in some years nearly three fourth.

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, আত্মহত্যার সরকারী তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশের এই প্রকারে যত স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়, তাহার ২।৩ অংশ

অবিবাহিতা। কোন কোন বৎসরে এইরূপ স্ত্রীলোকের মৃত্যুর সংখ্যা ৩/৪ অংশ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই পুস্তকের অপর অংশ, ফ্রান্স বেভেরিয়া, প্রুসিয়া হেনোভার দেশের পাগলা গারদের তালিকায় দেখা যায় যে, পাঁচজন স্ত্রীপাগলের মধ্যে চারিজন অবিবাহিতা ; এই প্রকার অন্যান্য দেশেও পাগলা গারদের তালিকাও তিন চারিজন স্ত্রীপাগলের মধ্যে মাত্র একজন বিবাহিতা। আবার এই হতভাগিনী-দিগের ব্যভিচারের কথা শ্রবণ করিলে একেবারে অবাক্ হইতে হয়। আমেরিকা-বাসীরা আজকাল সর্ব্বপ্রকারে সভ্যতার আদর্শ, স্ত্রীস্বাধীনতার পূর্ণবিকাশের স্থল। এই আমেরিকারনিউইয়র্ক নগরের ১৯০২ সালের গণনায় স্থির হইয়াছে যে, মাত্র এই নগরে ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার বেশ্যা বাস করে, এবং প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে মোড়ে একটী দুইটী করিয়া সুরা বিক্রয় করিবার দোকান আছে, ( Modern medicine ) এই আমেরিকার নিউইয়র্ক ব্যতীত, চিকাগো, ফিলাডেলফিয়া, প্রভৃতি অনেক বড় বড় নগর আছে, তথায় ইহা অপেক্ষা অনেক বেশ্যারবাস; তাহার উপর এই পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী দেশের গৃহস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে চরিত্রহীনা আছে, ইহারা সংগোপনে বেশ্যাবৃত্তি করে, তাহাদের সংখ্যা যে পাশ্চাত্য দেশে অত্যন্ত অধিক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর হতভাগিনী দিগের মধ্যে কেহ যৌবন রক্ষার জন্য, কেহ ভোগ বিলাসিতার জন্য কেহ বা দরিদ্রতা নিবন্ধন অনেক সময় ভ্রূণহত্যা করে, কেহ বা শিশুহত্যা করে। ইহার মধ্যে বিশেষ বিস্ময়ের কথা এই যে, অনেক বিবাহিতা স্ত্রীও বিলাসিতার অনুরোধে এই প্রকার স্বীয় সন্তান হত্যা করে, কেহ বা স্বীয় স্তন দুগ্ধ পান করিতে দেয় না। এই দুশ্চারিণীদিগের ঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব, কিন্তু এই সকল দেশস্থ প্রধান এবং জন সাধারণ এই হতভাগ্য শিশুদিগের জীবন রক্ষার জন্য অনাথ শিশুর ( orphanage ) এবং অন্যান্য যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহার রিপোর্ট পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝা যায়, এই দুষ্কর্ম্মান্বিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যধিক। ইহারা প্রতিদিন রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে সাধারণ রাজপথের পার্শ্বে এই স্বকীয় নিঃসহায় সন্তানদিগের কাপড় চাপা দিয়া রাখিয়া যায়, এবং এই অনাথ আশ্রমের, বেতন ভোগী কর্ম্মচারি গণ, প্রত্যহ প্রত্যেক সাধারণ রাস্তায় অনুসন্ধান করিয়া এই সমস্ত শিশু সংগ্রহ করে। আবার সাধারণ শিশুদিগকে উপযুক্ত আহার ও বস্ত্র দেওয়া হয় কি না, তাহা বাটী বাটী অনুসন্ধান করিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত আছে, তাহাদের রিপোর্টে বিলাসিতা বা দরিদ্রতা জন্য পিতা মাতা সন্তানের প্রতি কত প্রকার

নিষ্ঠুরাচরণ করিতে পারে, তাহার সবিশেষ বিবরণ পাঠ করিলে এদেশের লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে। অনেকেই এই সমস্ত বিষয় অবগত আছেন, এজন্য তাহার বর্ণনা পরিত্যাগ করা হইল। যাহা হউক, এক্ষণকার সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অতিরিক্ত স্ত্রীস্বাধীনতার বিষময় ফল বুঝিয়াছেন। উপরোক্ত পুস্তকের স্থানান্তরে লেখা আছে "The liberty usual in America is some what unheard of, and in conceivable here" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "আমেরিকা দেশে স্ত্রীলোকদিগকে যে প্রকার অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা কেহ কখনও শুনে নাই, এবং এদেশস্থ ( ইংলণ্ডে ) লোকে তাহা মনে ধারণা করিতে পারে না। ফ্রান্স, জর্ম্মানী, স্পেন, প্রভৃতি দেশে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র গঠন করিবার জন্য, যতদিন পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, ততদিন তাহাদিগকে বোর্ডিং স্কুল, ও নানা প্রকার স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার নানাপ্রকার বন্দোবস্ত হইতেছে। এক্ষণ আর পূর্ব্বের মত আইবড়দিগের পরস্পরের হৃৎপরীক্ষার ( Courthsip ) সময় কুমারীদিগকে যথেচ্ছা স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। খুড়ী, জেঠী, মামি, মাসি, প্রভৃতি প্রবীনা কোন স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে কুমার কুমারীর নির্দ্দোষ আলাপ পরিচয় হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এক্ষণ বিচার করিয়া বুঝুন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার দোহাই দিয়া, যাঁহারা এতদ্দেশস্থ স্ত্রীলোকদিগকে, স্বাধীনতা এবং বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহারা কতদূর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই বিবেচনা করুন, বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া জ্বর, ওলাউঠা, প্লেগ, প্রভৃতির কল্যাণে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে মা, মাসি, পিসি, খুড়ী, জেঠী, ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতি নৈকট্য সম্পর্কীয় স্বজনদিগের মধ্যে কেহ না কেহ অল্পবয়স্কা বিধবা বর্ত্তমান আছে! তাহারা তোমাদের ন্যায় মানুষ এজন্য জন্ম সহভূত এবং বয়স সহভূত সমস্ত শারীরিক বৃত্তিগুলিও তাহাদের আছে। বাল্য যৌবন আদি বয়স অনুসারে এই সকল বৃত্তি পরিপুষ্ট হইয়া, তোমাদের ন্যায় তাহাদেরও ভোগ বাসনা অতি প্রবল হয়। যদি তোমরা আত্মসুখে একেবারে বিমুগ্ধ না হইয়া থাক, অন্যের মনোভাব বুঝিবার যদি কোন প্রকার শক্তি থাকে, তবে বুঝুন যে, নাটক, থিয়েটার, বাইনাচ, খ্যামটানাচ, মেয়ে যাত্রা, প্রভৃতি কুবৃত্তি উদ্রেক কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া, সধবাই হউক, আর বিধবাই হউক, কর্ত্তব্যধর্ম্মপরায়ণ গৃহিণী মাত্রের পক্ষে কত অনিষ্টকর যাহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন, তাঁহারা একবার এক্ষণকার বঙ্গসমাজের প্রতি দৃষ্টি করুন, তাহাতে বুঝিবেন যে, যত অধিক পরিমাণে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ

রন্ধন, গৃহমার্জ্জন আদি গৃহকার্য্য, এবং উপবাস ব্রত, নিয়ম আদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া হইতে অবসর লইতেছেন, তত অধিক পরিমাণে পাশ্চাত্য ভাবে ভোগ বিলাসিনী হইয়া হীন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতেছেন।

পূর্ব্ব কালে বেশ্যার স্পর্শ জল গ্রহণ বা বেশ্যার হুকার তামাক টুকু পর্য্যন্ত খাইলে লোকে পতিত ও সমাজচ্যুত হইত, এখন তাহার বিপরীত বেশ্যার পক্ক অন্ন গ্রহণ করিলেও কোন দোষের কথা হয় না। রাজা, মহারাজ, পণ্ডিত, মূর্খ, আদি ব্যক্তিগণ, বেশ্যাদিগকে আজকাল যে প্রকার সম্মান ও প্রচুর অর্থাদি দিয়া উৎসাহান্বিতা করিতেছেন, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে যে পরিমাণে বেশ্যার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ভয় হয়; অচিরাৎ বিদেশী লোকের বাঙ্গালীদিগকে Nation of prostitute (কুকুরের জাত) বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আদম শুমারীর (Census) তালিকায় দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আদি উচ্চশ্রেণীর বেশ্যার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এক্ষণ বেশ্যা বলিলে আমরা কি বুঝিব! বাজারে যে সকল অসংখ্য নাম লেখা প্রকাশ্য বেশ্যা আছে, তাহাদিগকে অনেকেই অবগত আছেন। সংসার জ্ঞান পরিশূন্য স্কুল মাষ্টারগণ এবং তাহাদের ন্যায় কল্পনা প্রসূ ব্যক্তিগণ এই শ্রেণীর বেশ্যাদিগকে গৃহস্থপল্লী হইতে স্থানান্তরিত করিলেই আমাদের যুবক যুবতীদিগের চরিত্র শুদ্ধি হইবে বলিয়া মনে করেন। যদিও ইহা আংশিক সত্য' তথাপি তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষা অপ্রকাশ্য শত্রু অধিকতর ভয়াবহ ত্রিকালদর্শী আর্য্য ঋষি গণ বহু পূর্ব্বে বুঝিয়া গিয়াছেন যে, সমাজ গঠনের প্রধান উপাদান স্ত্রীলোক, আর, স্ত্রীলোকদিগকে পবিত্র রাখা সর্ব্বপ্রকার সামাজিকের প্রধান কর্ত্তব্য। তাই তাঁহারা বিধান করিয়া গিয়াছেন যে, নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির বাটীতে কুলললনা এক রাত্রি মাত্র বাস করিলে তাহারা পতিতা হইবে, অর্থাৎ একদিনের পরে এই পতিতা স্ত্রীলোকের হস্তের জল পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য এই ব্যবস্থার প্রতিকূলে সমাজ সংস্কারকগণ কলিকাতায় সভা সমিতি করিয়া এই সুব্যবস্থার পরিবর্ত্তে, ইহার কুট ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া চাকরানী ও রাধুনী দিগকে পরিবার মধ্যে নিযুক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত করেন; তাঁহাদের যুক্তির এই যে, শাস্ত্রে ধর্ম্ম, সম্পর্ক অতি পবিত্র সম্পর্ক বলিয়া উল্লেখ আছে। এই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া চাকরানী বা রাধুনীগণ বাটীর কর্ত্রীকে ধর্ম্মমাতা বলিয়া ধর্ম্মসম্পর্ক সংস্থাপন করিয়া তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিবে, এবং কর্ত্রী এই চাকরানী ও রাধুনীকে ধর্ম্ম কন্যা অর্থাৎ ঝি বলিয়া সম্বোধন করিলে আর কোন দোষ থাকিবে

না। এজন্য কলিকাতায় চাকুরানীদিগকে ঝি এবং রাঁধুনীদিগকে বামুনমেয়ে বা বামুন-ঝি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, আর্য্য ঋষিগণের বাক্য অবহেলা করিয়া এই প্রকার ঝি এবং রাঁধুনীদিগকে পারিবারিক কার্য্যে নিযুক্ত করিবার প্রথা অতি অল্পদিন হইতে প্রচার হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাহার বিষময় ফলে আজকাল কলিকাতায় অসংখ্য ঝি ও রাধুনি কার্য্য উপলক্ষে বাস করিতেছে এবং প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে অন্তঃপুরবাসী পরিবারবর্গের সহিতও বাস করিতেছে। ইহাদের চরিত্র বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে সকলেই বুঝিবেন যে, ইহাদের মধ্যে অনেকেই চরিত্রহীন রীতিমত প্রকাশ্য বেশ্যা, আর যাহারা রাত্রি দিনের ঝি তাহারাও অপ্রকাশ্য বেশ্যা। বাজারের নাম লেখা প্রকাশ্য বেশ্যা অপেক্ষা এই প্রকার ঝি-রূপী বেশ্যা অধিক অনর্থের মূল, তাহা চিন্তাশীল মাত্রেই অবগত আছেন। যে কুলাঙ্গার বঙ্গবাসী একমাত্র বিলাসীতার প্রশ্রয় দিবার জন্য, মা, মাসি, পিসি, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগকে, ঝি রাধুনিরূপী বেশ্যার সংস্পর্শে দিবারাত্র রাখিতে লজ্জা কিংবা শঙ্কা করে না, তাহারা কি কখন স্বদেশী হইতে পারে! তাহারা যতই ধনী, যতই মানী হউন না কেন, যতই পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হউন না কেন, প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট তাহারা পশুবৎ ঘৃণিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গৃহকর্ম্মে, রন্ধন কার্য্যে, এবং অন্যান্য নিতান্ত আবশ্যকীয় কার্য্যে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ সম্পূর্ণ অপারক তবে পাশ্চাত্যভাবে মেমসাহেবদের অনুকরণ করিয়া সুসজ্জিত গৃহে জীবন্ত পুতুল সাজিয়া সমাগত লোকদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে বিশেষ পারদর্শিনী তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই শ্রেণীস্থ আদর্শ মহিলাগণ যদি হিন্দু প্রভৃতি রক্ষণশীল (Conservation) সমাজের তীব্র গঞ্জনায় সঙ্কুচিত হইয়া না চলিতেন, অথবা দেশস্থ হিন্দু যদি এই সমাজভুক্ত হইতেন, তাহা হইলে, গতত্রিশবৎসর হইতে উপস্থিত সময় পর্য্যন্ত এই অল্পকাল মধ্যে এই আদর্শ মহিলাগণ সমাজ এবং গৃহস্থ আশ্রমে কি প্রকার বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিতেন, চিন্তাশীল এবং ভুক্তভোগী মাত্রেই অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিতেন। যাঁহারা ইহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা কল্পনা সাহায্যে বুঝুন যে, উন্নতিশীল সমাজ বিজ্ঞানের অনুরোধে বা সাহেবদের অনুকরণে বাল্য বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক, বিজ্ঞান অনুসারে বলিতে গেলে বুঝিতে হইবে, ২০ হইতে ২৫ বৎসর স্ত্রীলোকের বিবাহের সময়।

কিন্তু উন্নতিশীল সমাজ দ্বারা যুবক যুবতীগণকে যথাক্রমে ১৮।২১ বৎসর বয়সের পর মা-বাপের অধীনতা হইতে সম্পূর্ণ যদি মুক্ত করা হইত তাহা হইলে স্বাধীনতার অধিকার অনুসারে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় আমাদের সমাজের সহস্র সহস্র অবিবাহিতা যুবতীগণ, হাটে, ঘাটে, মাঠে, ইত্যাদি সুস্থান কুস্থানে স্বাধীনভাবে যদি বিচরণ করিতে পারিত, তবে আজ হিন্দু পরিবারের কি দুর্দ্দশা ঘটিত।

আজকাল যে প্রকার দেশস্থ লোক স্বদেশী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার সুধাময় ফল এই যে যাহার যেরূপ জ্ঞান, তিনি সেই প্রকার আপন দেশের তত্ত্ব অনুসন্ধানি হইয়াছেন, তাই আমরা বিচক্ষণ পাঠকদিগকে দেখাইতেছি, পূর্ব্বকালের আর্য্যঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর গবেষণা করিয়া সমাজ গঠন প্রণালী এবং বিবাহ প্রথা, যে অক্ষয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক চক্ষে সমালোচনা করিলে, তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া মনে হইবে। তাঁহাদের মতে বিবাহের প্রথা এবং প্রধান শিক্ষা "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" অর্থাৎ পুত্রের জন্য স্ত্রীর আবশ্যক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্ত্রীরগর্ভে পুত্র উৎপাদন করাই, পুরুষের বিবাহ করার প্রধান উদ্দেশ্য, পুরুষের এই পুত্রোৎপাদনে করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য উপনিষদ্ এবং পুরাণ আদি প্রবৃত্তি ধর্ম্ম শাস্ত্রে নানাবিধ প্রকার উৎসাহ জনক উপদেশ দেওয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ পুংনামক অতিশয় দুঃখজনক নরক হইতে উদ্ধার করে যে, তাহাকে পুত্র বলে। এক্ষণ ইহার পৌরাণিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া বুঝিতে গেলে দেখা যায়, হিন্দু ঋষিগণ ব্যক্তিমাত্রকেই বিবাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কাহাকেও Bachelor অর্থাৎ অবিবাহিতা অবস্থায় বাস করিতে উপদেশ দেন নাই। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বহুকালব্যাপী পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন, অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রী কেহই বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী নহে। বিজ্ঞান আরও বুঝাইয়াছেন, জগতে অধিকাংশ সৎকার্য্য বিবাহিত দিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় বলিলে বিবাহিতদিগের মধ্যে অধিক দৃষ্ট হয়।

সন্তান—অর্থাৎ পুত্র এবং কন্যা পিতার সম্পত্তির স্বরূপ, কখন তাহাদের Indiveinal right of independence নাই, আজীবন সন্তান পিতার অধীন, তাহার সুখময় ফলে যুবক যুবতীগণকে বাধ্য করিয়া ...

কন্যা উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রে স্বীয় কন্যাকে সর্ব্বতোভাবে দান করিবার অধিকার পিতাকে হিন্দুশাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে ১৮ বৎসর বয়সে কন্যা সম্পূর্ণ স্বাধীন, কখন কাহারও দান করিবার অধিকার নাই।

স্ত্রীঃ—বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি স্বরূপ, নিষ্কাম ভাবে স্বামী সেবাই তাহার জীবনের ব্রত। স্ত্রী, স্বামীর এত অধীন যে, তাহার পুত্র এবং কন্যার উপর স্বামী বর্ত্তমানে তাহার কোন অধিকার নাই।

বিধবা স্ত্রী :—বিধবা স্ত্রী স্বামীর পাপক্ষয় কামনায় আজীবন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কিন্তু ইহার বিপরীত ব্যভিচারিণী হইলে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে অপুত্রক বিধবা, স্বামীর বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে না। কাজেই বিধবাগণের ধন লালসায় এবং কলঙ্ক ভয়ে সংযমী হইয়া চলিতে হয়। অধিকন্তু ব্যভিচারিণী শাস্ত্রানুসারে জন্মের মত পতিতা, সুতরাং হিন্দু সমাজে তাহারা আজীবন ঘৃণিতা। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এদেশে বহুকালের বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বিনী স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়া ভদ্রসমাজে কখন প্রচলিত হইতে পারে না।

এক্ষণ যাহাদের স্বদেশের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ আছে, যাহাদের কিছুমাত্র বিচারশক্তি আছে, স্বদেশী আন্দোলনে যাহাদের কিছুমাত্র অন্তর্দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, একবার বুঝিয়া দেখুন সহস্র সহস্র বৎসরাবধি যে নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া, যে আর্য্যজাতি যে সমাজ গঠন করিয়া দৈহিক সাংসারিক, আধ্যাত্মিক, এবং পারত্রিক আদি সর্ব্ববিষয়ে জগৎকে প্রাধান্য দেখাইয়াছিলেন আমরা সেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শস্থানীয় আর্য্যজাতির বংশধর হইয়া, পাশ্চাত্য সংস্রবে, সমাজের অন্তঃসারশূন্য বাহ্য চাকচিক্যের রূপজ মোহে পতঙ্গবৎ বিমোহিত হইয়া, আমরা সর্ববিষয়ে আত্মহারা হইয়া এরূপ অধঃপতিত হইয়াছি যে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতি আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়! এক্ষণ ধনী, নির্ধন, উত্তম, অধম, পতিত, মূর্খ, সকলেই একবার একমত হইয়া ভাবিয়া দেখুন, আমাদের সমাজ কি ছিল, কি হারাইয়াছি।

—:০:—

# গুপ্ত রসায়ন।

লেখক—শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

প্রতিভাশালী সুচিকিৎসক এবং চিন্তাশীল সুযোগ্য লেখক আমাদের পরম বন্ধু শ্রীমৎ ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন, এম, ডি, মহাশয় ইতিপূর্ব্বে "জন্মভূমি" পত্রিকায় "ভারতবাসীর রসায়ণ সেবনের আবশ্যকতা" শীর্ষক যে অতীব উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। হেমবাবু কেবল সুচিকিৎসক বা চিন্তাশীল লেখক নহেন, তিনি একজন আনুষ্ঠানিক হিন্দু এবং যোগী ও সাধক। শ্রীমৎ সেন মহাশয় স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সুচিকিৎসা শাস্ত্রে যেমন পারদর্শী, তেমনি উভয় দেশের ভাষাতেও উৎকৃষ্ট অধিকারী। হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রেও তাঁহার জ্ঞান অল্প নহে, সুতরাং এরূপ বহুদর্শী পণ্ডিত, সুচিকিৎসক এবং সাধকের উপদেশ সকলেরই শিরোধার্য্য বলিয়া গণ্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমিও কতকগুলি রসায়ণের কথা উল্লেখ করিতে বাসনা করি। এই রসায়ণ গুলি অতিশয় গুপ্ত; এবম্প্রকার বহু রসায়ণ অপ্রকাশিত আছে, এবং রসায়ণ সম্বন্ধীয় অনেক প্রাচীন গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত বা প্রচারিত হয় নাই। সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশ, যোগী প্রভৃতি এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ; তাঁহাদের অনুগৃহীত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দুই একজন কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। আমি যে কয়েকটী রসায়ণের কথা লিখিতেছি ইহা তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত রসায়ণ; অবধূত দিগের মধ্যে এই সকল রসায়ণ সচরাচর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য সাধু পুরুষগণ রসায়ণ ঔষধের কথা প্রায়ই প্রকাশ করেন না, সুতরাং সর্ব্ব সাধারণের নিকটে ইহা অবিদিত থাকে। বিধিমত রসায়ণ ব্যবহার না করিলে রসায়ণ দ্বারা ঘোরতর বিপদ সংঘটিত হয়, এই জন্য অবিধিমতে রসায়ণ ব্যবহার করা অপেক্ষা ইহা ব্যবহার না করাই ভাল। রসায়ণ ব্যবহারের নিয়ম গুলিও কঠিন। সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ও সম্পূর্ণ সাত্বিকতা না থাকিলে রসায়ণে কোন ফলই হয় না, বরং অনিষ্টই হইয়া থাকে। প্রতি পদে সংযম অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়।

শ্রীমৎ সেন মহাশয়, রসায়ণ সেবন কালে যে সকল প্রধান নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রসায়ণ সেবনের পূর্ব্বে এবং পরে (এই উভয় কালেও) কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পালন করা আবশ্যক, নতুবা রসা-

হইয়া গিয়াছেন। রসায়ণ সেবনের পূর্ব্বে তীব্র বিরেচক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেহকে শুদ্ধ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমে জোলাপ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করা আবশ্যক; জোলাপ ব্যবহারের পরবর্ত্তী চতুর্থ দিবসে পুনরায় মৃদু জোলাপ ব্যবহার করার বিধি আছে। তদনন্তর দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত লঘু দ্রব্য আহার করিয়া প্রাতঃকালে উষ্ণ জল সহ নিম্ব পত্র সিদ্ধ করিয়া ঐ জল অর্দ্ধপোয়া মাত্র সেবন করিতে হয়। তৎপর দিবস হিঞ্চি (হেলেঞ্চা বা হিংচা) ঐরূপে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া মাত্র ক্বাথ সেব্য। তদনন্তর কল্মী বা নটে শাক, তৎপর দিবস উচ্ছে (অথবা করেলা ফল কিম্বা তাহার পত্র) ঐ রূপে সেবনীয়। ইহার পরবর্ত্তী দিবসে পটল কিম্বা পটলপত্র (পল্‌তা) ঐ বিধি অনুসারে সেব্য। তদনন্তর চিরেতার ক্বাথ শীতল জল সহ ব্যবহার করিতে হয়। সপ্তম দিবসে দশ বিন্দু ঘৃত ও দশবিন্দু মধু; এক পোয়া উষ্ণ গব্য দুগ্ধ সহ সেবন করিবে। এবম্প্রকারে সাত দিন গত হইলে পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত, মাখন, পনির, গব্যদুগ্ধজ তক্র (ঘোল) এবং ঘৃতপক্ক ভোজ্যাদি ব্যবহার করিবেন। এই রূপে দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহকে শোধন করিয়া লইয়া রসায়ণ সেবন করা আবশ্যক। সাধুরা রসায়ণ সেবনের পূর্ব্বে এই বিধি অবলম্বন করিয়া থাকেন। এতদ্বারা তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি, দন্তের সামর্থ, মেধা, বল, চিন্তাশক্তি, সংযম সামর্থ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা অত্যন্ত অধিক বয়ক্রমেও চক্ষে চশ্‌মা ব্যবহার করেন না এবং তাঁহাদের স্মরণশক্তি ও দাঁতের সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু তাঁহাদের রসায়ণ প্রায়ই গুপ্ত। যাঁহারা প্রকৃত যোগী তাঁহাদের পক্ষে বৃষ্যকরণ, বাজীকরণ, রসায়ণ প্রভৃতি ঔষধের আদৌ প্রয়োজন হয় না। যোগী পুরুষেরা একমাত্র "যোগ" সাহায্যে শত সহস্র রসায়ণ অপেক্ষাও মহত্তর ফল ভোগ করেন।

রসায়ণ সেবনের পরে কেহ ৪১ দিন, কেহ তিন মাস, কেহ ছয় মাস, কেহ বা একবর্ষকাল পর্য্যন্ত কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। এক বৎসরের অধিক কাল ব্যাপিয়া নিয়ম রক্ষা করিতে হয় না। রসায়ণ সেবনের পরে পুষ্টিকর অথচ সাত্বিক আহার্য্য দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। হস্তী বা উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহন নিষিদ্ধ। পদব্রজে সুদীর্ঘ ভ্রমণ অবিধেয়। উগ্র ব্যায়াম অনিষ্ট জনক। গব্য দুগ্ধ অথবা গব্য ঘৃত প্রতিদিন সেব্য। গাত্রের আবরণ যত পাৎলা হয় ততই ভাল, একেবারে অনাবৃত শরীরে থাকিতে পারিলে আরও অধিক উপকার পাওয়া যায়। প্রভাতের নির্ম্মল বায়ু প্রত্যহ অবশ্য সেবনীয়। নিশিকালে শর্করা

নিম্নে কয়েকটি রসায়নের পরিচয় দিতেছি। প্রথম—"গঙ্গজরা"। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র ইহা এই নামেই সুপরিচিত। ইহা এক প্রকার তৃণ বিশেষ, দূর হইতে দেখিলে ধান গাছ বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু ধান গাছে এমন গুচ্ছ থাকে না। ধানের শিষের মত ইহার সুদীর্ঘ শীষ হয় কিন্তু ফল, ফুল বা শস্য জন্মে না। শীষ বা পাতায় অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোঁয়া বা শোঁয়া থাকে, অসাবধানতা সহকারে হাত দিলে হাতে শোঁয়া লাগে; ছোট ছোট বালক বালিকার হাত কাটিয়া যাইতে পারে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই তৃণের জীবন; একবার জন্মিলে শীঘ্র শুখাইয়া মরিয়া যায় না। অনেক দেশের লোকে ইহার পাতা বাঁটিয়া গরম জল সহ জরাক্রান্ত রোগীকে খাইতে দেয়। ইহা জ্বর রোগের একটা ঔষধ, কিন্তু জরা জীর্ণের পক্ষে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। ইহার মূল, পত্র এবং গুচ্ছের মধ্যাংশ সমপরিমাণে লইয়া ঘোলসহ সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়; সুসিদ্ধ হইলে শর্করা সহ ঐ ঘোল ব্যবহার্য্য। পঞ্চদশ দিবস ব্যবহার করিলে মহোপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা আশুফল প্রদ। ইহার গুণ অত্যন্ত বিস্ময় জনক।

দ্বিতীয়তঃ।—চিত্রামূল। ভাষা কথায় ইহা "রাংচিতে" বলিয়া পরিচিত। ইহার মূল এক ছটাক পরিমাণে লইয়া মৃদু অগ্নিতে উত্তমরূপে ভস্ম কর, তদনন্তর চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লও। ঐ চূর্ণের সহিত, অতি পুরাতন এক খণ্ড লৌহ রাখিয়া, একটা মৃণ্ময় পাত্রের ভিতর এক সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত বদ্ধ করিয়া রাখ। দেখিবে, ঐ লৌহে ঐ চূর্ণ আকর্ষিত হইয়া উহার সহিত সম্মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং লৌহের বর্ণও কিয়ৎ পরিমাণে লোহিত হইয়া গিয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া ঐ লৌহ খণ্ড এক পোয়া গব্য দুগ্ধে দশ পনর মিনিট কাল পর্য্যন্ত ফেলিয়ারাখ, তদনন্তর ঐ দুগ্ধ মাত্র পান কর, এই রূপে একমাস সেবনীয়। একমাসের পরে ঐ লৌহ খণ্ড অব্যবহার্য্য। উহাতে আর কোন গুণ থাকে না।

তৃতীয়তঃ ——"সন্ধ্যা হরিতকী"। প্রত্যহ সায়াহ্নে (সূর্য্যাস্তের অল্প পরে) একটি বড় হরিতকী গব্যঘৃতে উত্তম রূপে ভাজিয়া লও; ভাজা শেষ হইলে চিম্টা দ্বারা ঐ হরিতকীকে ধরিয়া জলন্ত অগ্নির উপরে রাখ। সুন্দর রূপে ভস্ম হইয়া গেলে ঐ ভস্ম "মাখন তোলা গব্য ঘৃত" সহ মিশাও, তদনন্তর কয়েক বিন্দু উৎকৃষ্ট মধু উহার উপরে ফেলিয়া দিয়া অন্ততঃ অর্দ্ধ সের (এক সের হইলে ক্ষতি নাই) [illegible] মিশাইয়া দিয়া ঐ দুগ্ধ তৎক্ষণাৎ পান কর। প্রত্যহ সায়ংকালে

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ণের নাম "কায়া কল্প"। মহাপুরুষগণ ভিন্ন অপরে ইহা জানে না এবং জানিতেও পারে না। যদি সুবিধা হয়, বারান্তরে ইহার প্রক্রিয়া মাত্র লিখিতে পারি, কিন্তু উপাদান সমূহ আমিও সম্পূর্ণ রূপে জানি না।

—:•:—

# গীত।

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্চী বিরচিত।

যে জন শ্যামা ভজে তোরে
সে কি মা শমনে ডরে।
সে শমনের শমন করে—
আপন মনে হাসে অন্তরে।
তোর ভাবে মা বায় ভোলা মন
সে যে বাবা ভোলার মতন
সেজে যোগী এ বন সে বন
তোর প্রেমরস সেবন করে।
তুই যারে ছুঁয়েছিস তারা—
সে আনন্দে মাতোয়ারা—
নইলে কেন কাটামুণ্ড হাস্‌বে
মা তোর হাতে করে।
শোন্ মা বলি মহামায়া—
দে মা তোর পদ ছায়া—
আমি রাখি এই ধূলার কায়া
ধূলা খেলা সাজ করে॥

—:•:—

## কদম্বতলে মিলিতাঙ্গ রাধাশ্যাম।

( সম্মুখে পঞ্চ সখি )

প্রথম সখি।—

কে তুমি হে তরুবর! কুঞ্জবনে দাঁড়াইয়ে,
কুঞ্জ করিতেছ আলো, রাধা লতা জড়াইয়ে?
শাখা পত্র প্রেমভরে প্রেমপথ দেখাইয়ে,
ডাকিয়াছে মোসবারে প্রেমরসে গলাইয়ে।

( তরু নীরব )

দ্বিতীয়া সখি।— ( সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিয়া )

না সখি! ও তরু নয়, তোমার নয়ন
ধাঁধিয়াছে, করিতেছে তরু দরশন!
তরু বটে! জান সখি! যে সে তরু নয়,
প্রেমকুঞ্জ কল্পতরু, নিকুঞ্জে উদয়!
আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র তরুরূপে সাজি,
কুঞ্জে গোপ-বালা কুলে ছলিছেন আজি।
বড় ভাগ্যবতী সতী বৃকভানু সুতা—
লতারূপে রাধালতা, প্রেমে অভিভূতা!
আমরাও ভাগ্যবতী, প্রেমের নয়নে
হেরিতেছি তরুলতা মধু-কুঞ্জবনে!
প্রেমতরু, প্রেমলতা, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী,
শ্রীঅঙ্গে শ্রীঅঙ্গ বেড়া, যুগল মুরতি!

তৃতীয়া সখি।—

তাই বটে! ঠিক তাই! বুঝিনু ললিতে।
আসিয়াছি কৃষ্ণ প্রেমে ঢলিতে ঢলিতে,
কোথা কৃষ্ণ! এস কৃষ্ণ! বলিতে বলিতে,
হোচট খেয়েছি কত চলিতে চলিতে,

---

* এই দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণ অচল, রাধিকা অচলা। প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণকে বৃক্ষ-কল্পনা করিয়া সখিগণ সরলপ্রাণে সম্ভাষণ করিতেছে।

রাধালতা জড়াইয়া, গলাগলি করি,
আমাদের নেত্রপথে দিলা দরশন,
নেহারি ও তরুলতা জুড়াল নয়ন!
প্রেম পুষ্পাঞ্জলি পদে করি সমর্পণ,
এস সখি! ভক্তিভরে পুজি শ্রীচরণ।

চতুর্থ সখি।— ( পুষ্পাঞ্জলি দিয়া করজোড়ে )

লহ তরু, লহ লহ, কুসুম অঞ্জলি,
তরু সাজিয়াছ হরি, তাই তরু বলি।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি, বৃন্দাবন ধন,
আমরা তরুণী তরু! তব পাদ তলে—
কৃষ্ণ প্রেম ভিক্ষা করি, বস্ত্র দিয়া গলে!
নমি সবে, তরুবর! বৃন্দাবন চাঁদ,
কল্পতরু রূপে তরু! পূর্ণ কর সাধ!
বৃন্দাবন চন্দ্র তুমি, তাই মোরা জানি,
চাঁদে উপহার দিতে বন ফুল আনি;
আর কি কোথায় পাব, আছে কিবা আর,
গোপীদের মনঃ প্রাণ, সকলি তোমার।
লোকে বলে বিশ্বময়, তুমি বিশ্বেশ্বর,
যে বলে বলুক যাহা, তুমি তরুবর,
জানি মোরা শুধু তুমি বৃন্দাবনেশ্বর,
তুমি শুধু আমাদের, আর সব পর!
গরবে আমরা জানি, আমাদের হরি,
কৃষ্ণ প্রেম পাবো বোলে আছি আশা ধরি।
খেলা করি, ছলা করি, প্রেমে যাই গলে,
প্রেম রোষে নিন্দা করি ননী চোরা বলে,
যা করি তা করি হরি! ভজিব তোমারে,
আর কোন সাধ নাই এ ভব সংসারে!
চাহিনা মর্ত্তের সুখ, বাসনা বিলাস,

নাহি চাহি পতি পুত্র, আত্ম পরিজন,
নাহি চাহি সংসারের অচ্ছেদ্য বন্ধন।
নাহি চাহি প্রতিবাসী, সুহৃদ বান্ধব,
নাহি চাহি শুনিবারে ভব কলরব,
নাহি চাহি ধর্ম্ম শাস্ত্র, কল্পিত পুরাণ
নাহি চাহি তুমি ছাড়া কোন তীর্থ স্থান;
মহাতীর্থ বৃন্দাবন, যথা থাক তুমি,
ধন্য ধন্য আমাদের বৃন্দাবন ভূমি!
পৃথিবীর রাণী হয়ে স্বর্গ যদি পাই;
কৃষ্ণপ্রেম হারাইয়ে কিছু নাহি চাই!
কৃষ্ণ! বড় ভয় করে, তুমি দয়াময়,
কিন্তু কৃষ্ণ, তব দয়া পাইবার নয়!
ভক্তি দিয়া দয়া লাভ, মূল মন্ত্র মানি,
কৃষ্ণ ভক্তি কোথা পাব, কিবা তত্ত্ব জানি!
পথে যেতে পথ ভুলে বাঁকা পথে যাই,
দুষ্টের কুহকে পড়ে তোমারে হারাই,
দায়ে পড়ে দীনবন্ধু তব নিন্দা গাই,
আয়ানের মুখে শুনি কলঙ্কিনী রাই!
গুরু লঘু কি বলিব, অজ্ঞান তাড়নে—
সবাই তোমার নিন্দা ঝঙ্কারে বদনে!
ভয়ে ভয়ে আমারও সায় দিয়ে যাই,
সে পাপে কি পার আছে? কোন গতি নাই!
কলহ, বিবাদ, নিন্দা, হিংসা অনিবার,
কলুষে পূরিত এই নশ্বর সংসার;
কেবল কলুষহারী, তুমি হে রাখাল!
তোমার বাঁশরী রবে মোহিত গোপাল,
তোমার বাঁশরী রবে গোঠে নাচে গরু,
তারা জানে এ রাখাল বাঞ্ছাকল্পতরু।

পঞ্চম সখি।—

আমরা দুঃখিনী গোপী; চিনি না তোমায়,
আয়ানের নারী বলে চিনি রাধিকায়;

রাধা জানে কৃষ্ণপ্রেম, তাই মনে করি,
মনে হয় ভাগ্যধরী ব্রজের কিশোরী।
তাত নয়, তরুবর! জড়ায়েছ বটে,
কিন্তু হরি আছে কি তা রাধিকার ঘটে?
সত্য কিহে কৃষ্ণপ্রেম পেয়েছে রাধিকা?
মিথ্যা কথা! জু জু ভয়ে লাগে ভ্যাবা চ্যাকা!
তোমাতেও ভয় আছে, ভব ভয় হারি!
বাক্য আছে, বিনা ভয়ে বলিতেও পারি।
মনে কর, তরুবর! সেই একদিন,
এই কুঞ্জে যেই দিনে রুষেছিল তিন,
জটিলা, কুটীলা, আর দুরন্ত আয়ান,
গেয়েছিল লইবারে রাধিকার প্রাণ;
মনে কি পড়ে সে দিন, ওহে বনমালী,
আয়ানের ভয়ে হেথা সেজেছিলে কালী।
ভয়ে ভয়ে রাধারাণী বসিয়ে তথায়,
ফুলাঞ্জলি দিয়েছিল কালিকার পায়!
বুঝা গেছে, কৃষ্ণপ্রেম পায় নাই রাধা,
কথা মাত্র শ্রীরাধিকা শ্রীঅঙ্গের আধা।
পিপাসী চাতকী যথা মেঘ পানে চায়,
আমরাও সেইরূপে ধেয়াই তোমায়।
মেঘোদয়ে চাতকীর যেমন উল্লাস,
তেমতি উল্লাসে মোরা পূর্ণ করি আশ;
নব জলধর তুমি, নব তরুবর!
তোমারে হেরিলে হয় প্রফুল্ল অন্তর,
তাই হেরিবারে আসি গৃহকার্য্য ছাড়ি,
ছেলে মেয়ে কাঁদে, কারো ভেঙ্গে যায় হাঁড়ি;
তোমারে পড়িলে মনে, মিছার সংসার—
একেবারে ভুলে যাই; সব ফকিকার
লাগে চক্ষে, বুদ্ধি শুদ্ধি হারা হয়ে যাই,

রাধিকার সখি মোরা, তোমার কিঙ্করী,
কৃপাকর কৃপাসিন্ধু, প্রণিপাত করি।
বলেছি মনের কথা, বলি হে আবার—
চাহিনা বিলাস ভোগ; চাহিনা সংসার,
এই ভিক্ষা দাও কৃষ্ণ; মিনতি চরণে,
কৃষ্ণ প্রেম থাকে যেন জীবনে মরণে!
এইবর দাও কৃষ্ণ, এই ভিক্ষা দাও,
প্রেম পিপাসিনী কুলে কৃপাদৃষ্টে চাও!
হয় যেন আশাপূর্ণ, তোমার কৃপায়,
গোপীদের কৃষ্ণ, যেন জগজ্জনে গায়।

—:০:—

# রংমহলে প্রেম।

## লেখক—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

যথারীতি এক এক করিয়া, লিউকস ও জুলিয়ানের পরিচয় জুলেকার নিকট দেওয়া হইল। যুবকদ্বয় বিনীত ভাবে যুবতীকে অভিবাদন করিলেন, জুলেকাও স্বীয় লজ্জাবনত মুখ ঈষৎ উন্নত করিয়া, ঘাড় নাড়িয়া প্রত্যেকের অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। শেষে গুলনেয়ার ও থির্জার দিকে চাহিয়া, একটু লজ্জিতভাবে অথচ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"ছি ভাই, আমাকে এমনকরে হঠাৎ লজ্জা দেওয়া তোমাদের ভাল হইল কি? ভগিনিদ্বয় হাসিলেন। তাহাদেরও মুখে লজ্জা প্রকাশ পাইল। অবশেষে সকলে উপবেশন করিলেন। খালিল জুলেকার পার্শ্বে বসিলেন, জুলিয়ান ও থির্জা এবং গুলনেয়ার ও নিউকস পৃথকভাবে পরস্পরের একটু একটু দূরে উপবেশন করিয়া, মৃদু মন্দস্বরে প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। এই সুযোগে আমরা যুবতীদিগের রূপ লাবণ্যের কথা একটু বিস্তারিতভাবে পাঠককে জানাইয়া রাখি। যে কক্ষে প্রণয়ীরা বসিয়াছেন। সেটী যে অতি প্রসস্ত ও বহুমূল্য দ্রব্য সম্ভারে সুসজ্জিত তাহা নিউকসের মুখে পূর্ব্বেই পাঠক ...

সুন্দর পর, চিত্ত বিনোদন মছলন্দ, বিচিত্র ঝিচিত্র গালিচা ও নানা বর্ণের কাপড় পর্দা চারিদিকে সজ্জিত রহিয়াছে। মূল্যবান্ বিবিধ অলঙ্কার যে কত স্থানে রহিয়াছে তাহারও ইয়ত্তা নাই। এক পার্শ্বে এক খানি টেবলের উপর সুস্বাদু সুরাত খাদ্যাদি প্রস্তুত রহিয়াছে, এক কোনে একটী ফোঁয়ারায় নিরন্তর জল পড়িতেছে। সহসা সে দিকে দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন শূন্য হইতে শ্বেতপুষ্প বৃষ্টি হইতেছে। আতর দানিতে স্থানে স্থানে গোলাপী আতর রহিয়াছে। কক্ষটী যেমন শীতল সুগন্ধি, তেমনি আমোদিত।

ডলতাবান পাশার জ্যেষ্ঠ কন্যা গুলনেয়ারের বর্ণ অতি মাত্র উজ্জ্বল। দেখিলে চক্ষু ঝল্সাইয়া যায়। কেশ পাশ তত নিবিড় না হইলেও মস্তকের শোভার বিঘ্ন ঘটায় নাই। যুবতী আকারে দীর্ঘ। অঙ্গ সৌষ্টব থাকায় সে টুকু বেশ ঢাকিয়া গিয়াছে। তাহার সহোদরা থির্জার কেশগুলি কিছু কটা কটা। কিন্তু সেগুলি তাহার সুগঠিত উন্নত কপালের উপর পড়িয়া, মুখের বড়ই শ্রী সম্পাদন করিয়াছে তাহার বর্ণও গুলনেয়ারের মত উজ্জ্বল নহে। জ্যেষ্ঠার বর্ণ তুষার রাশির ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণ; কনিষ্ঠের বর্ণ ঈষৎ মলিন। গণ্ড স্থলে ফুটন্ত গোলাপী আভা, কনিষ্ঠার কপোল দেশ জায়ত্রী ফুলের ন্যায় আরক্তিম। জ্যেষ্ঠার ন্যায় কনিষ্ঠার শরীরে যৌবন এখনও পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। কনিষ্ঠা কিছু কৃশাঙ্গী। কৃশাঙ্গী হইলেও ক্ষীণাঙ্গী নহে। ঈষৎ উন্নত বক্ষস্থল দেখিলে, বিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন, যৌবনের পূর্ণ বিকাশ হইলে, শরীরে রূপ ধরিবে না। উভয় ভগ্নিরই নেত্রদ্বয় আকর্ণ বিশ্রান্ত ও নীলাভ। উভয়েরই দন্তপাতি সুন্দর ও শুভ্র। কাহার কোন অঙ্গেই খুঁত নাই। যেমন সুগোল বাহু, তেমনি সুগঠিত চরণদ্বয়। জ্যেষ্ঠার মুখ গহ্বর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, কনিষ্ঠার ওষ্ঠদ্বয় বিম্বের ন্যায় রক্তবর্ণ।

তাহাদের পিতৃস্বসা তন্বী জুলেকার সৌন্দর্য্য ভিন্ন রকমের। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি তরঙ্গাকারে স্কন্ধদেশ ব্যাপিয়া পৃষ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে। বাদামাকৃতি সেরূপ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হরিণ নেত্র কেবল এই সকল রমণীতেই দেখা যায়। তাহার ধনুকের ন্যায় ভ্রূযুগল দেখিলে বোধ হয় যেন কেহ চিত্র করিয়া রাখিয়াছে। সুবিমল সে নয়ন দর্পণে হৃদয়ের সমস্ত ভাব প্রতিফলিত হইতেছে। পক্ষ্মগুলি সুদীর্ঘ ইচ্ছামত তদ্দ্বারা নেত্রাবরণ করিয়া মনের ভাব গোপন করা অনায়াস সাধ্য। মুখের গঠনের কথা কি বলিব, কন্দর্পের ধনু তাহার নিকট লজ্জা পায়। অধরোষ্ঠ প্রবালকে গঞ্জনা দেয়।

স্পর্দ্ধী বক্ষস্থল কাঁচলির সাহায্য বিনাও পৃথক ভাবে সমুন্নত। বর্ণ স্বভাবতই একটু ফিকা। কিন্তু শোণিত শূন্য মৃত দেহের ন্যায় সাদা নহে। সুনিপুণ কারিকরের গঠিত শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি সচরাচর যেরূপ মসৃণ, যেরূপ উজ্জ্বল হয়, এ বর্ণ সেই রূপ উজ্জ্বল। আকৃতি নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব্ব। কিন্তু ক্ষীণ মধ্য ও সুগোল সুললিত বাহুতে তাহাকে অপেক্ষাকৃত একটু দীর্ঘাকৃতিই দেখায়। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সেই যুবতীর স্বরের মধুরতার কথা লিখিয়া জানাইবার সাধ্য আমাদের নাই। কথা কহিবার সময় বোধ হয় যেন শ্বেত প্রস্তর নিঃসৃত শুভ্র বারিরাশি ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। ঈষৎ হাসির সময় যখন অধরোষ্ঠ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। তখন মুক্তার ন্যায় দন্ত পংক্তি বাহির হইয়া, মুখের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে। বোধ হয় যেন তাহার মস্তকস্থিত মকমলের টুপির নিম্নে কেহ মুক্তা শ্রেণী বসাইয়া দিয়াছে।

সেই সুসজ্জিত গৃহে এইরূপ সুন্দরী যুবতীগণের সমাগমে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এক স্থানে গুলনেয়ার একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট, মনোমুগ্ধকর পরিচ্ছদ পরিহিত আলমানে দেশীয় যুবক নিউকস পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাহার কাণে কাণে প্রেমমন্ত্র প্রদান করিতেছেন। অন্য স্থানে থির্জার পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, জুলিয়ান এক দৃষ্টিতে সেই বদন খানির দিকে চাহিয়া আছেন; এক একবার সেই মৃণাল বিনিন্দিত বাহু ওষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া জীবনে অন্য রমণীর পাণি গ্রহণ করিবেন না, বলিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক প্রণয়িণীর মন প্রাণ মুগ্ধ করিতেছেন। অপর এক স্থানে আমাদের পরমা সুন্দরী জুলেকা একখানি মকমল মণ্ডিত আরাম চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পার্শ্বোপবিষ্ট সুপুরুষ তুর্ক যুবকের বদন প্রতি দৃষ্টি যোজনা করিয়া আছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন, তাহার হৃদয় কেন এতশীঘ্র যুবকের প্রতি এতাধিক আসক্ত হইল।

কক্ষে যাহারা উপস্থিত, তাহারা সকলেই আত্মহারা। যুবতীগণ দীপালোক মুগ্ধ ফনিনীর ন্যায় প্রণয় পাত্রের রূপে মুগ্ধ। যুবকগণও অনিমেষ লোচনে একাগ্রচিত্তে তাহাদের প্রণয়িণীগণের রূপ মাধুরী ধ্যান করিতেছেন। যুবতীরাও একবারও ভাবিতেছেন না যে, যুবকদিগকে নিজ কক্ষে আশ্রয় দিয়া, কি বিষম অপরাধ করিয়াছেন। যুবকেরাও বুঝিতে পারিতেছেন না যে, বিনা অনুমতিতে এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের রঙমহলে প্রবেশ করিয়া, কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। আমাদের পাঠক বৃন্দের মধ্যে হয়ত অনেকেই জানেন না যে, ইহাঁদের অবরোধ প্রথা বড় কঠোর। রমণীদিগকে তাহারা কিরূপ কঠোর শাসনে রাখেন।

বর্ত্তমান আইনে যদিও ততদূর অনুমোদন করে না, তথাপি নিজ পত্নীকে ব্যভিচার রত দেখিয়া কোন ব্যক্তি যদি অবিশ্বাসিনী পত্নী বা তাহার উপপতিকে হত্যা করে, তাহা হইলে, প্রায়ই তাহাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সেইরূপ দণ্ডনীতি স্পষ্টাক্ষরে অনুমোদন না করিলেও রঙমহলের কঠোর নিয়ম লঙ্ঘনকারীকে প্রাণদণ্ড করিলেও রঙমহল স্বামীর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না।

আমাদের আখ্যায়িকা পুনর্ব্বার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে। ডলজাবান পাশা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। পাশার বয়স পঞ্চান্ন বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু দেখিলে, তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হয়। শরীর এখনো বিলক্ষণ বলিষ্ঠ আছে। বদনে কঠোরতা ও গাম্ভীর্য্য উভয়ই বিলক্ষণ বিদ্যমান পাশা কখনই প্রখর বুদ্ধিশালিনী ছিলেন না। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত হইয়াছে; সুতরাং যুদ্ধবিদ্যাতেই তাঁহার যা কিছু বহুদর্শিতা। তিনি সর্ব্বোচ্চ জেনারলের পদে অভিষিক্ত, একজন পুরুষ সাহসী সেনাপতি বলিয়া খ্যাত। অন্য সকল বিষয়েই তিনি একজন গোঁড়া ধার্ম্মিক। তবে দুই এক গ্লাস সুরস মদ্যে তাঁহার তত অরুচি ছিল না। এই কারণেই সাম্‌পেন্ ব্রাণ্ডি প্রভৃতি মূল্যবান্ সুরা তদীয় কনষ্টাণ্টিনোপলের প্রসাদে এবং বসভোরস তীরস্থ এই সুরম্য উদ্যান বাটীতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

পাঠক এখন বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, এই বসফোরস নদী বক্ষস্থিত রমণীয় প্রাসাদে পাশার স্থায়ী বাসস্থান নহে। গ্রীষ্মাধিক্য ঘটিলে, পাশা সপরিবারে আসিয়া, মধ্যে মধ্যে এখানে বাস করেন মাত্র। তাঁহার অতুল সম্পদ, কনষ্টাণ্টিনোপলের প্রাসাদে অসংখ্য দাস দাসী সর্ব্বদা বিচরণ করে। বাগান বাটীতে কেবল প্রয়োজন মত কতিপয় ভৃত্যমাত্র থাকে। সহরের বাটীতে হইলে, তাঁহার কন্যাগণ কোনমতেই নিজ নিজ প্রণয় ভাজন যুবকদিগকে এত সহজে গৃহে প্রবেশ করাইতে পারিতেন না। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন পদস্থ কতশত প্রহরী রক্ষক ও কর্ম্মচারীর হাত এড়াইয়া, তবে কাহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইতে হয়। অত সাহসিক কার্য্য করিতে কাহারই সাধ্য নাই। কিন্তু বাগান বাটীর অন্দরে প্রবেশ করা অনায়াস সাধ্য। এখানে কতিপয় খোজা মাত্র রঙমহলের রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত আছে। উৎকোচ দ্বারা যে কেহ অনায়াসে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারে। বিশেষ তাহারা সকলেই সেই চতুরা বৃদ্ধা দূতী আমিনার বশীভূত।

দিগকে অনন্যমনা হইয়া, পরস্পর বিশ্রম্ভালাপে রত দেখিয়া আসিয়াছি। খালিল এই অল্পকাল মধ্যে জুলেকার মন অনেকটা হরণ করিয়াছেন, তথাপি কিন্তু লজ্জাবতী যুবতী তাঁহার কথায় দুই একটী মাত্র উত্তর দিতেছেন। সকল কথার উত্তর না দিলেও, তিনি এক মনে সাগ্রহে ও আনন্দেরস হিত খালিলের প্রত্যেক কথাটী শুনিতেছেন লজ্জায় মনের যে সকল ভাব কথায় প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাহার অধিক চোখে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। প্রথম প্রণয় রাগের চিহ্ন তাহার মুখে দেখা দিয়াছে। অন্তরে ভালবাসা জন্মিলেও খালিলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কোন ত্রুটিই জুলেকার হইতেছে না। তাহাদের সমাজের প্রথা অনুসারেই এরূপ হউক বা খালিল কথায় কথায় জুলেকার কানে এমত কোন কথা বলিয়া থাকিবেন, তাহাতে তাঁহাকে সদ্বংশজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় জানিয়াই হউক, জুলেকা প্রণয় ভাজন খালিলের সহিত বিনয় নম্রতা দেখাইয়া বিশেষ খাতির করিয়াই কথা কহিতেছেন।

ক্রমশঃ।

# পরম কল্যাণ গীতা।

## লেখক—শ্রীমদ্ শিব নারায়ণ স্বামী

### ব্যবহার কাণ্ড।

### সাধু শব্দ বর্ণন।

রাজা প্রজা পণ্ডিত ও সাধুগণ আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে বাসস্থান ও স্ত্রী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া মস্তক মুণ্ডন ও নানা প্রকারের বেশ ধারণের কি তাৎপর্য্য ও প্রয়োজন? যদ্যাপি মস্তক মুণ্ডন ও কেশ ধারণ করিলে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিম্বা তিনি প্রসন্ন হন, তবে ভেড়া আদির প্রতি বৎসর মুণ্ডন (অর্থাৎ রোম কাটা) হইয়া থাকে, উহারও ত উত্তম সাধু সন্ন্যাসী এবং সিদ্ধ পুরুষ? যদ্যাপি জটা বাড়াইলে উদ্ধমুখে থাকাতে কিম্বা বাণশর্য্যায় শয়ন করাতে ও রং করা কাপড় পরিলে সাধু সন্ন্যাসী হয়, তাহা হইলে বটবৃক্ষেতে বৃহৎ বৃহৎ জটা (ঝুরি) হয়, বাদুড় উর্দ্ধমুখে ঝুলে, এবং সজারুর সমস্ত শরীর কাঁটা পূর্ণ আছে, এই কাঁটার শর্য্যায় শয়ন করে। এবং বেশ্যাগণ নানা প্রকার রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করে তবেত উহারা বড় বড় মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষ?

নানা প্রকারের বেশ ধারণ করাতে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না বা তিনি প্রসন্ন হন না। কেবলমাত্র তাঁহাকে পূর্ণরূপে ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করা ও তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার নিয়মমত ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে বিচার পূর্ব্বক করা ও সকলকে আপনার আত্মা জানিয়া সমদৃষ্টিতে ব্যবহার করা এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট লোককে সাধু মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষ জানিবে, গৃহত্যাগ করিয়া কেবল বনে যাইয়া পশুর মত থাকাকে সাধু মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষ বলে না।

সত্যযুগ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ অহঙ্কারের সহিত তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বরের একটী লোমেও বক্র হয় না; রাজা প্রজা সকলই হাহাকার করিতেছেন। বিনা জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম কাহার সাধ্য রাজা প্রজার দুঃখ দূর করিবেন? দীন দুঃখিরা কি করিবে, কাহারও দোষ দিবেন না, সকলই মায়া ব্রহ্মের লীলা! যেমন

"জানামি ধর্ম্মং নতু মে প্রবৃত্তিঃ জনাম্য ধর্ম্মং নতুমে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

সকলই আপনার আত্মা কাহারও দোষ দিবেন না। কেবল সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা রাখিলে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে তিনি প্রসন্ন হইবেন ও আত্মবোধ হইবেক। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে প্রীতি ভক্তি না করিয়া যে ব্যক্তি পরিশ্রম ভয়ে, অথবা মাতা পিতা পরিবারগণের সহিত বিবাদ করিয়া কিম্বা রাজার ভয়ে (অর্থাৎ কোন গুরুতর অপরাধ করায় গুরু দণ্ড ভোগ আশঙ্কায় অথবা বিষয় তৃষ্ণাতে বা দরিদ্রতা হেতু গৃহ হইতে পলাইয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া সাধুর বেশ ধারণ করত দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও সদাব্রতের স্থানে দল বাঁধিয়া গমন করে, কিম্বা সুখাদ্য পেড়া ইত্যাদি উত্তম উত্তম পদার্থ জন্য প্রজার উপর নানা প্রকার উপদ্রব করে এইরূপ লোক সাধু নহে।

"জোয় মরি ঘর সম্পৎ নাশি।
মুড় মড়ায় ভয়ে সন্ন্যাসী॥"

এই সকল লোক কেবল পেটের সাধু রাজা প্রজা, পরব্রহ্মের ভক্ত যথার্থ সাধুকে চিনিতেছেন না। যথার্থ সাধু মহাত্মার লক্ষণ এই যে, সত্য অসত্যের বিচার করিয়া দয়া, শীলতা সন্তোষ, ধৈর্য্য, সত্যবাক্য বলা, সমস্ত চরাচরের উপর সমদৃষ্টি, কোমল স্বভাব, কোন জীবকে কোনও প্রকারের কষ্ট না দেওয়া, কাহারও নিকট কোনও বস্তু যাচঞা না করা, [illegible]

দিবে, তাহা প্রাণ রক্ষার জন্য আহার করা, শরীর ধর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য, বস্ত্র মাত্র পরিধান কোন আড়ম্বর না করা এরূপ মহাত্মা সহস্রের মধ্যে একজন হইয়া থাকেন। পণ্ডিত, রাজা জমিদারের এই ধর্ম্ম যে, প্রপঞ্চী, বেশধারী, মিথ্যা সাধু সকলকে ধরিয়া উহাদের মাতা পিতা অথবা কুটুম্বের নিকট পাঠাইয়া দেন যাহাতে তাহারা গৃহে যাইয়া মাতা পিতার সেবা, কুটুম্ব পালন ও পরব্রহ্মকে ভক্তি করে। ইহাতে ঐ লোকদের সমস্ত সিদ্ধি হইবেক। কেবল শরীর বাঁচাইয়া বিনা পরিশ্রমে উদর পূরণ করিলে কোন প্রয়োজনই সিদ্ধি হইবেক না। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত লোক সকল আপন কুটুম্ব আদির নিকট না যায় তবে আপনারা বিচার করিয়া এমন ব্যবস্থা করুন যে, এই সকল লোক অন্ন বস্ত্রের জন্য কষ্ট না পায়। এবং প্রজাদিগকেও কষ্ট না দেয়। প্রত্যেক গ্রামে এক একটী বাগান প্রস্তুত করিয়া আপন আপন অধিকারের প্রপঞ্চী সাধু ইত্যাদি দ্বারা কন্দ মূল উৎপন্ন করাইয়া উহার উপসত্বে উহাদিগকে প্রতিপালন করুন। এবং দরিদ্র, দুঃখী দিগের দ্বারা যথাযোগ্য কার্য্য করাইয়া লইয়া উহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা এবং বিবাহ আদি দেওয়া উচিত। যদ্যপি তাহারা অভিসম্পাৎ করে তাহাতে তাহাদিগকে সাধু মনে করিয়া ভয় করা উচিত নহে। যে যে কর্ম্মের উপযোগী তাহার দ্বারা সেই কার্য্য লইবেন। উহাতে কোন ক্ষতি হইবেক না। ইহা সত্য সত্য জানি-বেন। এইরূপে বিচার করিয়া দরিদ্র অসমর্থ লোকদিগকে যুক্তি দ্বারা পালন করা উচিৎ। যাহাতে উত্তমরূপে জগতের ব্যবহার চলে ও সকলে সুখে থাকে তাহা করা কর্ত্তব্য।

—:o:—

# জ্যোতিষ তত্ত্ব।

লেখক— শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল।

## তারার কাহিনী।

### কৌমুদী।

( The Harvest Moon. )

অবস্থি কোকিল কুজনে—রঘু ১৩।২ শরৎ প্রসন্ন আকাশ অমরত্ব লাভ করি-য়াছে। শারদী বিষুব দিনের পূর্ণিমার চাঁদের মত রৌপ্য শুভ্র সমুজ্জল বিমল চাঁদ

সর্ব্বত্র কৃষক ও রাখালগণ শরৎ খণ্ড আহরণ সমাপণ করিয়া এই পূর্ণিমার সারা রাত্র মনের আনন্দে নৃত্যগীতে জাগিয়া কাটাইত। কৃষি জীবগণের এই জগৎ ব্যাপ্ত আনন্দ উৎসব হইতে এই পূর্ণিমার কৌমুদী (=ধরার-আনন্দ=ধায়িনী) নাম। ৩৯৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে শারদী বিষুব বিন্দু কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছিল। শত পথ ব্রাহ্মণে ২।১।২।৩ এই জ্যোতিষ তত্ত্ব বিবৃত আছে (ক) তখন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা কৌমুদী নাম পাইয়াছিল। অয়নাংশের বিলোম গতি ফলে ২৪৭৫ বর্ষ হইল এই বিষুব বিন্দু অশ্বিনী নক্ষত্রে উপনীত হইয়াছিল। তদবধি আশ্বিনী পূর্ণিমা কৌমুদী নাম পাইয়াছে। প্রাচীন অভিধানে কৌমুদী অর্থে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা লেখে আধুনিক অভিধানে কৌমুদী অর্থে আশ্বিনী পূর্ণিমা লেখে। এই অর্থভেদের মূল জ্যোতিষিক পরিবর্ত্তন। (খ) আর ৪৫০০ বৎসর পরে ভাবী অমর সিংহ ভাদ্রী পূর্ণিমাকে কৌমুদী বলিবেন।

কার্ত্তিকী কৌমুদীর ভট্ট নারায়ণ কৌমুদী মহোৎসব সাক্ষ্য দিতেছেন নৃত্য গীতের মহোৎসব হইতে এই পূর্ণিমার নাম রাস (নৃত্যগীত) পূর্ণিমা হইয়াছে। নামটী যেমন ঐতিহাসিক তেমনি উপযুক্ত। প্রাচীন ভারতে রাস পূর্ণিমার রজনীতে বিমল জ্যোৎস্নাতরঙ্গে বিমান যেমন প্লাবিত হইত। উৎসবের আনন্দ ঢেউ তেমনি ধরাতল ভাসাইয়া দিত। ধরাতলে রাখাল ও গোপগণ আহ্লাদে উন্মত্ত হইত। গোলকে ত্রিলোকের গোপ (ঋক্ ১।১৬৪।৩১; ১০।১৭৭।৩, অথর্ব্ব ৯।১০।১১; ১৩২।২) সূর্য্য নারায়ণ রাধা (বিশাখা) নক্ষত্রের বাহু যুগল মধ্যে প্রবেশ করিয়া ত্রিদেবের "রাই রাঙ্গার" কিরণ সুধা হরণ করিতে করিতে অস্তাচলে চক্ষু নিমীলিত করিতেন। এদিকে পূর্ব্বাকাশে উদয়াচলে কৃত্তিকাস্তব কৌমুদীর চাঁদ তারাবৃষের স্কন্ধভূত কৃত্তিকা শিরে উদয় হইত (গ)। প্রাচীন তারা দর্শক! তুমি ধন্যজীবন পাইয়াছিলে। তুমি বৃষস্কন্ধে উমা দৈবত পৌর্ণ মাসীর দক্ষালয়ে (ঘ) আগমন মাংসচক্ষে দেখিয়া জীবন চরিতার্থ করিয়াছ। কি অপূর্ব্ব রূপমাধুরী। কি অপূর্ব্ব হৃদয়ানন্দ দায়িনী শরৎ শোভা বিমানে এবং

(ক) "এতাঃ (কৃত্তিকাঃ) হ বৈ প্রাচ্যৈঃ দিশঃ ন চ্যবন্তে।"

(খ) শব্দ কল্পদ্রুম "কৌমুদী" দেখ।

(গ) বিশাখয়োঃ সদা সূর্য্য চরতি অংশম্ তৃতীবকং তদা চন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকা শিরসিস্থিতং॥ বিষ্ণু পুরান ২।৮।৭২

কি বিমল আনন্দ সাগরোচ্ছ্বাস ধরাতলে তুমি যুগপৎ অবলোকন করিয়াছিলে। দুঃখময় ধরাধামে দিব্য সুখে তোমার হৃদয় প্লাবিত হইত। পরতন্ত্র ভারতে অকালিক স্বাধীন বাণিজ্যের তীব্র দোহনে অন্ন রস মরিয়া আসিয়াছে। তাই রাসের হৃদয়োল্লাস দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিল না।

আশ্বিনী কৌমুদীর (কো) জাগরী (কে জাগিয়া আছ।) নামটী ও মন্দ নহে। ভাগ্যে পৌরাণিকগণের সর্ব্বরা কল্পনা শক্তির ফলে কোজাগরী উৎসবের অবতারণা হইয়াছিল। তাই নিরন্ন ভারতে বর্ত্তমান কৌমুদীর আদর অভ্যর্থনা কর্ত্তক মর্ত্তক আজও চলিতেছে!

ভাবী ভাদ্র কৌমুদীর কপাল ভবিষ্যতের গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন।

# সদনুষ্ঠানে দারবঙ্গাধিপতির বক্তৃতা।

বিগত ১৫ই পৌষ রবিবার কালিঘাটে ব্রাহ্মণ সভার একটী বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীল শ্রীযুক্ত দারবঙ্গাধিপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণসভায় এরূপ বিরাট অধিবেশন আর কখনও হইয়াছে কিনা জানি না। সুশোভিত পটমণ্ডপে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে পাঁচটী ছাত্র মনোহর ঋষিকুমারের বেশ ধারণ করিয়া সুললিত স্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ দ্বারবঙ্গেশ্বরকে শাস্ত্রীয় প্রথা অনুসারে পত্র পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিলে পর মহারাজ প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—"আমাদের সনাতন ধর্ম্ম সম্প্রতি পুনরায় উন্নতিলাভ করিতেছে দেখিয়া সকলের অন্তঃকরণে অতিশয় আনন্দ জন্মিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উন্নতি ভিন্ন যে সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে না ইহা আমি সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিয়া নিশ্চয় করিয়াছি. যেহেতু এই যে, সনাতনধর্ম্মের আচার ব্যবহাররূপ একটি কলেবর, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণের আচরণই মস্তকস্বরূপ হইয়া সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান বলিয়া আমাদের মনে হয়। সেই ব্রাহ্মণগণের সদাচারের উন্নতির জন্যই এই ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশন হইয়া ছ।

মোক্ষদায়িনী এবং চিরস্থায়িনী হউক, সনাতনধর্ম্মনদীর যে স্রোত প্রবাহিত দেখিতেছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণধর্ম্মের উন্নতি স্রোত প্রবাহিত করাও আপনাদের উচিত হইয়াছে। কামক্রোধ মোহপূর্ণ কলি কালে তপস্যা অধ্যয়ন সদাচার এবং সদ্‌বিচার প্রভৃতি সত্যযুগের ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব স্মৃতিপথে প্রধাবিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া একটা আক্ষেপ হইতে পারে বটে, কিন্তু কাচের মধ্যে যেরূপ লাল রঙের বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িয়া সেই কাচটীও লাল হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্যযুগের প্রাণীগণের সদনুষ্ঠানসমূহের প্রতিবিম্ব হওয়াতে আমরাও সেই ভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইব এইরূপ মনে করিয়া আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে এই সদনুষ্ঠানে অবশ্যই মঙ্গল হইবে। ইহাতে কেহ কখনও কোনরূপ নিরুৎসাহ হইবেন না, সংসারের ইহাই একটি নিয়ম যে, যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মের উন্নতি করিতে সদাচেষ্টিত হয়, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাহারই উদ্যম সফল করিয়া থাকেন। ধনের দ্বারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু বিদ্যাভ্যাসপূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠানেই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য লাভ হইয়া থাকে।

স্মৃতি শাস্ত্রে ইহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও আপন আপন বেদের শাখানুসারে ব্রাহ্মণগণ আর গর্ভাধানাদি সংস্কারের দ্বারা নিজ নিজ বালকগণকে সংস্কৃত করেন না, এবং যজ্ঞোপবীত প্রদান করিয়া বালকগণকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করাইয়া ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে অভ্যাস করাইতে আর মনোযোগ নাই। কিন্তু এক্ষণে সকলেই সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাপন, যথা সময়ে উষ্ণীষ ধারণ প্রভৃতি অন্যান্য জাতিতেও নিজ নিজ জাতীয় চিহ্ন দেখিতে পাই, অতএব শিখা যজ্ঞোপবীত তিলক প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত চিহ্ন ধারণ কখনও ব্রাহ্মণের পক্ষে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। এই রাজধানীতে সম্প্রতি ব্রাহ্মণধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আশাকরি যদি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের দ্বারা এবং ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের দ্বারা প্রীতিপূর্ব্বক সহানুভূতি স্বীকার করিয়া নিজের উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

——:*:——

# নভেলের আয়ুঃ শেষ।

লেখক—শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক জুলেকা বার্ণের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, বার্ণের নবন্যাসও অনেকেই পড়িয়াছেন; এখন বার্ণ বৃদ্ধ; তাঁহার সকল নবন্যাসেরই কিন্তু এখনও পূর্ণ যৌবন বার্ণ বৈজ্ঞান, তাড়িতবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষবিদ্যা প্রভৃতি

য়াছেন এখন তাহার অনেক তথ্যই লোকের দৃষ্টিপথে পড়িতেছে। বার্ণ যাহা উপন্যাসে দেখাইয়াছেন, লোকে এখন তাহা প্রকৃত ঘটনায় দেখিতেছে। বার্ণের "সমুদ্রগর্ভে ত্রিংশৎ সহস্রযোজন" নামক নবন্যাসে দেখিতে পাইবেন নায়কনটিন্‌স নামক জাহাজকে সপ্ত সমুদ্রের জল দিয়া বাহিত করিয়াছেন, সাগরগর্ভে প্রবেশ করিয়া কত অদ্ভুত জীব জন্তু বৃক্ষলতাদি দেখিয়াছেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাহ যুগলবৎ শুক্তির ভিতর বিলাতী কুমড়ার মত বড় বড় মুক্তা বাহির করিয়াছেন; তখন নটিন্‌স কল্পনায় করিয়াছিল; এখন প্রকৃতে পরিণত হইয়াছে। নানা সবসেরিণ বোট বা সাগরতলগামী অর্ণবযান এখন ইউরোপ আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছে। একখানা নবন্যাসের নায়ক প্রকাণ্ড বিরাট কামানের শূন্যগর্ভ বিরাট গোলার ভিতর বসিয়া চন্দ্রালোকের পার্শ্বে বসিয়া চন্দ্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাঁদের গিরি গহ্বরাদি দেখিয়া বুঝিয়া আবার পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে আসিয়াছেন; এইরূপ নানা নভেলে বার্ণ নানারূপ বৈজ্ঞানিক তথ্যেরই আভাস দিয়াছেন; এখন তাঁহার কল্পনা প্রসূত অনেক বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক বৈচিত্র্যই কার্য্যে পরিণত হইতেছে। বার্ণ বলিতেছেন "আমি গঞ্জিকায় শিষ্যত্ব করি নাই, বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ স্থির করিয়াছিলাম, আমার কোন নভেলে গাঁজাগুরির নামগন্ধও নাই।" কথা মিথ্যা নহে। বিজ্ঞানের দিন দিন যে উন্নতি পরিণত হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে পণ্ডিতকেও অজ্ঞান হইতে হয়।

বিলাতের ওয়েলস্ বৈজ্ঞানিক নবন্যাসে বার্ণকেও পরাস্ত করিতেছেন, তিনি মঙ্গলের হস্তপদহীন মস্তকময় মহাবৈজ্ঞানিক দিগকে কেবল চন্দ্রযোগে ভূমণ্ডলে আসিতেছেন, যন্ত্রস্থ মস্তকসার মাঙ্গলিক মানবেরা বৈজ্ঞানিকযন্ত্র ও বিজ্ঞানকৌশলে ইউরোপকে পরাস্ত ও বশীভূত করিয়াছেন, ওয়েলস্ নিজের নবন্যাসে বৈজ্ঞানিক বৈচিত্র্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। ফরাসীর ফ্ল্যামেরিয়ান নবন্যাস নহে, প্রবন্ধ পুস্তকে ভবিষ্যদ্বিজ্ঞানের আভাস দিয়া জগৎকে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন; আমেরিকায় আল্‌ভা এডিসন এবং নিকোলা তেস্‌লব তাড়িতবিজ্ঞানে যাহা করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বে কোন গঞ্জিকালয়েও আলোচিত হয় নাই। ইতালির মার্কোনি ইংলণ্ডের টান্‌সন্ বল্ প্রভৃতিও বৈজ্ঞানিক অবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লইয়া লোককে বিস্ময় বিহ্বল করিতেছেন, কিন্তু এখন যিনি যাই করুন, পূর্ব্বে যে বার্ণই পথ দেখাইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত; সেই বার্ণ

হইবে। জগতের অবস্থা ব্যবহার বার্ণের মত আর কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলিতেছেন :—

"নবন্যাস জীবন ক্রমেই ফুরাইয়া আসিতেছে ; যে নভেলে কেবল মানবচরিত্রই অঙ্কিত হয়, যাহাতে কেবল শৃঙ্গার হাস্য করুণাদি মানবহৃদয়স্থ লীলা খেলা হয়, যাহাতে কেবল লৌকিক ঘটনাই বিবৃত হয়, সেরূপ নভেল এখন এক প্রকার অপাঠ্য হইয়াছে। ইউরোপ আমেরিকার ভাল ভাল লোক এখনই এরূপ নভেলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এখনকার বিদ্বান লোক এরূপ নভেল হাতে করিতেই চাহেন না। যাহা কিঞ্চিৎ অল্পই আছে, তাহা কেবল বৈজ্ঞানিক নভেলের। আমি যখন কেবল বৈজ্ঞানিক নভেল লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখনই ইহা বুঝিয়াছিলাম। এই জন্যই আমার নভেলগুলির অসাধারণ আদর হইয়াছিল, আদর এখনও আছে। যে দুই একজন লেখক এখন বৈজ্ঞানিক বিচিত্র নবন্যাস লিখিতেছেন, নবন্যাসে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আভাস দিতেছেন, বর্ত্তমান দেখিয়া বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ বুঝিতেছেন, ও লোককে বুঝাইতেছেন, তাহাদের নবন্যাসই বিদ্বৎ সমাজে আদৃত হইতেছে। অন্যান্য নভেল বিদ্বৎ সমাজে এখন আর আদৃত হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক নভেলের সময় হইয়া আসিতেছে। অবৈজ্ঞানিক সাধারণ নভেলের সময় শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইবে। তোমরাই তাহার পাণ্ডিত্য লোপ দেখিতে পাইবে। বৈজ্ঞানিক নভেলেরই প্রতিপত্তি আর কিছুদিন থাকিবে। কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সমস্ত লীলা খেলা দেখিয়া তাহাই ভবিষ্যৎ লীলা খেলাও হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহেন, তাঁহারাই বৈজ্ঞানিক নভেলের প্রকৃত পাঠক। তাঁহারা নভেলের জন্য নভেল পড়েন না, বিজ্ঞানের জন্য নভেল পড়েন ; একাজ ক্রমেই সংবাদ পত্রে সম্পন্ন হইবে। সংবাদ পত্রই লোককে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সমস্ত ঘটনা সমস্ত লীলা লোককে দেখাইয়া দেখাইয়া তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানেরও রহস্যভেদে দক্ষ করিবে। এখন আর লোকে রহস্যলাভের জন্য কাল বিলম্ব করিতে চাহে না, জগতে যেখানে যে ঘটনা যখন হইতেছে, সকলেই সেই ঘটনার সেই দিনই খবর লইতে পারে। দিন দিন প্রহরে প্রহরে দণ্ডে দণ্ডে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, বৈজ্ঞানিক কার্য্য উদ্ভাবিত হইতেছে, বৈজ্ঞানিক নব তথ্য আলোচিত হইতেছে, সমস্তই লোকে এখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দেখিতে শুনিতে জানিতে বুঝিতে চাহে। একার্য্য সংবাদ পত্রেই সিদ্ধ হইতেছে। দিন দিন দৈনিক সংবাদ পত্র যাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, তাঁহাদিগকে অগত্যা সপ্তাহ যাবৎ অপেক্ষা করিতে হয় সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রেই জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ

করিতে হয়। তাই এখন সকল সংবাদ পত্রেই নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সর্বদাই আলোচনা হইতেছে। যে সংবাদ পত্রে বৈজ্ঞানিক তথ্যের অধিক আলোচনা হয়। সেই সংবাদ পত্রেরই এখন সভ্য সমাজে আদর অধিক।

নবন্যাস পুস্তকের কাল অতীত প্রায়। সামাজিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি লৌকিক নবন্যাসের কপ ত দিয়াছেন, পরন্তু বৈজ্ঞানিক নবন্যাসের কালও ফুরাইয়া আসিতেছে। নবন্যাসের কার্য্য এখন সংবাদ পত্রে হইতেছে। ক্রমে সংবাদ পত্রই সব এক চেটিয়া করিয়া লইবে। এখন লোকের নবন্যাসের বাজে কথা, বাজে গল্প বৃথা আড়ম্বর অনাবশ্যক বচন বিন্যাস পাকামী জেঠামী পড়িতে চাহে না, অল্প কথায় অধিক জ্ঞাতব্য জানিতে চাহে, যে জ্ঞাতব্যও এখন কেবল বৈজ্ঞানিকেই পরিণত হইতেছে। এখনকার লোকে দেখিতে চাহে কেবল কার্য্য কারণ; বুঝিতে চাহে কেবল প্রাকৃতিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ। এ উদ্দেশ্য অল্পসময় শীঘ্র শীঘ্র সংবাদ পত্রেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সংবাদ পত্রেরই জয় জয় কার। জনতার সাহিত্যক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে সংবাদ পত্রেরই একাধিপত্য হইবে।

জুলেস্ বার্ণের কথা মিথ্যা নহে। বার্ণের সভ্য মানব কেবল ঐহিক লইয়াই মত্ত কেবল জড় বিজ্ঞানের জড়িভূত, আধ্যাত্মিকের আদর কমিয়া গিয়াছে,— আধিভৌতিক আদর বাড়িতেছে, মানুষ এখন ভগবানকে ভুলিয়াছে; আসল ফেলিয়া নকলে মজিয়াছে, বিশ্বপাতার বৈজ্ঞানিক কৌশল বুঝিয়া তৎপদে প্রাণভরা ভক্তি ঢালিতে মানুষ এখন আর প্রবৃত্ত নহে; ক্ষুদ্র মানবের বৈজ্ঞানিক কৌশল দেখিয়াই তন্ময় হইয়া যাইতেছে। মানুষের চাঞ্চল্য ও ঔৎসুক্য চরমে উঠিয়াছে। এখন সকলেরই সকল বিষয়ে তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি; ধৈর্য্য সংসার হইতে উড়িয়া যাইতেছে। এক পল পাইলে মানুষ এখন আর দণ্ডের জন্য প্রতীক্ষা করিতে চাহে না এক দণ্ড পাইলে এক দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন না; অমুৎসোক্য ধৈর্য্য স্থৈর্য্য প্রতীক্ষাশীলতা প্রভৃতি গুণ ক্রমে মানব হৃদয় হইতে চলিয়া যাইতেছে। কলির সভ্যতায় জগতের মানব হৃদয় ক্রমাগত রজোগুণেই আচ্ছন্ন হইতেছে। পতনের পূর্ব্বে এইরূপ হইয়া থাকে। সৃষ্টিলোপই কাল সন্নিহিত ক্রমেই হইতেছে। মহাপ্রলয়ের বড় অধিক বিলম্ব নাই। তাহার দূরদর্শীরা বুঝিতে পারিতেছেন। জড়বিজ্ঞানের এরূপ একাধিপত্য একরূপ অযৌক্তিক আদর আশঙ্কা জনক। কিন্তু অপ্রার্থনীয় অনিষ্টজনক হইলেও, এভাব স্বাভাবিক এ স্রোতে বাধা দেওয়া দুঃসাধ্য সত্বকে যে, কলির শেষে রজো গুণের কাছে পরাজিত হইতে হইবে, তাহা বোধ হয়, সেই শক্তি মানেরই অভিপ্রেত। তাই ক্রমে সত্বরজঃ কর্তৃক পরাজিত হইতেছে; শেষে কিন্তু রজকেও তমোর কাছে পরাস্ত হইতে হইবে। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে তমোগুণের একাধিপত্য হইবে। সত্বে সৃষ্টি, রজে স্থিতি, তমে সংহার। প্রলয় তমোগুণের কার্য্য তমোগুণের বশীভূত। জড়বিজ্ঞানের আধিপত্য দেখিয়া যাহারা আনন্দিত হইতেছেন, তমোগুণকৃত মহাপ্রলয়ের ভাবনাও তাঁহাদিগের ভাবা উচিত। দীপনির্ব্বান হইবার পূর্ব্বে একবারই দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

—:*:—






"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

( মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। )

| ১৫শ বর্ষ। | পৌষ, ১৩১৩ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা। |
|---|---|---|

# কোন পথে যাই।

লেখক—শ্রীঅপূর্ব্ব চন্দ্র শর্ম্মা *।

বেশ সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম, অকস্মাৎ কে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। নিদ্রিত মূর্চ্ছিত অচেতন থাকিয়া স্বপ্নে কত কি দেখিতেছিলাম, কে আসিয়া জাগ্রত করিল। কার তীব্র তেজস্বিনী শক্তি, মধুর ইঙ্গিতে অনন্ত সুখের চিত্র দেখাইয়া, আমাকে সচেতন করিল? হৃদয় নাচিয়া উঠিল, মন ব্যাকুল হইল—প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল কে ডাকিল, কে জাগাইল, কে দেখাইল,—মনঃপ্রাণ তাঁহাই দেখিতে

* লেখক—ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত সেবক, ভক্ত সমাজে সুপরিচিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী জন্মভূমিতে প্রকাশার্থ প্রদান করিবার অল্পদিন পরে গত ২০

চায়। জাগ্রত হইয়া কিছুই সন্ধান পাই না, তাই সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলিয়া দাও কোন পথে যাই, কোন পথে গেলে তাহা পাইব—যাহা আমি চাই। স্থানের নিদর্শন জানি না, কিন্তু যদি কেহ জান, তবে বলিয়া দাও সে স্থান কোথায়? যিনি দেখা দিলেন তাঁহাকে চিনি না, বলিয়া দাও তিনি কে? যে চিত্র দেখিয়াছি বলিয়া দাও তাহা কিরূপে পাই। আমি সুপ্তোত্থিত হইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছি। মহাত্মাগণ বিপন্নকে রক্ষা করুন। যদি কেহ আমাকে পথ দেখাইয়া দাও আমি কৃতার্থ হইব। এই কথা বিঘোষিত হইয়া অবধি আমাকে কত লোকে কত কথা বলিতেছে। পরস্পরের কথায় বড় বিরোধ দেখিয়া আমি কোন পথই অবলম্বন করিতে পারিতেছি না। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সে একটি নূতন পথ দেখাইয়া দেয়, তাই মনে বড় সংশয় ও অতিশয় ভয় হইয়াছে। পাছে বিপথে গিয়া জীবনান্ত হই, এই জন্য সকলকেই জিজ্ঞাসা করি, কোন পথে যাই। হয় ত সকলে আমাকে বাতুল বলিয়া উড়াইয়া দিবে; কেন না যেখানে যাইব তাহার নিদর্শন বলিতে পারি না,—তবে লোকে তাহার পত্র কিরূপে বলিয়া দিবে? পুনর্বার বলি আমি যেখানে যাইতে চাই, বলিয়া দাও সেই স্থানে কোন পথে যাই। আমার এই অদ্ভুত জিজ্ঞাসায় অনেকের মনে কৌতূহল উঠিল, আমাকে বুঝাইবার জন্য অনেক লোকে অনেক বেশে একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিচিত বৃদ্ধগণ বলিলেন, পাগল! বৃথা কাঁদিতেছ কেন, সেখানে কি কেহ যাইতে পারে? সেই মনোবুদ্ধির অতীত স্থানে যেখানে যাইতে যাইতে কল্পনা লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া আইসে, তুমি যাইতে পারিবে না, আমাদের ন্যায় বিষয় কোলাহলে নৃত্য করিয়া, প্রচলিত প্রথায় অঙ্গ ঢালিয়া বসিয়া থাক; যদি ভাগ্যে থাকে ক্রমশঃ কামনা পূর্ণ হইবে। এই কথায় মন মানিল না। আবার পথে পথে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াই। দেখিলাম, সাগর পার হইয়া বীরবেশে মোহনবেশে দলে দলে লোক আসিয়া বলিল যে, তোমার ক্রন্দন আমরা বহুদূর হইতে শুনিয়াছি, তোমারই কামনা পূর্ণ করিবার জন্য সত্য পথ দেখাইতে আমরা আসিয়াছি। তাঁহাদের মিষ্ট কথায় মন ভিজিল। তাঁহাদের অনুগত হইতে যাই, এমন সময়ে মনে সংশয় উঠিল। ভাবিলাম, যাহারা সে দেশে কখন গিয়াছে তাহারাই সে পত্র জানে, সে পথ তাহারাই দেখাইয়া দিতে পারে। ইহাঁদের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া সে দেশে যে ইহারা কখন গিয়াছে, এরূপ বোধ হইল না। সাগর পারাগত অভ্যাগতদিগকে ছদ্ম বন্ধে বুঝিলাম। তাহাদের মনের অভিসন্ধি

দের কথা বার্ত্তায় বোধ হইল, তাহারা সে দেশের কোন গূঢ় সমাচারই বলিতে পারে না। তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে না পাইতে আবার একজন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল যে, যদি কেহ সত্য পথে যাইতে চাও, তবে আমাদের অনুগমন কর। দেখিলাম তাঁহারা আমাদের স্বদেশী, আমাদের ভাষায় কত ভাষা মিশাইয়া কত বিচিত্র ভাবে পথের কথা কহিতেছেন। তাঁহাদের ভাব ভঙ্গী ও কথার ছটায় মন মুগ্ধ হইল; ভাবিলাম এত দিনে আমার ভবসাগর পারের কর্ণধার পাইলাম। তাঁহারা বলিলেন, কাহারও কোন তত্ত্ব জানিবার জন্য আর বৃথা ভ্রমন করিতে হইবে না। আমরা সকল দেশের সকল ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিয়া একত্র করিয়াছি। কাহারও প্রতি দ্বেষ, হিংসা আমাদের নাই; আমাদের পথে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল, চামার দেশী বিলাতী, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ আদির বিচার নাই; এখানে সকলের সমান অধিকার; আমাদের ধর্ম্মই সার ধর্ম্ম, কেন না ইহাতে সমস্ত ধর্ম্মের সার সঙ্কলিত হইতেছে। তাঁহাদের উচ্চ উদার কথাগুলি শুনিয়া যখন তাঁহাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলাইতে চাই, তখন তাহাদের কথায় সংশয় উপস্থিত হইল, ভাবিলাম সকল ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করা তো সহজ নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে, যে ভিন্ন ভিন্ন সত্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা কেমন করিয়া একজন মনুষ্য সমস্ত সমান ভাবে দর্শন করিবে। তাহার নিজ বুদ্ধিতে যে কথাটি যে ভাবে অনুভূত হইয়াছে, সে সেই ভাবেই তাহা গ্রহণ করিবে। অতএব নিজ বুদ্ধিই যখন সত্যের পরীক্ষক, তখন বুদ্ধির বিকার থাকিলেই কখন সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতীতি হইবে। বস্তুতঃ সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা জানিতে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল চক্ষু চাই। একজন বিষয়ী ব্যক্তি সহস্রশঃ অতি বুদ্ধিমান হইলেও সত্যের প্রতিভা সহসা ধারণা করিতে পারে না।—বিষয়-বিমূঢ় অভিমানী ব্যক্তিগণ অসারকে সার বলিয়া গ্রহণ ও সারকে অসার বলিয়া পরিত্যাগ করেন। তিন জন লোককে বলিলাম, গোশালা হইতে সার যাহা তাহা লইয়া আইস; একজনের বিবেচনায় গব্য দুগ্ধই গোশালার সার; অন্যের বিবেচনায় গাভীই গোশালার সার; তৃতীয় ব্যক্তির বিবেচনায় গোবরই সার বলিয়া স্থির হইল; তিনজনে তিন প্রকার সার আনিল। বস্তুত মনুষ্য নিজ নিজ রুচি অনুসারে যে সে পদার্থকে সার মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সার কি তাহা স্থির করিতে হইলে, সারাৎসারের সাক্ষাৎসম্বন্ধ আবশ্যক। বুঝিলাম সার সংগ্রহ, নিজ নিজ রুচি অনুসারে কতকগুলি কথা ভিন্ন

না। উহা "সার-সংগ্রহ" না বলিয়া, আমি কেবল মাত্র "সংগ্রহ" বলিয়া জানিলাম। আমাদের দেশে বাউল সম্প্রদায় এক প্রকার আপাদ-বিলম্বিত জামা ব্যবহার করে। তাহাতে একটু কিংখাপ, একটু মখমল, একটু শালু, একটু বারানসী চেলি, একটু কাশ্মীরি শাল, একটু ছেঁড়া কাঁথা আদি, একটু একটু অনেক অনেক প্রকারের বস্ত্র থাকে। এটী যেমন সকল বস্ত্রের সংগ্রহ, ইহা যেমন ভদ্র লোকে ব্যবহার করে না, ইহার যেমন মূল্য অধিক নহে, ইহা দেখিলে লোকের যেমন হাস্যোদ্রেক হয়, প্রোক্ত সংগ্রহের পথও ঠিক সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ও বিচার বানের ব্যবহারের অযোগ্য এবং ইহার গঠন প্রণালীও হাস্যজনক। তাঁহারা আবার বলিলেন, আমরা সকল জাতি এক করিয়া ভ্রাতৃভাব করিব। কিন্তু তাঁহাদের আভ্যন্তরিক ব্যবহারে, আমাকে সে কথা বিশ্বাস করিতে বাধা দান করিল। একজন বহু ধনের আশায় শিবের তপস্যা করিয়াছিল; উপযুক্ত সময়ে আশুতোষ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "বৎস! বর গ্রহণ কর।" সে তাকাইয়া দেখিল, সম্মুখে জটাধারী, ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর একজন দিগম্বর পুরুষ দণ্ডায়মান; দেখিয়াই বলিল, তুমিই কি আমার ইষ্টদেব? আমি কি তোমারই সাধনা করিতেছিলাম? আমি যে অতুল ধনের প্রার্থী! মনে মনে ভাবিল, যিনি স্বয়ং বস্ত্রহীন তিনি আমাকে অতুল সম্পত্তি কোথা হইতে দিবেন? প্রকাশ্যে বলিল, "প্রভো! যদি দয়া হইয়াছে, দেখা দিয়াছেন, তবে এই বর দিন যেন নিজের একখানি পরিধেয় বস্ত্র হয়, আমার কিছুই চাহি না। আমিও তাই ভাবিলাম, যে, যে দলের আড়াই জন লোকের মধ্যে তিনদিনে সাড়ে তিন ভাগ হইয়াছে, তাহারা সমস্ত জাতির সহিত ভ্রাতৃভাব করিবে, কোথা হইতে! তাঁহাদের কার্য্যে ও অনুষ্ঠানে যথেচ্ছাচারিতার দুর্গন্ধ পাইলাম। আমি দেশে যাইতে চাই, কৈ, সে দেশের সমাচার তো কিছুই পাইলাম না। তবে তাঁহারা কেমন করিয়া আমাকে সত্য পথ দেখাইবেন? মরুভূমিবাসী, হিম সাগরের জল কোথা হইতে দিবে! তাঁহাদের আশা ভরসা ছাড়িলাম।

তবে কে বলিয়া দিবে, আমি কোন পথে যাই? যাঁহারা সেই পথে গিয়া লক্ষিত স্থানে পৌঁছিয়াছেন, সেই স্থানের অনন্ত আনন্দ সাগরে স্নান করিয়াছেন, কৈবল্য সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই আমার পথের প্রদর্শক। যাঁহারা নিজ নিজ জীবনে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই আমার পথ প্রদর্শক। তাই বলি, আর্য্যঋষিগণ! তোমরা একবার আসিয়া এই অন্ধকে

তোমাদের দয়ায় বঞ্চিত হইয়াছি। কিন্তু তোমাদের সাত্ত্বিকী দয়া তো আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। দুর্ভাগ্য আমরা, তোমাদের মর্য্যাদা বুঝি কিরূপে ? দাবানল প্রজ্বলিত হইলে যাহা দগ্ধ হয় না, কত সমরানল অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়াও যাহা ভস্ম করিতে পারে নাই, ত্রিভুবন ভস্ম হইলেও যাহা দগ্ধ হইবার নহে, আজ তাহারা, সামান্য দীপ-শলাকায় তাহা পুড়াইতে চায়॥ মহর্ষিগণ! অবোধ বালককে ক্ষমা করিয়া প্রসন্ন হউন। কীর্ত্তিনাশার জলে ভাসাইয়া কতক গৌরব রক্ষিত হইয়াছে, কেন না সে নদীতে "কীর্ত্তি" পুত্রই বিনষ্ট হয়। প্রকারান্তরে শাস্ত্র গুলি ভারতের কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের মলিন আকাশ নির্ম্মল করিয়া দাও, আর্য্য কার্য্যভূমি সরল করিয়া দাও, আমাদের মনকে তোমাদের পদে অবনত হইবার জন্য শিক্ষা দাও, বৃথা অহঙ্কার অভিমান বিচূর্ণ করিয়া দাও; তোমরা যে পথে আনন্দ নিকেতনে গিয়াছ, সেই নিষ্কণ্টক পথ আমাকে দেখাইয়া দাও। তোমাদের ইঙ্গিত মাত্রেই বুঝিয়াছি যে, আমার পার্শ্ব দিয়া যে পথ গিয়াছে, যদিও তাহাতে পতাকা আছে, বাদ্য গীত আছে বক্তৃতা আছে, গ্যাস লাইট আছে, ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট ও ইলেকট্রিক ফ্যান্ আছে, গাঁদা ফুলের মালা ও রঙ্গীন ফুলের তোড়া আছে বিবিধ এসেন্সও আছে, অর্থাৎ মন মাতান অনেক জিনিষই আছে, কিন্তু তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত যায় নাই। তোমাদের পথে আবর্জ্জনা পূর্ণ ও অপরিষ্কার বোধ হইতেছে। বুঝিলাম লোকের গতি বিধি অল্প হওয়াতে, এমন সুন্দর সরল পথটী দুর্গম বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমরাই এ পথের নেতা। যোগীগণ বল্লভ স্বয়ং ভগবান এ পথের প্রহরী ও রক্ষক। এ পথে ভয় নাহি, এই পথই আমার গম্য। এমন সুন্দর ও সিদ্ধপথ থাকিতে লোকের প্ররোচনায় আর অন্য পথে যাইব না, ধন্য তাঁহারাই যাঁহারা ঐ অগ্রে অগ্রে কেহ জটা কম্বল ধারণ করিয়া, অঙ্গে বিভূতি মাখিয়া, কেহ বা মস্তক মুণ্ডন করিয়া, সংযত চিত্তে, তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন। ধন্য ঐ যোগীগণ, যাহারা চক্ষু বুঝিয়া এই পথে দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন। ধন্য ঐ আচার্য্যগণ, যাঁহারা জ্ঞান বলে ত্রিলোক তুচ্ছ বোধ করিয়া, লক্ষ্য পথে ধাবিত হইতেছেন, ধন্য ঐ ভক্তগণ, যাঁহারা প্রেমাশ্রুজলে হৃদয় শীতল করিয়া নাচিতে নাচিতে, এই পথে অনায়াসে যাইতেছেন। হা! এ পথে নস্ত্রীক ও সস্ত্রীক সকলেই পরমসুখে নির্ভয়ে গমন করিতেছে। আর্য্যগণ! আমি তো এই পথই চলিলাম, বিপথগামীগণকেও স্বপথ দেখাইয়া দাও। তোমাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে

# কি উপায়ে আমাদের দেশীয় শিল্প কৃষি এবং বাণিজ্যের প্রসারণ ও উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে।

লেখক—শ্রীবনমালী গোস্বামী এম, এ।

পুরাকাল হইতে কৃষিই ভারতবাসীগণের একমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় স্বরূপ চলিয়া আসিতেছে। নানারূপ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইহা ভারতবাসীকে অন্ন প্রদান করিতেছে। ভারতের কৃষকগণ কৃষিকার্য্যে এতদূর বুৎপন্ন যে বৈজ্ঞানিক উপায়ই হউক বা যে কোন উপায়ই হউক কিছুতেই হস্ত চালিত লাঙ্গলের অনুরূপ ফল দেখাইতে পারিবে না। ডাক্তার ভলকার বলেন, যে আগাছা খুটিয়া তুলিয়া ভারতের কৃষকগণ যেমন জমি পরিষ্কার রাখে, জমি জলসিক্ত করিবার জন্য জল তুলিবার সরল উপায় উদ্ভাবনে তাহারা যেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, জমি, সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তাহার উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি এবং কখন কোন জমিতে কিরূপ ফসল জন্মিতে পারে এই সকল বিষয়ে ভারতীয় কৃষক যেমন প্রাজ্ঞ তেমন আর কোন দেশীয় কৃষক নহে। রিজলি সাহেব যিনি এক্ষণে বাঙ্গালা কটন বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপির জন্য দেশ বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি বলেন যে ভারতীয় কৃষকগণ বিলাতী কৃষক দিগের অপেক্ষা কৃষি বিষয়ে অনেক অগ্রসর।

কৃষির পরেই ভারতে তুলা, রেশম ও পশমের কার্য্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। যতপ্রকার বয়নকার্য্য আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে তুলার কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান। জগতের মধ্যে ভারতেই সর্ব্বপ্রথমে তুলার কার্য্য আরম্ভ হয়। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও মনুসংহিতায় ইহার বিষয় উল্লিখিত আছে। ভারতের প্রত্যেক পল্লিতে এখনও তন্তুবায়গণ বিদ্যমান আছে, তাহারা স্থানীয় অভাব অনেক পরিমাণে এখনও দূর করিতেছে। তুলাদ্বারা ভারতে প্রধানতঃ থান কাপড় ও কালিকো প্রস্তুত হয়। এই উভয়ের মধ্যে সম্ভবতঃ থান বস্ত্র বয়নই পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল। ঢাকা ও তদন্তর্গত শোনারগাঁ, ধামরাই, জঙ্গলবাড়ী, বাজিৎপুর এবং ঢাকার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত। মসলিন নামক অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র যাহা প্রস্তুত করিতে ১২৬ রকম যন্ত্রের প্রয়োজন হইত এবং যাহার এক থান এক মুষ্টিতে আবদ্ধ রাখা

পূর্ব্বকালে বেবিলন, টায়ার, কার্থেজ, ইজিপ্ত, গ্রীস ও রোম নগরে ইহা অতি যত্নের সহিত ব্যবহৃত হইত। এখনও সাদা জামদানি এবং চার খানা মসলিন ইয়ুরোপের প্রায় সমস্ত বড় বড় নগরে নানা শ্রেণীর গণ্যমান্য লোকে অতি সন্তোষের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। মোগল রাজত্ব সময়ে এবং যখন ঢাকা মুসলমান শাসনাধীন ছিল, তখন মসলিনের অত্যধিক আদর ছিল। সুতরাং কারিকরগণও সচ্ছন্দে স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় চালাইয়া লাভবান হইত। আব্রায়োয়ান, বাপ্তয়োয়া, শুভানাশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে এই মসলিন পরিচিত ছিল। জগতের বিখ্যাত সুন্দরী নুরজাহান ও বাদসাহ আওরাঙ্গজীবের মদগর্ব্বিতা ভগ্নীগণ এই মসলিন অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন এবং শিল্পীগণকেও বিশেষরূপ পুরস্কৃত করিতেন। কোম্পানির রাজত্বকালে ইংরাজগণ এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ, আর্ম্মানি, ও ফরাসীস প্রভৃতি সওদাগরগণ এই মসলিন সমগ্র ইয়ুরোপে বিক্রয়ের জন্য লইয়া যাইত। মোট কথা এমন এক সময় ছিল যখন মসলিনই বঙ্গোপসাগর ও পূর্ব্বাঞ্চলের বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ছিল। কিন্তু মুসলমান রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইলে ঢাকার অধঃপতন আরম্ভ হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে ও যথেষ্ট কাটতি না থাকাতে ভারতের উৎকৃষ্ট মসলিন বয়নকার্য্য প্রায় বিলুপ্ত হয়। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও ইংরাজ রাজত্বকালে একেবারে উঠিয়া যায়। তবে যে এখন সড়াইল, নাগপুর নেলোর প্রভৃতি স্থানে মসলিন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সেই পুরাকালের উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য বিশিষ্ট ঢাকাই মসলিনের অপদস্থ রূপান্তর মাত্র।

কালিকো পরে প্রচলিত হইলেও উহা শুভ্র শুসি ও কেলি, চারখানা প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইয়া পাঞ্জাব এবং মান্দ্রাজের অন্তর্গত বহুস্থানে প্রস্তুত হইত। কার্পাস বস্ত্র ভারতের নানাস্থানে এখনও প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু উহার পূর্ব্বের গৌরব আর নাই, এবং সম্ভবতঃ অল্প কাল মধ্যেই ইহাও ভারতের অন্যান্য শিল্প কার্য্যের অনুসরণ করিবে অর্থাৎ বিলাতী বস্ত্রের সমকক্ষতায় অপারগ হইয়া একেবারে উঠিয়া যাইবে। কার্পাসের সুতাকাটা কার্য্য প্রায় লুপ্ত হইয়াছে তন্তুবায়গণ এখন বিলাতি সুতা ব্যবহার করিতেছে।

তুলার কার্য্যের পরেই রেশমের কার্য্য ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যদিও নানা উপায়ে গুটি পোকা রক্ষিত হইয়া রেশমের কার্য্য এখনও চলিতেছে,

তথাপি ইহার প্রাগপক্ষ প্রসার ক্রমেই ম্রিয়মাণ হইয়া আসিতেছে। বেনারস, আহম্মদাবাদ এবং মুর্শিদাবাদের কিংখাব এখনও জগৎ পুজ্য।

কিতালিকর শাল, সাদা শাল, ডুরিদার শাল, এবং দোশালা নামে সুপরিচিত রেশমি পশমি গাত্র বস্ত্র এখনও ভারতীয় পণ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কাশ্মিরী শালের তুলনা জগতে অন্য কোথাও নাই। সূচি কার্য্যেও রেশমি পশমি বস্ত্রের সমকালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সূচির চিক্কণ কার্য্যে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী জগতে আর কুত্রাপি নাই। কারচুপির কার্য্যেও ভারত অদ্বিতীয় ছিল। রেশম পশম ও মখমলের উপরে কারচুপির কার্য্যের জন্য দিল্লি, অমৃতসর লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ ঢাকা, সুরাট এবং বোম্বাই এখনও সুপ্রসিদ্ধ গালিচার কার্য্যে যদিও ভারত ততদুর প্রখ্যাত নহে, তথাপি গালিচা, সুজানি প্রভৃতি নানা রংয়ের আবরণ বস্ত্রাদি আমাদের দেশে বহু পরিমাণে প্রস্তুত হয়। দিনাজপুর, আগ্রা প্রভৃতি নগর সতরঞ্চির জন্য বিখ্যাত। সপ, মাদুর পাটি প্রভৃতি জিনিষ এখনও ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর ইত্যাদি স্থানে প্রস্তুত হয়।

নানাপ্রকার অতি সুন্দর এবং প্রয়োজনীয় মৃৎপাত্র খেলনা ইত্যাদি জিনিষ প্রস্তুত করিয়া চুনার ও কৃষ্ণনগরের কারিকরগণ বহুশিল্প প্রদর্শনী হইতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেছে।

সূত্রধারের কার্য্যেও আমাদের দেশ অন্যান্য দেশের শীর্ষস্থানীয় ছিল। কপাট চৌকাঠ, মুড়িবার জন্য কাষ্ঠের পাত, কারুকার্য্য খচিত কাষ্ঠের কৌটা, বাসন, ডিবা, ঝরকা, জাফরি এবং নানাবিধ রঞ্জিত কাষ্ঠের জিনিষ এখনও বাজারে ক্রেতাবর্গের নয়নরঞ্জন করে। খোদাই, গৃহনির্ম্মাণ এবং ভাস্কর বিদ্যায় ভারতীয় শিল্পীগণ এখনও গৌরবান্বিত। তেত্রিশকোটি দেব দেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি, ৺জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বরের মন্দির, আগ্রার তাজমহল প্রভৃতি তাহার নিদর্শন।

চিত্র বিদ্যায়ও ভারত পশ্চাৎ পদ নহে। রবি বর্ম্মার চিত্র নিচয়ের কাটতি বাজারে অত্যধিক এবং উহাদের মনোহারিণী শক্তিও বিস্ময়কর। স্বর্ণকার, কর্ম্মকার জহুরি প্রভৃতি জাতি সকলেই আপন আপন কার্য্যে সবিশেষ গুণপনা দেখাইয়া আসিতেছে।

রত্নপ্রসূ ভারতে যেমন নানারত্ন মিলে, তেমনই ঐ সকল রত্ন ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য নানাশ্রেণীর কারিকর জন্মে। বোধ হয় ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে অব্যবহার্য্য বা অপ্রয়োজনীয় কোন জিনিষই ভারতে বড় একটা

স্থান পাইত না যে সকল জিনিষ ভারতবাসীগণের ব্যবহারে আসিত কেবল তাহাই আমাদের দেশে প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হইত। কৃষি বয়ন, মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ; গৃহনির্ম্মাণ ও জহরতের কার্য্যই ভারতে সবিশেষ আদৃত হয়, কারণ ঐ সকল শ্রমলব্ধ জিনিষই ভারতীয় জনগণের নিত্য ব্যবহারে আসে। কৃষিজাত দ্রব্য, মৃৎপাত্র এবং গহনা ব্যতীত ভারতবাসীর একেবারেই চলে না।

ভারতবাসীগণের পূর্ব্বরুচি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে তাহা কাল প্রভাবে ও বৈদেশিক সংবর্ষণে অনেকটা বিকৃত হইয়াছে। এই নিমিত্তই ভারতীয় শিল্পের আদর আর ততটা নাই। এখন বিলাতী সস্তা কাপড় ছাড়িয়া দেশীয় মূল্যবান ও টেকসই কাপড় আমরা ব্যবহার করি না। যাহা হউক, ভারতীয় কৃষক, শিল্পী ও শ্রমজীবিগণের শ্রমজাত জিনিষ যে একদিন জগতে সর্ব্বত্র সমাদৃত, হইত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

তবে এখন ঐ সকল জিনিষ ভারতে প্রস্তুত হয় না কেন, এবং কেনই বা উহাদের জন্য আমরা পরপ্রত্যাশী হইয়া রহিয়াছি? কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচ গ্রহণ করিয়া আমরা কোন্ দুর্ল্লভ জিনিষ প্রাপ্তি কামনায় ভারতমাতার হৃদয় শোণিত বৈদেশীকে দিয়া তাঁহাকে দিন দিন দুর্ব্বল করিতেছি? সুখের বিষয় যে ঐ সকল প্রশ্নের সুমীমাংসার জন্য ভারতবাসীর প্রাণ মন এক্ষণে উদ্ঘাটন হইতেছে।

আজকাল কাপড়ের দর দিন দিন চড়িয়া যাওয়ায় অনেকেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এরূপ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ; কেননা বিলাতে তুলার আমদানি কমিয়া যাওয়ায় কাপড়ের দর এত বৃদ্ধি হইয়াছে, বিলাতি তাঁতিরা আর সুবিধা দরে আমেরিকার তুলা ক্রয় করিতে পারিতেছে না, অথচ আমেরিকার মুখ পানেই তাহাদিগকে তুলার জন্য হাদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে হইতেছে। আমরা দেখিতেছি যে, এই সুযোগ বুঝিয়া বিহারের ইয়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা কার্পাসের আবাদে অধিকতররূপে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। অতএব এবার হইতে বিহারে তুলা ভালই হইবে বলিয়া আশাকরা যায়। তবে প্রকাশ থাকে যে, বিহারে তুলা জন্মিলেও আমাদের লেপ তোষক তৈয়ার করায় কোনই সুবিধা হইবে না, কেননা যাঁহাদের প্ররোচনায় বিহারে তুলার চাষের উন্নতি হইতেছে, তাঁহারাই সমস্ত তুলা বিলাতে টানিয়া লইবেন। এই সুযোগে যদি এ দেশের লোকেও তুলার চাষে মনঃসংযোগ করে তবে তাহাদেরও দু'পয়সা

ব্রিটিস এসোসিয়েসনের সভাপতিরূপে সার নরম্যান লকইয়ার ইংলণ্ডের জন সাধারণকে বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইবার জন্য সম্প্রতি অনেক সারগর্ভ কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"Germany after jina and France after sedan acted on the view.

"When land is gone and many spent, then learning is most excellent"

অর্থাৎ জেনার যুদ্ধের পর জর্ম্মনি এবং সিদানের যুদ্ধের পর ফ্রান্স এই ধারণায় চলিয়াছিলেন যে, যখন বিষয় সম্পত্তি নাশ ও অর্থব্যয় হইয়া যায়, তখন বিদ্যাই অতীব প্রয়োজনীয়।

বাস্তবিক পক্ষে জেনার যুদ্ধে প্রুশিয়ার শোচনীয় দশা উপস্থিত হইলে রাজা ও তদীয় জ্ঞানী মন্ত্রীগণ দেশের লোকের মস্তিস্কের উন্নতি সাধন করিয়া নানাবিধ ক্ষতি পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব সত্বেও জর্ম্মন সম্রাট তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় ও আরও কতিপয় সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। এইরূপ চেষ্টার ফলে দেশে শিক্ষার এতই উন্নতি হইয়াছিল যে, কয়েক বৎসর পরেই লর্ড পমোর্সটন জর্ম্মনিকে দার্শনিকের দেশ বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ সিদানের যুদ্ধের পর ফরাসীগণ জর্ম্মনবাসীদিগের অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার ফলে ফ্রান্সের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার অধীনস্থ বিদ্যালয় সমূহ ১৫টী স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ পরিণতির ফলস্বরূপ ১৮৯৭-৯৮ সালের ছাত্র সংখ্যা ১২ হাজার ও শিক্ষায় ব্যয় ২ লক্ষ পাউণ্ড হয়। সার নরম্যান্ লকইয়ার এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, এই সকল দৃষ্টান্ত অপেক্ষাও জাপানের উদাহরণ প্রকৃষ্টতর। জাপান কোন যুদ্ধের পর নহে, পরন্তু একটী যুদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষার প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অতএব আমরা জর্ম্মনি ও ফ্রান্সের ন্যায় হওয়ার পর কি কোন দেশব্যাপী দুর্ঘটনা হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই দূরদর্শী জাপানের ন্যায় শিল্পাদির শিক্ষার দ্বারা স্বদেশের কল্যাণ সাধন করিব, তাহাই জিজ্ঞাস্য? আমরা বলিতে পারি যে, এই সকল কথা ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতের পক্ষেই বেশী খাটে। সারনরম্যান লকইয়ার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে ইংলণ্ডের বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য ৩৬০ কোটি টাকা

ঐরূপ একই উদ্দেশ্য সাধন জন্য অর্থ সাহায্য করিবেন, সন্দেহ নাই। তবে ইহা স্থির যে, গবর্ণমেণ্টের নিকট অত্যধিক সাহায্যপ্রাপ্তির আশা করা বৃথা। জাপানের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, জাপানের মধ্যবিত্ত লোকের সমবেত চেষ্টারই ফল। প্রকাশ থাকে যে; ২৫ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের এই শ্রেণীর লোকের অবস্থা ভারতের মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয় ছিল। অতএব বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞান ও শিল্পের শিক্ষার জন্য ভারতবাসী মাত্রেরই যথাবিহিত চেষ্টা করা যুক্তি সঙ্গত। সার নরম্যান লকইয়ার বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের ৫ লক্ষ লোক যদি প্রত্যেকেই বার্ষিক ৬ পেনস্ মাত্র সাহার্য্য করেন তবে সেই মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইবে। বলা বাহুল্য, ভারতের পক্ষেও ঐরূপ নীতি প্রযোজ্য করা একান্ত আবশ্যক।

এতদ্ব্যতিরিক্ত বৎসরে ৫০ জন ভারতবাসী যুবককে বিদেশে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা আবশ্যক। ভারত সভার নিম্নলিখিত কয়েকটী উদ্দেশ্য থাকা সমীচীন, (১) ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার উৎসাহদান। (২) ঐরূপ শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য বৎসরে ৫০ জন ভারতীয় যুবককে ইউরোপে প্রেরণ করা। (৩) এ দেশীদিগের দ্বারা পরিচালিত কলেজ সমূহের যোগ্য ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রধান প্রধান নগর সমূহে বিজ্ঞানাগার প্রভৃতি স্থাপন করা। (৪) শিক্ষার্থীগণের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপযোগী অর্থদান ও শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে এদেশে কর্ম্মে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা। (৫) এদেশে বিজ্ঞান-সম্মত উন্নত কৃষি কার্য্যে উৎসাহদান। (৬) বৃত্তি স্থাপন।

এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, ১লক্ষ ২৫ হাজার টাকা চাঁদা দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইবে। এই টাকার মধ্যে চাঁদা আদায়ের জন্য ২৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে। অবশিষ্ট টাকা নিম্নলিখিত কার্য্যের জন্য ব্যয় হওয়া প্রয়োজনীয়। (১) ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানে গমনান্তর শিক্ষার জন্য বৃত্তি বাবত ৪০হাজার। (২) ইউরোপে উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষার জন্য ১০ হাজার। (৩) বিদেশে শিক্ষা সমাপনান্তে যে সব ছাত্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তাঁহাদের ব্যয়ের জন্য ২৫ হাজার এবং কলিকাতায় বিজ্ঞান শালা স্থাপন জন্য ২৫ হাজার টাকা।

৫ লক্ষ ভারতবাসী যদি প্রত্যেকে চারি আনা চাঁদা দেন তাহা হইলে এই টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। দেশের সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারীগণ, উকীল ও মোক্তার সম্প্রদায় এবং ছাত্র সমিতি যদি এই শুভ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য চেষ্টা

বীরগণ এই কার্য্যে যোগদান করেন তবে ইহা সম্পন্ন করাও কঠিন নহে। তবে এইরূপ লোক এই কার্য্যে যোগদান করিবেন কিনা, তাহাই আলোচ্য বিষয়। প্রত্যেক সভ্য দেশেই এইরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, সুতরাং ভারতেও তাহা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যদি দেশের লোকে এইরূপ সাধুব্রত উদযাপন করে অকপট চেষ্টা ও সহানুভূতি প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে তাহা এ দেশের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে।

সুখের বিষয় লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের আমলে শিল্পশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক গুলি বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং এই সকল বৃত্তি প্রধানতঃ খনিজ বিদ্যা শিক্ষার জন্য দেওয়া হইবে বলিয়াই ঘোষিত হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, এই সকল বৃত্তিধারী যুবকগণ জাপানে শিক্ষার জন্য যাইতে পারিবেন না। তবে গত সুপ্রিম কাউন্সিলের অধিবেশনে সার ডেনজিল ইবেটসন বলিয়াছেন যে, প্রতীচ্য শিক্ষা প্রাচ্য দেশে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন লোক জাপানে প্রেরিত হইবেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রদত্ত রিপোর্ট সন্তোষজনক হইলে গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণ ভবিষ্যতে জাপানেও শিক্ষার্থ যাইতে পারিবেন।

তবে এক্ষণে কথা হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট যখন আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন তখন কি এ দেশের লোকের কর্ত্তব্য পরায়ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে? এখন দেশের লোকে আপনারাই আপনাদিগকে সাহায্য করিলে এই কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদিত হইবে। এইরূপে আমরা একটী জাতিস্বরূপ অগ্রসর হইতে পারিব ও শেষ পর্য্যন্ত জাতীয়তা প্রতিপাদন করিতেও সক্ষম হইব। এ সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ যে প্রস্তাব করিয়াছেন,তাহা অতীব সমীচীন ও সাময়িক। মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা খাঁ বাহাদুর অনারেবল সিরাজুল ইসলাম এই শুভ আন্দোলনে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অপিচ দেশের নানা স্থান হইতে যোগেন্দ্র বাবুও নানারূপ আশা ভরসা পাইতেছেন। অতএব এই প্রস্তাব মত চারিদিকেই সুন্দররূপে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এবং এইরূপ কার্য্য আরম্ভ হওয়াই কার্য্যসম্পন্ন হওয়ার অর্দ্ধেক প্রমাণ বলিতে পারা যায়। এখন যেরূপ আশা পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় কার্য্য নিশ্চয়ই সম্পাদিত হইবে। এই ব্যাপারে সমগ্র দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে এবং ইহাতে বহুতর যুবকের অশেষ কল্যাণও সাধিত হইবে।

রণেরই একান্ত সহানুভূতি থাকা আবশ্যক। যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি যদি সেই রূপ সাহায্য করেন তাহা হইলে সেই সমবেত সাহায্যের পরিমাণ নিশ্চয়ই সুফল-প্রদ হইবে।

এরূপ দৃষ্টান্তও এ দেশে বিরল নহে, কেননা এইরূপ সমবেত চেষ্টার ফলেই লাহোরের আর্য্যসমাজ তথায় দয়ানন্দ এংলোভেদিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই আর্য্যসমাজ দুই চারি করিয়া শেষে ৪ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। বাঙ্গালা অপেক্ষা পাঞ্জাব যখন অনুন্নত, তখন উন্নত বাঙ্গালা কি এরূপ সংকার্য্যে পাঞ্জাবের অনুকরণ করিতে পারিবে না। ভারত অপেক্ষাও জাপান দরিদ্রতর, কিন্তু জাপানী কুলিরাও আবশ্যকমত দেশের মঙ্গলের জন্য যথাশক্তি সাহায্য করিয়া থাকে। এমন কি, জাপানের কুলিরা কখন কখন আপনাপন মজুরের সিকি অংশ জাপানী গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে তিল মাত্রও ইতস্ততঃ করে না। জাপানের দেশভক্তি এতই প্রবল যে, কোন প্রবাসী জাপানী আপন সুন্দরী ভার্য্যাকে তাঁহার সুচিক্কণ কেশগুচ্ছ বিক্রয় করিয়া তন্মূল্যে যুদ্ধ ফণ্ডে সাহায্য করিতে বলিয়াছিলেন। অতএব জাপানীরা যেরূপ প্রীতির চক্ষে স্বদেশকে দেখিয়া থাকেন, আমরাও কি তেমনি ভারতকে দেখিতে পারিব না?

শিল্পকর্ম্মের উন্নতি কল্পে সচেষ্ট হওয়া আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার সাধন এবং নব শিল্পের প্রচলন যাহাতে কল কারখানা দ্বারা সমাহিত হয়, আমাদের সর্ব্বতোপ্রযত্নে তাহাই করা উচিত। কলকারখানার সাহায্য ব্যতীত আমাদের হাতে বোনা কাপড়ের পক্ষে ল্যাঙ্কেশায়ারে যন্ত্র প্রস্তুত বস্ত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়াস করা বাতুলতা মাত্র। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সফল মনোরথ হইতে হইলে অবস্থাগত সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক। কলে ও হাতে সে সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। তাই বলিয়া যে হস্তে বুনন কার্য্য আমরা একেবারে পরিত্যাগ করিব তাহা নহে। কারুকার্য্য বিশিষ্ট বস্ত্রাদির জন্ত হস্তকৌশলে কর্ম্মসম্পন্ন চিরকালই করিতে হইবে যাহাতে বোম্বাইয়ের মত আরও কল কারখানা এদেশে সংস্থাপিত হয় তাহা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কার্য্যে মূলধনের আবশ্যক। সম্ভূয় সমুত্থানে কার্য্যারম্ভ করিলে মূলধনের অভাব শীঘ্রই দূর হইবার সম্ভাবনা। সম্মিলিত হইয়া কার্য্যসাধন করিবার ইচ্ছা থাকিলে তদুপযোগী শিক্ষা চাই। উপযুক্ত শিক্ষাদ্বারা চরিত্র পরিমার্জ্জিত ও গঠিত না হইলে ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক সংগৃহীত অর্থে দেশের শিল্পোন্নতি সাধন করা [illegible]

ইহা আশ্বস্ত হইবার বিষয় সন্দেহ নাই যে, দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার কল্পে একক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায় সচেষ্ট হইয়াছেন। কি বিলাসের জন্য, কি অভাব মোচনের নিমিত্ত স্বদেশজাত বস্তুর ব্যবহার যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, ইহাও নিরাতশয় আহ্লাদের বিষয়। তবে এই স্বদেশ বস্তু প্রচারের স্রোত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে; আশার অনুরূপ দেশীয় বস্তুর ব্যবহার হইতেছে না; যথার্থই পরিতাপের বিষয়। কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা অপেক্ষা দেশীয় দ্রব্যের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন অধিকাংশস্থলে লোকে দেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার করিতে পারে না। কোথায় দেশীয় দ্রব্য পাইবে, তাহার সন্ধান করিয়া বেড়ান কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব পর হয় না। কাজেই দেশীয় দ্রব্যের অভাবে বৈদেশিক দ্রব্যের ব্যবহার করিতে হয়। সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, শুদ্ধ দেশহিতৈষিতার উপর নির্ভর করিলে, লোকের ভাবোচ্ছ্বাস ও অনুরাগের আশায় স্বদেশ বস্তু প্রচারের কামনা করিলে সফলতালাভের সম্ভাবনা নাই। প্রতিযোগিতায় স্বদেশীয় দ্রব্যের মূল্যাধিক্য যতদিন না হইবে, যেখানে সেখানে পাইবার সুবিধা যতদিন না হইবে, ততদিন আমরা আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ স্বদেশ বস্তু প্রচারের আশা করিতে পারি না। কাজেই এখন চারিদিকে স্বদেশ-বস্তু বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে। দেশীয় বস্ত্র, দেশীয় পাদুকাদি, রেশম ও পশমের দেশী বসনাদি, পিত্তল, কাঁস, স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্ত প্রভৃতির দ্রব্যজাত, মর্ম্মরাদি প্রস্তরের বাসন, খেলনা প্রভৃতি চারিদিকে পাওয়া যাইতেছে। যাহা দেশে পাওয়া যায়, নিকটে পাইলে লোকে তাহার বিলাতী আমদানি লইতে চাহে না। বরং চীনা ও জাপানী দ্রব্য লইতে চাহে, তথাপি "মেড্ ইন্ জার্ম্মেনি" প্রভৃতি চাহে না। এ বৎসর জাপানী দীপশলাকার এত অধিক কাটতি এই জন্যই হইয়াছে।

সে যাহা হউক, কলিকাতায় "ইণ্ডিয়ানষ্টোরস্" বা ভারত ভাণ্ডার নামে সমুদয় সমুত্থানে অর্থাৎ সম্মিলিত মূলধনে যে ব্যবসায় আরব্ধ হইয়াছে, তাহা অতীব সন্তোষের বিষয়। এ নবীন উদ্যমে পদে পদে ত্রুটী থাকিতে পারে, বহুদর্শিতার অভাবে ইহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। তথাপি এ বৎসর ইহাতে যে শতকরা ছয় টাকার হারে অংশীরা লাভ পাইয়াছেন, ইহা সামান্য আশার কথা নহে।

"ইণ্ডিয়ানষ্টোরস্" যে কৃতকার্য্য হইতেছেন, তাহার প্রধান কারণ ইহার অংশীগণের একাগ্রতা; তাঁহাদের নিঃস্বার্থতত্ত্বাবধান, অকৃত্রিম উদ্যোগ, অসাধারণ অধ্যবসায় ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম যে ইহার উন্নতির প্রধান কারণ, তাহাতে

তাহাও ইহার উন্নতির অন্যতর কারণ। এরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া, ব্যক্তিগত লাভের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অকাতরে পরিশ্রম করিলে যদি চেষ্টা না ফলবতী হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের উদ্যমই বৃথা।

এ ভাণ্ডার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হিসাব পরীক্ষক লভলক ও লুইস মহোদয়েরা সমস্ত খাতাপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, তাহা অতীব সন্তোষজনক। এ বৎসরে একলক্ষ বাইশ হাজার নয় শত উননব্বই টাকার দ্রব্য বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, ইহাও আশার বিষয়। যখন কলিকাতার চারিদিকে এইরূপ দেশীয় ব্যবসায়ের বিস্তার দেখিব, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, এইরূপ স্বদেশ দ্রব্য প্রাপ্তির সুযোগ দেখিব, কি ধনবান কি দরিদ্র সকলেই দেশের দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে, অনুভব করিতে সমর্থ হইব, তখন বুঝিব, এই ভারত ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়াছে।

দেশীয় বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইতেই হইবে। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান রাজস্বনীতি আমাদের দেশজাত পণ্যের অনুকূল নহে। ভারতের রাজস্বনীতি ভারতেরই প্রতিপোষক হওয়া উচিত। ল্যাঙ্কেশায়ারের সুবিধামূলক রাজস্বনীতি ভারতে প্রবর্ত্তন করিলে তাহাতে ভারত বাণিজ্যের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। যদি ভারতের প্রতি ন্যায় বিচার করিতে ইংলণ্ডের ইচ্ছা এবং সাহস থাকে, তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ড যেমন স্বদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য রক্ষা করিতেন, ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যও তাঁহাকে তদ্বৎ রক্ষা করিতে হইবে। যদি ইহা একান্তই অসম্ভব হয়, তবে ভারতের তাৎকালিক রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যে স্বাধীন বাণিজ্য নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এ দেশীয় শিল্প পণ্যের প্রসার কল্পে ভারতের ব্যবস্থা বিধাতাগণেরও সেই নীতি অবলম্বনীয়। ভারতীয় কল কারখানায় প্রস্তুত কম্বা দ্রব্যজাতের উপর যে এক দেশদর্শী শুল্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং যাহার ভারে ভারতীয় শিল্প মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই নিন্দনীয় করভার লাঘব করা ভারত গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। লবণকর একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত। ভারতে যে সকল বৈদেশিক দ্রব্যজাতের আমদানি হইলে তাহার উপর কর আদায় করা হয়, দেশীয় পণ্য যদি ঐ সকল দ্রব্য জাতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে, তবে সেই দেশীয় পণ্যের উপর কর বসান কখনই সমীচীন নহে। একথা পক্ষপাত শূন্য ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমরা রক্ষণশীল বাণিজ্যের সমর্থন করি

দের দেশে বিক্রয়ার্থ আসিলে যদি আমরা তাহার উপর কর আদায় করি; তবে তাহা বেশী দরে বিক্রীত হইবে এবং সেই বেশীদর আমাদিগকে করস্বরূপ দিতে হইবে। এইরূপ করিলে রাজ কোষে অবশ্যই কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইবে, কিন্তু দরিদ্র ভারতবাসীর কিছুমাত্র উপকার হইবে না। পরন্তু এ দেশীয় পণ্য বিদেশে প্রেরিত হইলে, তদ্দেশীয় গবর্ণমেন্ট ও ঐ পণ্যের উপর কর আদায় করিবেন। সুতরাং আমাদিগকে এক পক্ষে বৈদেশিক জিনিষ বেশীদরে ক্রয় করিতে হইবে এবং অপর পক্ষে এ দেশীয় রপ্তানিদ্রব্যের উপর বৈদেশিক গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক যে কর বসিবে, তাহাও দিতে হইবে। অতএব আমাদিগকে দুই দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। আমরা সেই স্বাধীন বাণিজ্যের পক্ষপাতী যাহা ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুক সমর্থন করিয়াছিলেন। জনষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, সকল বাণিজ্যেরই শৈশবে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষণশীল হওয়া আবশ্যক। আমরাও বলি, ভারতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে আমাদের সদাশয় গবর্ণমেন্টের ও রক্ষণশীলনীতি অবলম্বন করা যুক্তি যুক্ত। আমাদের গবর্ণমেন্ট যে ম্যাঞ্চেষ্টারের বিপক্ষে দেশীয় শিল্পোন্নতির জন্য রক্ষণশীল নীতির অনুমোদন করিবেন,তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। তবে যাহাতে দেশীয় শিল্পের করভার লাঘব হয়, এতদ্দেশীয় রাজপুরুষগণের তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শাসন কার্য্য সৌকার্য্যার্থে আমাদিগের প্রভূত অর্থ বিলাতে প্রেরণ করিতে হয়, কিন্তু তদ্বিনিময়ে তথা হইতে কিছুই প্রাপ্ত হই না, এবং অকিঞ্চিৎকর বৈদেশিক শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতিদানে আমাদিগকে দেশের কৃষিজাত দ্রব্য প্রদান করিতে হয়! এই দুই কুপ্রথা পরিবর্জ্জিত না হইলে ভারতের মঙ্গল নাই। মোট কথা দেশের ধন যাহাতে দেশে রহিয়া যায়, সর্ব্বান্তকরণে আমাদের তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যে কেবল বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানি কমা যাইবে তাহা নহে, পরন্তু দেশীয় দ্রব্যের রপ্তানি বর্দ্ধিত হইয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিবে।

এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ পার্শীধনকুবের জেমসেটজী নাসেরিয়ানজী তাতা মহোদয়ের জীবনীর স্থূল স্থূল ঘটনাগুলি বর্ণনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বস্তুতঃই তাতা মহোদয় একজন প্রকৃত কর্ম্মবীর ছিলেন। দেশের মঙ্গলের জন্য ভারতবাসীর উন্নতির জন্য তিনি যেরূপ আন্তরিক চেষ্টা যত্ন করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে সেরূপ চেষ্টা ও আন্তরিকতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, দেশীয় শিল্পাদির উন্নতি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। তাই তিনি ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য, ইয়ুরোপের

অজস্র অর্থব্যয়ে অক্লান্ত শরীরে প্রাণপণ খাটিয়া শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর চাকরি লালসা ঘুচাইতে না পারিলে, আর ভারতের অন্য উপায় নাই। তাই তিনি বিপুল পরিশ্রমে, অদম্য অধ্যবসায়, ভারতীয় যুবক বৃন্দের কর্ত্তব্যস্রোত ফিরাইবার জন্য ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। অল্পবয়সেই পড়াশুনা পরিত্যাগ করিয়া, তিনি পিতার ব্যবসায়ের সহকারীরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। অদ্ভুত প্রতিভা এবং তীক্ষ্ণ দর্শিতার বলে অল্পকালমধ্যেই বাণিজ্যনীতির সূক্ষ্মতত্ত্বাদি তাঁহার আয়ত্তাধীন হয়। অবিলম্বে তিনি চীন দেশে গমন করেন। তথায় এক সুবিস্তৃত কারবারের প্রতিষ্ঠা করিয়া জাপানের বিভিন্ন প্রদেশে, চীনের হংকং সাংহাই প্রভৃতি নগরে ফ্রান্সের পারিস এবং মার্কিনের নিউইয়র্ক সহরে তাহার শাখা বিভাগ খুলেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রভূত অর্থলাভ হয়।

এই সময়ে তাঁহার বিলাত গমনের একান্ত অভিলাষ হয়। ইংলণ্ডের বস্ত্র ব্যবসায়িগণ কিরূপে বস্ত্র বাণিজ্য চালাইয়া থাকেন তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই, এই বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য। নানাবিধ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি বিলাত গমন করিয়া এ সম্বন্ধে সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করেন এবং দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চিঞ্চপুগলি নামক তৈলের কল খরিদ করিয়া তথায় একটী কাপড়ের কল খুলেন।

এই কলই বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত "আলেকজেন্দ্রা মিল"। এ কলে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হয়। এই মিল বিক্রয় করিয়া তিনি পুনরায় বিলাত গমন করেন। তথায় ল্যাঙ্কাসারের সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়িগণের সহিত নানারূপে ঘনিষ্ঠতা করিয়া বড় বড় সূতা ও কাপড়ের কলের কার্য্য প্রণালী দেখা শুনা করিয়া, কাপড়ের কল বিষয়ে তিনি সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। দেশে আসিয়া "এম্প্রেসমিল" নামে নাগপুরে আর একটী কাপড়ের কল খুলেন।

এই সময় একটী বিশেষ কাজ করিয়া তাতা ভারতের বিশেষ উপকার সাধন করেন। এতদিন পর্য্যন্ত কতকগুলি বিলাতী এবং অন্যান্য দেশীয় ষ্টীমার কোম্পানি ভারত হইতে মাল বুঝাই করিয়া চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে পৌছিয়া দিত। কিন্তু তাহাতে যে ভাড়া লাগিত, তাহা কিছু অধিক। তাতা দেখিলেন এই সকল বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানি কতকটা অন্যায় রকমে ভাড়া আদায় করিতেছেন। তাতা জাপানের কতকগুলি জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে যোগ দিয়া, এই ভাড়া হ্রাসের জন্য আন্দোলন করিয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিলাতী ষ্টীমার

অনেক অর্থব্যয়ে তিনি "তাজমহল" হোটেল নির্ম্মাণ করাইয়া বহু ব্যক্তির অভাবমোচন এবং নিজের প্রভূত ধনাগমের উপায় করিয়া গিয়াছেন।

"রিসার্চ্চ ইনিষ্টি টিউট" বা গবেষণা তত্ত্ব বিদ্যালয়
স্থাপন চেষ্টাই তাঁহার জীবনের অতুল কীর্ত্তি।

কাপড়ের কল, রেশমের চাষ এবং অন্যান্য কার্য্য ব্যতীত ভারতের লৌহ এবং তাম্রাদি খনিজ দ্রব্য যাহাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সে দিকেও তিনি সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

মহীশূরে রেশমের চাষ এবং মধ্য ভারতের লৌহ ও তাম্র সকলের জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

সমাপ্ত।

# রঙ মহলে প্রেম।

## লেখক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

যুবক যুবতীরা প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপে প্রেমালাপ করিতেছেন। সকলেই বাহ্য জ্ঞান শূন্য, কতক্ষণ যে এইরূপে অতীত হইয়াছে, সম্মুখে যে কোন বিপদ উপস্থিত কি না তাহা অনুধাবন করিবার শক্তিও তাঁহাদের নাই। এই কক্ষ শ্রেণীর অপর পার্শ্বস্থিত কোন কক্ষের দরজার বাহির দিক হইতে কে সজোরে আঘাত করিতেছে। সহসা সেই শব্দ শুনিয়া, প্রণয়ীবৃন্দ চমকিয়া উঠিলেন, শব্দ সকলের কর্ণে বজ্র গম্ভীর বাজিল। ব্যাঘ্র ভয় ভীতা কুররীর ন্যায় গুলনেয়ার ও মির্জা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাদের আরক্তিম বদনে প্রণয় রাগের পরিবর্ত্তে ভীষণ ভীতির চিহ্ন দেখা দিল। উভয়ে যুগপৎ চীৎকার করিলেন, "বাবা" "বাবা" বাবা আসিতেছেন।'

"মামা" মামা আস্‌ছেন। কি সর্ব্বনাস" বলিয়া জুলেকা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। খালিল তদ্দণ্ডে নেত্র ভঙ্গী করিয়া, তাহাকে কি বলিলেন। রক্ষাকর্ত্তা ভাবিয়াই যেন জুলেকা খালিলের নিকট গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া দাঁড়াইল।

আঘাত ক্রমশঃ অধিক জোরে হইতে লাগিল। অবশেষে ডলতাবান পাশার কর্কশ-বজ্র গম্ভীর স্বর সকলের কর্ণে আসিয়া পঁহুছিল। এই দণ্ডে দ্বার উন্মোচন না করিলে যে, তিনি দ্বার ভঙ্গ করিয়া, গৃহে প্রবেশ করিবেন, এই কথাই পাশা

খালিদ কহিলেন,—"ভাই সকল, পরিণামে যে দণ্ডেই ভোগ করিতে হউক সমস্ত দোষ আমাদের স্কন্ধেই লইতে হইবে। ভদ্র লোকের মত কাজ করিতে হইবে। পাশাকে এমত কোন কৈফিয়াত দিতে হইবে, যাহাতে সমস্ত দোষ আমাদেরই স্কন্ধে পড়ে, অন্য কোন জীবিত প্রাণীকেই ইহার সহিত লিপ্ত করা হইবে না।"

লিউকস কহিলেন,—"ভাল কথাই বলিয়াছ; প্রিয়তম খালিদ, তুমি ভদ্র লোকের মত কথাই বলিয়াছ। আমাদের সকলের দিয়া আমি কৈফিয়াত দিব।"

"জুলিয়ান কহিলেন,—"আমাদের পরম বন্ধু খালিদ যাহা বলিবেন, তাহাই কর্ত্তব্য। আমরও সেই মত, অন্য কাহাকেই দোষী করা হইবে না।"

দ্বারের আঘাত ও পাশার তর্জ্জন গর্জ্জন সমান ভাবেই চলিতেছে। লিউকস কহিলেন,—"আমিই গিয়া দরজা খুলিয়া দিব, পাশার তীব্র রাগের প্রথম কোপটা আমারই মাথায় পড়ুক।" এই বলিয়া লিউকস কক্ষান্তরে গিয়া, দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন।

## চতুর্থ স্তবক।

### পাশা।

চাবি খুলিবামাত্র কবাট, দুই খানি বেগে দু-দিকে সরিয়া গেল। বাহিরের আলোকে লিউকস দেখিলেন। ডলতাবান পাশার পশ্চাতে ছয় জন কৃষ্ণকায় কাফ্রি দাস। গ্রীক যুবক তন্মধ্যে দুই জনকে তৎক্ষণাৎ চিনিলেন, তিনি গুপ্ত-ভাবে যে কয় দিন পাশার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই কয় দিনই উহারা সেই ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া আনিয়াছে। দ্বার খুলিবা মাত্র লিউকস এক পাশে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। ডলতাবান সর্ব্বাগ্রে অতি বেগে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই সুযোগে গ্রীক যুবক ঐ দাস দ্বয়কে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, তাহারা যদি কোন কথা প্রকাশ না করিয়া থাকে, তবে তাহাদের কোন ভয় নাই, দাসদ্বয় সেই ইঙ্গিত বুঝিল তাহারা প্রথম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে তাহারা কোন কথাই প্রকাশ করে নাই পরে অভয় পাইয়া, মস্তক অবনত পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জানাইল।

চোকের পলক পড়িতে না পড়িতে এই কার্য্য হইয়া গেল তৎদণ্ডে উলঙ্গ অসি উত্তোলন করিয়া ডলতাবান পাশা ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় লিউকসের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

যুক্ত করদ্বয় বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া, বিনীত ভাবে লিউকস কহিলেন,—

কিন্তু তাহা হইলে, নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করা হইবে। ইহা অবশ্য বীরের কার্য্য নহে। যদিও আমার কটিবন্ধে অসি ঝুলিতেছে, কিন্তু আমি প্রাণান্তেও সে অসি ধর্ম্ম পরায়ণা প্রিয়তমা গুলনেয়ারের জনকের বিরুদ্ধে কোন মতেই উত্তোলন করিতে পারিব না।"

ডলতাবান বীর পুরুষ তিনি সাহস বড় ভাল বাসেন, পরম শত্রু ব্যক্তিরও সাহসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কখন ইতস্ততঃ করিতেন না। উত্তোলিত নিষ্কো-সিত অসি ক্রমে নমিত হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া, বিশেষ মনোযোগের সহিত তিনি লিউকসের সর্ব্বাবয়ব পরীক্ষা করিলেন। সে সরোষ দৃষ্টিতে কঠোরতা এখনো সমানভাবে বিরাজমান। কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, তিনি সহসা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন;—"ইহাকে বন্দীকর।"

ছয় জন দাস তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। লিউকস তিলমাত্র বাধা জন্মাইলেন না। প্রভুর দ্বিতীয় আদেশ পাইবামাত্র রক্ষকগণ লিউকসের মণি মুক্তা শোভিত অসি দ্বয় কাড়িয়া লইল। বন্দীকে লইয়া অগ্রগামী হইবার জন্য দাস দিগকে আজ্ঞা করিয়া, পাশা দ্রুত পদে পূর্ব্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করি-লেন। নিষ্কাশিত তরবারি তখনও তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া আছেন।

পাশা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র গুলনিয়ার ও থির্জা ভয় বিহ্বল হইয়া, অতি দুঃখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা হইয়া, পিতার চরণ প্রান্তে নিপতিত হইল! জুলেকা এ যাবৎ খালিলকে ধরিয়া ছিলেন। মাতুল গৃহে প্রবেশ করিলে, তিনিও ভগ্নি-দ্বয়ের দেখাদেখি মাতুলের পাদদেশে নিপতিত হইলেন। কিন্তু তাহার মুখে একটিও কথা সরিল না। কেবল ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে মাতুলের মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন।

পাশা খালিল ও জুলিয়ানের দিকে দৃষ্টি যোজনা করিয়া, বজ্র গম্ভীরস্বরে দাস দিগকে কহিলেন,—"ইহাদেরও অস্ত্র কাড়িয়া লও।"

তুর্ক যুবক বিনীতভাবে অথচ স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কহিলেন,—"ধর্ম্মাব-তার, বল প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন, বর্ত্তমান অবস্থায় কোন প্রকার বাধা জন্মাইতে আমাদের বাসনা নাই।"

জুলিয়ানও সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন,—"না ধর্ম্মাবতার সে সংকল্প আমাদের নাই। আমরা দোষ করিয়াছি, অতএব আমরাই দণ্ড গ্রহণ করিব। মরিতে হয়, আম-রাই মরিব, কারণ আমরা একাই দোষী।"

"মরিতে হয় মরিবে, না-মা', উভয় সহোদরা যুগপৎ এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া, লম্ফভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জ্যেষ্ঠার ভীতি চঞ্চল নেত্র একবার লিউ-কসের দিকে, একবার পিতার বদনে স্থাপিত হইতে লাগিল। কনিষ্ঠাও সভয়ে একবার জুলিয়ান ও একবার জনকের দিকে চাহিতে লাগিল।

জুলেকায় ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। এখনো তাহার মুখে কথা ফুটিল না। সে কেবল সলজ্জ ও সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার খালিলের দিকে চাহিল।

লিউকস কহিলেন,—"ধর্ম্মাবতার, যদি অনুগ্রহ করিয়া, এক মুহূর্ত্ত কাল ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, আমার কথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে, আমি সন্তোষ জনক রূপে আপনাকে বুঝাইতে পারি যে, উপস্থিত ব্যাপারে আপনার কন্যাদ্বয় ও আপনার ভাগিনেয়ী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। অদ্যকার অপরাধের যা কিছু দণ্ড, যা কিছু প্রতি-হিংসা——প্রতিহিংসা লইয়াই যদি আপনার অভিমত হয়—সে সমস্তই আমাদের উপর অর্পিবে।"

পাশা তীব্রস্বরে কহিলেন,—"বল কি বলিবার আছে।

এই বলিয়া প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায়, তিনি গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। যে কথা শুনিবার জন্য তাঁহাকে গ্রীক যুবক সাম্নয়ে অনুরোধ করিল, তাহা মনো-যোগের সহিত শুনাই যেন কর্ত্তব্য বুঝিয়া তিনি কহিলেন,—"বল, কি বলিবার আছে।"

লিউকস অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন,—যেন প্রকৃত সত্য কহিতেছেন,—"মহাশয়, আমি ও আমার বন্ধুদ্বয় আমরা সকলেই সম্রান্ত-বংশীয় ধনীর সন্তান কেবল মাত্র দেশ ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই বিদেশে আসিয়াছি। কনষ্টাণ্টিনোপলে আমরা সবে এই কয় দিন মাত্র আসিয়াছি। অদ্য সন্ধ্যার সময় বসফোরস নদীর তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে তীরস্থ পাদপরাজি ও লতাকুঞ্জের মনোহর শোভা দর্শন করিতে করিতে আমরা আপনার এই প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং একটী ফটক মুক্ত দেখিয়া,—"পাশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ ফটক ?,,

লিউকস একটু ইতস্ততঃ করিলেন বটে, কিন্তু উত্তর করিবার সময় সেইরূপ অসঙ্কুচিত ভাবেই কহিলেন—"দ্বারটা ময়দানের পশ্চাৎ ভাগে কোন স্থানে হইবে।"

পাপা কহিলেন,—"আচ্ছা বল।"

জন্মিল, তিনি উত্তর করিলেন,—"মুক্ত দ্বার দিয়া আমরা উদ্যানের যে শোভা দেখিলাম, তাহাতে আমাদের কৌতূহল অতি মাত্র বৃদ্ধি পাইল এবং আমরা উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। উদ্যান মধ্যে কাহাকেও না দেখিয়া, আমরা অনুমাণ করিলাম, বাগান বাটীতে আজ কাল কেহই বাস করিতেছে না। কিয়ৎক্ষণ চতুর্দ্ধিকে ভ্রমণ করিয়া, আমরা উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিয়া যেমন প্রীত হইলাম তেমনি অধিকক্ষণ পরিভ্রমণে পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্তও হইলাম। যেরূপ সুরুচির সহিত আপনার উপবনটী সুসজ্জিত তাহা দেখিলে. এমত লোক কেহ নাই যে মুগ্ধ না হয়। নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ক্ষণকালের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, শ্রম দূর ও পিপাসা শান্তি করা নিতান্তই আবশ্যক হইল। কোথায় যাই, এই চিন্তা করিতেছি, এমত সময় দূর হইতে এই প্রাসাদের একটী মুক্ত দ্বার আমাদের নয়ন পথে পতিত হইল—পাশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ দ্বার ?"

লিউকস কহিলেন,—"দ্বারটী এই কক্ষ শ্রেণীর পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিত।" লিউকস খালিলের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—'সত্য কথা বলা উচিত। আমার এই জনৈক বন্ধু অনাহিত হইয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। বন্ধুবর জুলিয়ানও খালিলের মত সমর্থন করিয়া, নিষেধ করেন। আমিই কেবল, ধর্ম্মাবতার, নিতান্ত জিদ করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম, এক গ্লাস শীতল জল চাহিয়া পান করিয়া, শান্তি করিলে কিংবা ক্ষণকালের জন্য এই প্রাসাদ মধ্যে কোন স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক একটু বিশ্রাম করিলে, কোন অপরাধই হইতে পারে না। আমার একান্ত জিদ দেখিয়া, আমার বন্ধুরা অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আমারসঙ্গে প্রবেশ করিলেন। আর ও আর এক কথাও বলা আবশ্যক যে, এই নগরীতে আজ কাল যে অদ্ভুত ও অশ্রুত পূর্ব্ব হত্যা কাণ্ড ঘটিতেছে। তদসম্বন্ধে আমারা কিছু কিছু শুনিয়াছি, শুনিয়া অবধি আমাদের প্রাণে একটা ভয় জন্মিয়াছে, সেই হইতে আমরা ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রাণান্তেও পরস্পর ছাড়াছাড়ী হইব না। সেই রূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলে হয় ত আমার বন্ধুরা আমার সঙ্গে এই প্রাসাদে প্রবেশ করিতেন না।"

যুবতীত্রয় হত্যার নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। জুলেকার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, বিনা আশ্রয়ে দাঁড়াইতে না পারিয়া, যুবতী খালিলের স্কন্ধদেশ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইল। পাশার দৃষ্টি সে দিকে পতিত হওয়ায়, তিনি জুলেকাকে

পাশা কহিলেন,—"তার পর বল।"

যুবক কহিলেন,—"অধিক আর বলিবার নাই। আমরা এই প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম; সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্রথম যে কক্ষ পাইলাম, তাহাতেই করাঘাত করিলাম। কেহই উত্তর দিল না। আমরা সাহস পূর্ব্বক —আমরাই বা কেন বলি—আমি সাহসে ভর করিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলাম। আমি অগ্রে গৃহে প্রবেশ করিলে, আমার বন্ধুদ্বয় অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। আমরা ক্রমে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া এই যুবতী তিনটীকে দেখিতে পাইলাম। আমাদিগকে দেখিবামাত্র যুবতীরা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অনন্তর ভয় একটু কমিলে, তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, আমরা সুন্দরীদিগের রূপে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম যে, আমাদের ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি রহিল না। আমরা আর আমাদে প্রভুর রহিলাম না, আমরা কোন মতেই গৃহের বাহির হইতে সম্মত হইলাম না। ফলতঃ আমাদের ব্যবহার যে, নিতান্ত বিসদৃশ ও গর্হিত হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যুবতীদিগকে ভীতা বা কুপিতা দেখিয়াও যখন আমরা অচল অটল রহিলাম, তখন তাঁহারা কাকুতি মিনতি, অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে তখন প্রেমানুরাগ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। আমরা এক এক করিয়া আপনার কন্যা-দ্বয় ও ভাগিনেয়ীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলাম। এই শুভ কার্য্য সমাহিত করিবার জন্য যাহাদের অনুমতি আবশ্যক, আমরা তাহাদিগের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেও প্রস্তুত হইলাম। এই সকল কথা হইতেছে, এমতঃ সময়ে দ্বারে আঘাত শুনিয়া, সকলে চমকিয়া উঠিলাম। এখন আপনি সকলই অবগত হইলেন।

পাশা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন তিনি এতক্ষণ ধরিয়া স্থিরভাবে লিউকসের কথা শুনিতেছিলেন, তাহাতেই বোধ হয়, তাহার কথায় কত দূর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না। যুবতীদিগের মুখে দারুণ উৎকণ্ঠার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে, এ চিহ্ন জুলেকার অপেক্ষা গুলনেয়ার ও থির্জার বদন মণ্ডলেই অধিক পরিমাণে দেখা যাইতেছে। তাহাদের সকলেরই মনে আর একটা ভাব সমভাবে উদিত হইয়াছিল। লিউকসের উদারতা ও মাহাত্ম্য দেখিয়া, তাহারা সকলেই বিস্মিত, মহদাশয় যুবক শুদ্ধ যে, তাহাদিগের

নির্দ্দোষী রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছে। লিউকসের এই উচ্চাশয়তা দেখিয়া তাহার বন্ধুদ্বয়ও মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। ডালতাবান পাশার এই দারুণ প্রতিহিংসার ফল ( যেরূপ কঠোর হউক না ) লিউকসকে একাকী ভোগ করিতে প্রস্তত দেখিয়া, তাহারা সুহৃদুত্তমকে মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া, পাশা আবার তীব্র দৃষ্টিতে লিউকসের দিকে চাহিলেন, চাহিয়া কহিলেন,—"তুমি কে, বল, তুমি কে।"

উত্তর হইল,—"আমার নাম লিউকস ভমিলো। আমি মহামান্য সম্রাট সুলতানের একজন প্রজা। আমার পিতা একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি, তিনি তুর্ক সাম্রাজ্য ভুক্ত আলবানিয়া রাজ্যে তাঁহার জমিদারী।"

পাশা এবার কনিষ্ঠ গ্রীকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"তুমিই বা কে?"

জুলিয়ান সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন,—"আমার নাম জুলিয়ান মেলেত্তা। আমার জনক লেমনস দ্বীপের একজন ধনশালী বণিক। আমিও সুতরাং প্রবল প্রতাপ রাজাধিরাজ সুলতান তৃতীয় সেলিমের একজন প্রজা।

তুর্ক যুবকের দিকে চাহিয়া, পাশা পুনরপি কহিলেন,—"আর তোমার পরিচয়;" জুলেকার প্রণয়াভিলাষী যুবক উত্তর করিলেন,—"আমার নাম খালিল ওসমান, আমার পিতা কর মানিয়া প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ও একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন; তাহার সমস্ত সম্পদের আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী। সামাজিক অবস্থাতেই বলুন আর ঐশ্বর্য্যেই বলুন, কোন অংশেই বলুন, আমি আপনার রূপবতী মনোমুগ্ধ করী ভাগিনেয়ী জুলেকার অনুপযুক্ত পাত্র নহি। আমার বন্ধুদ্বয়ের ন্যায় আমিও সম্রাট সুলতানের প্রজা।"

খালিল যতক্ষণ এইরূপ আত্ম পরিচয় দিতে ছিলেন। জুলেকা ততক্ষণ লজ্জা রঞ্জিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন ও একমনে তাহাই শুনিতেছিলেন। পাশা আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলেন। চিন্তার বেগ একটু থামাইয়া, তিনি সহসা চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে চমক এত আকস্মিক যে, কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। পাশা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা গুলনেয়ারের দিকে লক্ষ্য করিয়া, খোজা দিগকে সঙ্কেত করিলেন। দুই জন খোজা তৎক্ষণাৎ গুলনেয়ারকে বন্দী করিল। প্রভু কন্যাকে বন্দী করিবার সময় তাহারা যে বিশেষ নিষ্ঠুরতা দেখাইল না বা কোন প্রকার পীড়ন করিল না, সে কথা বলা

গুলনেয়ার অতিমাত্র কাতর স্বরে কহিল,—"পিতা, পিতা, কর কি!" একি কঠোর আজ্ঞা, এই বলিয়া যুবতী পিতার মুখ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া প্রিয়তমের মুখের উপর স্থাপন করিলেন।

মির্জা চীৎকার করিয়া কহিল,—"বাবা, বাবা, দিদিকে ছাড়িয়া দেও, তাহার অপরাধ ক্ষমা কর।

ধীরে মৃদু মন্দস্বরে জুলেকা কহিলেন,—"মামা, হঠাৎ কোন কাজ করিও না। রাগের মাথায় যদি একটা কাজ করিয়া ফেল, তাহা হইলে, এ জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও কখন আর সুখ শান্তি পাইবেন না।"

জুলিয়ানও পাশার নিকট গুলনেয়ারের জন্য অনুরোধ করিতে ভুলিলেন না। খালিলও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু উলতাবানপাশা হাত ঘুরাইয়া, ও হাকে নীরব থাকিতে আজ্ঞা করিলেন। ক্রমশঃ।

# অনুশীলন ও গার্হস্থ আশ্রম।

লেখক—ডাক্তার শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী।

## সমাজ গঠনে মাতার দায়িত্ব।

উপরে হিন্দু-সমাজ গঠনের যে কয়েকটী মৌলিক নিয়মের উল্লেখ করা হইল, তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, পুত্র কন্যা এবং স্ত্রী, পুরুষের সম্পত্তি, শাস্ত্রানুসারে সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান এবং উপযুক্ত কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার অধিকার তাহার আছে। ইহার বিপরীত পাশ্চাত্য-সমাজ এবং আইন অনুসারে পুত্র কন্যা নির্দ্দিষ্ট বয়সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থাৎ পিতা বা মাতার কোন অধিকার এই বয়ঃপ্রাপ্তি সন্তানের উপর থাকে না। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ এই আচারকে পশ্চার বলেন, কেন না, মনুষ্যে-তর সর্ব্ব প্রাণীগণের মধ্যে এই আচার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ইহার সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ না করিয়া, সহজে দেখা যায় যে, জলচর জীব মৎস্য; এই মৎস্যের মধ্যে শ'ল জাতীয় মৎস্যের পোণার (শিশু সন্তান) ঝাঁকের নিকটে মৎস্য-মাতা থাকিয়া যতদিন পর্য্যন্ত তাহার শাবকগণ আত্মরক্ষার উপযোগী না হয়, ততদিন তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করে; এই প্রকার কচ্ছপ উভচর জীব, ইহারা উচ্চ অথচ অল্প আর্দ্র জমীতে গর্ত্ত খনন করিয়া [illegible] ডিম্ব প্রসব করিয়া অতি সাবধানতার সহিত মাটি চাপা দেয়,

যাহারা কচ্ছপ মাতার ডিম্বোপরি মাটি চাপা দেওয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরিষ্কার বুঝিয়াছেন, মহৎ-তত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব) সৃষ্টি পালনের কি প্রকার সুব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কচ্ছপের মাতৃস্নেহের এই পর্য্যন্তই শেষ। হংসজাতীয় জলচর অথচ গৃহপালিত পক্ষিগণের ডিমে তা' দেওয়া কার্য্যে মাতৃস্নেহের আর একটু অধিক বিকাশ দেখা যায়, যেদিন যে সময় হংস ডিম্বের ভিতর হইতে ক্ষুদ্রকায় হংস-শাবকগণ তাহাদের ক্ষুদ্র চঞ্চুর আঘাত করতঃ ডিম্বাবরণ ভগ্ন করিয়া বাহির হওয়া তৎক্ষণাৎ বিচরণ করিতে থাকে, হংসমাতা কিঞ্চিৎ ব্যবধানে দণ্ডায়মান হইয়া, অনন্যমনে এই সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকে। যখন সমস্ত শাবকগণের বহির্গমন কার্য্য সমাধা হয়, তখন তাহাদিগকে আর একবার এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাবে দৃষ্টিপাত: করিয়া মাতৃস্নেহের শেষ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া, নিজে কার্য্যান্তরে গমন করে। হংসমাতা আর কখন শাবকদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করে না।

কুক্কুট হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য বিহঙ্গম শাবকদিগকে আত্মরক্ষার বয়স পর্য্যন্ত প্রতিপালন এবং রক্ষনাবেক্ষণ করে। গবাদির মাতৃস্নেহ চিরপ্রসিদ্ধ, অল্প বয়স্কা সতেজ গাভীর প্রসব সময় যখন বৎস গর্ভ হইতে অর্দ্ধেক বহির্গত হইয়াছে, এবং অর্দ্ধেক গর্ভের ভিতর আছে, এমত সময় যদি কোন ব্যক্তি তাহার নিকট গমন করে, গর্ভিনী তাহাকে তাহার আততায়ী মনে করিয়া হিংসার্থ সিং উত্তোলন করিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে থাকে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, মাতৃস্নেহ গর্ভসহভূত পরে সদ্যজাত এবং নবজাত বৎসের প্রতি গোমাতার মাতৃস্নেহ যে অত্যধিক, ইহা চির প্রসিদ্ধ। নবজাত বৎসহারা হইয়া গোমাতা কি প্রকার ব্যগ্রভাবে হাম্বা হাম্বা রবে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া বৎস অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া থাকে, যিনি ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই গোমাতার অপত্যস্নেহের আতিশয্য বুঝিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বপালনী শক্তির অপূর্ব্ব রহস্য এই যে, এই গোমাতার দুই বৎসর পরে স্বীয় বৎসের প্রতি কোন প্রকার অপত্যস্নেহ দেখা যায় না। এই প্রকার অন্যান্য প্রাণিগণের মধ্যে সন্তানের আত্মরক্ষার বয়স পর্য্যন্ত মাতৃস্নেহ বিদ্যমানতা দেখা যায়। এক্ষণে মনুষ্যের বিষয় বিচার্য্য। মনুষ্যকে পশুভাবে বিচার করিলে চলিবে না। কেন না, মনুষ্য যখন ১৮ কিম্বা ২১ বৎসর বয়সে বাল্য অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া আত্মরক্ষার উপযোগী হয়, এই সুদীর্ঘ ২১ বৎসরের মনুষ্যমাতা ১ হইতে ১৫।১৬টী সন্তান সাধারণতঃ প্রসব করিতে পারে। এক্ষণ মনে করুন,

আরম্ভ করিয়া ৪০।৪২ বৎসর পর্য্যন্ত পর পর কতকগুলি সন্তান প্রসব করিয়াছেন, এবং তাহার এই ১৮ বৎসর বয়স হইতে সন্তানের বাহ্য প্রস্রাব পরিষ্কার, উপযুক্ত সময় আহার দেওয়া, রোগ হইলে সেবা করা, ইত্যাদি সন্তান প্রতিপালন কার্য্য আরম্ভ করিয়া, তাহার ৪২ বৎসর বয়সের শেষ ছেলের ২১ বৎসর বয়স হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাহার ৬৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতার সন্তান লালন পালনের কর্ত্তব্য শেষ করিতে হয়। ইহাতে আরও বুঝিতে হইবে যে, পশুর ন্যায় সন্তানকে মাত্র আহার প্রদান করাই মাতার কর্ত্তব্য, এমত নহে, পরন্তু খোরাক, পোষাক যোগান, বিদ্যাভ্যাস করান, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক, মানসিক, এবং সাংসারিক আধ্যাত্মিক, পরমাত্মিক, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে সন্তান যাহাতে উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে, তাহার উপযোগী করা মনুষ্যমাতার প্রধান কর্ত্তব্য। এক্ষণে যাঁহাদের কিছুমাত্র বিচার শক্তি আছে,তাঁহারা সহজে বুঝুন যে, পশ্বাচারের সহিত মনুষ্যাচারের কখন তুলনা হয় না। এই বিষয়টী আর একটু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বুঝিলে দেখা যায়, মনুষ্য মাতাগণ পশু মাতাগণের ন্যায় একাকী সন্তানপালনে সমর্থ নহে। তাহাকে সন্তানের পিতার সাহায্য গ্রহণ করার আবশ্যক হয়।

## সন্তান বা সমাজ গঠনে
## পিতার দায়িত্ব।

পিতা, মাতা, এবং সন্তান, এই তিনটী স্বতন্ত্র সম্বন্ধ, এক অপরের সাপেক্ষ, অর্থাৎ একের আত্যন্তিক অভাবে অপরের অস্তিত্ব অসম্ভব। আবার অন্যভাবে বুঝিতে গেলে দেখা যায় যে, স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য-সম্মিলনের অবশ্যম্ভাবী ফল সন্তান, সুতরাং স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য আকর্ষণ বা স্নেহ নিম্নতম প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম মনুষ্যসৃষ্টিতে কি প্রকার ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে পিতা ও সন্তান এই উভয়ের প্রতি উভয়ের কর্ত্তব্য অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। খেচর পক্ষীদিগের মধ্যে দেখা যায় যে, যে স্থানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে দাম্পত্যস্নেহের স্থায়িত্ব কাল অতি দীর্ঘ, সেই স্থানে মাতার অভাবে পিতা সন্তানে আহারাদি প্রদান করিয়া সন্তান লালন পালন করে।

# হিন্দুর ঈশ্বর।

লেখক — শ্রীপ্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায়।

একমাত্র চার্বাক্ সম্প্রদায় ( নাস্তিক ) ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশীয়, সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণের ধর্ম্মগ্রন্থেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ কি? কিভাবে জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর পর জীবের পরিণামই বা কি হয়, ইত্যাদি কথা লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে নানা প্রকার মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলকথা ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণ নিজ নিজ কল্পনা বলে তৎসম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিগণই সেই সেই মতকে অভ্রান্ত সত্য ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের ধর্ম্মমত ভ্রান্তি সঙ্কুল বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। এবং সেই জন্যই পৃথিবীতে পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া এত বিরোধ।

আমাদের সনাতন আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে সিদ্ধান্তীকৃত ঈশ্বরের স্বরূপ কি অর্থাৎ ঈশ্বর বলিলে, সাধারণতঃ হিন্দুরা কিরূপ বুঝেন, সেই কথাটা অদ্য আমরা সংক্ষেপ পাঠকগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। শাস্ত্রকথা না তুলিয়াও কেবল মাত্র বাহ্য জগতের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া, ঈশ্বরের সত্ত্বা সম্বন্ধে স্থূল দৃষ্টিতে যেরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, অগ্রে তাহারই আলোচনা করিব। তাহার পর বিশেষ বিশেষ কথার আলোচনার সময় অবশ্যই শাস্ত্র-প্রমাণের সাহায্য লওয়া হইবে।

অতঃপর প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। এই যে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী এবং পাহাড় পর্ব্বত, গাছপালা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি পদার্থ সমন্বিত স্থূল জগৎটা আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, বর্ত্তমান স্থূলাবস্থাই কিন্তু ইহাদের আদিম অবস্থা নহে। কিঞ্চিৎ প্রণিধান পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, এই সমস্ত স্থূল পদার্থ সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ সূক্ষ্ম পরমাণুপুঞ্জই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান স্থূলাকারে পরিণত হইয়াছে; নতুবা স্থূল বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কখনই সূক্ষ্মাকারে বিভাগ করা যাইতে পারিত না। বস্তুতঃ সূক্ষ্ম হইতেই যে স্থূলের উৎপত্তি, একথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। এখানে যে পরমাণুর কথা বলিলাম, প্রকৃত পক্ষে তাহাও পদার্থ সকলের আদিম অবস্থা নহে। পরমাণু সকলকে আরও সূক্ষ্মাকারে বিভাগ করিলে, অবশেষে গুণ বা শক্তিমাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা গুণ বা শক্তি, তাহাই সেই বস্তুর আদিম সূক্ষ্মাবস্থা। স্থূল অগ্নির আদিম সূক্ষ্মাবস্থাই হইল, তাহার দাহিকা শক্তি; স্থূল জলের শৈত্য গুণই তাহার আদিম সূক্ষ্মাবস্থা; ইত্যাদি। অতএব এক্ষণে আমরা বুঝিতে

পরিণাম, এই স্থূল জগৎশক্তি বা গুণের বিকৃতাবস্থা মাত্র। অর্থাৎ শক্তি বা গুণ-সমষ্টি ক্রমান্বয়ে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া, বর্ত্তমান স্থূলাকারে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, শক্তি ও গুণ; এই দুইটী একার্থবাচক শব্দ।

আরও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জগতের যাবতীয় কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ও শৃঙ্খলা পূর্ব্বক সুসম্পাদিত হইতেছে; কোথাও তাহার ব্যত্যয় ঘটিতেছে না। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির উদয় ও অস্ত, ষড় ঋতুর পরিবর্ত্তন, বসন্তকালে বৃক্ষলতাদির পত্র পুষ্পোদ্গম, সমুদ্রে জোয়ার, ভাঁটা ও বন্যার আবির্ভাব, এবং সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীতে গ্রহণ সঞ্চার, ইত্যাদি ঘটনাই এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত জাগতিক পদার্থ সকলের মধ্যে উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস কার্য্যও যথানিয়মে চলিতেছে। বলা বাহুল্য যে, উৎপত্তি ও ধ্বংস কথাটা ব্যবহারিক কথা মাত্র। প্রকৃত পক্ষে কোন বস্তুরই নূতন রূপে উৎপত্তি বা এক কালীন ধ্বংস হয় না। প্রত্যেক পদার্থই এক অবস্থা হইতে অনবরত: অবস্থান্তরিত হইতেছে। উৎপত্তির সময় সর্ষপ প্রমাণ অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের উদ্ভব হইতেছে; আবার ধ্বংসের সময় ঐ বট বৃক্ষই অগ্নিদগ্ধ হইয়া হউক বা অন্য প্রকার সূক্ষ্মাকারে পরিণত হইয়া কোন না কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। বস্তুতঃ এই অবস্থান্তরের ক্রিয়া এতই সূক্ষ্ম যে, আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। তবে ক্রিয়ার মাত্রাধিক্য হইয়া স্থূলভাবে বস্তুর আকারের যখন পরিবর্ত্তন ঘটে, তখনই তাহা আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেখাইব। মনে কর, এক খানি নূতন বস্ত্র তুমি অদ্য পরিধান করিলে; কিন্তু ছয় মাস পরে এক দিন তোমার হাত লাগিয়া বস্ত্রের এক স্থান ছিন্ন হইয়া গেল। তখন তুমি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলে যে বস্ত্র খানি এককালীন জীর্ণ হইয়া পচিয়া গিয়াছে। মনে রাখিও এই পচন ক্রিয়া এক দিনেই সম্পন্ন হয় নাই; যে দিন বস্ত্র খানির প্রথম উৎপত্তি হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার পচনক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, এবং এখন ঐ ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হইল মাত্র। কিন্তু বস্ত্র খানি পচিয়া গেলেও তাহার এককালীন ধ্বংস হইল না; বস্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সকল নিশ্চিতই কোন না কোন স্থানে থাকিয়া গেল।

আবার কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রত্যেক সৃষ্ট ব্যাপারের অভ্যন্তরেই উৎকৃষ্ট বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থলচর, জলচর ও

ছাত্রের শক্তির সমাবেশ শীত প্রধান দেশে বিচরণশীল ইতর জীবজন্তুগণ, যাহারা প্রকৃতির বশে পরিচালিত হয়, তাহাদের শরীরে রোমাধিক্য এবং সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার, ইত্যাদি ঘটনাগুলি কি প্রকৃষ্ট বুদ্ধি কৌশলের পরিচায়ক নহে?

প্রাসঙ্গিক বোধে এই স্থলে আরও একটী কথার অবতারণা করা যাইতেছে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে, এই জগৎ বৈষম্যময়। আকৃতি বা গুণে এখানে দুইটী বস্তু সর্ব্বথা সমান নাই। সমান হইতে পারে না; পরস্পরের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য বা বৈচিত্রভাব থাকিবেই থাকিবে। পশু, পক্ষ্যাদি কতকগুলি ইতর জীব জন্তু স্থূল-দৃষ্টিতে সহসা একাকৃতি লক্ষিত হয় বটে; কিন্তু বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, তাহাদের মধ্যেও বৈষম্য বা বৈচিত্র ভাব বিদ্যমান আছে। তাহা না থাকিলে, ঐ সকল জীবের পরস্পরের মধ্যে আত্ম-পর ভেদ নিরূপণ হইবে কিরূপে? বস্তুতঃ এই বৈষম্য বা বৈচিত্রভাব আছে বলিয়াই, এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর পার্থক্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। নতুবা সংসারে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। ফল কথা ছোট, বড়, ভাল, মন্দ, উচ্চ, মধ্য, নীচ, ইত্যাকার বৈষম্য ভাব লইয়াই যে জগৎ রচিত হইয়াছে, ইহা একজন স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

আমরা এই পর্য্যন্ত যে সকল কথার আলোচনা করিলাম, তাহার ফলিতার্থ এই দাঁড়াইল যে, এই পরিদৃশ্যমান বৈচিত্রময় জগৎ অতি সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতম গুণ বা শক্তির বিকারেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। এবং জগতের যাবতীয় কার্য্যই প্রকৃষ্ট বুদ্ধি কৌশল ও সুশৃঙ্খলা সহকারে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু এখন আমরা দেখাইব, ঐ শক্তি কেবল অন্ধ জড় শক্তি মাত্র নহে; উহার সহিত চৈতন্য বা জ্ঞানরূপ পদার্থেরও সংযোগ আছে। কেননা অন্ধ জড় শক্তি দ্বারা কখনই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ও সুশৃঙ্খলা সহকারে কার্য্য চলিতে পারে না। বাষ্পীয় শক্তি-পরিচালিত এঞ্জিনে যদি ড্রাইভার রূপ চৈতন্য পদার্থের যোগ না থাকে, তাহা হইলে রেলগাড়ি বা জাহাজাদি যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলিতে বা প্রতি ষ্টেশনে থামিতে পারে না; জগৎ প্রসূতি শক্তির সম্বন্ধেও সেই কথা বুঝিতে হইবে। অতএব সহজ জ্ঞানে ও স্থূল দৃষ্টিতেই আমরা বুঝিতে পারিলাম, জগতের মূল উপাদান কারণ যে শক্তি, তাঁহার সহিত নিশ্চিতই চৈতন্য পদার্থের সংযোগ আছে। এই শক্তি সম্বেত চৈতন্যই হিন্দুর ঈশ্বর এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহার একটী স্থূল রূপ মাত্র। অতঃপরে আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে অন্যান্য কথার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত

আমাদের শাস্ত্রমতে (যুক্তিমতেও বটে) সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের ন্যায় তাঁহার সৃষ্টি প্রবাহও অনাদি ও অনন্ত। অর্থাৎ সৃষ্টির পর প্রলয়, ও প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি, এই দুই ঘটনা অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্তও চলিতে থাকিবে; ইহার প্রথম ও শেষ নাই। সৃষ্টির সময় জগতের ব্যক্তাবস্থা হয়, আবার প্রলয় কালে তাহা সূক্ষ্মাকারে পরিণত হইয়া পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকে। কথাটা পরেই বিশদ করা যাইবে। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে কথিত, "কতিপয় সহস্র বৎসর মাত্র জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ও এই সৃষ্টির অন্ত সময়েই সব ফুরাইবে; সেই শেষ দিনে নিরাকার ঈশ্বর, আত্ম মিত্র, সভাসদ লইয়া জীবগণের পাপ পুণ্যের বিচারে বসিবেন; ত্রাণকর্ত্তা যীশুখৃষ্ট তৎকালে সমগ্র জীবগণের আত্মাকে ঐ বিচারালয়ে হাজীর করিবেন; এবং তাঁহারই মন্তব্য অনুসারে ঈশ্বর বিচার-নিস্পত্তি করিবেন; অর্থাৎ যাহারা সংসারে থাকিয়া যীশুর শরণ লইয়াছিল, তাহারা মহাপাপী হইলেও অনন্ত কাল স্বর্গবাস করিবে; কিন্তু যাহারা যীশুর শরণ লয় নাই, তাহারা মহা পুণ্যবান হইলেও চির-নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে।" ইত্যাকার অসঙ্গত, অস্বাভাবিক, পক্ষপাত দুষ্ট; প্রলাপোক্তিবৎ-বাক্যে হিন্দু কখন আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। যাহা হউক পূর্ব্বে যে সৃষ্টি প্রবাহের কথা বলিয়াছি, প্রতি কল্পে তাহা একই নিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সন্ধ্যার অঘমর্ষণ মন্ত্রে আছে,—

> "সূর্য্যা চন্দ্র মসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ
> পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।"

সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গাদি লোক সকল পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টিতে যেমনটী ছিল তেমনি ভাবেই সৃষ্টি করিলেন। এখানে "যথা পূর্ব্বং" এই ক্রিয়া বিশেষণ দ্বারা সৃষ্টি প্রবাহের অনাদিত্ব ও একনিয়মত্বই সূচিত হইতেছে।

সৃষ্টি ও প্রলয় কি নিয়মে হইয়া থাকে, অতঃপর সেই কথাটা সংক্ষেপেই বলিব। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা অক্রিয়াবস্থা, অর্থাৎ যে অবস্থায় গুণত্রয়ের মধ্যে পরস্পরের বৈষম্যভাব ও ভবাভিভব চেষ্টা থাকে না সেই অবস্থাকেই প্রকৃতি বলে। সুতরাং প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের সৃষ্টিকারিণী শক্তি মাত্র। এই প্রকৃতিই ব্যবহারিক জগতের মূল উপাদান কারণ। এবং গুণত্রয়ের পরস্পরের ভবাভিভব ক্রিয়া দ্বারা নিখিল পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি

বস্তুতঃ জীবগণের ভোগ কাল উপস্থিত হইলেই, পরব্রহ্ম তাদাত্ম্য সম্বন্ধে উক্ত মূল প্রকৃতিতে উপস্থিত ( প্রতিবিম্বিত ) হয়েন। তখন বসন্ত কালীন বৃক্ষ লতাদি হইতে পুষ্পোদগমের ন্যায়, তিল হইতে তৈল নিঃসরণের ন্যায় ঐ মূল প্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তিই আদ্যাশক্তি নামে কথিতা হইয়া থাকেন। তন্ত্র শাস্ত্রে ইনি আদ্যা কালী নামে ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে রাধিকা নামেও অভিহিতা হয়েন। যাহা হউক এই আদ্যা শক্তি ও মূল প্রকৃতির ন্যায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ও পরমাত্মার সহিত একীভূতা। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, মূল প্রকৃতি অবিকৃতি; কিন্তু ইহার বিকৃতি হইয়া থাকে। ফলে সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে এই আদ্যাশক্তিরই প্রথম পরিণাম, মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব; বুদ্ধিতত্ত্বের পরিণাম অহঙ্কার, অহঙ্কারের পরিণাম পঞ্চ তন্মাত্র * ও একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চ তন্মাত্রের পরিণতি অবস্থা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম, এই পঞ্চ স্থূল ভূত এবং এই স্থূল ভূতের বিকারেই নিখিল জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, আদ্যাশক্তি হইতে পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রকৃতির বিকারে সমুৎপন্ন হইয়াছে। আচার্য্যদেব বিজ্ঞান ভিক্ষুও বলিয়াছেন, ——

"প্রকৃষ্টাকৃতিঃ পরিণামো যস্যা প্রকৃতি।"

অর্থাৎ অনন্ত পদার্থ যাহার পরিণাম, যাহা হইতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিকাশিত হইয়াছে, সেই প্রকৃষ্ট কার্য্যকারী পদার্থই প্রকৃতি।

পূর্ব্বোক্ত চৈতন্যময়ী আদ্যাশক্তি হইতে অনুলোমক্রমে যে ভাবে জগতের উৎপত্তি হয়, আবার মহাপ্রলয় সময়েও প্রতিলোম ক্রমে সেই ভাবেই তাহার লয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্থূল জগতের লয় স্থান, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ স্থূল ভূত; স্থূলভূতের লয় স্থান পঞ্চ তন্মাত্র; তন্মাত্রাদির লয়স্থান অহঙ্কার, অহঙ্কারের লয়স্থান মহত্তত্ত্ব; মহত্তত্ত্বের লয়স্থান আদ্যাশক্তি এবং এই আদ্যাশক্তিও পূর্ব্ববৎ মূল প্রকৃতির অন্তর্লীন হইয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম চৈতন্য ও তাঁহার সৃষ্টিশক্তিরূপা প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন পার্থক্য বা ভিন্নতা নাই। যেখানে চৈতন্য, সেইখানেই প্রকৃতি; আবার যেখানে প্রকৃতি, সেইখানেই চৈতন্যের সত্তা নিত্য বিদ্যমান। কেবল অজ্ঞান শিষ্যকে বুঝাইবার জন্যই ইহাদের পার্থক্য কল্পিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক সৃষ্টিতে এক অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম চৈতন্যের একাংশে মাত্র ব্যব-

হারিক জগৎ ভাসমান হয়। কিন্তু তাঁহার অবশিষ্ট তিন অংশ নিজ স্বরূপে অর্থাৎ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত আছেন। শাস্ত্রে আছে,—

"পাদোস্যে বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ।
ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ॥" পঞ্চদশী।

অর্থাৎ সেই পরমাত্মার এক পাদ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত এবং অন্য তিন পাদ নিত্য শুদ্ধ, মুক্ত ও স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপ। বস্তুতঃ মায়া ( প্রকৃতি ) যে ব্রহ্মের একদেশবৃত্তি, এই কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। আবার ভগবদ্গীতাতেও কথিত হইয়াছে,—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! আর তোমার অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? তুমি কেবল এই মাত্র জানিয়া রাখ যে, আমি আবার একাংশ দ্বারাই এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছি।

তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, পরব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও অবস্থিতি করিতেছেন।

প্রকৃতি কাহাকে বলে ও কি ভাবে প্রকৃতি দ্বারা জগতের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, তাহা একরূপ দর্শিত হইল। অতঃপর ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

"চিদানন্দময়ং-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব সমন্বিতা।
তমোরজঃ সত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥
সত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াঽবিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্ বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণ শরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥" পঞ্চদশী।

চিদানন্দময় পরব্রহ্ম প্রতিবিম্বিতা সত্বরজঃ তমোগুণ স্বরূপা প্রকৃতির অবস্থা স্থূলতঃ দ্বিবিধ, মায়া ও অবিদ্যা। বিশুদ্ধ সত্বপ্রধানা অবস্থার নামই অবিদ্যা। উক্ত মায়া-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম ঈশ্বর সংজ্ঞায় অভিহিত এবং মায়া তাঁহার বশবর্ত্তিনী বলিয়া ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী। আর অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব। এই জীব অবিদ্যার বশবর্ত্তী বলিয়া অল্পজ্ঞ, অল্পকর্ত্তা ও অল্পশক্তিমান্। মায়া এক, কিন্তু অবিদ্যা নানাপ্রকার বলিয়া জীবও নানাপ্রকার।

অবিদ্যাভেদ মলিনতার ন্যূনাধিক্য অনুসারেই হইয়া থাকে। এই অবিদ্যাই কারণ শরীর। কারণ শরীরাভিমানী জীবের নাম প্রাজ্ঞ।

অতএব বুঝা গেল যে, ঈশ্বরে ও জীবে উপাধিগত সামান্য পার্থক্য ব্যতীত স্বরূপতঃ কোনই ভেদ নাই। কেননা মায়া ও অবিদ্যা, এই দুইটী উপাধি বাদ দিলে, উভয়ের মধ্যে কেবল চৈতন্য মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে বন ও বৃক্ষের কথাই উল্লিখিত হইতেছে। যেমন বহু বৃক্ষের সমষ্টির নাম বন ও বনের অন্তর্গত এক একটী বৃক্ষের নাম ব্যষ্টিভাবে বৃক্ষই থাকে; তদ্রূপ বিশ্বব্যাপী সমষ্টি চৈতন্যের নাম ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি চৈতন্যই জীব। সেই জন্যই হিন্দুর যাবতীয় উপাসনা-পদ্ধতির "সার কথাই হইল, সোঽহং" ভাবের অনুধ্যান।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পরের ভবাভিভব-ক্রিয়ার কথা পূর্ব্বে আমরা কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে গুণত্রয়ের লক্ষণ ও কি ভাবে ঐ ভবাভিভব-ক্রিয়া চলিতেছে, সেই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ।।
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্।।
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য-নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রসাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥
সর্ব্বদ্বারেষু দিহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশম স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ।।
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরু-নন্দন ॥" ভগবদ্গীতা;

ও জ্ঞান সঙ্গ দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। রজোগুণ তৃষ্ণা ও আসঙ্গলিপ্সার উৎপাদক অনুরাগ যোগে জীবকে কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে। তমোগুণ অজ্ঞানাংশ হইতে উৎপন্ন এবং মোহজনক আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। ফল-কথা সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে রজোগুণ কর্ম্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রমাদেই নিযুক্ত করিয়া রাখে। রজঃ ও তমঃ গুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ, রজঃ ও সত্ত্বকে পরাভূত করিয়া তমোগুণ এবং সত্ত্ব পতনঃ গুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ প্রবল হইবার জন্য প্রতিনিয়তঃই সচেষ্ট থাকে ও উত্তেজক কারণ পাই-লেই তাহা কার্য্যে পরিণত করে। যখন শ্রোত্রাদি সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানরূপ প্রকাশ ভাবের উৎপত্তি হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে; দেহ মধ্যে সত্ত্ব গুণের প্রব-লতা হইয়াছে। রজোগুণের প্রবলতার সময় লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, অশান্তি ও আকাঙ্ক্ষারই উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর তমোগুণের প্রাবল্য সময়ে অবি-বেক, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারই নাম গুণত্রয়ের ভবাভিভব-ক্রিয়া।

জীবদেহ মধ্যে প্রতিনিয়মই যে ভাবে ত্রিগুণের ভবাভিভব-ক্রিয়া হইতেছে, তাহাই এখানে দর্শিত হইল। কিন্তু কেবল মাত্র জীবদেহ বলিয়া নহে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বস্থানে চেতন, অচেতন, স্থূল সূক্ষ্ম, সকল প্রকার পদার্থের অভ্যন্তরে ঐরূপেই ত্রিগুণের ভবাভিভব-ক্রিয়া চলিতেছে এবং তাহারই ফলে পরিদৃশ্যমানজগৎ বৈষম্য বা বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। অতঃপর আমরা উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পর ব্রহ্মের দুইটী অবস্থা নির্গুণ ও সগুণ। যখন তিনি স্বপ্রকাশরূপে নিজ স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, সেই অবস্থাকে নির্গুণ বলা যায়; আর যখন তিনি সৃষ্টিশক্তিরূপা প্রকৃতির সহকারিতায় জগৎসৃষ্টি করণে উন্মুখ হয়েন, তখনই তিনি সগুণ ও ঈশ্বর পদবাচ্য হইয়া থাকেন। এই ঈশ্বর আবার সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্যার্থে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামেও অভি-হিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যখন তিনি রজোগুণকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন ব্রহ্মা নামে, যখন সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া জগৎ পালন করেন, তখন বিষ্ণু নামে এবং যখন তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া সংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তখনই তিনি মহেশ্বর নামে কথিত হইয়া থাকেন। ফলকথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একই ঈশ্বরের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। শাস্ত্রে আছে,—

এই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই উপাস্য। নির্গুণের উপাসনা নাই, হইতেও পারে না। তিনি কেবল জ্ঞেয় পদার্থ মাত্র। সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানস-ব্যাপারের নামই উপাসনা।

"উপাসনানি সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক-মানস-ব্যাপাররূপাণি।" তন্ত্র।

পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মায়া অর্থাৎ প্রকৃত্যুপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর। প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হয় বলিয়া তিনি মাতৃস্বরূপা এবং চৈতন্যের সহযোগ ব্যতীত সৃষ্ট্যাদি কার্য্য যথানিয়মে চলিতে পারে না বলিয়া, তিনি পিতৃস্বরূপ। সুতরাং ঈশ্বর বলিলেই তাঁহাকে মাতৃত্ব পিতৃত্ব অথবা স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব, এই উভয় শক্তিরই বিদ্যমানতা আছে, বুঝিতে হইবে। স্ব স্ব প্রকৃতি ও রুচি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি প্রকৃতি চৈতন্যময় ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকেন। সেই জন্যই তিনি কাহারও নিকট পুরুষ, কাহারও নিকট স্ত্রী, আবার কাহারও নিকট স্ত্রীপুং ভাবের অতীত বলিয়া, প্রতীয়মান হয়েন। বস্তুতঃ ত্রিগুণময়ী মায়ায় অভিভূত বিষয়াসক্তচিত্ত সংসারি মানবের মলিন অন্তঃকরণে নির্গুণ বা নিরাকার পদার্থের ধ্যান ধারণা বা উপলব্ধি হয় না বলিয়া, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান কৃপা করিয়া ভক্ত সাধকগণের হিতার্থে তাঁহাদের প্রকৃতির অনুকূল মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেও আছে,—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা।"

বেদমূলক সনাতন আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র মানবের প্রকৃতি ভেদেই অধিকার ভেদ করিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষ বিচার পূর্ব্বক ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রকৃতি ভেদে এক এক রস ও এক এক বর্ণ প্রিয় হইয়া থাকে। অম্ল কেহ মিষ্ট, কেহ বা তিক্ত রসপ্রিয়; আবার কেহ লোহিত; কেহ পীত, ও কেহ লবণ, বা হরিদ্বর্ণ প্রিয়। মানবের জন্মকালে যে যে গ্রহ নক্ষত্রাদির সমাবেশ বা আধিপত্য থাকে, তাহাদের প্রভাবানুসারেই ঐরূপ প্রকৃতি ভেদ ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রের অংশ যাহার শরীরে অধিক, লবণরস ও শুক্লবর্ণ তাহার স্বাভাবিক প্রিয়। আবার রব্যাদি গ্রহগণের মধ্যে কতকগুলি পুংজাতীয় ও কতকগুলি স্ত্রী-জাতীয়। এই পুং জাতীয় গ্রহের ভাগ যাহার শরীরে অধিক, সে ব্যক্তি পুরুষ দেবতা ভাল বাসে। আর যাহার দেহে স্ত্রীজাতীয় গ্রহের অংশাধিক্য বিদ্যমান, সে ব্যক্তি স্ত্রী দেবতার প্রতিই অধিকতর প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকে ফলে এই কারণেই উপাসক সম্প্রদায় প্রধানতঃ শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য ভেদে পঞ্চ শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। যাহারা শক্তি মন্ত্রের উপাসক, তাহারা শাক্ত; যাহারা বিষ্ণু মন্ত্রের

তাহারা বৈষ্ণব ; শিব মন্ত্রের উপাসকগণ শৈব ; সূর্য্য মন্ত্রের উপাসকগণ সৌর ও গণেশ মন্ত্রের উপাসকগণই গাণপত্য নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি একই ঈশ্বরের বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া, যে ব্যক্তি যে ভাবেই উপাসনা করুক, এমন কি পুত্র পিতাকে, পত্নী পতিকে শিষ্য গুরুকে, ও শূদ্র ব্রাহ্মণকে যে উপাসনা করে, তাহাতে ব্রহ্মভাব থাকিলে সেই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

অর্থাৎ যে, যে ভাবেই আমার উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই কৃতার্থ করিয়া থাকি।

বলা বাহুল্য যে, কলি প্রাবল্য হেতু মানবগণ এখন ঘোর মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে সুতরাং শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় ভূক্ত কোন কোন মূঢ় ব্যক্তি ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাকে ভেদ বুদ্ধিতে ও বিদ্বেষ ভাবে দেখিয়া, আপনাদের নরক গমনের পথই প্রশস্ত করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ও ভক্ত সাধকেরা অবশ্যই ঐ পথের পথিক নহেন। তাঁহারা আপন আপন ইষ্টদেবতার প্রতি মুখ্য বুদ্ধি রাখিয়া, ও অন্যান্য উপাস্য দেবতাকে তাঁহারই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র ভাবিয়া, তদনুরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকেন। পাঠক! শক্তি সাধক সিদ্ধ পুরুষ রাম প্রসাদ কি বলিয়াছেন শুন,—

রাগিনী জংলা—তাল খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবরবেশে বৃন্দাবনে॥
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝে একথা বিষম ভারী॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে; মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, অনুরেখা ভাল, তুলালে নাগরী, নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত সাগরে, নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরস ভাবিছে, বুঝেছি জননি! মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সব বুঝিতে নারী॥

আবার শুন, শক্তি সাধক কমলাকান্তের কথা।

রামকেলি একতালা।

জাননা রে মন, পরম কারণ, শ্যামা ত কেবল মেয়ে নয়।
সে যে মেয়ের বরণ, করিয়া ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতী, কখন রামের জানকী হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দানবচয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়া বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়া লয়॥
যেরূপে যেজন, করয়ে ভজন, সেইরূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের, হৃদি সরোবরে, কমল মাঝারে, করে উদয়॥

পাঠক! একজন বৈষ্ণব সাধক কালী দর্শনে কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হইয়া কালীকে 'হরি' সম্বোধনে কি বলিয়াছেন, তাহাও শুন :—

বাউলের সুর—তাল খেমটা।

হরি! কই সে মোহন বাঁশরী।
কেন ভয়ঙ্করা, অসিধরা, হলে হে বংশীধারী॥
কি লাগি কেলে সোণা, দিগবসনা, লোলরসনা, হেরি।
লয়ে বনমালা, মুণ্ডমালা, কে পরালে শ্রীহরি॥
কেন পায় রুধির ধারা, পড়ে ধরায়, চরণে ত্রিপুরারি।
হলে কার্ ভাবে ত্রিনয়না শ্যাম, বাঁকা নয়ন সম্বরি।
কি কারণে, মত্ত রণে, সুধাপানে দৈত্যারি॥ ইত্যাদি।

দুঃখের কথা এই যে, অনভিজ্ঞ অনার্য্য জাতীয় লোকেরা ও তাঁহাদের পদাঙ্ক সেবী আর্য্যবংশের কুলাঙ্গারেরা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত উপাসনা-পদ্ধতির গূঢ় মর্ম্ম না বুঝিয়া ও নিজের কল্পনা বলে এক একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, সাধারণ হিন্দু জাতিকে 'পৌত্তলিক' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু সেটা তাঁহাদের ভ্রান্তি মাত্র। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুজাতি পৌত্তলিক নহেন ; তাঁহারা কখনই পুতুলের পূজা করেন না। হিন্দুর দৃষ্টিতে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" ও "একমেবাদ্বিতীয়ং"। ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানে চেতন, অচেতন, স্থূল, সূক্ষ্ম, সকল পদার্থের অভ্যন্তরেই হিন্দু এক অখণ্ড অদ্বিতীয় পরমাত্মার সত্ত্বাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রে দেবতার গঠিত মূর্ত্তি, ঘট, পট, জল, অনল, প্রভৃতি সকল আধারেই এমন

তাহাই নহে, শাস্ত্রে আরও উপদিষ্ট হইয়াছে যে, উপাসকগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে "সোঽহং" ভাবে অর্থাৎ স্বীয় আত্মার সহিত অভেদ জ্ঞানে অর্চ্চনা করিবেন। যথাঃ—

"শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ।"

অর্থাৎ নিজে শিব হইয়া শিব পূজা করিবে। ফল কথা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান যাহার নাম তাহা কেবল পৃথিবীর মধ্যে সত্ত্বগুণান্বিত একমাত্র আর্য্যজাতি ব্যতীত অন্য কোথাও নাই। অতএব এ হেন হিন্দুকে যাঁহারা পৌত্তলিক আখ্যায় আখ্যাত করেন; তাঁহারা যে নিতান্তই ভ্রান্ত ও স্থূলদর্শী, সে কথা বলাই বাহুল্য।

—:•—

# সমালোচনা।

**হোমিওপ্যাথিক সরল ভৈষজ্য তত্ত্ব।**—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাই-মোহন বন্দোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মূল্য আড়াই টাকা। রাইমোহন বাবু এই পুস্তকে নানা রোগের লক্ষণ, ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, এবং রোগ বিশেষে ঔষধের ব্যবস্থা, অতি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমেরিকা ও ইয়োরোপ খণ্ডের প্রধান প্রধান সুচিকিৎসক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণেতা মহোদয়গণের মত ও অভিপ্রায় ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সঙ্কলন কর্ত্তা বলেন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধিয় বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা আয়ত্ব করা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে। এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে বহুগ্রন্থ পাঠের উপকার ও চিকিৎসা তত্ত্বের সার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। তাঁহার এই উক্তি সার্থক হউক, ইহাই আমাদের বাসনা, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এদেশে যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্রতী, এই ভৈষজ্য তত্ত্ব খানি তাঁহাদের পক্ষে সবিশেষ উপকারপ্রদ হইবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। রাইমোহন বাবুর যত্ন ও পরিশ্রম বিফল হইবে না আমাদের এইরূপ বিশ্বাস।

**হোমিওপ্যাথিক মতে শিরঃপীড়া চিকিৎসা।**—এখানিও উক্ত রাই-মোহন বাবুর সঙ্কলিত। মূল্য বার আনা। পাশ্চাত্য খণ্ডের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের প্রণীত নানাগ্রন্থ অবলম্বনে এখানি লিখিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক

বঙ্গভাষায় অনেকগুলি সরল পুস্তক প্রকাশ করিয়া রাইমোহন বাবু সাধারণের বিশেষউপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আশা করি ভবিষ্যতেও করিবেন। এই পুস্তকে যাহা যাহা লেখা আছে, তাহা কাহারও মন কল্পিত নহে, ডাক্তার হ্যানিম্যান ও তাঁহার শিষ্যগণ পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বাংশে সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এই দুই খানি পুস্তকের প্রকাশক। সাধারণ লোকের উপকারার্থ তিনি, উপরি উক্ত "ভৈষজ্য তত্ত্ব" ক্রয় করিলে এই শিরঃপীড়া চিকিৎসা পুস্তক-খানি তিনি উপহার প্রদান করিবেন। ছয়শত গ্রাহক উপহার পাইবেন। এই সঙ্কল্পের জন্য গুরুদাস বাবু আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

**গুরু শিষ্য সংলাপ ও জ্বর চিকিৎসা।**—শ্রীযুক্ত কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য আড়াই টাকা। গুরু শিষ্য সংবাদ প্রণালীতে জ্বর চিকিৎসার বিবরণ বিলিখিত, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। জ্বর রোগ সম্বন্ধে শিষ্য যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন; গুরু সেই সকল প্রশ্নের সদ্ উত্তর দিয়াছেন, প্রশ্নোত্তরগুলি প্রীতিকর, পাঠে শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। কবিরাজ মহাশয় প্রবীণ চিকিৎসাতেও তাঁহার সুযশ আছে, কিন্তু মুখবন্ধের প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের কবিরাজেরা জ্বরাদি রোগের চিকিৎসা জানিতেন না, ইহার অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে এদেশে উপযুক্ত কবিরাজ ছিলেন না, আমরা কিন্তু জানি এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ সুদক্ষ কবিরাজ অধিক বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপস্থলে প্রবীণ কবিরাজ মহাশয়ের লেখনী হইতে ঐরূপ অযশকর বাক্য নির্গত হওয়া বোধ হয় ভাল হয় নাই। কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

**প্রণয় প্রসঙ্গ।**—(কবিতাপুস্তক) শ্রীযুক্ত রাধানাথমিত্র বিরচিত মূল্য ছয় আনা। এই পুস্তিকায় একচল্লিশটি প্রসঙ্গ আছে, সকল গুলি কবিতায় গ্রথিত বিবাহাদি গার্হস্থ বিধানের অঙ্গগুলি অতি পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত হইয়াছে। বাবু রাধা নাথের রচিত কবিতাগুলি আড়ম্বর শূন্য, অথচ সুরল ভাব পূর্ণ, প্রসঙ্গগুলি পাঠ করিয়া সত্যই আমরা কাব্যানন্দ উপভোগ করিলাম




"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

( মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। )

১৫শবর্ষ । } ১৩১৩ সাল। মাঘ } ৭ম সংখ্যা।



## পরম কল্যাণ গীতা।

লেখক — শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।

### চিকিৎসা বিবরণ।

কবিরাজ, হাকীম, ডাক্তারগণ সকল রোগেরই ঔষধ জানেন। কতশত রোগী গণকে উৎকট উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিতেছেন, এবং একশত রোগী আবার সেই রোগে, সেই ঔষধ সেবন করিয়াও আরোগ্য হইতেছে না। আবার অপরের যে রোগ চিকিৎসক যে ঔষধের দ্বারা আরোগ্য করিতেছেন, সেই রোগে সেই ঔষধ দিয়াও তাঁহার নিজের ঘরে স্ত্রী পুত্র আদি মরিয়া যাই-

তেছে, এবং সময় ও ব্যক্তি বিশেষে চিকিৎসকও সেই রোগে মরিয়া যাইতেছে। ইহা পরমাত্মার লীলা। আর কোন কোন চিকিৎসক এইরূপ বলেন যে অমুক চিকিৎসক হইতে আমি চিকিৎসা বিদ্যা উত্তমরূপে জানি। আমার ব্যবস্থাতে রোগী বাঁচিবে ও রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবেক। কিন্তু তাঁহার নিজ শরীরে রোগ হইলে তাহা হইতে নিজেই রক্ষাপান না। ইহা বিধাতার লীলা, ইহাতে কাহারও দম্ভ ও অহঙ্কার করা উচিত নয়। যে দণ্ডে যাহা হইবার আছে, তাহা অবশ্যই হইবেক। অকারণ কোন বিষয়ে জেদ করা ভাল নয়। যে বস্তু যাহার নিমিত্তক, তাহাদ্বারা তাহাই হইবেক। আর যাহার নিবারণ করিবার নিমিত্ত না হইবেক উহাতে লক্ষ প্রকার যুক্তি করেন এবং লক্ষ প্রকারের ঔষধ দেন কখনই নিবারণ হইবেক না এবং মৃত্যু হইবেক। প্রমাণ যেমন, জল পান করিলে পিপাসা নিবারণ হয়, জল পিপাসা নিবৃত্তির নিমিত্তক, কিন্তু যখন সান্নিপাতিক জ্বর হয়, এবং পিপাসা পায় তখন যতই জলপান কর তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। বস্ত্র গায়ে দিলে শীত নিবারণ হয় কিন্তু কম্প জ্বরে শাল দুশালা, লেপ গায়ে দিলেও শীত ও কম্প নিবারণ হয় না। আর যদি জ্যোতিঃস্বরূপ নিবারণ করেন, তবে তাহা সহজেই নিবারণ হইয়া থাকে। ব্যবহার কার্য্যে যাহা কিছু করিতে হয় তাহা বিচার পূর্ব্বক করিবে। যে রোগের যে ঔষধ তাহা চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী করা আবশ্যক; কোন বিষয়ে জেদ করা উচিত নহে। চিকিৎসকগণের নিকট মৃত্যু রোগের ঔষধি নাই, তাহা কেবল মাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। যাহা ইচ্ছা ও যে কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবে আর করাইবে, ইহার ফলাফল বিষয় ব্রহ্মেরই উপর ভরসা রাখিবে। যথাশক্তি পরের উপকার করিবে। বিচার করিয়া দেখুন! এই সামান্য বাস গৃহ যাহাতে বাস করা যায়, তাহার ভিতর বাহির অপরিষ্কার থাকিলে তাহাতে বাস করিতে মনের কতই ঘৃণা জন্মে ও রোগাদি হয়, তখন, এই শরীর গৃহে যাহাতে অমৃতরূপী পরমাত্মা বা তুমি বাস করিতেছ, তাহা অপরিষ্কার ক্লেদযুক্ত থাকিলে যে,তোমার কতই বিকার মানসিক ও শারীরিক মনোবিকার বুদ্ধি স্থূল হওয়া, চিত্তের প্রফুল্লতা রহিত হওয়া, এবং শারীরিক বিকার শিরঃপীড়া অম্লশূল আদি এবং অপর উৎকট উৎকট রোগ জন্মে তাহার ইয়ত্তা নাই! অপরিষ্কার ক্লেদরূপ মল যাহা নাড়ীতে বদ্ধ থাকে ভুক্ত বস্তুর রসের ন্যায় সেই বদ্ধ মলের বিষময় রস সমস্ত শরীরের সর্ব্বস্থানে যাইয়া উৎকট উৎকট রোগ উৎপন্ন করে; অতএব সেই বিষ জনক বদ্ধমল নাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যাই-

ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখা বিশেষ আবশ্যক ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জলের দ্বারা শরীরের বাহির যত্ন পূর্ব্বক ধৌত করা এবং নির্ম্মল স্থানে বাস করা উচিৎ। এবং শরীরের ভিতর পরিষ্কার করিবার উপায় নাড়ীর বদ্ধমল বহির্গত করা ভিন্ন অপর কোন উপায় নাই। অতএব রেচক ঔষধি ( জোলাপ—যে বস্তু সেবনে নাড়ীর বদ্ধমল নির্গত হয়, অথচ পীড়াদায়ক না হয়, কারণ উগ্র রেচক প্রাণনাশক ) মৃদু অর্থাৎ মধ্যমার রেচক বিহিত। প্রতি সপ্তাহে, না হয় প্রতিমাসে, না হয় প্রতিপক্ষে, না হয় তিন মাস মধ্যে একান্ত পক্ষে না হয়, ছয় মাস মধ্যে বিচার পূর্ব্বক রেচক ক্রিয়া ব্যবহার করা অতি আবশ্যক, নচেৎ শরীর সুস্থ থাকা অতীব দুষ্কর। এবং মনের পরিষ্কার অর্থাৎ আন্তরিক ক্লেদ, পীড়া যথা, আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ অভিমান ইত্যাদি মান অপমান জয় পরাজয় যুক্তি পূর্ব্বক বিচার করিয়া সেই সকলকে ত্যাগ করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মনকে ব্রহ্মরূপ সাগর-জলে ধৌত করিয়া শান্তিরূপ পরিষ্কার করিয়া আনন্দরূপ নির্ভর সন্দেহ রহিত ও জন্ম মৃত্যুর ভয় রহিত মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকিবেক। জ্ঞানবান পণ্ডিত, রাজা জমি-দারগণ আপন আপন অধিকারে গ্রামে গ্রামে প্রজার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত এবং যথা বিহিত ঔষধির ব্যবস্থা করিবেন, ইহা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য ; এবং প্রতি ঘরে ঘরে তদন্ত করিয়া যাহাতে প্রজা সকল প্রকারে সুখী থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

## জোলাপ বিবরণ।

দ্রব্য গুণে কোন কোন জোলাপ এমন আছে যে, দাস্ত পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে উদরে পরিপাক হইয়া উদর গরম হয় এবং শরীরের নানা পীড়া হয়। ইহা চিকিৎসকগণ জানেন। কিন্তু হরিতকী সোনামুখীর জোলাপ লইলে যদ্যাপি দাস্ত পরিষ্কার নাও হয় উহা উদরে পরিপাক হইলে শরীরের কোনও বিকার হয় না বরং তাহাতে উপকার হয়। হরিতকী সোনামুখীর জোলাপে দাস্ত পরি-ষ্কার হইলে বিশেষ ফলদায়ক হয়, এমন উপকার আর অন্য কোন জোলাপে হয় না। এ জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মতে জোলাপ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শরীরের সুস্থতা পক্ষে আশু ফল পাইবেন।

| | |
|---|---|
| জাঙ্গি হরিতকী গুঁড়া ... ... ... | ১ তোলা |
| সোনামুখীর পাতার গুঁড়া ... ... ... | ঐ |
| পরিষ্কার মিছরির গুঁড়া ... ... ... | ঐ |
| গোল মরীচ গুঁড় ... ... ... | ৵০ আনা ওজন |
| মধু ... ... ... | অর্দ্ধতোলা |
| পরিষ্কার কিসমিস ... ... ... | ২ তোলা |

কিম্বা যে পরিমাণে কিস্‌মিস্ মিশ্রিত করিলে, গুলি বাঁধা যায়, তাহাই ইহার পরিমাণ। হরিতকী প্রভৃতির গুঁড়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ওজন করিতে হইবেক। প্রথমে হরিতকী, সোনামুখী নিছরি গোল মরিচের গুঁড়া ওজন করিয়া কোন একটী প্রস্তরের পাত্রে রাখিয়া একত্রে সমস্ত উত্তরূপে মিশ্রিত করিয়া, পৃথক রূপে কিস্‌মিস্ বাঁটিয়া লইয়া পরে ঐ গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ঐ প্রস্তর পাত্রে বাঁটিয়া গুলি বাঁধিতে হইবেক। একটী টোপা কুলের আকারের ন্যায় গুলি বাঁধিয়া পরিমাণ করিতে হইবেক কিম্বা ঐ সমস্ত জোলাপের ছয় মাত্রা করিয়া লইলেই হইবেক। প্রতি মাসে কিম্বা দুই মাস অথবা তিন মাস মধ্যে এই জোলাপ ক্রমান্বয়ে তিন দিবস রাত্রে আহারের পর শয়নের পূর্ব্বে একটী গুলি দুগ্ধের কিম্বা পরিষ্কার জলের সহিত সেবন করিতে হইবেক। পরদিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত যদ্যাপি দাস্ত পরিষ্কার না হয়, তবে এক পোয়া গরম দুগ্ধ কিম্বা গরম জলপান করিলে দাস্ত পরিষ্কার হইবে। দাস্ত পরিষ্কারের সময় আম নির্গত হয়, বলিয়া কিঞ্চিৎ পেটের বেদনা হইয়া থাকে, তাহাতে কোন ভয় নাই। সেই সময় গরম জল বা দুগ্ধ খাইলেই সুস্থ হইবেক। প্রাতে যদ্যাপি দাস্ত পরিষ্কার না হয়, তবে আহারের পর নিশ্চিত দাস্ত পরিষ্কার হইবেক। শরীরের কোন গ্লানি না থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে স্নান করা যায় ও করিবেন, তাহাতে কোন নিষেধ নাই। যে দিন জোলাপ লইয়া দাস্ত হয়, সেদিন মুগের ডালের খিচুড়ি বা ডাল ভাত খাইলে ভাল হয়, অভাবে যাহার যেরূপ সংগতি সে সেইরূপ সরু পুরাতন চাউলের অন্ন খাইবে, তদাভাবে যে দেশে যাহার যেরূপ আহার সে সেইরূপ আহার করিবেন, ঐ আহারের সহিত লঙ্কার ঝাল ও অম্ল নিষেধ। বালক বালিকাদিগের জন্য উপরোক্ত পূর্ণমাত্রা অর্দ্ধেক পরিমাণ। এই জোলাপের অপর একটী বিশেষ গুণ এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীলোক অর্দ্ধ মাত্রায় ইহা সেবন করিলে তাহার গর্ভপাতের কোন সম্ভাবনা নাই বরঞ্চ বিষময় রস শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া জোলাপ গর্ভ ও গর্ভধারিণীর পরম উপকার করে। কিম্বা কেবল মাত্র ১ তোলা জঙ্গী হরিতকী চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত এক তোলা পরিষ্কার সোনামুখির পাতা অর্দ্ধপোয়া জলে কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া তাহা প্রাতে চটকাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া জলটী খাইবে। তাহার পর অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা পরে উক্ত প্রকার গরম জল বা দুগ্ধ খাইবে। অবস্থানুসারে কিঞ্চিৎ কমবেশী হইলে কোন ক্ষতি হয় না ইহা পূর্ণ মাত্রা।

# সারস্বত আবাহন।

লেখক—শ্রীমহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

( ১ )

মাগো এ পরাণে বড় অসহ্য যাতনা,
অবসন্ন তনু মন—
কিসে করি আবাহন
চে'য়ে বসন্তের পানে মিলেনা সান্ত্বনা
মাগো, এ পরাণে বড় অসহ্য যাতনা !

( ২ )

কি সুখে করিবে বঙ্গ তোমার উৎসব,
দুর্ভিক্ষ রাক্ষস যার
করি বক্ষ চূর মার
সহস্র দুঃখের ঢেউ করিছে উদ্ভব
কি সুখে করিবে বঙ্গ তোমার উৎসব !

( ৩ )

স্বর্গেও শোভিছে কি মা সপত্নী বিদ্বেষ ?
পৃথিবীর পাপাদর্শে
তথা না করুনাবর্ষে
সপত্নী পুত্রের হেরি এ শোকার্ত্ত বেশ !
স্বর্গেও শোভিছে কিমা সপত্নী বিদ্বেষ ?

( ৪ )

তবে কি তোদের হয় অশুভ সংযোগ ?
বসন্ত পঞ্চমী তিথি
না মানে সপত্নী প্রীতি
লক্ষ্মী অলক্ষিতে কিমা বাড়ায় দুর্ভোগ
তবে কি তোদের হয় অশুভ সংযোগ ?

( ৫ )

ফে'লেদে ফে'লেদে দূরে, বীণা বীণাপাণি !
শোকে বঙ্গ মুহ্যমান
তাহারে সান্ত্বনা দান
সাজে কি সপ্তমে সাধা বসন্ত রাগিণী' ?

( ৬ )

'হা অন্ন হা অন্ন' রবে কাঁপিছে মেদিনী
হ'য়ে আজ লক্ষ্মী ছাড়া
কত জন বাস্তুহারা
শুনিনি নারীর হিংসা এত প্রমাদিনী !
'হা অন্ন হা অন্ন' রবে কাঁপিছে মেদিনী !

( ৭ )

শুধু কি সপত্নী সুতে বিমুখ ইন্দিরা ?
পল্লীর কৃষক ভ্রাতা
জানুতে স্থাপিয়া মাথা
নমিছে দুঃখের পায়, ভোগী মনঃ পীড়া
শুধু কি সপত্নী সুতে বিমুখ ইন্দিরা ?

( ৮ )

যারা এত কালছিল সুপ্রীতি ভাজন,
অবিদ্যায় মতিছন্ন
বিপুল ক্ষমতাপন্ন
তারাও অবস্থা চক্রে হইতেছে পেষণ,
যারা এত কালছিল সুপ্রীতি ভাজন !

( ৯ )

নিতান্ত এ'সেছ যদি তোষিতে সন্তানে,
আজি নিরানন্দে ভাসি
দেখাও কঙ্কাল রাশি
কোপ নেত্রা কমলার আঁখি বিদ্যমানে !
নিতান্ত এ'সেছ যদি তোষিতে সন্তানে

( ১০ )

যাচ বিমাতার দয়া সন্তানের তরে
দেবের বাঞ্ছিত যাঁই
তথা তাঁর দৃষ্টি নাই
তাই বৃত্রাসুর বত নির্ভয়ে বিচরে,
যাচ বিমাতার দয়া সন্তানের তরে !

( ১১ )

তোরা যে মা সাগরের যমজ দুহিতা
সুরাসুর দুইপক্ষ
মথিয়া জলধি বক্ষ
তোদেরে লভিয়াছিল অনূঢ়া সুস্মিতা।
তোরা যে মা সাগরের সমজ দুহিতা।

( ১২ )

কেন আজ ধর্ম্মভ্রষ্ট আর্য্যাবর্ত্ত বাসী
জগতের শীর্ষস্থান
কেন আজ হতমান
সোনার ভারত ভূমি অনার্য্যের দাসী।
কেন আজ ধর্ম্মভ্রষ্ট আর্য্যাবর্ত্তবাসী॥

( ১৩ )

বারিধি মথিলে হায় লক্ষ্মী যথা মিলে,
'ঐরাবত' 'উচ্চৈঃশ্রবা'
'কৌস্তুভে' বিলায় প্রভা
তথায় 'পরানুগ্রহ' বিধি কি লিখিলে ?
বারিধি মথিলে হায়া লক্ষ্মী যথা মিলে।

( ১৪ )

রমারে ক্ষমার তরে কর অনুরোধ
কিদোষে এ আর্য্যবংশ
উন্মত্ত করিতে ধ্বংস
কি মহা পাপের এই তীব্র প্রতিশোধ ?
রমারে ক্ষমার তরে কর অনুরোধ।

( ১৫ )

আলস্যের ঘোর নিদ্রা ভে'ঙেছে এবার,
পূজিতে আপন মায়
আজি মা সকলে চায়
ঘরে ঘরে আয়োজন সে মাতৃ সেবার
আলস্যের ঘোর নিদ্রা ভে'ঙেছে এবার।

( ১৬ )

হায় মা যেহেতে বঙ্গ গায় মাতৃ পাশ ;
না 'জনমে' শস্য মাঠে
বৃথাই কৃষাণ খাটে
কি দুঃখের বৎসর কাটে কোটী পল্লীমাতা
হায় মা যেহেতু বঙ্গ গায় মাতৃ গাথা।

( ১৭ )

এবার না চাহি বিশ্বে করুণা তোমার,
চঞ্চলার হ'লে দয়া
তুমি না হবে নিদয়া
এ যুগে হ'য়েছে এই তত্ত্ব আবিষ্কার,
এবার না চাহি বিশ্বে করুণা তোমার।

( ১৮ )

যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে বাঙ্গালী
হ'লে তাহা সুসমাপ্ত
অযশ হইবে ব্যাপ্ত
ঘুচিবে অতীত লজ্জা শত শত গালি !
যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রেছে বাঙ্গালী।

( ১৯ )

যদি গো ভারত লক্ষ্মী না চাহে ফিরিয়া,
ভারত মাতারে আর
উদ্ধারিতে পুনর্ব্বার
পারিবনা হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি দিয়া !
যদি গো ভারত লক্ষ্মী না চাহে ফিরিয়া।

( ২০ )

মুছাও মুছাও অশ্রু বঙ্গ দুঃখিনীর,
ঘুচাও মা অন্ন ক্লেশ
এ ভিক্ষাই ভিক্ষা শেষ
এ গাথা মরম গাথা এই অকৃতির—
মুছাও মুছাও অশ্রু বঙ্গ দুঃখিনীর !

—:*:—

# প্রেম না অনুরাগ?

লেখক—শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

( ১ )

কেন দেখিলাম—দেখিয়া কেন মজিলাম? কি অপরূপ রূপ। এমন রূপত কখনও দেখি নাই। কি যোগিনী বেশে, আর কি রাজরাণী বেশে—সে রূপের ত কিছুই হ্রাসবৃদ্ধি দেখিলাম না! আকুঞ্চিত কেশদাম পরিবেষ্টিত সেই মুখচন্দ্রের কি অপূর্ব্ব শোভাই দেখিলাম! সে ভ্রূযুগল ত নয়—যেন মদনের ফুলধনুক! আর সেই খঞ্জনগঞ্জন আঁখিই যেন সেই ধনুকের বাণ! সে বাণের কি অব্যর্থ সন্ধান! সে সন্ধানে আমার প্রাণ যে যায়। প্রেমানলে প্রাণটা যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! অভিনেত্রী বেশে সে আমার মন চুরি করিয়াছে। থিয়েটার রোজ রোজ হয় না, কেন? সেই বিম্বাধরের ঈষৎ হাসির রেখা আমার কেবলই মনে পড়িতেছে! সেই আকর্ণবিস্তৃত চক্ষুদ্বয়ের বঙ্কিম-কটাক্ষ আমায় যে অস্থির করিল গা! যাই—যাই তাহার কাছে ছুটিয়া যাই—নইলে যে আমার প্রাণ যায়। এক বার আলিঙ্গনের বিনিময়ে হাসিতে হাসিতে এ প্রাণও আমি বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। একটি চুম্বনের মূল্য কত? আবার সেই মুখ আমার ক্রমাগতই মনে পড়িতেছে—আর আমি স্থির হইতে পারিতেছি না। যখন তার বাড়ীর ঠিকানা জানি, তখন আর কেন? যখন সে স্বর্গের সন্ধান জানি, তখন সে স্বর্গসুখে বঞ্চিত থাকিব কেন? আর না—আর না—আমি চলিলাম।

( ২ )

এই ত সম্মুখে সেই বাড়ী। আমার পা আর চলিতে পারে না কেন? প্রাণের সে উৎসাহ আর নাই কেন? বুকের ভিতর এমন ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ করে কেন? ভয় ও লজ্জা কোথা হইতে আসিয়া আমার হৃদয়ে অনধিকার প্রবেশ করিল কেন? কিসের ভয়—কিসের লজ্জা? সে বিহনে আমার যে প্রাণ যায়! না—আর না—আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছি, এমন সময় একজন স্ত্রীলোক আসিয়া আমায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কাকে খুঁজছেন বাবু?"

আমি আর কাহাকে খুঁজিব? যে আমার মনপ্রাণ হরণ করিয়াছে, আমি

কিন্তু আমি তাঁহার নাম জানি না—এখন এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? এই সময় হঠাৎ আমার মুখ হইতে বহির্গত হইল—"এ বাড়ী থেকে থিয়েটারে যায় কে?"

তখন সেই স্ত্রীলোক বলিল—"ও বিনোদ, তোকে কে একজন বাবু খুঁজ্‌ছে দেখ।"

তখন আমি বুঝিলাম—আমার মনমোহিনীর নাম বিনোদিনী। তা বিনোদিনীই বটে। কই—সে স্ত্রীলোকের কথায় সে বিনোদিনী ত আসিল না। তখন সেই স্ত্রীলোক পুনরায় কহিল—"আপ্‌নি সিঁড়ি দিয়ে উপরে যান্ না মহাশয়, উপরে উঠেই বাম দিকের ঘর বিনোদিনীর।"

সাহসে ভর করিয়া আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম। উপরে উঠিয়া কম্পিতহৃদয়ে বাম দিকের ঘরের দিকে যাইতেছি, এমন সময় দেখি—সেই ঘরের দরজা খুলিয়া কে বাহিরে আসিল। চাহিয়া দেখি—এ সেই বিনোদিনী—হাঁ আমারই বিনোদিনী। বিনোদিনী আমার দিকে ঈষৎ হাসি হাসি মুখে এক কটাক্ষ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কহিল—"আপ্‌নি কে মহাশয়?"

আমার মুখ হইতে সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর বাহির হইল না, তখন পুনরায় প্রশ্ন হইল—"আপ্‌নি কি চান মহাশয়?"

এইবার আমি সেই প্রশ্নের উত্তরে কহিলাম—"আমি তোমায় চাই।"

বিনো। তা আপনার সঙ্গে ত আমার কোন আলাপ-পরিচয় নাই, আপ্‌নি আমায় চাইবেন কিরূপে?

আমি। আলাপ-পরিচয় নাই বলেই, সেই আলাপ-পরিচয় করতেই আমি এসেছি। আর তোমার আমার সঙ্গে পরিচয় না থাকুক, আমার তোমার সঙ্গে খুব পরিচয় আছে।

বিনো। কই—আমার ত কিছুই স্মরণ হচ্ছে না।

আমি। কেন গত শনিবার থিয়েটারে সে পরিচয় হয়।

বিনো। সে কি কথা মহাশয়?—তবে আমি নয়, আপনার ভুল হয়েছে।

আমি। হাঁ তুমিই—আমার ভুল কিছুমাত্র হয় নাই। তুমিই সেই দিন হইতে আমার মন কেড়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছ।

বিনোদিনী তখন স্পষ্ট হাসিয়া কহিল—"আজ্ঞে, তবে সেটা আমার জ্ঞানকৃত অপরাধ। নয় অজ্ঞান কৃত অপরাধ থিয়েটার জায়গা—শতসহস্র লোক—পাঁচটা মনের সঙ্গে অজ্ঞাতে ভুলে নিয়ে এসে থাকবো। আমি সে সব ...

আমি। আমি ত মন ফেরৎ নিতে আসি নাই।

বিনো। তবে কিসের জন্যে এসেছেন মহাশয় ?

আমি। আমার মনচোরকে দেখ্‌তে এসেছি।

বিনো। তা এখন দেখা ত হয়েছে—আপনি এইবার স্বচ্ছন্দে বাড়ী ফিরে যেতে পারেন।

আমি। এ দেখায় ত আমার সে তৃষ্ণা মেটে নাই, বরং সে তৃষ্ণা বেড়ে গেল যে!

বিনো। তা কি কর্‌বো মহাশয়—তা ত আমার ত আর কোন অপরাধ নাই।

আমি। তার একটা উপায় তোমায় কর্‌তেই হবে—নইলে একটা ব্রহ্মহত্যা হবে।

বিনোদিনী তখন শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"আপ্‌নি ব্রাহ্মণ না কি! আমি মনে করেছিলাম—এক ডিগ্রি নীচে—তা তবে আসুন—আসুন। এটা কিন্তু মনে রাখ্‌বেন—ব্রহ্মহত্যার ভয়ে আপনাকে বস্‌তে বল্‌ছি না। কারণ, ব্রহ্মহত্যার চেয়ে আমাদের বরং গো-হত্যার ভয়ই বেশী!"

সেই দিনই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া গেল!

( ৩ )

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু পিপাসা ত মিটিল না। অগ্নিতে ঘৃত সংযোগের ন্যায় সে পিপাসার হ্রাস না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধিই ত দেখিতে পাই। এখন উপায়?—উপায় আর কিছুই নাই—যেখানে উৎপত্তি, সেইখানেই নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য উপায় আর কি থাকিতে পারে? আমার এ সংসারের আর কিছুই ভাল লাগিত না—কেবল সেই বিনোদিনী ব্যতীত; বিনোদিনী ভিন্ন এ সংসারে আমার আর কিছুই আপনার ছিল না। আমি প্রতি অভিনয় রাত্রে সেই থিয়েটারে যাইতাম—অভিনয় দেখিতে নয়, সে কেবল বিনোদিনীকে দেখিবার জন্যে। অন্য দিন সন্ধ্যার পর, বিনোদিনী অভিনয় শিক্ষার জন্যে থিয়েটারে আসিত, সুতরাং সে সময় বিনোদিনীকে দেখিতে না পাইয়া আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতাম। শেষে অন্য দিন থিয়েটারে প্রবেশাধিকারের জন্যে, থিয়েটারের অধ্যক্ষের সঙ্গে উপযাচক হইয়া প্রণয়টা গাঢ় করিলাম—সেও কেবল বিনোদিনীর জন্যে।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। আমি এক দিন থিয়েটারে গিয়া বিনোদিনীকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমার মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। আমি থিয়েটার হইতে বিনোদিনীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, বিনোদিনী আর সে বাড়ীতে নাই—সে বাড়ী হইতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আরো এক ভয়ঙ্কর কথা শুনিলাম—বিনোদিনী এখন একজন বড় লোকের রক্ষিতা—তাহার সহিত আর কাহার দেখা-সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই! কি ভয়ঙ্কর কথা! আমার মাথায় যেন অকস্মাৎ বিনা মেঘে এক ভীষণ বজ্রাঘাৎ হইয়া গেল! আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

অনেক অনুসন্ধানের পর, আমি বিনোদিনীর নূতন বাড়ীর সন্ধান করিলাম। সন্ধান করিলাম বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ-লাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না! সে বাড়ীর সদর দরজায় দ্বারবান্ ছিল, সে দ্বারবান্ আমায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। কি ভয়ঙ্কর কথা! বিনোদিনীর বাড়ীর মধ্যে আমার প্রবেশের অধিকার নাই? আমি স্বপ্নেও কখন যে এ কথা মনোমধ্যে স্থান দিতে পারি নাই—কল্পনাতেও যে এ কথা আমার মনে কখন উদয় হয় নাই! বিনোদিনী যে আমার প্রাণ—বিনোদিনী বিহনে যে এক মুহূর্ত্তও আমি জীবিত থাকিতে পারি না।

সে দ্বারবান্কে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলাম—উৎকোচ দিতেও চাহিলাম—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে সেই দ্বারবান্ আমায় অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। দ্বারবানের নিকট যে অপমানিত হইলাম, তাহার জন্যে কোন দুঃখ হইত না—যদি সে অপমানের পর, বিনোদিনীর একবার সাক্ষাৎ পাইতাম। চেষ্টার কোন ত্রুটি হইল না—কিন্তু বিনোদিনীর ত আর সাক্ষাৎ পাইলাম না। এ সত্য না স্বপ্ন?—বিনোদিনী কি এত নিষ্ঠুরা? মানুষ কখন এত নিষ্ঠুর হইতে পারে না—বিনোদিনী বিহনে আমার যে এত কষ্ট হইবে—সে নিশ্চয়ই সে কথা জানে না। সে এ কথা জানিলে কখনই আমায় এত কষ্ট দিত না। এখন তাহাকে এইকথা জানাইতে পারিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। আমি পাগলের ন্যায়এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম—এরূপ শূন্য হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে আমার আর প্রবৃত্তি হইল না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াই, আবার ঘুরিতে ঘুরিতে সেই বিনোদিনীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হই। আশা—যদি কোন রকমে তাহার সাক্ষাৎ পাই। আশা—একবার সাক্ষাৎ হইলে, সে নিশ্চয়ই আমায় বাড়ীর মধ্যে যাইতে দিবে। কিন্তু না—কিছুতেই আর বিনোদিনীর দর্শনলাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না!

( ৪ )

আচ্ছা, এ সহরে কি বিনোদিনীর মতন আর সুন্দরী নাই ? থাকিতে পারে—কিন্তু সে আমার পক্ষে নহে। বিনোদিনীর মতন কেন—বিনোদিনী অপেক্ষাও অনেক সুন্দরী বারবিলাসিনী আছে। বিনোদিনী অপেক্ষা কুসুম সুন্দরী—হরিমতী সুন্দরী—ভবতারিণী সুন্দরী—কিন্তু আমিত তাহাদিগকে চাই না—আমি যে বিনোদিনীকেই চাই। বিনোদিনীর রূপের জন্যে নহে, কেবল বিনোদিনীর জন্যে! সে রূপের তৃষ্ণা আমার আর নাই, সে পিপাসা ত অনেক দিন মিটিয়া গিয়াছে, এখন শুধু বিনোদিনীর জন্যেই আমি বিনোদিনীকে চাই। তবে আমার এ অনুরাগ না প্রেম ?

তা অনুরাগই হউক, আর প্রেমই হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, আমার মনের কথা আমি বিনোদিনীকে চাই। তোমরা ইহাকে অনুরাগ বলিতে চাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই প্রেম বলিতে চাও তাহাতেও কোন আপত্তি নাই, আমি কিন্তু বিনোদিনীকে চাই। এই যে 'চাই' কথার একটুকু অনুরাগ থাকিতে পারে,—আমি স্বীকার করি—আমার সে কামনা আছে। তা ছাড়া আর আমার মনে অনুরাগ ত কিছুই নাই। তুমি ধনের কাঙ্গালী—মানের কাঙ্গালী যশের কাঙ্গালী এ সংসারে তোমার কাম্য বস্তু অসংখ্য। আমি কিন্তু তোমার ধন চাই না—মান চাই না—আর যশ ত নয়ই—আমি কেবল বিনোদিনীকে চাই। আমি কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া সমাজে অতি ঘৃণ্য ও অতি হেয় হইয়াও সেই বিনোদিনীকে চাই। বিনোদিনীর জন্য আমার ধন, মান, সম্ভ্রম, যশ, প্রতিপত্তি সকলই গিয়াছে,তবু আমি বিনোদিনী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ সুন্দরী থাকিলেও আমি সেই বিনোদিকে চাই। তুমি বলিবে—বিনোদিনী বারবিলাসিনী—বিনোদিনী বেশ্যা—বিনোদিনী নরক—বিনোদিনী পাপ, তথাপি আমি সেই বিনোদিনীকেই চাই। আমার এ অনুরাগ না প্রেম ?

( ৫ )

বিনোদিনী আমায় চায় না, আমি কিন্তু বিনোদিনীকেই চাই। বিনোদিনী আমায় ভাল বাসে না, আমি কিন্তু বিনোদিনীকেই ভালবাসি, কেন, ভালবাসি জান ? সে ভালবাসা কিন্তু বিনোদিনীর জন্যে নয় নিজের সুখের জন্য। বিনোদিনীকে ভালবাসিয়াই আমার সুখ, আমিও সেই জন্যেই বিনোদিনীকে ভালবাসি। হয় ত, আমায় ভালবাসিয়া বিনোদিনী সুখী নয়, সেই জন্যে বিনোদিনী আমায়

ভালবাসে না। সে দিকে আমার দেখিবার ইচ্ছা নাই আমি যে বড়ই স্বার্থপর। আমি এ ভালবাসায় প্রতিদান চাই না বিনোদিনীকে ভাল বাসিয়াই আমি সুখী। দান-প্রতিদানে যে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, আমি সেই কারণ সে দান-প্রতিদান চাই না আমি তাহাকে ভাল বাসিয়াই সুখী। এখন তোমরা বিচার করিয়া বল আমার এ অনুরাগ না প্রেম?

তুমি বলিবে—এপ্রেম বটে কিন্তু পবিত্র প্রেম নয়—এ অপবিত্র প্রেম। আমি তোমার পবিত্র অপবিত্রের ধার ধারি না—আমি কেবল প্রেম লইয়াই সুখী। বিনোদিনীকে ভাল না বাসিলে, আর আমার অন্য উপায় নাই—সেই জন্যেই আমি বিনোদিনীকে ভালবাসি। তুমি বলিবে—এরূপ অপবিত্র ভালবাসায় পাপ আছে—আমিও বলি তথাস্তু। আমি ত সে পাপ অস্বীকার করি না—তবে তোমায় আমায় মতের প্রভেদ কি? তুমি বলিবে—এ পাপের জন্য আমার নরক-ভোগ করিতে হইবে—আমিও সেকথা অস্বীকার করি না—হউক পাপ, হউক নরক, তথাপি আমি বিনোদিনীকে ভালবাসিব। আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বিনোদিনীকে ভালবাসার সঙ্গে আমার এমন সুদৃঢ় বন্ধন রহিয়াছে যে একের আবির্ভাবে অন্যের আবির্ভাব, একের তিরোভাবে অন্যের তিরোভাব। এখন তোমরা বিচার করিয়া বল—আমার এ অনুরাগ না প্রেম? আর যদি প্রেম হয়—এ প্রেম পবিত্র কি অপবিত্র প্রেম?

(৬)

আচ্ছা, সাধনা করিলে কি সিদ্ধিলাভ হয় না? আমি যদি সেই প্রেমের সাধনা করি, আমার অদৃষ্টে কি সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না? আমার প্রেমের সাধনা শুনিয়া হয় ত তুমি হাসিবে। তুমি ঐশ প্রেমের সাধনা করিতে পার, আর আমি বিনোদিনী প্রেমের সাধনা করিতে পারি না? তোমার অভীষ্ট ভগবান, আর আমার অভীষ্ট বিনোদিনী। তুমি যদি আপনার সাধনার দ্বারা তোমার অভীষ্টদেবকে লাভ করিতে পার, আমি সেইরূপ সাধনা দ্বারা আমার অভীষ্টদেবী বিনোদিনীকে লাভ করিতে না পারিব কেন? তোমার না হয়—ভগবান, আর আমার না হয় বিনোদিনী—এই মাত্র প্রভেদ। তোমার ভগবান তোমার কাছে যেমন বড়, আমারও বিনোদিনীও আমার কাছে সেইরূপ বড়। তবে আর মূলে প্রভেদ কোথায় রহিল? তোমার সাধনা যদি অতি কঠোর ও অতি কঠিন হয়, আমিও সেইরূপ অতি কঠোর ও অতি কঠিন সাধনাই করিব। তুমি সিদ্ধিলাভ

করিবে, আর আমি কি সে সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত থাকিব না কি? আমার মনে যদি যথার্থই একাগ্রতা জন্মিয়া থাকে, আমি যদি বাস্তবিকই অনন্যমনা, অনন্যকর্ম্মা হইয়া থাকি, তবে আমার সিদ্ধিলাভ না হইবে কেন?

তুমি কি চাও?—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম না মুক্তি? তোমার ধর্ম্ম, তোমার অর্থ, আর তোমার কাম বাদ দিয়া তোমার জীবনের যে সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য—সেই মুক্তির কথাই ধরিলাম। তুমি যে মুক্তি চাও—আমিও ত সেই মুক্তি চাই। তুমি নিত্য সুখ প্রাপ্তির আশায় সাধনা করিতেছ—আমিও সেই নিত্যসুখের প্রার্থী।—সেই নিত্যসুখের আশারই সাধনা করিতে প্রয়াসী। তুমি, এই সাংসারিক দুঃখের নিবৃত্তি চাও, আমিও ত তাই চাই। তুমি তোমার দেহের ইন্দ্রিয়াদি হইতে বন্ধন মোচনের প্রার্থী, আমিও ত তাই। তুমি তোমার পরব্রহ্মে একেবারে লয় প্রাপ্ত হইতে চাও, আমিও ত আমার বিনোদিনীতে সেইরূপ লয় প্রার্থনা করি। তবে তোমার আর আমার প্রভেদ কি? তুমি যে যোগমার্গ সাধনা করিতেছ, আমিও ত সেই যোগমার্গই অবলম্বন করিতে চাই, তবে তোমার মুক্তি হইলে, আমরাও মুক্তি না হইবে কেন? তুমি না হয়—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ চাও, আর আমি না হয়—আমার পাপাত্মার সহিত বিনোদিনীর আত্মার সংযোগ চাই—এই মাত্র ত প্রভেদ? তবে তুমি যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, আমি সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না কেন?

তোমার সাধনায় হয়ত শ্মশান চাই, কিন্তু আমার সাধনায় সর্ব্বত্রেই শ্মশান। এই গঙ্গাতীরেই আমি সাধনায় বসিলাম—দেখি—সিদ্ধিলাভ হয় কি না? হয় সিদ্ধি, না হয় মৃত্যু—দুই এর এক চাই। তোমার সাধনায় উদ্দেশ্য হয়ত তোমার ইষ্টদেবের নিকট বর প্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু আমি অন্য বরের কথা দূরে থাকুক, তোমার ইন্দ্রত্বও চাহি না॥

(৭)

অনাহারে ও অনিদ্রায় প্রথম দিন সেই গঙ্গাতীরে কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিবসে শরীর বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল না—কেবল শরীর দুর্ব্বল। তা হউক শরীর দুর্ব্বল—হয় সিদ্ধিলাভ—না হয় মৃত্যুর জন্যে যে প্রস্তুত, তাহার আর শরীর দুর্ব্বলেতে আর কি করিতে পারে? আমি এ ক্ষণভঙ্গুর শরীরের প্রতি কোন লক্ষ না করিয়া পুনরায় একাগ্রচিত্ত হইয়া সাধনায় মনোনিবেশ করিলাম। এইরূপে দ্বিতীয় দিবস কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে শরীরের অবসাদ আরো বৃদ্ধি দেখিলাম। ক্রমেই শরীর যেন অবসন্ন হইতে লাগিল। তথাপি

আমার মনের একাগ্রতার কিছুমাত্র হ্রাস দেখিলাম না। শরীর দুর্ব্বল হইলেও আমি তখনও মনের বলে বলীয়ান ছিলাম। এইরূপে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর যে কি হইল—আমার আর স্মরণ নাই! আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম।

অধিক রাত্রে আমার জ্ঞান হইল—তখন রাত্রি কত, আমি বলিতে পারি না। আমি কিন্তু সে সময় এক মহাতেজঃপুঞ্জঃ জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে শায়িত ছিলাম। সন্ন্যাসী আমার মুখে এক মহাসুগন্ধযুক্ত পানীয় অল্পে অল্পে ঢালিয়া দিতে ছিলেন। বোধ হয়—সে পানীয়ের গুণেই আমি পুনরায় জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া, সন্ন্যাসী আমায় ধীরে ধীরে কহিলেন—"বৎস" তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। তোমার একাগ্রতাই তোমার সিদ্ধিলাভের মূল কারণ। এখন তুমি কি চাও—বল?"

কিসে কি হইল জানি না—সন্ন্যাসীর সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি ধীরে ধীরে উত্তর করিলাম—"আমি আপনার শিষ্য হইতে চাই—দাসানুদাস হইতে চাই।"

সন্ন্যাসী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"তুমি সে বিনোদিনীকে আর চাও না?"

আমি আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ি উত্তর করিলাম—"না না না আমি আর সে বিনোদিনীকে চাই না। বিনোদিনী মায়াবিনী—বিনোদিনী রাক্ষসী।"

তখন সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"তবে এস বৎস, আমার সঙ্গে এস।"

সেই দিন হইতে আমি গৃহসংসার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এই মহাপুরুষের শিষ্য হইলাম।

—:*:—

# আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ।

## লেখক—শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

খাদ্যাখাদ্যের উপর যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপিত তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। এজন্য হিন্দুর কি ধর্ম্মশাস্ত্র কি সাধক মণ্ডলী সকলেই আহার বিষয়ে সংযত হইতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। প্রবৃত্তি বা বাসনা স্রোতে ঢালিয়া দিলে, মানবের মানবত্ব রক্ষা হয় না। মানব-সন্তান যতদিন পর্য্যন্ত নিম্ন-স্তরে বিচরণ করিতে থাকে, ততদিন ভোগ বাসনাকেই, জীবনের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান করিয়া, তাহারই সেবা করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যখন ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে, ধর্ম্মের পরম সুপবিত্রালোকে হৃদয়-ধাম সুশোভিত করে, ভোগ-বিলাসিতার উপর সংযম ও সদাচারের বৈজয়ন্তী উড্ডীন

করে, এবং ভগবৎ প্রেমের সুধাপানে আপনাকে অমর করে, তথাই মানবের মানবত্ব। পরম ভাগবত প্রভুপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ বেগম্ জিহ্বা-
বেগমুদরোপস্থ বেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বামপি
মাং পৃথিবীং সশিষ্যাৎ॥"

বাস্তবিক, যে মহাপুরুষ বাক্য, মন, ক্রোধ, রসনা এবং উদর প্রভৃতির বেগ ধারণ করিতে সমর্থ, তিনি সর্ব্বত্র জয় করিয়া থাকেন। ভারতের আর্য্য ঋষিগণই আপ্ত পুরুষ ছিলেন; তাঁহাদের মনের তেজ, হৃদয়ের দৃঢ়তা, বিষয় ভোগে নিস্পৃহা এবং পরার্থে আত্ম বিসর্জ্জন একবার চিন্তা করিয়া দেখ। সেই ফলমূলাশী মহাপুরুষেরা কি-না করিয়া গিয়াছেন? তাঁহারা এতদূর দৃঢ় ছিলেন যে, ঐহিক সর্ব্বস্ব তুচ্ছ করিয়া, কেবলমাত্র জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেই জগৎগুরু আচার্য্যদিগের চরণে আজ কত জ্ঞান-গর্ব্বিত উন্নত মস্তক অবনত হইতেছে! যে পাশ্চাত্য জগতে এতদিন রাজসিক ও তামস আহারই মনুষ্যের প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। আজ সেই মহাদেশে মদ্য মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্ত্বিক আহারের প্রতি আদর বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইতেছে। তথাকার তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণের মধ্যে অনেকেই মদ্য মাংসাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরামিষ আহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কালে যে পৃথিবীতে সাত্ত্বিক আহারের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, অধিকার ভেদে অনুষ্ঠানের পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, সুস্পষ্ট প্রতীয়মান্ হয় যে, হিন্দুর আহার সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যে সকল পশ্বাচারী মনুষ্য জীব- হিংসা এবং নর শোণিত পাত দ্বারা বসুন্ধরা কলঙ্কিত করিয়া থাকে, তাহাদিগের আহার্য্য ও জগতের হিত ব্রতধারী ব্রহ্মপরায়ণ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন সাধু ব্যক্তিদিগের খাদ্য কখনই একরূপ হইতে পারে না। রাজসিক ও তামসিক আহারে মানবের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠে। ঐ সকল প্রবৃত্তির উত্তেজনায়, ধর্ম্মাচরণের পক্ষে মহা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ যাহাতে ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত জন্মায় তাহা যে, সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য, ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। আর এক কথা, ভোগ বিলাসে আসক্ত হইলে, নিয়তই ভোগের বাসনা বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন :

"ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্জেত কামতঃ।
অতি প্রসক্তিং চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ ॥"

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রয়োজন বিষয়ে কামতঃ আসক্ত হইবে না; ঐ সকলের আসক্তি হইতে মনের সংযম করিবে। কারণ সংযমের সাধনা করিতে পারিলেই, প্রকৃতভাবে সুখভোগের সম্ভাবনা। কাম বা ভোগকে দমন করিতে না পারিলে, প্রকৃতপক্ষে উপভোগ হয় না।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে ॥

ভোগের দ্বারা কখন ভোগের শান্তি হয় না; পাবকে ঘৃতাহুতি দান করিলে, অগ্নির বৃদ্ধিই হয়; অর্থাৎ বাসনার উপভোগে ভোগের কামনা মাত্রই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূজ্যপাদ ঋষিগণ এই সকল বুঝিয়াই, ধর্ম্ম পথাবলম্বী জনগণকে তামসিক ও রাজসিক আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

রিপুর দমন, কামনার জয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম দ্বারা ধর্ম্মরূপ অমূল্য রত্ন লাভ হয়। "কাম জয়ের এবং ইন্দ্রিয় সংযমের বিধি উপদেশ এবং অনুষ্ঠান স্ব-আর্য্য-শাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপক। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারেও রিপু দমনের অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। কিরূপ দ্রব্য সমূহ ভোজনে, কোন্ কোন্ রিপুর বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার বিচার পূর্ব্বকই সাধক দিগের পক্ষে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্দ্দেশ হইয়া থাকে যাহারা ইয়ুরোপীয় রাসয়নিক বিশ্লেষণকেই দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না যে, পূর্ব্বকালে কিরূপে দ্রব্যগুণের পরীক্ষা হইয়াছিল। বস্তুতঃ রাসায়নিক বিশ্লেষণটী অপেক্ষাকৃত স্থূল ব্যাপার, উহাতে কোন সমষ্টীভূত দ্রব্যের সম্যক্ ব্যষ্টীকরণ হয় না, এবং উহাদ্বারা কোন্ দ্রব্য জীব শরীরে কিরূপ কার্য্য করে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝা যায় না। ভক্ষ্য দ্রব্যের গুণাগুণ, সেই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া দেখিলেই প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা বুঝিতে পারেন,ফলতঃ আমাদের শাস্ত্রে শরীরের পটুতা সাধন, বুদ্ধি বৃত্তি সম্মার্জ্জন, চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণ এবং রিপু সকলের সংযম সাধন কারবার গুণ বর্ণিত এবং প্রশংসিত হইয়াছে। তৎসাধনের বাহ্য ও অভ্যন্তরিক উভয় প্রকার উপায় কথিত হইয়াছে। এবং এমন সকল নিত্য ব্যবহার ও অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা ঐ সকল কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া, সমস্ত মানব জীবন একটী বিশুদ্ধ পদার্থ এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভের সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। কি সুন্দর তথ্য ॥*

* স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় কৃত——"আচার প্রবন্ধ" দেখ।

আহার-বিহার-জনিত ভোগ-বিলাসে নির্লিপ্ত থাকা, ধর্ম্ম-সাধনের একটী অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। ভোগাসক্ত ব্যক্তি ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না; কারণ, ভোগ বিলাস দ্বারা চিত্তের দৃঢ়তা বা একাগ্রতা জন্মে না। চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধই ধর্ম্মের রাজ্যের প্রবেশ দ্বার-স্বরূপ। ধর্ম্ম পথ, সাধনার পথ কুসুম-সমাকীর্ণ সুখকর নহে। আপাত মধুর লালসা বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া, এই পথের পথিক হইতে হয়। কিন্তু যখন মানব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হন, তখনই তাঁহার ভাগ্যে শাশ্বত সুখের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়া যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডের অনু পরমাণু হইতে অমৃত ধারা নিঃসৃত হইয়া, তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিতে থাকে। সাধনার পথে, ধর্ম্মের পথে যাত্রিদিগকে সাবধান করিবার জন্য আর্য্য শাস্ত্র জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন :—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নি বোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতাদুরত্যয়া
দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ শ্রুতি।

জীব সকল তোমরা উঠ, জাগ্রত হও, বর সকল প্রাপ্ত হইয়া, তাহা সম্যক্ রূপে উপলব্ধি কর। যেমন ক্ষুরের নিশিত ধার দিয়া গমন করা দুঃসাধ্য, পণ্ডিতগণ বলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড পথ সেইরূপ দুর্গম। অতএব সাধক সতর্ক হইয়া, এই পথে অগ্রসর হও। কঠোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় :—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাস্তো ন সমাহিতঃ।
নাশান্তমান যো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

যে দুষ্কর্ম্মপরায়ণ, সে আত্মাকে দেখিতে পায় না। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষয় ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত থাকে, সে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। যাহার চিত্তে একাগ্রতা জন্মে নাই, সে তাঁহাকে পাইতে পারে না। তবে যে ব্যক্তি এই সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই একমাত্র প্রজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন। অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় :—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বাল
প্রমাদ্যন্তং চিত্ত মোহেন মূঢ়ম্॥ কঠ।

"পরা বিদ্যা বালকের নিকট, বিষয় মদে মত্ত ব্যক্তির নিকট, অথবা চিত্ত মোহে মুগ্ধ ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন না।" চিত্ত চাঞ্চল্য বা বিকৃত হইলে যে, ধর্ম্মসাধনের পক্ষে গুরুতর ব্যাঘাত জন্মে, ইহাই আর্য্য শাস্ত্রের অভিমত। কথাটা যুক্তি বা বিজ্ঞান সম্মত কিনা তাহা একবার আলোচনা করা আবশ্যক।

আমরা যাহা আহার করিয়া থাকি, তাহাই যখন পাক যন্ত্রে মথিত হইয়া, মনের গঠন বা পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে, তখন ইন্দ্রিয় উত্তেজক খাদ্য আহার করিলে যে, মনের বিকার উৎপাদন করিবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয়কি আছে? এই জন্যই সাধকগণ খাদ্যাদি জনিত ভোগ বিলাসকে বিষবৎ-পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

ভোগে রোগ ভয়ম্
বৃত্তে নৃপালাদ্ ভয়ম্।
মানে দৈন্য ভয়ম্ বলে রিপুভয়ম্
কায়ে কৃতান্তাৎ ভয়ম্॥
শাস্ত্রে বাদি ভয়ম্ গুণে খল ভয়ম্
রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতম্ ভুবি
নৃণাং বৈরাগ্য মেবাভয়ম্॥

অহো, কি অমৃতময় উপদেশ! যেখানে ভোগ, সেইখানেই রোগভীতি ব্যাধি কীট জর্জ্জরিত বংশ খণ্ডের ন্যায়, দেহকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। ব্যাধি-ক্লিষ্ট দেহ দ্বারা কি সাংসারিক কি পারলৌকিক কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। মানবাত্মার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। পার্থিব ভোগ বিলাসে আসক্ত থাকিলে, সে উদ্দেশ্য কখনই সুসিদ্ধ হয় না। পশ্বাদি ইতর প্রাণীর ন্যায়, মনুষ্য কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় বা উদর সেবার জন্য এ সংসারে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। অস্থি মাংস মেদ এবং মল মূত্র পূর্ণ দেহের সেবার উদ্দেশ্য কি? মানব সন্তান, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া, সেই জ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মরত্ন লাভ করিবেন, ইহাই অভিপ্রায়। সুতরাং ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে দেহের পবিত্রতা সাধনে মনোযোগী হইতে হয়।

"যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস থাকিব, ততদিন পর্য্যন্ত সাংসারিক সুখের বাসনা, আমাদের মনকে বিচলিত করিবে; যতদিন পর্য্যন্ত দেহ অসংযমিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের মানস পটে আত্মার দ্বারা নিপতিত হইবার উপযোগী হইবে, একথা যেন স্বপ্নেও ভাবি না। দেহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে আমাদের শিক্ষা চাই; ইহাতে যথারীতি আহার নিদ্রা এবং ব্যায়ামের দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করা চাই। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে, যাহা কিছু ইহার স্বাস্থ্যের হেতু ভূত তাহা অবশ্য ইহাকে দিতে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া

হই যে, শরীর আত্মার কার্য্যভূত. সুতরাং দেহ উহার বশীভূত ভৃত্যস্বরূপ হওয়া চাই। যোগাভ্যাস কারীর আহার বিষয়ের নিয়ম সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬শ শ্লোকে বলিয়াছেন ঃ—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈ কান্ত মনশ্নতঃ।
না চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥

হে অর্জ্জুন, অতি ভোজীর যোগ হয় না, অনাহারীরও হয় না, এবং অতি জাগরণ শীলেরও হয় না, অতি নিদ্রালু ব্যক্তিরও হয় না। মাত্রা কোন দিকেই যেন অতিরিক্ত না হয়। 'সর্ব্বং অত্যন্তং গর্হিতং' অতিরিক্ত কিছুই ভাল নহে। শরীরকে কষ্ট দেওয়া বা পীড়ন করা উচিত নহে; কারণ, ইহা সাধনার প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।' কিন্তু অপর পক্ষে শরীরের এমত বশ হওয়া উচিত নহে যে, সে আপনাকে প্রভু বলিয়া মনে করে। যদি কেহ এই মার্গ অবলম্বন করে, তবে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত না হইয়াও, সাম্যচ্যুত না হইয়াও, সমাজচ্যুত না হইয়াও, সূক্ষ্ম বিষয় গ্রহণ বা অনুভূতি করিতে সক্ষম হয়; স্বাস্থ্যের হানি না করিয়াও, সূক্ষ্ম বিষয়ও আধ্যাত্মিক ব্যপার উপলব্ধি করিতে পারে। আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে, সূক্ষ্ম বিষয় অনুভব করিতে অত্যন্ত সুদক্ষ, অথচ তাঁহার মস্তিষ্ক সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে বিকার শূন্য।

শরীরকে এই প্রকারে বশীভূত এবং পরিশোধিত করিলে, ইহাকে উচ্চসুরে বাঁধিতে পারি; কিন্তু এজন্য আমাদের সাধারণ ভোগ্য বিষয়ে আস্থা রহিত হওয়া এবং বহির্জ্জগতের আকর্ষণের প্রতি বিমুখ ও উদাসীন হওয়া আবশ্যক। উচ্চতর প্রজ্ঞা স্থূল জগতে প্রকাশমান্ করিতে হইলে, আমাদের বৈরাগ্যা-ভ্যাস বা অনাসক্তির বিশেষ প্রয়োজন। যতদিন আমরা তুচ্ছ বহির্জ্জগতের পদার্থে আকৃষ্ট হইব, ততদিন আমাদের উচ্চতর প্রজ্ঞা এ শরীরকে স্বীয় উপাধি স্বরূপ বিবেচনা করিয়া এই ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে পারিবে না। যদি আমরা উচ্চতর প্রজ্ঞাকে স্থূল জগতে প্রতিভাত করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদের ঐকান্তিকী ভক্তি চাই, এবং বিশিষ্ট জ্ঞান সহকারে মনের ও ইন্দ্রিয় সমূহের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে; সুতরাং এই প্রদর্শিত মার্গে চলা চাই। আমাদের জীবন ও আচরণ শুদ্ধ হওয়া চাই; জীবে দয়া ও কোমল প্রাণ হওয়া আবশ্যক; আমাদের চতুর্দ্দিকে সকল বস্তুতেই আত্মাকে দেখিতে শেখা চাই। কি সুন্দর, কি কুৎসিত, কি উচ্চ, কি নীচ, কি দেবতা, কি উদ্ভিদ্ সমুদয় বস্তুতেই একই আত্মার বিকাশ দেখিতে শেখা চাই। যিনি সর্ব্ব জীবে আত্মাকে দেখেন এবং

আত্মাতে সর্ব্ব বস্তু দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শী।” *

সাত্তিক আহারে, এবং সাত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ভিন্ন যে আত্মার ঐরূপ পবিত্রতা সাধিত হয় না, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। মানব যতদিন পর্য্যন্ত স্থূল জগতে অর্থাৎ নিম্নস্তরে অবস্থিতি করে, ততদিন তাহার ভোগ বিলাসে আসক্ত থাকে। তখন সে রসনা তৃপ্তি কর উপাদেয় খাদ্য, ইন্দ্রিয় ভোগোপযোগী বিবিধ বিলাস সাধন দ্রব্য সম্ভারই ইহ জীবনের একমাত্র সুখ ও শান্তির নিকেতন মনে করিয়া থাকে। অন্ধের পক্ষে যেমন জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা চির-রুদ্ধ, বধিরের পক্ষে যেমন বিহঙ্গের গুঞ্জন, ভ্রমরের গুঞ্জন এবং কোকিলের অমৃতময়ী স্বর লইয়া অনাস্বাদিত, সেইরূপ বিষয়াসক্ত, ইন্দ্রিয় সেবারত এবং ভোগবিলাসীর পক্ষে পবিত্র ধর্ম্মোৎপাদ্য স্বর্গীয় সুখ অনুভূত হয় না। বাস্তবিক, সুখ ভোগে নহে, সুখ ত্যাগে ; যিনি ত্যাগী, তিনিই প্রকৃত সুখী।

# ঈশ্বর দর্শন।

লেখক—শ্রীরাজ কৃষ্ণ পাল।

“এজগতের প্রত্যেক দ্রব্যই”তোমার উদ্দীপনার কারণে রহিয়াছে দেখিতেছি। আমি প্রস্তুত হইলেই ইহা দেখিতে পাই। প্রত্যেক সরল গানের ভিতর দিয়া তোমার নিকট উঠা যায়। তাহারা চেষ্টা করিয়া এরূপ উদ্দেশ্যে লিখে নাই যে, তোমার নিকট উঠা যাইবে বলিয়া উহা রচিত, তাহা নহে, তাঁহাদের যাহা মনে আসিয়াছে তাই লিখিয়াছে, এমন গান ধরিয়া বেশ যাওয়া যায়। এই দেখ না,—

“পশুপতি গিরিজাপতি শঙ্কর পিনাক পাণি।” এই পংক্তিতে মনে আঘাত দিতেছে, পশুপতি অর্থাৎ জগতের প্রাণের অধিপতি! গিরিজা-পতি অর্থাৎ জগতের জড়ের অধিপতি শঙ্কর অর্থে ব্যোম্ ভোলা বা আকাশ পিনাক পাণি শিঙ্গা বা শব্দের আধার তুমি! কি বুঝিলাম! কেবল আকাশ ও শব্দ বা ওঁকার! তাই বলি, সরল গানে, সরল স্থানে, সরল প্রাণে তুমি যত শীঘ্র আইস, যতশীঘ্র দেখা দাও, যতশীঘ্র দেখা পাই, কবির নিজের লেখায় তাহা পাই না। আধ্যাত্মিক করিতে গিয়াই পড়িয়াছি! ! !

কালের গায়ে রং দিয়া দিয়াছ একটিমা দিদকা ( দিন) [illegible]

এই দুইটা রং কালের ( সময়ের ) গা' হইতে পুঁছিয়া ফেল! তবেপ্রকৃত কাল ( মৃত্যু ) দেখা যাইবে। পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সৎ-অসৎ, ধনী দীন, জড় ও চেতন এই দুইটা তফাৎ করে, সরাইয়া পুকুরের পনে চাও, জল দেখা যাইবে, জল নাড়াইয়া তোমায় দেখা, পৃথিবী নাড়াইয়া তোমায় দেখা, জড়দেহ নাড়াইলেই তোমাকে দেখা যাইবে, তুমির সাক্ষাৎ হইবে, আমিকে বুঝিতে পারিবে।

মন স্থির করো, উপাসনায় অনেক হ'য়েছে, উপাসনা বন্ধ কর, এখন যোগ কর। এখন তোমাতে তাঁহাতে যোগকর ঠিক কর, ঠিকদিয়া এককর। মনটা স্থির কর্ত্তে পারছনা। জিনিস ধরো! এই যে নৈবিদ্যের উপকরণ চারিদিকে। দীপ জ্বাল! ঐ দীপ শিখার উৎপত্তি স্থানে মনকে আস্তে আস্তে ফেলিয়া উহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মনকে তুল! কেমন দীপ শিখা দু'টা দেখা যাইতেছে না! ! ঐ রূপ একটা আমির ভিতর দুটা আমি দেখা যায়। উহার একটার নাম মন অন্যটী প্রাণ। মনে প্রাণে কথা কও। ঐ যে ভিতর থেকে কে বল্‌ছে, "আজ স্নান করিব, আবার কে বলছে না করিব না।" কেন এ ধোকায় পড়িতেছ! ভিতরে দুটা আছে কিন্তু উভয়ে স্থির হয় নাই। স্থির করিয়া লও। তাহা হলেই এরাজ্য হইতে অন্যরাজ্যে যাইবে।

একটা বৃক্ষপত্র চক্ষের উপর ধরিলে, চক্ষু অন্ধকার দেখে, কিন্তু আলোর সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ বন, বড় বড় অট্টালিকা, বৃহৎ বৃহৎ নগর ঐ আলোক রাজ্যে রহিয়াছে, ভাসিতেছে, তাহা আমাদের চক্ষের ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া তোমার মন্দিরে পৌঁছিতেছে। ঐরূপ শব্দ রাজ্যেও কত বন, পর্ব্বত, নদ নদী, বাড়ী, নগর, জীব জন্তু সবই রহিয়াছে, শব্দ কি? ঐ সকল দ্রব্যের সত্য জ্ঞাপক ব্রহ্ম! অতএব তাহাও কর্ণ পটাহ দিয়া তোমার শ্রীমন্দিরের দ্বারে পৌঁছিতেছে। জল রাজ্যেও তোমার মহিমা বিঘোষিত! ঐ জলের ভিতর জগতের সমুদয় দ্রব্যের আস্বাদন বিরাজিত। আস্বাদনেও আদত দ্রব্য বিজ্ঞাপিত প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকাইত তিক্ত আস্বাদনে নিম্ জাতিয় দ্রব্যের কেমন জ্ঞান হইতেছে! ঐরূপে সমুদায় জ্ঞেয়! তাহা তোমার রসনা দ্বারা প্রকাশ মন্দিরের দ্বারে উপনীত। ওকি! ! গন্ধের ভিতর তোমার বিরাট রাজ্য ব্যাপিত! গন্ধেও মানুষ ধরা যায়! তাহাও তোমার নাসিকা দ্বার দিয়া স্বপ্রকাশ উপলব্ধি মন্দিরে গিয়াছে। একি! তোমার সমাধি অবস্থার ভিতরে, তোমার কল্পনা রাজ্যই কি এখানে সত্য নামে অভিহিত! বুঝেছি, তোমার বিরাট মস্তিষ্কের ভিতর আমার স্বপ্নের খেলা! হে স্বপ্রকাশ আমরা যেন এইরূপ সর্ব্বদা তোমাকে ধরিয়া বসি। তোমার সমাধি

# সর্ব্বাধিকারী বংশ।

লেখক—শ্রীমৎধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মুসলমান শাসন কালে পশ্চিম বঙ্গ যে সকল "সুবে" বা বিভাগে বিভক্ত ছিল, তাহার মধ্যে ইল্‌হাম্ সুবে অতীব প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান হুগলী ও মেদিনীপুর জিলার প্রায় অধিকাংশ ঐ সুবের অন্তর্গত ছিল। দুঃখের বিষয় প্রোক্ত সুবে বহু পরগনায় বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় অনেকে ইহার প্রাচীন নাম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। ইল্‌হাম্ সুবের মধ্যে বঙ্গদেশের বহু সংখ্যক সুবিখ্যাত পুরুষের জন্ম হইয়াছে। ভুবন বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায় এবং দান-বীর দয়াবীর কর্ম্মবীর-ধর্ম্মবীর ও বিদ্যাবীর পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীমৎ ঈশ্বর চন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয় এই সুবের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী এবং ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ঐ বৃত্তিধারী এবং ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু সূর্য্য কুমার অগস্তি, রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সুলেখক রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ভিষককুল শিরোমণি ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, ব্যবহার জীবিচূড়ামণি ভুবনবিখ্যাত ডবলিউ, সি, বনার্জ্জি, তদ্ব্যতীত তমোলুক, ময়না, নাড়াজোল, নারায়ণ গড়, মহিষাদল প্রভৃতি রাজ্যের রাজাগণ, এবং বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্র প্রভৃতি এই প্রাচীন সুবের সীমারমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থ জাতির মধ্যে হুগলী জেলান্তর্গত থানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামবাসী "সর্ব্বাধিকারী বংশ" অতিশয় প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। অদ্য পর্য্যন্ত এই বংশে প্রায় ২৯ পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; ঐতিহাসিকদিগের মতে প্রত্যেক পুরুষের গড়ে অন্ততঃ ৩০ বৎসর করিয়া হিসাব ধরিলে এই বংশ সম্ভবতঃ প্রায় নয় শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। দুঃখের বিষয় অনেকে জাতিত্বের ইতিহাস লিখিতে গিয়া প্রাচীন ও প্রখ্যাত বংশের উৎপত্তি বিস্তৃতি, কুলবিবরণ, ইতিবৃত্ত ইত্যাদি কিছুই উল্লেখ করেন না।

এদেশে ঐতিহাসিক চর্চ্চা খুব কম; কঠিন প্রত্ন তত্ব চর্চ্চা আরও অল্প; এই রূপ প্রাচীন বংশ সমুহের বিবরণ লইয়া আলোচনা করিলে আমরা অনেক প্রয়োজনীয় কথা সংগ্রহ করিতে পারি। যাহাহউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে থানাকুল

করি। বলা বাহুল্য এই বংশের অনেক বঙ্গভূষণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব ও সৌরভ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ও রক্ষা করিতেছেন। সর্ব্ব প্রথমে বংশাবলীর পরিচয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। এইস্থলে কহিয়া রাখা উচিত, কায়স্থকুলতিলক সর্ব্বাধিকারী বংশের কুলগত উপাধি "বসু" পশ্চিমবঙ্গের বসু কায়স্থগণ বহু গ্রামী, ইহাঁরা "মাইনগর" গ্রামীন। কুলের শ্রেষ্ঠতা ও শুদ্ধতা জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে "সর্ব্বাধিকারী" নামে প্রসিদ্ধ। কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণ সহ যে পঞ্চজন কায়স্থ আগমন করিয়া ছিলেন, সেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর দিগের ইহাঁরা একতর বংশ। আদিপুরুষ দশরথবসু তস্য সন্তান কৃষ্ণবসু তস্য সুত ভবনাথ তাঁহার পুত্র হংস তাঁহার পুত্র মুক্তি ( সর্ব্ব প্রথমে ইনি মাইনগর বাসী); ইহাঁর তনয় দামোদর ইহাঁর তনয় অনন্ত তস্য সুত গুণাকর তদনন্তর ধারাবাহিক ক্রমে—মাধব, লক্ষণ, মহীপতি, সুরেশ্বর, বিশ্বনাথ, জনমেজয় মাধব, যাদব, কৃষ্ণদাস এবং তাঁহার পুত্র শ্রীরাম। উপরিউক্ত সুরেশ্বর ঈশানেশ্বর নামে এক সহোদর ছিলেন। ইহার বংশাবলী পাওয়া যায় নাই; পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। উপরিলিখিত কৃষ্ণ দাসের পৌত্র ( অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র বসুর পুত্র ) রত্নেশ্বর বসু সর্ব্ব প্রথমে থানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইহাঁর পঞ্চপুত্র; জীবন বল্লভ, প্রাণ বল্লভ, বিশ্বেশ্বর, কাশীশ্বর এবং জগন্নাথ। ইহার মধ্যে প্রাণবল্লভ, কাশীশ্বর ও জগন্নাথের বংশ অজ্ঞাত; উহাঁদের কোন বংশ ধর নাই। জীবনবল্লভ ও বিশ্বেশ্বরের বংশাবলী দেওয়া যাইতেছে। জীবনবল্লভ বসু, রাজা জানকী রাম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তস্য পুত্র রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ তস্য পুত্র রাজা ভুবন মোহন এবং তাঁহার তনয় রাজা রাজকীশোর। ইনি রাজা হরিপ্রসাদ নামেও সম্বোধিত হইতেন। রাজা হরি প্রসাদের সন্তান কালাচাঁদ, তাঁহার সুত আশুতোষ তস্য সন্তান শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী ( জীবিত )। রত্নেশ্বর বসুর তৃতীয় পুত্র বিশ্বেশ্বরের সুত কৃষ্ণ কিঙ্কর তাঁহার পুত্র নিত্যানন্দ। ইহাঁর দুইপুত্র; জনমেজয় ও মুন্সী রামনারায়ণ। জনমেজয়ের পুত্র রাজনারায়ণ তস্য তনয় শ্রীনাথ এবং তাঁহার পুত্র রাধানাথ। রামনারায়ণ মুন্সীর তিনপুত্র; মদন মোহন, মথুরা মোহন ও গোপীমোহন। মদন মোহনের পুত্র রাজা সীতানাথ; গোপীমোহনের বংশ অজ্ঞাত। মথুরা মোহনের তিনপুত্র; যদুনাথ ব্রজনাথ ও কেদার নাথ। যদুনাথের সন্তান প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী; রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, সবজজ আনন্দ কুমার সর্ব্বাধিকারী এবং রায়বাহাদুর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী। এই বংশে

সর্ব্বপ্রথমে যিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার নাম ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ নাগ—রাজা জীবনবল্লভ ( অন্য নাম রাজা জানকী রাম )। ইহাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গৌরকীশোর বসুর বংশ নাই। জেষ্ঠের বংশ যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। থানাকুল কৃষ্ণনগরের বসুবংশে সুরেশ্বরবসু সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বাধিকারী উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। অতঃপর বংশের প্রধান প্রধান পুরুষদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

বংশাবলীর ইতিহাস অনুসন্ধানে জানিতে পারাযায়,এই বংশের রত্নেশ্বরবসু নামক ব্যক্তি থানাকুল কৃষ্ণনগরের সমীপবর্ত্তী রাধানগরে সর্ব্ব প্রথম বসতি স্থাপন করেন। সুরেশ্বর বসু নামক সুযোগ্য পুরুষ প্রায় পঞ্চশত বর্ষাধিক কাল পূর্ব্বে দিল্লীর বাদসাহের অধীনে উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বসুজার বহুবিধ সৎগুণে এবং রাজভক্তি ও কার্য্যকুশলতায় বাদসাহ তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া উঠেন এবং পুরস্কার স্বরূপ বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি ( জায়গির ) প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত রঘুনাথপুর নামক পরগণা এবং বংশ পরম্পরা ক্রমে "সর্ব্বাধিকারী" উপাধিও প্রদত্ত হইয়াছিল। সুরেশ্বর বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানেশ্বর, দিল্লীর বাদসাহের উজির ছিলেন। রাজা জানকী রাম বসু নবাব আলিবর্দ্দী খাঁএর মন্ত্রী পদে নিয়োজিত হইয়া বিশেষ রূপে যোগ্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ভূরি ভূরি যশোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ বসু, বিদ্যাবত্তার জন্য "মুন্সী" নামে প্রখ্যাত হইয়া উঠেন। বাবু মদন মোহন বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সবজজ্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজা সীতানাথ বসু, গবর্ণরজেনারলের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হইয়া বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম বাহাদুরের কয়েকবর্ষ কালব্যাপী দেওয়ান ছিলেন। বসু বংশের রায় প্রসন্ন কুমার সর্ব্বধিকারী মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপল পদে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিকট এবং সর্ব্ব সাধারণের নিকট অত্যন্ত প্রিয় হইয়া ছিলেন। এই স্বনামধন্য পুরুষ কয়েক বৎসরের জন্য স্কুলইনেস্‌পেক্টরের কার্য্য ও সম্পাদন করিয়া ছিলেন। ইহাঁর বিরচিত "পাটি গণিত" নামক বৃহৎ বাঙ্গলা পুস্তক, সে সময়ের বাঙ্গালীছাত্রদিগের গণিত শিক্ষার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ছিল। এখনও বোধ হয় এতদপেক্ষা সুন্দরতর বাঙ্গালা গণিত শিক্ষার পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। প্রসন্ন বাবুর পূর্ব্বে

নাই। প্রসন্ন বাবুর সহোদর সূর্য্য কুমার বাবু কলিকাতার একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সুচিকিৎসক। ইনি গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কর্তৃক রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যতর সহোদর আনন্দ কুমার সর্ব্বাধিকারী সবজজ পদে নিযুক্ত আছেন। কনিষ্ঠ সহোদর রায় বাহাদুর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লক্ষ্ণৌ কানিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তদনন্তর সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুপেট্রীয়ট সংবাদ পত্রের সম্পাদক এবং বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়ান সভার সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি অন্যতম "ফেলো"। এই বংশের রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ বসু নবাব আলিবর্দ্দি খাঁএর মন্ত্রী ছিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলার ও ইনি উজিরী করিয়াছেন। রাজা ভুবন মোহন দিল্লীর বাদশাহ "শাহ আলমের" মন্ত্রীত্ব করিয়া তদনন্তর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণ বিভাগের দেওয়ানী করেন। রাজা রাজকিশোর মহাশয় কোম্পানীর রেশমকুঠির সর্ব্বপ্রধান দেওয়ান ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী মুর্শিদাবাদ জিলার অন্যতর জমিদার। খানাকুল কৃষ্ণ নগরের বসু বাবুদের জ্ঞাতিবর্গ বহুস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় স্থানে ইহাঁদের বংশের শাখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাস্তাপাড়া, চোঁয়া, বহরমপুর, কালনা, মেমারি, গুড়প, কলিকাতা, এলাহাবাদ, যশোহর, জঙ্গলবাধা, দীঘনগর, রাজসাহী, ভালকো, ভাগলপুর, মেদিনীপুর, শিবপুর, হাবড়া কাশী, উড়িষ্যা, জাজপুর, লক্ষ্ণৌ। বাবু শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী "হিন্দু পেট্রীয়ট" সম্বাদ পত্রের বর্ত্তমান সম্পাদক। সারবার্ণশ পিকক্ সাহেব যখন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরী ছিলেন, তখন শ্রীশ বাবুকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু নানাকারণে এই পদ গ্রহণ করিতে ইনি অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। শ্রীশ বাবু বাঙ্গালা এবং ইংরাজী ভাষায় সুলেখক, ইহাঁর ইংরাজী বক্তৃতা সমূহ পুস্তককারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীশ বাবুর পুর্ব্ব পুরুষ রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ পলাশীর সুবিখ্যাত যুদ্ধে লর্ড ক্লাইবের বিশেষ সহায় ছিলেন। শ্রীশ বাবু মুর্শীদাবাদ জেলান্তর্গত চোয়া নামক পল্লীর এক্ষণে অন্যতম অধিবাসী এবং জমিদার, ইনি তথায় স্কুল, চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিয়া জন সাধারণের বিশেষ হিত সাধন করিয়াছেন। সম্রাট গিয়াশুদ্দীন বাহাদুর শ্রীশবাবুর বংশে সর্ব্বাধিকারী উপাধি দান করিয়াছিলেন, রাজা ঈশানেশ্বর বসু ইহাঁর মন্ত্রী ছিলেন। এই বংশের আর একটা মহা সম্মান আছে, তাহা অন্য পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রদত্ত হয়

কোন সময়ে প্রবেশ করিবার অধিকারী এবং মস্তকোপরে ছত্র বিস্তার করিয়া প্রবেশ করিলেও কেহ আপত্তি করিতে পারেন না। এই প্রসিদ্ধ বংশ সমাদৃত উকীল অমৃত কুমার, ডাক্তার সত্যপ্রসাদ, এটর্নী দেবীপ্রসাদ, ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ, এম, ডি, উকিল জ্যোতিঃ প্রসাদ, কৃষ্ণ প্রসাদ প্রভৃতির নামও সগৌরবে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। ইতিপূর্ব্বে ভুবন মোহনের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, ইনি পারস্য ভাষায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন; দিল্লীর সম্রাটের তিনি দেওয়ান ছিলেন। ইহাঁর পুত্র দেওয়ান হরিপ্রসাদ নামে খ্যাত। তস্যপুত্র কালাচাঁদ বাবুর যত্নে বহরমপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাঁর পুত্র আশুতোষ চতুর্দ্দশ ক্রোশ ব্যাপী এক পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

প্রায় ঊনত্রিংশ বৎসর পুর্ব্বে কলিকাতার শ্রীমৎ রাজা সার রাধাকান্ত দেব, কে, সি, এস, আই, বাহাদুরের শোভাবাজারস্থ বাটীতে পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের কায়স্থ দিগের এক বিরাট বৈঠক বসিয়া ছিল। ঐ বৃহতী সমিতিতে বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরের বসু বাবুদের সর্ব্বাধিকারী উপাধি সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ঐ উপাধিটা মুসলমান নবাব বা সম্রাট প্রদত্ত উপাধি, ইহার সহিত কুলগত কোন সম্পর্ক নাই। তৎকালের কোন কোন সম্বাদ পত্রও ঐ অভিমতকে গ্রাহ্য বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিমতটা ভ্রমাত্মক। আমি স্বয়ং এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; উড়িষ্যাঞ্চলে সর্ব্বাধিকারী বংশের পূর্ব্ব পুরুষ দিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির কার্য্য ক্ষেত্র ছিল। আমি তথায় অনেক প্রাচীন পুরুষের মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। রাজা সুরেশ্বর ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রাজা ঈশানেশ্বর যখন উড়িষ্যাদেশে দেওয়ানী করিতেন, তখন তাঁহারা এক মহাযজ্ঞ সমাধা করিবার কারণ এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ও এক লক্ষ কায়স্থকে আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একলক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহ করিয়া রাজা বাহাদুর দ্বয় রৌপ্য ও সুবর্ণের মাদুলী মধ্যে তাহা রক্ষা পূর্ব্বক সহস্র সহস্র লোককে বিতরণ করিয়াছিলেন পাঠকেরা বোধ হয় অবগত আছেন, লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সর্ব্বত্রই দুর্লভ পদার্থ। এখনও ইহা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শুনা যায়, বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ ভিন্ন আর কোথাও এই দেব দুর্লভ বস্তু নাই। যাহা হউক, সমাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বর্গকে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক

মুসলমান সম্রাট উহা মঞ্জুর করায় ঐ উপাধি বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। ইহা কুলজ্ঞগণ কুলের সম্মান স্বরূপে ঐ বংশে প্রদান করিয়া ছিলেন। শুনা যায়, ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থগণ ঐ বংশে আর একটি মান্য দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই——

"কায়স্থের বিবাহ হইলে সর্ব্ব প্রথমে সর্ব্বাধিকারী বংশের লোক মাল্য প্রাপ্ত হইবেন। সভায় ঐ বংশের কেহ উপস্থিত না থাকিলে, ঐ মালা ঐ বংশের উদ্দেশে প্রদান করিতে হইবে।" এই নিয়ম কখন ঐ বংশে চলিয়া ছিল কিনা অথবা চলিয়া থাকিলে ঐ প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে কিনা, তাহা জানিতে পারি নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে সর্ব্বাধিকারী বংশের আত্মীয়, কুটুম্ব, এবং দূরস্থিত জ্ঞাতি-বর্গের উল্লেখ করিলাম না। তাহা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে, এজন্য তাহা হইতে বিরত হইলাম। বঙ্গের বহু বিখ্যাত কায়স্থ বংশের সহিত ইহাঁদের সম্পর্ক আছে।

# বাণী-সঙ্গীত।

লেখক—শ্রীপূর্ণ চন্দ্র দাস।

শ্বেত কমলের গায়
ভ্রমর ফিরে গুঞ্জ রবে ইতি উতি চায়।
শাখায় পাখী কি গায় দুলে, মলয়বয় সুবাস ঢেলে,
ঐ না বাজে মধুর বীণা প্রাণ পড়ে চ'লে—
ওরে, মায়ের পায়ের নূপুর-ধ্বনি ঐ না শুনা যায়।
খোকা খুকী সাবাস্ ছুটে আয়,
রাঙা ফুল তুলেছ ভাল সাজ-বে রাঙা পায়,
দু'সতীনে আয় মা বাণি! লক্ষ্মী সনে আয়,
এ আঁখি জল মুছে কোলে নেগো স্নেহের ছায়।

# নাম কি ?

লেখক—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,

ছেলে মেয়ের একটা-না-একটা নাম মাবাপে রাখেই রাখে। ছেলেমেয়ে ক্রমে বড় হয়, নামটাও থাকিয়া যায়। সে আপনাআপনি সেই নামে আপন পরিচয় দেয়, অন্যেও সেই নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকে, সেই নাম ধরিয়া তাহার পরিচয় দেয়। অধিক কি, মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার নামটা থাকে। চোর, ছেঁচোর, ধূর্ত্ত, বঞ্চক, কেহ কেহ আপন নাম বদ্‌লায় বটে; কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে মানুষের পরিবর্ত্তন যতই কেন হউক না, নামটা ঠিকই থাকে।

কিন্তু আমাদের জাতির নাম নাই। অন্ততঃ মা-বাপের রাখা নামটা এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখন অন্য লোকে আমাদিগকে হিন্দু বলে, আমরাও আপনা-আপনি হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিই। এই হিন্দু হইবার আগে, আমরা কি মোটেই ছিলাম না? যদি ছিলাম, তাহা হইলে আমাদের কোন নাম ছিল না, না কি? যদি ছিল, ত সে নামটা কি? আজিকালি ত মহাসমারোহে শব্দমহোদধিমন্থন-মন্ত্রঃ শুনা যাইতেছে। অশেষবিশেষ প্রকারে সাহিত্যের চর্চ্চা হইতেছে। অনেক প্রাজ্ঞ প্রত্নকল্পের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমাদের এই দুর্ভাবনাটা কেহ মিটাইয়া দিতে পারেন কি? দুর্ভাবনা এই যে, আমরা হিন্দু হইলাম কবে? হিন্দু হইলাম কেন? যখন হিন্দু হই নাই, তখন আমরা কি ছিলাম? তখন যাহা ছিলাম, এখন কি আমরা তাহা নহি?

হিন্দু—এই নামে কোন আপত্তি আছে কি না,—আপত্তি করিবার কারণ আছে কি না, তাহা জানি না। জানি এই যে, হিন্দু নামটা আমার ভাল লাগে না। ব্যাধি জীর্ণ হইয়া মজ্জাগত হইলেও, ব্যাধিকে ব্যাধি বলিয়া মনে হয়, ব্যাধি কখনও ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, হিন্দু শব্দটা যেন আগন্তুক, যেন বিজাতীয়। কাজে কাজেই আমার মনে হয় যে, হিন্দু এই নাম আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়া থাকিলেও, ইহা বুঝি মহাব্যাধি হইবে। ইহা পরিচয়ের নাম নহে; বাস্তবিক যেন অজ্ঞাত কোন কুলকলঙ্কের পশরা;—যেন আমাদের মা-বাপ ছিলেন না; অথবা আমাদের মাবাপ, আমাদের অসহনীয় দুর্বৃত্তি দেখিয়া তাঁহাদের দেওয়া আমাদের নামটি কাড়িয়া লইয়া, আমাদিগকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। আমাদের জাতির নামের পরিচয়ে কে-জানে-কেন একটু বিস্ময় হয়।

চক্ষুতে বেদ দেখি নাই, কাণে বেদ শুনি নাই, মুখে বেদ-ধ্বনি করি নাই, কিন্তু আমরা বেদের দোহাই দিই। কপিলবশিষ্ঠ-ব্যাসবাল্মিকী যেন আমাদের আত্মীয় ছিলেন বলিয়া প্রকাশ করি। এই রকমের কত নাম ধরিয়া অন্য অন্য জাতির সঙ্গে স্পর্দ্ধা করি; অথচ আমরা বলি যে, আমরা হিন্দু। বেদ কি আমাদিগকে হিন্দু বলিতেন ? কপিলবশিষ্ঠ কি হিন্দু ছিলেন ? এখন ত মুচী-মুর্দ্দফরাসও হিন্দু। মিঃ শেলী বোনার্জ্জির পিতাঠাকুর ত নিশ্চয়ই হিন্দু, বুঝিবা ডব্লিউ সি বোনার্জ্জির পুত্রবধূও হিন্দু! একটু গোল নহে কি ? কথাটা একবার ভাবিবার সময় হয় নাই কি ?

পাশ্চাত্য ত দুধের ছেলে, এখনও তাহার বয়স দুই হাজার বৎসর হয় নাই। অন্যান্য জাতির গায়ে এখনও আঁতুড়ের গন্ধ। বৌদ্ধকে যদি পর বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে সেও বড় জোর অপোগণ্ড।

ইহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, তিনি সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বোধ করি আমরা প্রৌঢ় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তবে আমাদের হিন্দু নাম কোথা হইতে আসিল ? কলিতে সবই উল্টা; সেই কলিমাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তে আঁতুড়ের ছেলে যে ম্লেচ্ছ—সেই কি আমাদের এই নাম রাখিয়াছে না কি ?

আমাদের নামটা খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যকও হইয়াছে। কেন না, কি না হইলে হিন্দু হয়, হিন্দু বলিলে ভাগ্যে ভাগ্যে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কি হইলে যে হিন্দু হয়, হিন্দু বলিলে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। নাম মাত্রেই ব্যাবৃত্তিলক্ষণ বটে; কিন্তু নামের সঙ্গে স্বরূপ লক্ষণের সম্বন্ধ থাকাই উচিত;—আর স্বরূপ সম্বন্ধ থাকিলেই ভাল হয়। স্বরূপের পরিচয়ই প্রকৃত পরিচয়। ইতরব্যাবৃত্তি হইলেও, অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে ভেদ করিতে হইলেও, কতকটা পরিচয় হয় বটে, কিন্তু ঠিক পরিচয়টাতে বুঝা যায় না! হিন্দু বলিলে এখন বুঝা যায় যে, বৌদ্ধ নহে, খ্রীষ্টান নহে, মুসলমান নহে ইত্যাদি। ইহা নহে, উহা নহে, তাহা নহে বুঝিলাম; কিন্তু বটে কি, তাহা ত বুঝিলাম না।

যে অর্থে ইদানী জাতি শব্দের ব্যবহার হয়, সে অর্থে সর্ব্বত্র জাতি প্রাকৃতিক হউক বা না হউক; প্রমাণভেদই মানুষের মধ্যে জাতিভেদের কারণ বলিয়া আমার ধারণা।

সব মানুষ এক জাতি নহে,—একথার অর্থ কি ? আমার ধারণা এই যে, কর্ম্মবিচারে ভেদ থাকাতে জাতিভেদ হয়। শরীরের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা

ত্রিবিধ, কায়িক, বাচিক, মানসিক। * এই কায়িক-বাচিক-মানসিক কর্ম্ম সকল জাতিতেই আছে, অথচ জাতিভেদও আছে। সকল জাতির সকল লোকেই এই তিন প্রকার কর্ম্মের মধ্যে যে প্রকারের যে কর্ম্ম যখনই কেন করুক না; হয় দুঃখ নিবৃত্তির উদ্দেশে; না হয় সুখ প্রাপ্তির উদ্দেশে যে কর্ম্ম করে। কর্ম্ম করিতে হয় আগে, দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ প্রাপ্তি তাহার পরে হইবার কথা। এ কারণে সময়ে অনেককে কর্ম্ম করিয়া ঠকিতে হয়। কর্ম্মের উদ্দেশ্য সফল হয় না বলিয়াই ঠকিতে হয়। এই ঠকাজিতা আছে বলিয়াই কর্ম্ম করিবার আগে সে কর্ম্মটা করা উচিত কি না, অর্থাৎ সে কর্ম্ম করিলে দুঃখনিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তি হইবে কি না, ইহা স্থির করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু কর্ম্ম যখন আগে ফল হয় পরে, তখন অমুক কর্ম্মের অমুক ফল হইবে কি না, ইহা কি প্রকারে স্থির করা যাইতে পারে। কর্ম্মফল স্থির করিবার একমাত্র উপায়,—প্রমাণ।

যাহার দ্বারা প্রমাণ হয়, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাই প্রমাণ। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শনাদির ফলে যদি যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে চক্ষু প্রভৃতি সে স্থানে প্রমাণ। ইহাকেই লোকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলে। আংশিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে সমগ্রের জ্ঞান যাহার দ্বারা করা যায় তাহাও একপ্রকার প্রমাণ। এই প্রমাণকে অনুমান বলে। আর যেখানে প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা নাই, প্রমাণেরও স্থল হয় না, সেখানে অন্তপ্রত্যকারীর বা শ্রেষ্ঠ অনুমানকারীর কথাও প্রমাণ হয়। সে প্রমাণকে বলে শব্দ-প্রমাণ। প্রত্যক্ষ অনুমান শব্দ—এই তিন প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান লইয়া মানুষে মানুষে তেমন বিরোধ হয় না। কিন্তু শব্দ প্রমাণ লইয়া ভয়ঙ্কর বিরোধ।

মানুষ যদি ইতর জন্তুর মত হইত, মানুষের মন যদি ছোট হইত, মানুষে যদি না ভাবিত, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে জাতিভেদ হইত না। এখন যে অর্থে জাতিভেদের কথা বলিতেছি, সে অর্থে হইত না। কিন্তু অল্পই ভাবুক আর অধিকই ভাবুক—মানুষে ভাবে। আবহমানকাল হইতে মানুষে ভাবিয়া আসিতেছে আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরকাল, স্বর্গ, নরক, প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যে যে ভাবের উদয় হইবার কথা, মানুষে ভাবে বলিয়াই এই সকল শব্দার্থ লইয়া এবং এই সকল শব্দের প্রতিপাদ্য পদার্থ কিছু আছে কি না তাহা লইয়া, এই সকল শব্দ প্রতিপাদ্য পদার্থ যদি থাকে ত তাহাদের স্বরূপ লইয়া, এই এই পদার্থের সহিত মানুষের কৃত-কর্ম্মের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে কি না তাহা লইয়া, মহাবিরোধ। এই বিরোধই মানুষের মধ্যে জাতিভেদের কারণ।

অন্যান্ত জাতির শব্দ প্রমাণে হয় তাহা জানা যায় না, না হয় কোন কোন বিষয়ে অন্যরূপ জানা যায়। ইহা হইতেই মতভেদ, আর মতভেদেই জাতিভেদ; প্রমাণ ভেদই, তাহাতেই বলিয়াছি যে প্রমাণ ভেদেই জাতিভেদ।

আমরা ত এখন আমাদিগকে হিন্দু বলি, অন্যেও আমাদিগকে হিন্দু বলে। এখন হিন্দু বলিলে কি আমরা এই বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, আমরা মুসলমান নহি, খৃষ্টান নহি, বৌদ্ধ নহি;—না কি আমরা কোন্ প্রমাণকে মানিয়া লইয়া আমাদের কর্ম্মবিচার করি তাহা নিশ্চয় করিয়া আমাদের জাতির পরিচয় করা উচিত।

হিন্দু—এই শব্দ হইতে আমাদের কর্ম্মের প্রমাণ কি, তাহা বুঝা যায় না। হিন্দু শব্দ সম্বন্ধে ইহাই আমার বিশেষ আপত্তি। আমার বিশ্বাস এই যে, আমরা বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, যাহারা তাহা করে না তাহারা আমাদের জাতি নহে। যাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে কেবল তাহারাই জাতি। এই কারণে আমাদের জাতির পরিচয় দিতে এমন কোন বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে ভাল হয়, যাহাতে আমাদের বেদপ্রমাণ্য স্বীকারের ইঙ্গিত বা আভাস থাকে। খ্রীষ্টান বলিলে খ্রীষ্টান জাতির খ্রীষ্ট প্রামাণ্য স্বীকারের পরিচয় পাওয়া যায়; মুসলমান বলিলে ইস্‌লাম প্রামাণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়; বৌদ্ধ বলিলে বুদ্ধ প্রামাণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের বেদপ্রামাণ্যের পরিচয়ের আবশ্যক নাই কি? অন্ততঃ তেমন একটা পরিচয় থাকিলে ভাল হয় না কি?

এমন দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে যে, আমাদেরই মধ্যে অনেকে জানেন না যে, আমরা বেদের প্রামাণ্য সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি। কিন্তু যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের জানা উচিত যে, আমাদের জন্মান্তরবাদে, আমাদের অদৃষ্টবাদ, আমাদের বর্ণভেদ, আমাদের ব্রাহ্মণ প্রাধান্য আমাদের যাবতীয় সংস্কার—অর্থাৎ গর্ভাধান; অন্নপ্রাশন; উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি সমস্তই বেদমূলক। আমাদের দেবতা; আমাদের মন্ত্র; প্রভৃতি সবই বেদমূলক। আমাদের স্মৃতিতে আমাদের পুরাণে, আমাদের তন্ত্রে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই; এই স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র আমাদের প্রমাণ। বেদার্থ লইয়া বিরোধ হয় সত্য, স্মৃতার্থ লইয়া বিরোধ হয় সত্য,—তাহার ফলে সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে, ইহাও সত্য: কিন্তু বেদের প্রামাণ্য, সম্বন্ধে কোন মতভেদ কখনও হয় নাই। বেদের বিধি-নিষেধ অবশ্যই মান্য; অর্থাৎ বেদের-বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায় হইবে, এ প্রতীতি সম্বন্ধে

কি হিন্দুজাতি ? যদি হয়, তাহা হইলে বেদমূলক বা শাস্ত্রমূলক একটা নাম আমরা স্থির করিবার চেষ্টা না করি কেন ?

আমার জিজ্ঞাসা নিবেদিত হইল ; এখন সদুত্তর পাইবার প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি।

——:o:——

# গ্রাম্যশব্দ কোষ ও তাহার প্রয়োজনীয়তা।

## লেখক—শ্রীযুক্ত রাজকুমার দেবতীর্থ।

বাঙ্গালা ভাষায় লেখ্য ও কথ্যভেদে শব্দ দ্বিবিধা। কথোপকথনে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহাকে কথ্য এবং ভাষায় যে সমস্ত শব্দের ব্যবহার দেখা যায় তাহাদিগকে লেখ্য শব্দ কহে। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির এই উভয় শ্রেণীর শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তবে সভ্যতার স্রোতে অনেক লেখ্য শব্দও কথ্য ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং কবিগণের স্বেচ্ছাচারীতায় অনেক গ্রাম্য বা কথ্য শব্দ ও গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রাম্যশব্দের ভাষায় ব্যবহার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। মহাকবি ভারত চন্দ্র ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বাঙ্গালা চলিত শব্দ ত দূরের কথা, তিনি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাদিতে বৈদেশিক শব্দেরও ব্যবহার করিয়াছেন। কেবল ভারতচন্দ্র কেন ? তাঁহার বহু পরবর্ত্তী কবিবর মধুসূদন দত্ত ( মাইকেল ) প্রভৃতি গ্রন্থকারবর্গের সাধুভাষা বহুল গ্রন্থাদিতেও অনেকানেক গ্রাম্যশব্দের প্রয়োগ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

অনাদরে সহোদরে ভাই ফোঁটা দান।
( দ্বাদশ কবিতা দীনবন্ধু মিত্র )
নাকের নাহিক চিহ্ন কেবল সুড়ঙ্গ। " "
সমুজ্জ্বল ঝলমল মুক্তাফল তাজে ॥
( পদ্মিনী রঙ্গলাল )
ব্যূহ ছেড়ে ভাগে যত দেড়ে বীর ॥ " "
ইত্যাদি।

কীর্ত্তিবাস—
পুত্রে পাঠাইলা বনে লোকে অপযশ।
( রামায়ণ )

ঈশ্বর গুপ্ত—
ফোস্কে গেল আস্কে খাওয়া,
ছেলের পানে বায় না চাওয়া,(পৌষপার্ব্বণ)
পোকাধরা শোঁকা ভার দেখে যায় রুচি।

সহদেব চক্রবর্ত্তী—
তেবাস্তর মোর বিলে,
তুমি মোরে আজ্ঞাদিলে, ( ধর্ম্মমঙ্গল )

মাণিক দত্ত—
জলে আড়িয়া বান বায়ে নিহারে ॥

যদি তাই হইল ; যদি কথ্যের ন্যায় লেখ্য ভাষাও গ্রাম্য শব্দ বহুল হইল, তাহা হইলে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বাঙ্গালা ভাষায় এক খানি চলিত অভিধান প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। কেরি, হফটন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিদ্বৎবর্গ এ বিষয়ে কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অনুমাত্র, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। বলিতে বোধ হয় বাধা নাই যে এ দীন লেখক আজ প্রায় ১০ বৎসর কাল এই কার্য্যে ব্রতী আছে। ইহার ফলে অনেক জেলায় গ্রাম্য শব্দাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে নিম্ন লিখিত জেলা কয় খানির শব্দ সংগ্রহ আজি পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হয় নাই।—(১) ময়মনসিংহ (২) মুর্শিদাবাদ (৩) পূর্ণিয়া (৪) মুঙ্গের (৫) কোচবিহার (৬) বাখরগঞ্জ (৭) দিনাজপুর (৮) ভাগলপুর (৯) বগুড়া (১০) খুলনা।

যদি সহৃদয় পাঠকগণ উপরোক্ত জেলা নিচয়ের শব্দ সংগ্রহ কার্য্যে আমাকে যথা সম্ভব উৎসাহিত করেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই। অপিচ অচিরে আমার বহুবর্ষ ব্যাপী পরিশ্রমের ফল—গ্রাম্য শব্দ কোষ সাধারণের নয়ন পথে সমুদিত হয়।

স্বার্থসিদ্ধি বা সুনাম অর্জ্জন আমার অন্যতম উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইলে আমি দীর্ঘকাল গ্রাম্যশব্দ কোষ সঙ্কলন কার্য্যে নিঃস্বার্থ ভাবে ব্যাপৃত থাকিয়া বহু ক্ষতি-বহু সময় নষ্ট-বহু অর্থব্যয় নির্ব্বিবাদে সহ্য করিতাম না, এবং তাহা হইলে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া এরূপ ভগ্ন স্বাস্থ্য ও হইতাম না।

গীতার মহাকবি বলিয়াছেন ;—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

আমিও সেই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়াছি। ক্রিয়া ফলের আশা ত্যাগ করিয়া কার্য্য পথে পর্য্যটন করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য বঙ্গ ভাষার একটী চিরন্তন অভাব সমুন্মুলিত করা। নাবিক যেমন ধ্রুব তারাকে লক্ষ্য করিয়া দিঙ্‌নির্ণয় পূর্ব্বক সমুদ্র পথে অগ্রসর হয়, আমিও তদ্রূপ এই মহোদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া ক্রিয়াবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইতে হইতে কাল সমুদ্রে অগ্রসর হইতেছি। যদি আমার এই ক্ষুদ্র শক্তিতে গ্রাম্যকোষ প্রকাশ না ঘটিয়া উঠে কি করিতে পারি ?—বিশেষ ; কার্য্য যেরূপ বহু ব্যয় সাধ্য হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সামর্থ্যে ইহার মুদ্রণাদি ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়াও দুষ্কর। তবে আমি চেষ্টা করিতেছি যে, কোন রকমে ইহাকে অচিরে প্রকাশ করিব। এক্ষণে সঙ্কলন কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করাই আমার মহাব্রত হইয়াছে। তজ্জন্য আমি প্রত্যেক জেলার শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের নিকট সহানুভূতি ভিক্ষা করিয়াছি ও করিব। সুখের বিষয় বিচারক

সংগ্রহাদি করিয়া দিয়া যথোচিত সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাঁহারা শব্দ সংগ্রহাদির দ্বারা আমার আনুকূল করিয়াছেন বা করিবেন ;—গ্রাম্যশব্দ কোষ বাহির হইলেই তাঁহারা এক এক খণ্ড পুস্তক পাইবেনই অধিকন্তু শব্দকোষের সহিত তাঁহাদিগের নামাদিও বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইবে। গ্রাম্যশব্দ কোষ সঙ্কলনের উপকারীতা বঙ্গের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন ও করিবেন সন্দেহ নাই। কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সভাও এ কার্য্যে অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। তবে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আর বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় মন্থর গতিতে কার্য্য করিলে কিছু একটা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি না। আমার পরিষদের সহিত পরিচয় হইলে বুঝিতে পারি যে আমার ন্যায় পরিষদও উক্ত কার্য্যে উদ্যোগি আছেন, তবে আমার কার্য্যারম্ভের বহুকাল পরে পরিষদের উদ্যোগ প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা হউক গুণ গ্রাহিকা গুণী জন স্বনাম বর্দ্ধিকা সাহিত্য পরিষৎ পরিচয়ের পরই আমাকে তাঁহাদিগের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আমাকে বিশিষ্ট সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করিয়া গ্রাম্যকোষ সম্পাদনের সমুদয় ভার আমার উপর ন্যাস্ত করিয়াছেন। এ সকল কথা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ অবগত আছেন।

একটী বড় পরিতাপের কথা যে ;—পরিষদের সহিত আমি শব্দকোষ সঙ্কলন কার্য্যের সকল বিষয় একমত হইতে পারিতেছি না। সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন, বি, এ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ( সহকারী সম্পাদক ) শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয় গণের অভিপ্রায় অন্যান্য অভিধানে যে সকল গ্রাম্যশব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদিগের চিরনির্ব্বাসন দিয়া আমি শব্দকোষ সঙ্কলন করি ; আমার ইচ্ছা অন্যরূপ। যখন বাঙ্গালা ভাষায় এক খানি পৃথক চলিত শব্দের অভিধান লিখিতেছি তখন তাহাকে অপূর্ণ বা অঙ্গ বৈকল্য কেন করিব ? যাহা হউক এ বিষয়ের একটা সুমীমাংসা হইবে আশা করা যায়।

আমি প্রথমে যে গ্রাম্যকোষের পাণ্ডুলিপি করিয়াছিলাম তাহা মাত্র হুগলী হাবড়া, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণার শব্দ রাশি সঙ্কুল ছিল। তাহার পর পুস্তক বিশেষের ভাষায় অন্যান্য জেলার কথ্য শব্দ সন্নিবেশ দেখিয়া অপরাপর জেলা সকলের গ্রাম্য শব্দাবলীও সংগ্রহ করিয়াছি। তন্মধ্যে কয়েক খানি জেলার কতকগুলি করিয়া শব্দ সমান্তরে উদ্ধৃত করিব, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে জেলা ভেদে গ্রাম্য শব্দ বিভিন্নতা কতদূর সংক্রামক।

এই সকল বা অপরাপর গ্রাম্য শব্দ ভাষায় যদি ব্যবহৃত হয় তাহা, হইলে কেমন করিয়া তাহা অন্য জেলা বাসীগণের বোধগম্য হইবে তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। বলা বাহুল্য আমার সঙ্কলিত অভিধানে সকল জেলার শব্দ নিবিষ্ট করিবার ইহাও একটী অন্যতম কারণ।

প্রণম্যহং প্রণমাহং প্রণম্যহং মহেশ্বর !



# নমঃ শিবায়।

রজত গিরি প্রতিম রজত বরণ।

সর্ব্বেশ্বর, সংসারের ত্রিতাপ হরণ॥

জটা-সর্প বিভূষণ ধৃত বাঘাম্বর,

সদাশিব সদানন্দ নমঃ স্মরহর॥

চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন শোভে ত্রিলোচন।

মঙ্গল নিলয় প্রভু সঙ্কট মোচন॥

কি বর্ণিতে পারি আমি মহিমা তোমার,

জোড়করে পদাম্বুজে শত নমস্কার॥

# স্বর্গীয় মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তী।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্র নাথ সোম।

শ্রীকবি কঙ্কণ কবি গৌড় কাব্যবনে,
একবৃন্তে দু'টি ফুল ফুটালে সুন্দর ;—
কি চিত্র চিত্রেছ তুমি কবি-চিত্রকর !
হৃদয়ে অঙ্কিত চির রবে এ জীবনে !
বহুকাল গত ;—কথা বহু পুরাতন,
ধ্বনিত অমৃত গীতি দামোদর কূলে ;
স্মৃতির মুকুতামালা তব কণ্ঠে তুলে,
দিলা নিজে বীণাপাণি ; হে দীন ব্রাহ্মণ !
তোমার কোমল কাব্য—সুধা নিঝরিণী,
প্রবাহিত বাঙ্গালার অন্তরে অন্তরে ;
প্রেমের মধুর ছবি—কবিত্ব মোহিনী,
জাগ্রত সুবাস যেন ফুল্ল ফুলাধরে !
ধন্য তব কবি নাম এ বঙ্গ মণ্ডলে,
কি যশঃ মুকুট শিরে শোভিত উজ্জ্বলে !

—:*—



# নিয়তি।

লেখক।—শ্রীভুপেন্দ্র নাথ সিংহ।

মূঢ় মন বৃথা কেন হতেছ উথলা—
করিবারে ইচ্ছা মত আকাঙ্ক্ষা পূরণ ?
মানবের কার্য্যে হয় নিয়তির খেলা,—
নিয়তি নিয়মে সব হয় সম্পাদন।

মানবে সদয় যদি না হয় নিয়তি,
যতই উত্তম কেন করুক সে জন,
নিশ্চয় বিফল হবে সেই মূঢ়মতি।
নিয়তি নিয়ম কভু না হয় লঙ্ঘন॥

চাতক কাতর ভাবে ডাকে বারি-দেরে,
বিন্দু বিন্দু বারি দানে মিটাতে পিয়াস ;
তবে কি জলদ তারে তুষ্ট করিবারে
বারি বিন্দু বরিষণে পূর্ণ করে আশ॥

—:*:—

## গীত।

রাগিনী ছায়ানট তাল ফেরতা—

### তিওট।

হরি নিস্তার করুণাদানে।
কাঙ্গাল ডাকে রাখ শ্রীচরণে॥
( আমি ) অতি দীনজন না জানি ভজন নিজগুণে হরি দাও শ্রীচরণ—
( দেখি শমন তাড়ন শঙ্কিত-জীবন )
( ওহে ) শমন দমন রাখ দীনজনে॥

### দশকুশী।

মনোহর বাঁকাঠামে, শ্রীরাধারে লয়ে বামে
একবার হয়ে ত্রিভঙ্গিম মুরারি
( একবার নেচে নেচে হে। )
তোমার যুগলরূপ নয়নে হেরে পাপ তাপ যাবে দূরে পাবে প্রাণ শান্তির বারি।
( ওহে শান্তিময় হে॥)

### একতালা।

গলে পরে'বন কুসুম মালা
একবার নেচে নেচে এস হে হরি,
( সাধের গোলক ছেড়ে একবার এস হে হরি। )
আমরা দেখে নয়ন শীতল করি—
( ভুবনমোহন রূপ )
করে ধরে মোহন বাঁশী।
(হৃদয় আকাশে) ( ওহে ভক্তের মন চোরা )
উদয় হও হে এসে ওহে শ্যাম কাল শশী।
হেরে মনের আঁধার দূরে যাক হে॥

### পঞ্চম শোরৎ।

যে রূপেতে বৃন্দাবনে লয়ে সব গোপীগণে,
করিলে হে লীলা লীলাময় ( ওহে হরি। )
রাধা রাধা রাধা বলে এস হরি কুতূহলে দেখিয়ে

### চৌতাল।

মাথায় সিঁথি পুচ্ছ চূড়া পরিয়ে রাখাল ধড়া,
রাখাল সনে রাখাল রাজা রাখালের বেশ ধরে।
গলায় দিয়ে বনমালা বনমালী কর খেলা,
হেরিয়ে হৃদয় জ্বালা সব যাবে দূরে॥

### ঝাঁপতাল।

নেচে নেচে এস কাছে ত্রিভঙ্গিম কানাই
হেরি ঠাম বাঁকা শ্যাম নয়ন জুড়াই,
অবহেলে হরি বলে ভব পারে যাই॥
গোপিনী রমণ বিশ্ব বিমোহন, রাধা বিনোদন মুরলী বদন।
কালীয় দমন কালের বারণ নিরদ বরণ তবগুণ গাই॥

### তিয়ট।

কংশ বিনাশন নন্দের নন্দন,
যশোদা জীবন ভক্ত প্রাণধন,
তোমায় ডাকি হে অভয় দাও দরশন-
সদা ব্যাকুল অন্তর কালের তাড়নে॥

---*---

## সমালোচনা।

**সংসার চক্র।**—সরল উপাখ্যান। মহাভারত কাব্য নাট্য প্রচরিতা প্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অকালে সংসার পরিত্যাগের পূর্ব্বে এই গল্পটী লিখিয়া গিয়াছিলেন. তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুনরায় এই পুস্তক খানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। গল্পে অসম্ভব বৈচিত্র নাই। সরল সুনীতি সঙ্গত রহস্য পূর্ণ। রহস্য পাঠামোদী পাঠকেরা এতৎ পাঠে কৌতুকলাভ করিতে পারিবেন। ইহাতে ৮ খানি সুন্দর ছবি আছে। মধ্যে মধ্যে কয়েকটী গান আছে, গান গুলির রচনা কবিত্ব পূর্ণ। মূল্য এক টাকা মাত্র।

**ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা।** পি, এম বাগচী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৩১৪

ইহাতে অনেক নূতনত্ব দেখা গেল। কতক গুলি স্বদেশী গীত, ঔষধের মুষ্টিযোগ, ক্রিকেট খেলা, দাবা খেলা, সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী, লিখিবার কালি প্রস্তুত প্রণালী, সুরভি তৈল প্রস্তুত প্রণালী, সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী, ইত্যাদি অনেক শিখিবার ও জানিবার বিষয় আছে। পঞ্জিকা খানি সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ, যিনি ইহার দোষ দেখাইয়া দিতে পারিবেন, প্রকাশক মহাশয় তাঁহাকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন। দেব দেবীরছবি গুলি উৎকৃষ্ট।

**গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা।**—১৩১৪ সালের সংশোধিত নব পঞ্জিকা, বর্ষে বর্ষে যেরূপ সুন্দর হয়, এবারে তদপেক্ষা বিশুদ্ধতা দৃষ্ট হইল. কাগজ উত্তম, ছাপা উত্তম, বাঁধাই উত্তম, ছবি উত্তম। এ পঞ্জিকাই সর্ব্বত্র বিশেষ প্রমাণ্য সকলেই তাহা জানেন নূতন পরিচয় বাহুল্য।

**খুড়িমা।** শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য এক টাকা চারি আনা। ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থকারের এক খানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে,—তাহার নাম "কনে বৌ" এই "খুড়িমা" পুস্তক খানি তাহারই উপসংহার।

যোগেন্দ্র বাবুর পরিচয় বোধ হয় বেশী দিতে হইবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে তিনি বিশেষরূপে পরিচিত। তৎ প্রণীত অনেক গুলি সুন্দর সুন্দর পুস্তক বিদ্যমান আছে। তাঁহার ভাবুকতা রচনা পারিপাট্য ভাষা লালিত্য বহুদর্শীতা সমাজ জ্ঞান সর্ব্বাংশে প্রসংশনীয়। যাঁহারা তাঁহার পুস্তকাবলী পাঠ করিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করেন। এই "খুড়িমা" পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি "কনে বউ" তিনিই খুড়িমা, খুড়া মহাশয়ের নাম শ্যাম কুমার মুখোপাধ্যায়। শ্যাম কুমার যেমন স্বধর্ম্ম পরায়ণ যেমন বদান্য যেমন আত্মীয় বৎসল, যেমন উদার প্রকৃতি খুড়িমাও সর্ব্ব প্রকারে তদনুরূপ; গুণবতী পৌরাণিক ইতিবৃত্ত দূরে রাখিলেও বলিতে হয়, খুড়িমাটি অথবা কনে-বৌটি পতিব্রতার আদর্শরূপিনী; তাঁহার গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হইয়াছিল। পুত্রের নাম দুর্গাদাস কন্যার নাম পদ্মাবতী। শ্যাম কুমারের দুটি ভ্রাতুস্পুত্র, জ্যেষ্ঠ নগেন্দ্র নাথ কনিষ্ঠ খগেন্দ্র, নগেন্দ্র নব্য উকীল খগেন্দ্র নাথ মূর্খ, খুড়িমা ঐ দুটি ভ্রাতাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। শ্যাম কুমারেরও স্নেহ তদ্রূপ, ওকালতী বুদ্ধিতে নগেন্দ্র যখন পৈত্রিক বিষয় বিভাগ করিয়া লইতে চান, পতির মুখে সেই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া খুড়িমা পতির পদতলে বসিয়া স্নেহাশ্রুধারে পতিপদ সিক্ত করিয়া ছিলেন, স্নেহাধার নগেন্দ্র খগেন্দ্র পর হইয়া যাইবে, সেই দুঃখেই অশ্রুপাত; পুস্তকের এই স্থানের

চিত্রটি এত চমৎকার যে লেখনী মুখে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। আমরা আশা করি সংসারের লোকে জন্মে জন্মে যেন এই রূপ খুড়িমা প্রাপ্ত হন। পুস্তকের আদ্যোপান্ত প্রকৃত স্বভাব চিত্রনে সুসজ্জিত। বিষয় বণ্টনের পর এই পরিবার পুনরায় একান্নবর্ত্তী হইয়া নিত্য সুখে সুখী হইয়াছিলেন। বাবু যোগেন্দ্র নাথ তাঁহার পাঠকবর্গকে যোগ্যাযোগ্য অবসরে হাসাইতে কাঁদাইতে বিলক্ষণ সুনিপুণ; তাঁহার রচনায় কাব্য সংসারের সর্ব্ব রস মূর্ত্তিমান। ৺কৃপায় তিনি দীর্ঘজীবি হইয়া থাকুন, তাঁহার মধুময় লেখনী অক্ষয় হউক। অসময় হইলেও একটি কথা বলিতে আমরা বাধ্য দুর্গাদাসকে অকালে স্বর্গে পাঠাইয়া পতি বৎসলা পতিব্রতা খুড়িমার প্রাণে বেদনা দেওয়া যোগেন্দ্র বাবুর উচিত কার্য্য হয় নাই।

**বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ।**—শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রাচীন কালাবধি এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ রাজা মহারাজা ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত উপাধিতে সমলঙ্কৃত, মহাভারতী মহাশয় এই পুস্তকে সেই সকল বংশের বিবরণ সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ণনা গুলি সুপাঠ্য ও বিশদ হইয়াছে, তবে কথা এই যে, প্রাচীন রাজবংশ বলিতে হইলে, যাঁহারা পুরুষানু ক্রমে রাজা, তাঁহাদিগের বংশই সম্মান স্থলে উল্লেখ যোগ্য বাদসাহেরা এবং ইংরাজ বাহাদুর যাঁহাদিগকে উপাধি দিয়া রাজা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন, কতকগুলি নূতন, যাঁহারা প্রাচীন তাঁহাদের বংশকেই রাজবংশ বলা কর্ত্তব্য, যাঁহারা নূতন তাঁহাদের বংশাবলীকে ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে রাজবংশীয় বলিয়া সম্মান দেওয়া হইবে; ইহাই ন্যায় সঙ্গত, যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা রাজা ছিলেন না, তাঁহাদিগকে রাজবংশ উদ্ভব বলিলে, এক প্রকার পরিহাস বুঝায়। এই পুস্তকে ৪৭টি রাজবংশের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীমৎ মহাভারতী মহাশয় প্রত্যেক রাজবংশের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আলোচ্য পুস্তকে সুচারুরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম।

**যাত্রা।**—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ অধিকারী মহাশয়ের যাত্রা শ্রবণ করিয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তিনি স্বয়ং কৃতী পুরুষ বিশেষতঃ তাঁহার তুল্য বেহালাবাদক আজ কাল দুর্লভ। সম্প্রতি "অজামিল উদ্ধার" ও "ভরত-চরিত" নামে দু'টি নূতন পালা বিরচিত হইয়াছে। পালা দুটি সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। যোগ্য যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা অভিনীত হয়। সাজ পোষাকও উৎকৃষ্ট।

——:০০০:——




"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৫শ বর্ষ। } ১৩১৩ সাল। ফাল্গুন { ৮ম সংখ্যা।

# পরম কল্যাণ গীতা।

লেখক—শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।

## আহারীয় দ্রব্য ব্যবস্থা।

আপনারা বিচার পূর্ব্বক অন্ন, ফলাদি যাহা আহারের যোগ্য, অর্থাৎ যাহা আহারে শরীরে কোন ব্যাধি ও কষ্ট না হয়, সেই বস্তু বিচার পূর্ব্বক আহার করিবেন। যাহা খাইবার যোগ্য নহে এবং যাহাতে পীড়া ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হ্রাস হয় এমত বস্তু খাইবেন না। নিরুপায়ে যাহা পাইবে তাহাই খাইবে ইহাতে কোন দোষ নাই। অখাদ্য বস্তু খাইলে অর্থাৎ মৎস্য মাংসাদি ভোজন ও মাদক দ্রব্য সেবনে বুদ্ধি নষ্ট হয়, এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ বলবান ও ভোগ আদির বাসনা ও

কাম, ক্রোধাদি বৃদ্ধি হয়। একারণ পরব্রহ্ম সম্বন্ধিয় সূক্ষ্মভাব বুঝিবার ক্ষমতা হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নেশা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমোদ বোধ হয়। যখন নেশা ছাড়িয়া যায় ও তাহা পাইবার উপায় না থাকে, তখন এক দণ্ড নেশার দ্রব্য না পাওয়ায় হায় হায় ও পরাধীন হইয়া অন্যের নিকট ভিক্ষা করিতে হয়; যদি কেহ না দেয়, তবে পাষণ্ড তাহা চুরি করিতে বাধ্য। ইহাতে বুদ্ধি জড় হইয়া যায়। এইরূপে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়া সমস্ত বুঝিয়া লইবে। মায়া ব্রহ্ম মনুষ্যদিগকে মায়াতে ভুলাইয়া নানাপ্রকার নেশা দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া পরব্রহ্ম ব্রহ্মনেশা হইতে বিমুখ করিবার জন্য। যাহাতে ইহারা বাহিরের নেশায় ভুলিয়া সত্য নেশা পূর্ণপরব্রহ্মে জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে বিমুখ থাকিবে।

পূর্ণপরব্রহ্মের নেশা পান করিলে সে নেশা সদা এত আনন্দ হয়, তাহার সীমা থাকে না, এবং সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তাহা কদাচ ছাড়িলেও ছাড়ে না, তাহা বিনা পয়সার নেশা অমূল্য রতন। উহা পান কর। অপর নেশাখোরকেও নিন্দা করিও না, সমস্ত আপনারাই আত্মা; যাহার যে রুচি হয়, সে তাহা খায় ও পান করে। ইহা পরব্রহ্মের লীলা। উহাকে মিষ্ট বচনে বুঝাইয়া দিবে, দুঃখদায়ক বোধ হইলে আপনিই ক্রমে ছাড়িয়া দিবে। আপনি বিচার করিয়া দেখুন, যে, ঈশ্বর মনুষ্যের জন্য নানা উত্তম উত্তম পদার্থ উৎপন্ন করিয়া দিয়াছেন, তাহা ভোজন করিলে চিত্ত শান্ত হইবেক, পরব্রহ্মে নিষ্ঠা হইবেক, সূক্ষ্মভাব বোঝা যাইবেক, জ্ঞান স্বরূপে নির্ভয় থাকিবেক। উত্তম উত্তম পদার্থ ভাত, রুটী, পুরি মিষ্টান্নাদি ভোজন কর। জিহ্বার কিঞ্চিৎ আস্বাদনের জন্য কেন অভক্ষ্য পদার্থ খাইবে। যাহা মনুষ্যের আহার মনুষ্য তাহাই খাইবে। যাহা পশুগণের আহার উহা পশুই খাইবে। এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

## আহারের সময়।

দিবা অথবা রাত্রি নয়টা কিম্বা দশটার ভিতর যদি আহার করেন, তাহা সাত্ত্বিক অর্থাৎ দেবতার আহার বলা হয়, বেলা দুইপ্রহর পর্য্যন্ত রাজসিক আহার বলাযায়, দুই প্রহরের পরে আত্মাকে কষ্ট দিয়া আহার করা তামসিক, চণ্ডালী, পশুর আহার বলিয়া জানিবেক। অর্থাৎ আত্মাকে কষ্ট দিয়া আহার করা কর্ত্তব্য নহে। দিবারাত্রে যে সময় ক্ষুধা ও পিপাসা পায়, ঐ সময় কিছু আহার করা আবশ্যক। ইহাই সাত্ত্বিক আহার জানিবেক। আত্মাকে প্রসন্ন রাখা উচিৎ। গীতাতে লেখা আছে যে

"আয়ুঃ সত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যা আহারাঃ সাত্বিক প্রিয়াঃ ॥" ইত্যাদি

পরমায়ু, উৎসাহ, বল, মনঃ—প্রসন্নতা, রুচি যে দ্রব্য বৃদ্ধি করে, যে দ্রব্য আরোগ্য জনক, স্নেহযুক্ত যে দ্রব্যের সার অংশ শরীরে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, যে দ্রব্য অতি সুদৃশ্য হয়, এরূপ দ্রব্য আহার সাত্বিক লোকের প্রিয় আহার। তিক্ত অম্ল, উষ্ণ আদি রাজসিক আহার, আর পচা দুর্গন্ধ যুক্ত আহারকে তামসিক (রাক্ষসী) আহার বলা যায়।

ভোজন করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভোজন করিবেন যথা—"পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপায় স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভোজন করিলে, সকল দেবদেবী অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানকেই, ভোজ্য বস্তু নিবেদন করা হইবেক। তদ্ব্যতীত সমস্ত জীবের প্রতি দয়া করা আর প্রত্যক্ষ চেতন জীব ইত্যাদিকে ও অগ্নি ব্রহ্মকে আহার দিবে। যদি বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশ মান থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া বলিবে যে, হে মাতাপিতা আহার প্রস্তুত আছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন এই বলিয়া প্রণাম করতঃ স্বপরিবারে আহারাদি করিবে, তাহা হইলেও ভগবানের ভোগ হইবেক। সূর্য্য অপ্রকাশ থাকিলে উপরি লিখিত মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে স্মরণ পূর্ব্বক সকলে আহার করিবেক।

## আহারের সময় নিরুপণ।

কোন কোন মতাবলম্বী বালকস্বরূপ অবোধ ব্যক্তি দিবসে আহার করেন, রাত্রিতে আহার করেন না। আর কেহ কেহ রাত্রিতে আহার করেন, দিবসে আহার করেন না। কেহ বাম নাসায় স্বর বা নিশ্বাস বহিলে ব্যাধিভয়ে আহার করেন না, ও দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহার সময় আহার করিলে, ব্যাধি হইবেক না ভাবিয়া দক্ষিণ স্বরে আহার করেন। দক্ষিণ স্বরের মতাবলম্বি বামস্বরে আহার করেন না। কিন্তু বিচার করিয়া দেখুন যে, উভয় স্বর অর্থাৎ নিশ্বাস তো আপনারই যে কোন স্বর থাকুক না কেন, যখন ক্ষুধিত হইবেন, তখন আহার না করিলে তাহার কষ্ট নিজেই ভোগ করিতে হইবে। যখন ভোজন করিতেছেন তখন আপনারই সুখ হয়। উহাতে কোন স্বর আপনার মিত্র আর কোন স্বর আপনার শত্রু? আপনার শরীর যে উভয় হাত আছে, তাহা আপনারই আছে,

উভয় স্বর একই বিরাট পরব্রহ্মের অর্থাৎ বিরাট পরব্রহ্মই অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ দক্ষিণ স্বর এবং চন্দ্রমাজ্যোতিঃ বামস্বর। যে স্বরে এবং রাত্রে অথবা দিবসে যখনই ক্ষুধা পিপাসা পায় তখনই খাইবে ও পান করিবে। কোন সন্দেহ করিবে না। যদি দক্ষিণ স্বর ও চলে আর ক্ষুধা না পায়, কিম্বা সামান্যরূপে ক্ষুধা পায় তবে সে সময় ভোজন করিলে অন্ন পরিপাক হইবে না, এবং ব্যাধি হইবেক। আর যখন ক্ষুধাপায় সে সময় যে কোন স্বর চলুক না কেন তখনই ভোজন করিয়া লইবে, উহাতে অন্নরস অপরিপাক জনিত ব্যাধি হইবে না; ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন। উভয় স্বরই পরব্রহ্ম জানিবেক।

## আহারের ফলাফল।

রাজা প্রজা বিচার করিয়া দেখ যে, সর্ব্বদা অসৎ পদার্থে তোমাদের চিত্ত আসক্ত থাকে। তোমরা অহঙ্কার করিয়া বলিয়া থাক যে আমি ইহা উহা আহার করি। অমুক এরূপ আহার করিতে পারে না। কিন্তু তোমরা বিচার করিয়া দেখ না যে, বাল্য অবস্থা হইতে বৃদ্ধ অবস্থা পর্য্যন্ত কত পরিমাণে আহার করিতেছ তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু যদ্যপি তোমারা আহার করিতে তাহা হইলে তোমাদিগের স্থূল শরীর পর্ব্বতাকার হইত বা মৃত্যুকালে এ শরীর হইতে জীবাত্মা পর্ব্বতাকার হইয়া বাহির হইতেন, কিন্তু আহারীয় দ্রব্য সকলের কিছুই তোমরা আহার করিতেছ না, ইহা কেবল মুখ ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পৃথিবীর সংযোগে মাটি হইতেছে। এবং যে জল পান করিতেছ তাহা মুখ ইন্দ্রিয় হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার জলরূপ হইতেছে। আহারীয় দ্রব্যের সার অংশ দ্বারা তোমাদিগের নূতন রক্ত অস্থি মাংসাদি হইতেছে,এবং পুরাতন মাংসাদি শরীরের ময়লা রেত ইত্যাদি রূপে নির্গত হইতেছে। ইহা কাহার বোধ আছে যে কেহই আহার করে না, অথচ আহার করা বোধ হয়। যেরূপ স্বপ্নে আহারাদী বোধ হইয়াও জাগ্রতে তাহা মিথ্যা বোধ হয়। এই প্রকার বোধ যুক্ত ব্যক্তি আহার করা সত্ত্বেও আহার করে না। যদ্যাপি তোমরা প্রকৃত পক্ষেই আহার করিয়া ভস্ম করিতে তাহা হইলে পৃথিবী ও সমস্ত অন্নশেষ হইয়া যাইত, কারণ সৃষ্টির আদ্যান্ত নাই। তোমাদিগের শরীরের পুষ্টি বর্দ্ধনের জন্য পরব্রহ্ম এই সকল অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। পরিমাণ ও প্রয়োজন মত ভোগ কর তাহাতে হানি নাই কিন্তু মনে ভোগের অহঙ্কার করিও না।

# তাৎকালিক স্ফুটগতিঃ।

## লেখক—শ্রীরাধাবল্লভ আচার্য্য জ্যোতিস্তীর্থ।

তাৎকালিক স্ফুটগতি সম্বন্ধে কোন বিষয় বলিতে হইলে স্ফুটগতি (Apparent motion.) কি মধ্যগতিই (Mean motion,) বা কি তাহাই পূর্ব্বে বলা আবশ্যক। যে বৃত্তে গ্রহগণের ভোগ স্থান (Apparent Longitude) স্ফুটগতির পরিমাণ নির্ণীত হয়, তাহাকে ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) বলে। সূর্য্য ঐ ক্রান্তি বৃত্তে ভ্রমণ করেন। অন্য গ্রহগণের পৃথক্ পৃথক্ ভ্রমণের বৃত্ত (কক্ষ) আছে। কোন কালে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেধ দ্বারা (observation.) গ্রহ দিগের ভোগ স্থান নির্ণয় করিলে গ্রহগণ প্রতি দিবসের স্বীয় স্বীয় আসমান গতিতে চক্র ভ্রমণ করতঃ যে দিবস যে সময়ে সেই পূর্ব্ব নির্ণীত ভোগ বিন্দুতে আগমন করেন, তাহাও বিশেষ নিপুণতা সহকারে বেধ দ্বারা (observation) নিরূপণ করিলে, উভয় বেধ কালের অন্তর্গত সাবন দিন সংখ্যা দ্বারা বৃত্তের পরিমাণকে (৩৬০ অংশকে) ভাগ করিলে সেই সেই গ্রহের মধ্যগতির পরিমাণ স্থির হইয়া থাকে। সুতরাং মধ্য গতি প্রতি দিবসই সমান। কিন্তু গ্রহগণ প্রতি দিবস এইরূপ সমান গতিতে ভ্রমণ করেন না। প্রতি দিবসই তাঁহাদিগের গতির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই পরিলক্ষ্যমাণ ভিন্ন গতিই তাঁহাদিগের সেই সেই দিনের স্ফুটগতি। প্রত্যহ স্ফুটগতি ও মধ্য গতির অন্তরকে ফল বলে। ফল ও প্রত্যহ ভিন্ন হইয়া থাকে। ক্রান্তিবৃত্তে গ্রহদিগের উচ্চ স্থান অনুসারে মধ্যগতি হইতে স্ফুটগতি অধিক বা অল্প হইয়া থাকে। স্ফুটগতি অধিক স্থলে ফল মধ্যগতিতে যোগ করিতে হয়। স্ফুটগতি অল্প স্থলে ফল মধ্যগতিতে বিয়োগ বা হইয়া থাকে। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ও পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন সুতরাং তাঁহাদের এক মাত্র মন্দ ফলসংস্কারেই স্ফুটগতি হইয়া থাকে। কিন্তু ভৌমাদি পঞ্চ গ্রহ পৃথিবী ও সূর্য্য উভয়কেই প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন এ জন্য তাঁহাদিগের প্রথমতঃ মন্দ ফল সংস্কার দ্বারা মন্দ স্পষ্ট গতি (হেলিয় সেন্ট্রিক মোসন্) স্থির করিয়া তৎপরে শীঘ্র ফল সংস্কার দ্বারা পৃথিবী কেন্দ্রীয় গতি অর্থাৎ স্ফুটগতি স্থির করিতে হয়।

মন্দ ফল = ভুজ জ্যা মন্দকেন্দ্র × মন্দ পরিধি।

গ্রহ দিগের উচ্চ স্থান হইতে মধ্য গ্রহের অন্তরকে (দূরতা) মন্দকেন্দ্র বলে। পরম মন্দ ফলের জ্যা তুল্য ব্যাসার্দ্ধে যে পরিধি হয় তাহাই মন্দ পরিধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

$$\therefore \text{গতি ফল} = \frac{\text{ভুজ জ্যা মন্দকেন্দ্র গতি} \times \text{মন্দ পরিধি}}{৩৬০}।$$

গ্রহদিগের এক দিনের উচ্চ স্থানের গতি মধ্য গতির অন্তরকে অথবা অদ্যতন মন্দকেন্দ্র ও শ্বস্তন মন্দ কেন্দ্রের অন্তরকে মন্দ কেন্দ্র গতি বলে। মন্দকেন্দ্র গতির ভুজ জ্যা সাধনের জন্য ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তি আচার্য্যগণ অদ্যতন মন্দকেন্দ্রের ভুজ জ্যা সাধনে যে ভোগ্য খণ্ড অর্থাৎ জ্যান্তর তদ্বারা মন্দকেন্দ্র গতিকে গুণ করিয়া ২২৫ দ্বারা ভাগ করতঃ ভাগ ফলকে মন্দকেন্দ্র গতির জ্যা বলিয়াছেন। তাহার অনুপাত এই, যদি ২২৫ কলা চাপে (Are) ভোগ্য খণ্ড পাওয়া যায় তবে মন্দকেন্দ্র গতি কলায় কি? লব্ধ ফল মন্দকেন্দ্র গতির জ্যা (sine)

$$\therefore \text{গতি ফল} = \frac{\text{ভোগ্য খণ্ড} \times \text{মন্দকেন্দ্র গতি} \times \text{মন্দ পরিধি}}{২২৫ + ৩৬০}।$$

যদাহ শ্রীপতিঃ

মন্দকেন্দ্র গতি রর্ক চন্দ্রয়ো
জ্যান্তরেন গুনিতা হৃতাশ্বয়া।
জীবয়া স্ব পরিণাহ তাড়িতা
খর্ত্তুরাম বিহৃতা গতেঃ ফলম্।

লল্লাচার্য্যও ধী বৃদ্ধি দে এই রূপই বলিয়াছেন কেবল তিনি $\frac{\text{(মন্দ পরিধি)}}{৩৬০}$

ইহাকে ৪॥ দ্বারা অপবর্ত্তন করিয়া $\frac{\text{স্ফুট গুণ ক}}{৮০}$ রাখিয়াছেন।

যদাহ ল্লাচার্য্যঃ।

জ্যা খণ্ড কেন গুণিতা মৃদুকেন্দ্র জেন ভুক্তি গ্রহস্ত শরযুগ্মযমির্বিভক্তা
ক্ষুন্না স্ফুটেন গুণকেনা হৃতাথ গৈর্লিপ্তাগতেঃ ফলমৃণং ধনমুক্তবচ্চ।

সূর্য্য সিদ্ধান্তেঽপি

গ্রহ ভুক্তেঃ ফলং কার্য্যং গ্রহ বগ্মন্দকর্ম্মণি

স্বমন্দ পরিধিক্ষুণ্না ভগণাংশোদ্ধৃতা কলাঃ ।
কর্কাদৌতু ধনং তত্র মকরা দা বৃণংস্মৃতং ॥

কিন্তু ভাস্করাচার্য্য সেই দিবসের মন্দকেন্দ্র গতি স্থানীয় ভোগ্য খণ্ড সাধন করিয়া গতি ফল স্থির করিয়াছেন। তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন এবং পাশ্চাত্য গণিতের ( Differential calculus ) চল গণিত নিয়মে গতি ফল সাধন করিলেও তাহাই হয়। ভাস্করাচার্য্য প্রদর্শিত যুক্তি এই যে স্থানে ত্রি জ্যা তুল্য কোটি জ্যা সে স্থানে ভোগ্য খণ্ড ২২৫। ত্রি জ্যা অপেক্ষা কোটি যেমন যেমন ন্যূন হইবে তেমন তেমন ভোগ্য খণ্ডও ন্যূন হইবে। অতএব কোটি জ্যা দ্বারা অনুপাত করিয়া ভোগ্য খণ্ড সাধন করা যাইতে পারে। যদি ত্রি জ্যা তুল্য কোটি জ্যাতে ভোগ্য খণ্ড ২২৫ তবে ইষ্ট মন্দকেন্দ্র কোটি জ্যাতে কি

$$\frac{\text{২২৫} \times \text{কো জ্যা মন্দকেন্দ্র}}{\text{ত্রি জ্যা}} = \text{ভোগ্য খণ্ড ।}$$

সূর্য্য সিদ্ধান্ত প্রভৃতি মতের গতির মন্দ ফল সাধনের ভোগ্য খণ্ড স্থানে

$$\text{গতি ফল} = \frac{\text{ভোগ্য খণ্ড} \times \text{মন্দকেন্দ্র গতি} \times \text{মন্দ পরিধি ।}}{\text{২২৫} \div \text{৩৬০}}$$

ভাস্করাচার্য্য সাধিত এই ভোগ্য খণ্ড গ্রহণ করিলে

$$\text{গতিফল} = \frac{\text{২২৫} \times \text{কো জ্যা মন্দকেন্দ্র} \times \text{মন্দকেন্দ্র গতি} \times \text{মন্দ পরিধি}}{\text{২২৫} \times \text{ত্রি জ্যা} \times \text{৩৬০}}$$

$$= \frac{\text{কো জ্যা মন্দকেন্দ্র} \times \text{মন্দ পরিধি} \times \text{মন্দকেন্দ্র গতি ।}}{\text{৩৬০} \times \text{ত্রি জ্যা}}$$

$$\frac{\text{কো জ্যা মন্দকেন্দ্র} \times \text{মন্দ পরিধি ।}}{\text{৩৬০}} \text{—মন্দকেন্দ্র কোটি ফল ।}$$

$$\therefore \text{গতিফল} = \frac{\text{মন্দকেন্দ্র কোটি ফল} \times \text{মন্দকেন্দ্র গতি}}{\text{ত্রি জ্যা}}$$

মধ্য গ্রহ স্থান সেই গ্রহের উচ্চ স্থানে প্রথম পদাদিতে ( মেষাদিতে ) হইলে মধ্য গতি হইতে স্ফুটগতি পরম গতি ফল তুল্য ন্যূন হইয়া থাকে। নীচ স্থানে অর্থাৎ তৃতীয় পদাদিতে ( তুলাদিতে ) মধ্য গতি হইতে স্ফুটগতি পরম গতি ফল তুল্য অধিক হয়। কক্ষামধ্যগত তীর্য্যগ্রেখা ও প্রতিবৃত্তের সম্পাত স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয় পদাদিতে ( কর্কাদিতে ) চতুর্থ পদাদিতে ( মকরাদিতে ) গতি ফলের অভাব

হয়। অর্থাৎ মধ্য গতি তুল্যই স্ফুটগতি হইয়া থাকে। সুতরাং মধ্য গ্রহ কর্কাদি ষড় রাশিস্থ হইলে গতি ফল মধ্য গতিতে ধন করিতে হয় এবং মৃগাদি ষড় রাশিস্থ হইলে বিয়োগ হইয়া থাকে।

যদাহ ভাস্করাচার্য্যঃ।

কোটী ফলঘ্নী মৃদুকেন্দ্র ভুক্তি স্ত্রি জ্যো দ্ধৃতা কর্কিমৃগাদি কেন্দ্রে
তয়া যুতো না গ্রহ মধ্য ভুক্তি স্তাৎ কালিকা মন্দ পরিস্ফুটাস্তাৎ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ও পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন এ জন্য তাঁহাদের কেবল গতির মন্দ ফল মধ্য গতিতে সংস্কার করিলেই স্ফুটগতি হইয়া থাকে। কিন্তু ভৌমাদি পঞ্চ গ্রহ পৃথিবী ও সূর্য্য উভয়কেই প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন এ জন্য তাঁহাদিগের প্রথমতঃ গতির মন্দ ফল সংস্কার করিয়া মন্দ স্পষ্ট গতি (হেলিয় সেণ্ট্রিক মোসন্) স্থির করিয়া তাহাতে গতির শীঘ্র ফল সংস্কার করিলে স্ফুটগতি বা পৃথিবী কেন্দ্র সম্বন্ধীয় গতি হয়। গতির শীঘ্র ফল সাধন প্রণালী লল্ল শ্রীপতি প্রভৃতির মতে—

$$\text{শীঘ্র ফল} = \frac{\text{জ্যা শীঘ্র কেন্দ্র} \times \text{শীঘ্রপরিধি} \times \text{ত্রি জ্যা}}{৩৬০ \times \text{শীঘ্র কর্ণ}}$$

$$\therefore \text{গতির শীঘ্র ফল} = \frac{\text{জ্যা শীঘ্র কেন্দ্র গতি} \times \text{শীঘ্র পরিধি} \times \text{ত্রি জ্যা}}{৩৬০ \times \text{শীঘ্র কর্ণ}}$$

লল্লাচার্য্য শ্রীপতি প্রভৃতি মতে

$$\text{জ্যা শীঘ্র কেন্দ্র গতি} = \frac{\text{ভোগ্য খণ্ড} \times \text{শীঘ্র কেন্দ্র গতি}}{২২৫}।$$

$$\text{গতি ফল} = \frac{\text{ভোগ্য খণ্ড} \times \text{শীঘ্র কেন্দ্র গতি} \times \text{শীঘ্র পরিধি} \times \text{ত্রি জ্যা}}{২২৫ \times ৩৬০ \times \text{শীঘ্র কর্ণ}}$$

অতএব শ্রী পতি

দ্রাক্ কেন্দ্র ভুক্তিরথবা গুণিতা স্বভোগ্য মৌর্ব্ব্যা শরাকৃতি
হৃতা পরিণাহ নিঘ্নী। চক্রাংশকৈ রপি হৃতা গুণিতা ত্রিমৌর্ব্ব্যা
কর্ণোদ্ধৃতা ভবতি শীঘ্র ফলং হি ভুক্তেঃ।

লল্লাচার্য্য ও এই রূপ করিয়াছেন কেবল তিনি $\frac{\text{শীঘ্র পরিধি}}{৩৬০}$ কে ৪॥ দ্বারা

অপবর্ত্তন করিয়া শীঘ্র পরিধি ÷ ৪॥ ইহাতে যেফল হয় তাহার নাম গুণক রাখিয়া

লল্ল মতে গতি ফল = ভোগ্য খণ্ড × শীঘ্র কেন্দ্র গতি × ত্রি জ্যা × স্বীয় গুণক
২২৫ + ৮০ + শীঘ্র কর্ণ

তদ্ যথা লল্লঃ

তদ্বর্জ্জিতা স্বচল তুঙ্গগতিঃ স্ব ভোগ্য খণ্ডাহতা শরযমাক্ষি হৃতা হতাচ।
স্বেন স্ফূটেন গুণ কেন খনাগ ভক্তা ত্রি জ্যা হতা শ্রুতি হৃতাশু ফলং গতেঃস্যাৎ
মন্দ স্ফূটা গ্রহ গতিঃ স্ফূটতামু পৈতি যুক্তোনিতা বিরহিতা সহিতা মুনাচ।

কিন্তু ভাস্করচার্য্য এই প্রকারে গতির শীঘ্র ফল আনয়ন করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, অদ্যতন ও শ্বস্তন শীঘ্র ফলের অন্তর গতির শীঘ্র ফল। গতির শীঘ্র ফল লল্ল প্রভৃতির ন্যায় মন্দ ফল বৎ আনয়ন করিয়া কর্ণানু-পাত করিলেও অনেক অন্তর হইয়া থাকে। কেন্দ্র গতি জন্য ফল সাধন করিলে তাহা বাস্তবিক গতির শীঘ্র ফল তুল্য হয় না। অদ্যতন শীঘ্র কেন্দ্র ভুজ ফল ও শ্বস্তন শীঘ্র কেন্দ্র ভুজ ফলের অন্তরকে ত্রি জ্যা দ্বারা গুণ করিয়া অদ্যতন কর্ণ দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল হয় শ্বস্তন কর্ণ দ্বারা ভাগ করিলে তাহার অন্যথা হয়। কর্ণ দ্বয়ের অন্তর অল্প হইলেও ভাজ্যের বহুত্ব হেতু অনেক অন্তর হইয়া পড়ে। এ জন্য এই প্রকারের গতি ফল আনয়ন না করিয়া মহামতি মৎ পাণ্ডতগণ অন্য প্রকারের গতির শীঘ্র ফল আনয়ন করিয়াছেন।

তথাচ ভাস্করঃ।

অদ্যতন শ্বস্তন শীঘ্র ফলয়ো রন্তরং গতেঃ শীঘ্র ফলং স্যাৎ। তচ্চ যথা মান্দং গতি ফলং গ্রহ ফল বদানীতং তথা যত্না নীয়তে কৃতেহপি কর্ণানুপাতে সান্তর মেব স্যাৎ। যথা ধী বৃদ্ধি দে। নহি কেন্দ্র গতিজ মেব ফলয়ো রন্তরং স্যাৎ কিন্ত্বন্যদপি। অদ্যতন ভুজ ফল শ্বস্তন ভুজ ফলান্তরে ত্রি জ্যা গুণেহদ্যতন কর্ণ হৃতে যাদৃশং ফলং স্যাৎ ন তাদৃশং শ্বস্তন কর্ণ হৃতে স্বল্পোন্তরেহপি কর্ণে ভাজ্যাস্য বহুত্বাদ্বহ্বন্তরং স্যাদিত্যেতদানয়নং হিত্বা ত্বস্মহা মতি মন্তিঃ কল্পিতম্।

তাহাদিগের মত এই।

শীঘ্র কেন্দ্র গতিঃ = শীঘ্রোচ্চ গতিঃ — মন্দস্পষ্ট গতিঃ

শীঘ্রোচ্চ গতিঃ — শীঘ্র কেন্দ্র গতিঃ = মন্দ স্পষ্ট গতিঃ। *

মন্দস্পষ্ট গতি — গতির শীঘ্র ফল = স্ফূট গতিঃ।

শীঘ্রোচ্চ গতি — ফল সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দ্র গতি = স্ফূট গতিঃ।

কেন্দ্র গতিরেব স্পষ্টীকৃতা। তস্যাং হি শীঘ্রোচ্চগতিঃ শোধিতায়াং গ্রহস্ত-গতিঃ স্ফুটৈবাবশিষ্য ত ইতি।

কেন্দ্র গতি স্পষ্টীকরণ প্রকার এই।

ভূ কেন্দ্র হইতে মন্দ স্পষ্ট গ্রহ স্থান পর্য্যন্ত শীঘ্র কর্ণ। যদি শীঘ্র কর্ণাগ্রে এই কেন্দ্র গতি জ্যা তবে ত্রি জ্যাগ্রে কি। ফল স্পষ্ট কেন্দ্র গতি জ্যা।

$$\text{কেন্দ্র গতি জ্যা} = \frac{\text{ভোগ্য খণ্ড} \times \text{কেন্দ্রগতি}}{২২৫}$$

$$\text{স্পষ্ট কেন্দ্র গতি জ্যা} = \frac{\text{ভোগ্য খণ্ড} \times \text{কেন্দ্রগতি} \div \text{ত্রি জ্যা}}{২২৫ = \text{শীঘ্রকর্ণ}}$$

$$\text{কেন্দ্র গতি} = \text{শীঘ্রোচ্চ গতিঃ} - \text{মন্দ স্পষ্ট গতিঃ}$$

$$\text{স্পষ্ট কেন্দ্র গতি জ্যা} = \frac{\text{ভোগ্য খণ্ড} \div (\text{শীঘ্রোচ্চ গতি} = \text{মন্দ স্পষ্টগতি})\ \text{ত্রি জ্যা}}{২২৫ = \text{শীঘ্র কর্ণ}}$$

এ স্থলে ফলের অল্পতাহেতু জ্যা ও চাপ সমান কল্পনা করা হইয়াছে।

লল্ল ও তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্য গণ এই প্রকারে ও স্ফুটকেন্দ্র গতি সাধন ও তাহা শীঘ্রোচ্চ গতি হইতে হীন করিয়া স্ফুটগতি সাধন করিয়াছেন।

যথা লল্লঃ।

(মন্দস্ফুটা ভবতি) তদ্ রহিতাশু ভুক্তিঃ ত্রি জ্যা হতা স্বচল কর্ণ হৃতা শু চাপ ভোগ্যজ্যয়া বিগুণিতা বিহৃতাস্ব মৌর্ব্ব্যা। লব্ধং ত্যজেৎ স্বচল তুঙ্গ গতেঃ সদৈব শেষং স্ফুটা ভবতি চ গ্রহ ভুক্তিরেবং॥

কিন্তু তাঁহারা কেহই তাৎকালিক স্ফুট ভোগ্য খণ্ড সাধন করেন নাই। ভাস্করাচার্য্য তাৎকালিক স্ফুটভোগ্য খণ্ড সাধন করিয়াছেন তাহা এই। যদি ত্রি জ্যা তুল্য শীঘ্র ফল কোটি জ্যাতে ২২৫ কলা জ্যা হয় তবে ইষ্ট শীঘ্র ফল কোটি জ্যাতে কি। যাহা হইবে তাহাই শীঘ্র ফল স্থানের ভোগ্য খণ্ড।

$$\text{ভোগ্য খণ্ড} = \frac{২২৫ + \text{কো জ্যা শীঘ্র ফল}}{\text{ত্রি জ্যা}}$$

$$\text{কো জ্যা শীঘ্র ফল} = \text{জ্যা}\ (৯০ - \text{শীঘ্র ফল})$$

$$\text{ইষ্ট ভোগ্য খণ্ড} = \frac{\text{জ্যা}\ (৯০ - \text{শীঘ্র ফল}) \times ২২৫}{\text{ত্রি জ্যা}}$$

$$= \frac{\text{ভোগ্য খণ্ড} \times \text{শীঘ্র কেন্দ্র গতি} + \text{ত্রি জ্যা।}}{২২৫ + \text{শীঘ্র কর্ণ}}$$

এই ভোগ্য খণ্ড স্থলে ভাস্করাচার্য্য প্রদর্শিত ভোগ্য খণ্ড গ্রহণ করিলে

$$\text{স্পষ্ট কেন্দ্র গতি জ্যা} = \frac{\text{জ্যা ( ৯০ — শীঘ্র ফল )} \times ২২৫ \times \text{শীঘ্র কেন্দ্র গতি} \times \text{ত্রিজ্যা}}{২২৫ = \text{শীঘ্র কর্ণ} + \text{ত্রি জ্যা}}$$

$$\frac{\text{জ্যা ( ৯০ — শীঘ্র ফল )} \times \text{শীঘ্র কেন্দ্র গতি}}{\text{শীঘ্র কর্ণ}}$$

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

$$\text{স্ফূটগতি} = \text{শীঘ্রোচ্চ গতিঃ} - \text{স্পষ্ট কেন্দ্র গতিঃ।}$$

$$\text{স্ফূটগতিঃ} = \text{শীঘ্রোচ্চ গতিঃ ঃ০}\frac{\text{জ্যা ( ৯০ — শীঘ্র ফল )} \times \text{শীঘ্র কেন্দ্র গতিঃ}}{\text{শীঘ্র কর্ণ}}$$

অতএব ভাস্করাচার্য্যঃ

ফলাংশ খাঙ্কান্তর শিঞ্জিনী ঘ্নী দ্রাক্‌কেন্দ্র ভুক্তিঃ শ্রুতিহৃদ্ বিশোধ্যা স্ব শীঘ্র ভুক্তেঃ স্ফূটখেট ভুক্তিঃ।

চল গণিত ( Differential calculus ) নিয়মে ও ইহার সম্যক্ উপপত্তি সাধন করা যাইতে পারে। ইহাতে জানা যায় প্রাচীন আচার্য্যগণও কিয়ৎ পরিমাণে চল গণিতজ্ঞ ছিলেন তাহার সাধন প্রকার ও এই প্রকার ছিল।

——০*০——

# বিবাহ—বাণিজ্য।

বার বার কত বার এতৎ সম্বন্ধে কত আন্দোলন হইয়াছে। বড় বড় সংবাদ পত্রে প্রধান প্রধান মাসিক পত্রে কত বড় বড় প্রবন্ধ বিলিখিত হইয়াছে, বড় বড় সামাজিক বক্তা মহাশয়েরা কত সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন, তথাপি আমাদের হতভাগ্য সমাজের লোকের একটুও চৈতন্য হইতেছে না, তাঁহারা যেন বধির হইয়া নয়ন মুদিয়া রহিয়াছেন, আন্দোলনের বিষয়টা কেবল লেখকের কালি কলমে আর বক্তাদের সরস রসনার বচনে বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। অহো! টাকা কি চমৎকার পদার্থ! টাকার মোহিনী শক্তি কি ভয়ঙ্করি! অর্থ লোভী লোকেরা টাকার লোভ সামলাইতে একেবারেই অক্ষম! বিষয় বিশেষে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া

সহস্র দোষ দেখাইয়া দিলেও তাঁহাদের চক্ষু ফুটিয়া উঠে না, লোভী লোকে চক্ষুষ্মান হইয়াও অন্ধ, শ্রবণ বিশিষ্ট হইয়াও বধির।

বাজারে যেমন পণ্য দ্রব্য বিক্রিত হয়, গৃহ-পালিত চতুষ্পদ পশু যেমন বেশী দামে বিক্রিত হয়, প্রকাশ্য নিলামে যেমন ভূম্যাদি গৃহাদি পশ্বাদি ও অপরাপর দ্রব্যাদি উচ্চ ডাকে বিক্রিত হয়, পুত্রের বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে, পুত্রের পিতারা সেই রূপে উচ্চ দরে পুত্র বিক্রয় করিতেছেন! চতুষ্পদ পশুর মধ্যে বড় বড় হস্তির মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই দৃষ্টান্তে ধন বানের পুত্রগণের দাম খুব বেশী হয়।

আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা অগ্রগণ্য, বড় আক্ষেপের বিষয়, আধুনিক বৈবাহিক বাণিজ্যের উপদ্রব্যে এই উভয় শ্রেষ্ঠ জাতিই অগ্রে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, বর্ত্তমান সমাজে যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে ঘোরতর সভ্যাভিমানি সমাজ সংস্কারক; তাঁহারা বল্লালি কৌলিন্য প্রথার নিন্দা করেন, দুরাচার কুলীন সন্তানেরা সেই সুপবিত্র কৌলিন্য প্রথাকে ক্রমে ক্রমে নিন্দনীয় করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের বহু দোষাবহ বহু বিবাহ বাদ দিলে কুলীনেরা এখনকার মত কন্যা কর্ত্তাগণকে ফকির করিত না, সামান্য মর্য্যাদা পাইলেই কন্যাকর্ত্তার কন্যা দায় উদ্ধার করিতেন, ধনবানেরা দরিদ্র মূর্খ কুলীন পুত্রকে কন্যা দান করিয়া প্রতিপালন করিতেন। এখন যাহা হইতেছে, তাহাতে কন্যাকর্ত্তাগণের রক্ত মাংস রক্ষ হওয়া ভার, ব্রাহ্মণ কায়স্থ গৃহের সকলেই ধনশালী, পাগলেও এমন কথা বলিতে পারে না, ধনবানের সংখ্যা অঙ্গুলি দ্বারা গনণা করা যায়। পনের আনা অপেক্ষাও অধিক লোক সামান্য দরিদ্র, কতক গুলি মধ্যবিত্ত তাঁহাদের গৃহে কন্যা জন্মিলে বিবাহের সময় তাঁহাদিগকে প্রায় সর্ব্বশান্ত হইতে হয়, ধনবানে ধনবানে কুটম্বিতা হইতেছে, টাকা কম হইবে বলিয়া ধনবান বরকর্ত্তারা গরিবের সহিত কুটম্বিতা করিতে রাজী নহেন, যেখানে রাজী হন, সেই খানেই গরীবের সর্ব্বনাশ! গরিবে গরিবে সম্বন্ধ হইলেও সর্ব্বত্র নিস্তার নাই, গরীবের ছেলে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের একপেশে দুইপেশে হয়, তবেই তাহার দাম বাড়িয়া উঠে। এই কু-প্রথাটা বড় বেশীদিন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ইংরাজী বিদ্যার বিস্তারের সঙ্গে ইংরাজী সভ্যতা বিস্তারের ছায়ায় ছায়ায় জ্ঞান বিস্তারের উজ্জল জ্যোতির প্রতাপে প্রতাপে বর গুলির মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

ব্রাহ্মণের ঘরে যারা কুলিন ছিলনা, তাহারা অনেক টাকা দিয়া মেয়ে কিনিয়া

তাহারাও এখন কন্যা কর্ত্তার ঘাড় ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া কন্যা গ্রহণ করিতেছে, কন্যা বিক্রয় কারিরা পূর্ব্বে ভদ্র সমাজে পাঁটি বেচা নামে হেয় হইয়া থাকিত, শাস্ত্র বাক্য প্রমাণে শুক্র বিক্রয় কারিরা পতিত হইয়া যাইত, অধিক কি, শাস্ত্র বলে, যে দেশে শুক্র বিক্রয় হয়, সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত। এখন তবে কি হইতেছে, ভারি ভারি ভুঁড়ি ওয়ালা লোকেরা শুক্র উৎপন্ন পাঁটা ও হাতি কত উচ্চ দরে বিক্রয় করিতেছেন, তাহারা কেন পতিত হন না। তাঁহাদের দেশ কেন পতিত হয় না. এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? যাঁহাদের কাছে উত্তর পাইবার আশা, তাঁহারাই শুক্র ব্যবসায়ী ওরফে পাঁঠা ব্যবসায়ী হাতি ব্যবসায়ী পুত্র ব্যবসায়ী!

কথা গুলি কিছু রূঢ় রূঢ় হইতেছে। কর্ত্তারা অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। দেখা গেল মিষ্ট কথায় কাজ হইল না, সহজ কথায় ফল ফলিল না, উপদেশ বাক্যে কাহারও চৈতন্য হইল না, কাজে কাজেই একটু মাত্রা চড়াইতে বাধ্য।

বরের দাম ছাড়া আরও অনেক প্রকারে বিবাহের ব্যয় বাড়িয়াছে গাত্রহরিদ্রার সওগাদ ও ফুল শয্যার সওগাদ, বহন করিয়া এক এক স্থলে প্রায় অর্দ্ধ সহস্র বাহক উপস্থিত হয়, ব্যাপারটা সাধারণ নয়, তাহাতে যে কত ব্যয় যাঁহারা হিসাব জানেন, তাঁহারা বুঝিয়া লইবেন, তাহা ছাড়া গ্যাসের রোশনাই বিদ্যুতের রোশনাই বাতির রোশনাই তেলের রোশনাই আতস বাজি, বিলাতী ধরণের তুরী ভেরী জয় ঢাকের বাদ্য, হরেক রকম সং তামাসা বাইনাচ, খ্যামটা নাচ, পাঁচালী ইত্যাদি না হইলে এখনকার ধনবানের বিবাহ মানায় না, বিবাহটা হয়ত মঞ্জুরই হয় না। যাঁহাদের অর্থ নাই, কালের গতি দেখিয়া লোক লজ্জার খাতিরে বিবাহ অসিদ্ধ হইবার ভয়ে তাহারাও ঐ সকল অঙ্গের কিছু না কিছু জোগাড় করিতে বাধ্য হয়।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিবাহ একটি প্রধান সংস্কার, ধন লোভী বরকর্ত্তা গণের দুর্জ্জয় লোভ নিবন্ধন এই সুপবিত্র সংস্কারটি কত দূর কলুষিত হইতেছে, ভাবিয়া দেখুন। ইংলণ্ডের ধন লুব্ধ নাগরেরা বহু ধনের উত্তরাধিকারিণী ধনবতী নাগরী খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য পায়ে ধরিয়া উপাসনা করে, আমাদের দেশের সাধারণ বরের পক্ষে ততদূর স্বাধিনতা এখনও ঘটে নাই, বরের পিতা ধনবানের কন্যা অন্বেষণ করিয়া প্রচুর অর্থ পাইবার চেষ্টা করেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ধনবানেরা গরীবের গৃহ হইতে পুত্রবধূ আনয়নে নারাজ। এখন বিবেচনা করুন, ধনবানে ধনবানে বৈবাহিক কুটুম্বিতা, অবিচ্ছেদে চলিলে গরীবের ঘরে বরের অভাব হইবে কি না? একপক্ষে অভাব যদি না ধরেন, কন্যার অভাবও ভাবিয়া রাখিতে পারেন, সকল বর যদি বড় দিকে ঝোঁকে তবে ছোট গুলির গতি

ক হইবে ? সহরের কায়স্থ সভায় একবার—একবার কেন ; কয়েক বার প্রস্তাব উঠিয়া ছিল, উত্তর রাঢ়ীয় দক্ষিণ রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ও বঙ্গজ কায়স্থের মধ্যে বিভিন্নতা না রাখিয়া বৈবাহিক সংস্কারে পরস্পর চারি শ্রেণী মিলন করা হউক। প্রস্তাবটি কেবল প্রস্তাবেই পরিণত হইয়া রহিয়াছে, বস্তুত কার্য্যে ফলপ্রদ হইলে মন্দ হয় না। ব্রাহ্মণ সমাজেও রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ঐরূপ একত্র মিলনে আদান প্রদান হওয়া উচিত কি না ? ভাল কি না ? সুবিবেচক ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

হাঁ, ভাল কথা।—পুত্র বিক্রয় নিবারণ পক্ষে এক জন বিদূষক একটা উপায় কল্পনা করিয়াছিলেন। কল্পনাটি এই যে, মূল্য দিয়া যে ব্যক্তি যে বস্তু খরিদ করে সে বস্তু তাহারই নিজস্ব হয়। পিতা অথবা মাতাকে মূল্য দিয়া যে দেশে যাহারা চাকর খরিদ করে, সে দেশে সেই প্রকারে বিক্রীত পুত্রেরা ক্রয় কর্ত্তার ক্রীতদাস হয়, তাহাদের উপর তাহাদের মাতা পিতার আর কোনও দাবী দাওয়া থাকে না, কন্যার বিবাহের জন্য বরকর্ত্তাগণকে দুই হাজার পাঁচ হাজার অথবা আট হাজার টাকা মূল্য দিয়া যাঁহারা বর খরিদ করেন, তাঁহারা সেই বর গুলিকে তাহাদের মাতা পিতার নিকটে ফেরত না পাঠাইয়া যদি কৃত জামাতা বলিয়া দাবী করেন, টাকা দিয়া কিনিয়াছি, তোমাদিগকে কেন দিব ? আইনানুসারে জোর করিয়া যদি এমন কথা বলেন, তাহা হইলে মন্দ হয় না, বোধ করি সেরূপ দাবী হইলে, বর বিক্রয় বন্ধ হইতে পারে গোটাকতক দৃষ্টান্ত পড়িলেই পুত্র বিক্রয় কারিদের চৈতন্য হওয়া সম্ভব, বিদূষকের মস্তিষ্ক সম্ভূত এই কল্পনাটুকুতে বেশ রং আছে।

—:০:—

# মধুমেহ ও রক্তামাশয়ে দেশী আমড়ার উপকারিতা।

## লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্তহেমচন্দ্র সেন এম, ডি।

দেশী আমড়াকে সংস্কৃত ভাষায় "আম্রাতক্" কহে। ইহার বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম (Spondias mangifera) ইহা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থানেই জন্মে। বিলাতী আমড়ার সহিত ইহার ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। উহা দেশী আমড়া

অপেক্ষা অনেক মিষ্ট। কচি আমড়া এবং ইহার বৌল অম্ল এবং কষায়াস্বাদ যুক্ত ও রুচিকর। ইহার পক্ক ফল মধুরাম্ল, স্নিগ্ধ এবং পিত্ত ও কফ নাশক। পক্ক ফল হইতে সরবৎ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অন্নে রুচি বাড়ে, উদরের বায়ু প্রকোপ কমে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, বলিয়া ইহা বলকারক এবং দেহের ক্ষয় দূর করে। ইহার পিত্ত প্রশমন করিবার শক্তি আছে বলিয়া দাহ রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। বাত পিত্তজনিত অজীর্ণ রোগে পক্ক আম্রাতকের ন্যায় ঔষধ অতি বিরল। ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয়। শ্লেষ্মা জনিত রোগে ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে। ইহার বীজের ( আঁটির শাঁসের ) উপকারিতা—পাকা দেশী আমড়ার আঁটির শাঁস ৪।৫ রতি মাত্রায় প্রাতে ১ বার করিয়া সেবন করিলে মধুমেহ ( Diabetes ) রোগে বিশেষ উপকার হয়; মধুমেহের তৃষ্ণা, গাত্রদাহ এবং অনেক পরিমাণে মূত্র ত্যাগ তিন দিনের মধ্যেই হ্রাস হইতে থাকে। আমি অনেক স্থলে অহিফেন এবং অহিফেনের সারাংশ, জামের বীজ এবং অন্যান্য ফলপ্রদ ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া এই ঔষধে ফল দেখিয়াছি। ইহা সকল রোগীর পক্ষে সমান ফলপ্রদ না হইলেও অনেকে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। আমড়ার বীজের শাঁস খাইতে সুস্বাদু। ইহাতে এক প্রকার তৈল আছে, আমার বোধ হয় এই তৈলই ইহার বীর্য্য। এই তৈল শুষ্ক হইয়া গেলে এই শস্য হইতে আর সেইরূপ উপকার দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাদের তিন দিনে উপকার না হয়, তাহাদের এই ঔষধ কিছু দিন ধরিয়া সেবন করা উচিত। ইহাতে কোন বিষাক্ত পদার্থ নাই সকলেই নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। শীতের শেষে দেশী আমড়া পাকে, এই সময় ইহার আঁটি সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত, এই ঔষধ ব্যবহার কালীন আহার সম্বন্ধীয় কোন কঠিন নিয়ম পালন করিবার আবশ্যক নাই। (Diabetes) রোগাক্রান্ত অনেকব্যক্তি ভূসির রুটি ( Bran bread. ) এবং মাটা তোলা দুগ্ধ ( Skimmed milk ) সেবন করিয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হন, ভূসি হইতে সার গ্রহণ করা মানবের জঠরাগ্নিরসাধ্য নহে। ইহা পশু জাতির খাদ্য। অধিক কাল এই পদার্থ সেবন করিলে ক্ষুধামান্দ্য এবং অতিসার রোগ জন্মে, ভূসির রুটিতে যে ময়দার অংশ থাকে তাহাতেই দেহ পুষ্ট হয়, কিন্তু অধিক ভুসি থাকে বলিয়া অগ্নিমান্দ্য হয়, সেই কারণে ময়দা হজম করিবার শক্তিও কমিয়া যায়।

কোনও শ্বেতসার ( starch ) যুক্ত পদার্থে চিনিতে পরিণত না হইয়া রক্তে

পাঁউরুটি, রুটি প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য সেবন করেন, তাঁহাদের ও সেই সকল আহারের শ্বেতসার ( Staroh ) চিনিতে পরিণত হয়। Diabetes রোগে কেবল মাংস আহার করিলেও উহা চিনিতে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। এই জন্য Diabetes রোগীর আহার চিনি শূন্য করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। শরীরের কোনও cell ( জীবাণু ) চিনির অভাবে পুষ্টহইতে পারে না। শরীরের জীবনী শক্তি বিকাশের জন্য যতটুকু চিনির আবশ্যক, তাহার অধিক চিনি সেবন করিলে সেই চিনিতে অপকার হয়। পুনশ্চ যদি আহার হইতে চিনি একেবারে বন্ধ করা হয় তাহা হইলেও রোগী অচৈতন্য হইয়া ( Diabetes coma ) হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। যাহারা চিনি হইবার ভয়ে শ্বেতসার যুক্ত আহার ( চাউল ময়দা প্রভৃতি ) ত্যাগ করিয়া কেবল মাংসের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদেরও সেই মাংস ভোজনের জন্য প্রস্রাব প্রস্তুত করিবার গ্রন্থি ( বৃক kidney ) এবং যকৃৎ বিকৃত হইয়া যায়। এই জন্য মধুমেহ রোগে মিশ্রিত আহার করাই শ্রেয়। একজন রোগী অহিফেনের সার কোডিন্ ( Codein ) সেবন করিয়া কিছু উপকার পায়। কিন্তু তাহার প্রস্রাবের চিনি কিছু কমিয়া একেবারে নির্দ্দোষ হইল না। সে হতাশ হইয়া আর অধিক দিন চিনি বর্জ্জন না করিয়া রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন সেবন করিতে লাগিল। ইহাতে অপকার না হইয়া, তাহার সকল যন্ত্রনা ক্রমশঃ জুড়াইয়া গেল। আজ কালকার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে আলুতে যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসার থাকিলেও ইহা Diabetes রোগে সুপথ্য। Diabctes রোগে সকল প্রকার আহার করা চলে। কায়িক পরিশ্রম করিয়া এবং যথাসাধ্য ভ্রমণ করিয়া মধুমেহ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও সমস্ত আহারীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারেন। Engine যে রূপ কয়লা দগ্ধ হয়, কায়িক পরিশ্রম দ্বারা Diabetes রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরেও সেই রূপ শর্করা দগ্ধ হইয়া যায়। অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগ এবং অধিক শুক্র নষ্ট করিলেও এই রোগ বৃদ্ধি পায়। অধিকাং মধুমেহ রোগ অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়; সেই জন্য এ রোগে গুরুপাক ভোজন একেবারে নিষেধ। ঘৃতের সহিত অন্ন পাক করিয়া সেবন করিলে ( ঘী ভাত ) মধুমেহ রোগী বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হন। দুগ্ধ এবং ঘৃতের সহিত অন্ন পাক করিয়া যে চরু প্রস্তুত হয়, তাহাও এই রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

## রক্তামাশয়ে আমড়ার গাছের ছালের উপকারিতা।

অংশ আধ তোলা পরিমাণে লইয়া, টাট্‌কা দধির সহিত পেষণ করতঃ রোগীকে দিবসে দুই তিনবার সেবন করাইলে, দুই তিন দিনের মধ্যে বিশেষ উপকার হয়। রক্তামাশয় রোগ সময়ে বিশেষ কষ্টপ্রদ হইয়া উঠে। প্রারম্ভে চেষ্টা করিলে এই রোগ সহজেই আরোগ্য হয়। ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে আমি অনেক রক্তামাশয়-গ্রস্ত রোগীকে দধির সহিত দেশী আমড়ার ছাল ব্যবহার করাইয়া আরোগ্য করিয়াছি। অনেক দরিদ্র লোক বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পায়, পাঠকগণ এই সুলভ ঔষধের সংবাদ জন সাধারণকে জ্ঞাপন করিয়া, চিকিৎসা করাইতে অক্ষম রোগীগণের পরম উপকার সাধন করেন, ইহাই প্রার্থনা। বেল-পোড়া, ছাগল দুগ্ধ, ভাতের বা চিড়ের মণ্ড, এই ঔষধ সেবন কালে ব্যবহার করিলে শীঘ্র উপকার দর্শে। কোড়নের মেতির বীচি-চূর্ণ দধির সহিত একটি মারবেলের মত বড়ী পাকাইয়া দিনের মধ্যে দুই তিনবার প্রয়োগ করিলে, শ্বেত এবং রক্তামাশয় গ্রস্তরোগী অনেক সময় দুই তিনদিনের মধ্যেই আরোগ্য হয়। আমি অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, জলবার্লি কি জল এরারুট অপেক্ষা ভাতের মণ্ড চিড়ার মণ্ডতে আমাশয় রোগে অধিক উপকার হয়, তরল পদার্থ দিলে প্রায় অতি শীঘ্র অপরিপক্ক অবস্থায় মলদ্বার হইতে নির্গত হইতে দেখা যায়।

---

# কৃষির অবনতির কারণ।

লেথক—শ্রীজগদ্বল্লভ রায়।

ভূমি কর্ষণে উপার্জ্জিত দ্রব্যের ইষ্টানিষ্টের প্রতি দেশের সর্ব্ব বিষয়ের ফলাফল নির্ভর করে। কৃষিজীবীর সচ্ছল অসচ্ছল অবস্থার সঙ্গে সর্ব্ববিধ কর্ম্মের হিতাহিতের নিয়ত সম্বন্ধ, যে দেশের যে বৎসর কৃষিজাত দ্রব্যের অবস্থা উন্নত বা অবনত, সে দেশে সে সময়ে সকল প্রকার সাংসারিক কার্য্য উন্নত বা অবনত হইয়া থাকে। কৃষির অনুশীলন বিনা আমাদের শরীর ও মনের পরিচালনা হয় না, কৃষিজাত দ্রব্যের সঙ্গে বাণিজ্যের নখমাংস সম্বন্ধ। কৃষির উন্নতি বিনা বাণিজ্যের উন্নতি হয় না, *কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন না হওয়া অথবা অতিরিক্ত রপ্তানী* উভয়েরই চরমফল দুর্ভিক্ষ। শিল্পকার্য্য কৃষি ও বাণিজ্যের অন্তর্গত, চাকরী ভিক্ষাদি অপ্রধান উপায় গুলি কৃষি ও বাণিজ্যেরই আনুসঙ্গিক, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল উন্নতি-করকার্য্য আমরা

দেখিতে পাই, সে সকলের মূল "কৃষি"। ফলতঃ কৃষি ধন্য, কৃষি পূজ্য, কৃষিই মানবের জীবন। কৃষির এই শ্রেষ্ঠতা এবং ইহাতে যে কৃষাণের ও কায়িক শ্রমের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক, ইহা সে কালের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীর ও অবিদিত ছিলনা, এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে, শাস্ত্রালোচনাদি উচ্চ মানসিক বৃত্তি পরিচালনেরও অবসর থাকিবে না, বোধ হয় এই সকল কারণে তৎকালের সামাজিক নিয়মে এইকার্য্য ইহাদের পক্ষে অবিধি কার্য্য ছিল; দেবার্চ্চনা শাস্ত্রালোচনা ও চাকরী ইহাদের প্রশংনীয় ও করণীয় কার্য্যছিল; এই সকল কার্য্যে ইহাদের দাবি দাওয়া ছিল, তাই ইহারা পুরুষানুক্রমে সমাদরে এই সকল অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রম জনক কার্য্য করিতেন, যাঁহাদের জমি জায়গা থাকিত, তাঁহারা তাহা ভাগসাঁজায় বিলি করাইয়া তদ্বারা কৃষিজাত দ্রব্য লইতেন; ইহারা এত অর্থ লোলুপ ছিলেন না, তখন বিলাস ও তামসিক ব্যয় এত অধিক ছিলনা, দ্রব্য সকল সুলভ ছিল, সুতরাং ইহারা স্ব স্ব উপার্জ্জিত অর্থে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতেন, শ্রমোপজীবিগণের মধ্যে আদিম কৃষি জীবিরাই কৃষিকার্য্য করিত, অন্যান্যেরা শিল্প বাণিজ্য এবং স্ব স্ব জীবিকা বৃত্তি দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, সর্ব্ব সাধারণে এত আগ্রহের সহিত কৃষিকার্য্য করিতেন না।

এখন উল্লিখিত সমাজ বিধির তেমন কোন নিয়ম নাই, শাস্ত্রালোচনাদির তাদৃশ্য পুরস্কার নাই, চাকরীর সেরূপ দাবি দাওয়া সম্মান দূরের কথা—চাকরী পাওয়া দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, শিল্প বাণিজ্যে বাধা পড়িয়াছে, স্ব স্ব জীবিকা বৃত্তিও রহিত হইতেছে, অথচ সর্ব সাধারণের অর্থ লালসা বিলাস ও তামসিক ব্যয় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, সুতরাং কি বুদ্ধিজীবী কি শ্রমোপজীবী সকলেই এখন এই কৃষিকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনঃসংযোগ করিয়াছেন। কৃষি লক্ষ্মী তাদৃশ্য সুপ্রসন্না হউন বা না হউন, আমাদের এই সকল পল্লী "ধেনো দেশ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে! বিধাতা যদি সৃষ্টি বৈচিত্র্যে তিন ভাগ জল একভাগ স্থল না করিতেন, যুগ মাহাত্ম্যের জন্যই হউক বা আমাদের শাসন জন্যই হউক যদি এরূপ অনাবৃষ্টি অযথা বৃষ্টি কীট পতঙ্গাদি দ্বারা কৃষির বিঘ্ন না করাইতেন, আমরাও যদি কৃষি কার্য্যের ও কৃষিজাত দ্রব্যের যথাবিহিত নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন এবং প্রচলিত উপাধি লাভ অট্টালিকা নির্ম্মাণ, কন্যাদায় মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক ভাবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে শান্তি-প্রিয়া কমলাকে চঞ্চলা না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের এই সকল পল্লী ধেনোদেশের পরিবর্ত্তে ভারত কৃষিভাণ্ডার

উপাধিতে ভূষিত হইয়া অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিত। যে সকল বুদ্ধিজীবী আমাদের শিক্ষা দীক্ষা আচার অনুষ্ঠান যাবতীয় কার্য্যে শীর্ষ স্থানীয়, তাঁহাদের দ্বারা এই দেশ ব্যাপক কৃষিকার্য্য যথা বিহিত নিয়মে, সুসম্পাদিত হইলে সমাজের ও সাধারণের মহোপকার সাধিত হইবে, এরূপ আশা করাযায়? এদিকে করুণাকর গবর্ণমেণ্ট দেশ হিতৈষী ধনবানেরা ও কৃষিতত্ত্ব বিদেরা কৃষির উন্নতি কল্পে 'মডেল ফর্‌ম' বা আদর্শক্ষেত্র 'কৃষি ব্যাঙ্ক' বা গ্রাম্য যৌথ ভাণ্ডার 'ক্যানেল' বা খোদিতখাল, কৃষিবিদ্যালয় সংস্থাপন এবং কৃষি বিষয়ক নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কার্য্য প্রণালী সকল উদ্ভাবন পূর্ব্বক সর্ব্ব-সাধারণের সম্যক হিত সাধনেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ—পল্লীতে ইহাদের এই সকল সদুপদেশ ও যন্ত্রাদি কার্য্যে সম্যক ব্যবহৃত হইতেছে না; ইহাও পরিতাপের বিষয়—কৃষি সংক্রান্ত বিধাতৃ শাসনের প্রতিকার করা আমাদের সাধ্যাতীত অথচ কোন কোন উপায় অবলম্বন করিলে এইকার্য্যে আশানুরূপ ফললাভ হইবে, সে সকলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা অনুষ্ঠান আন্দোলন না করিয়া কৃষির মধ্যে কেবল ধান চাষ করিয়া প্রভূত-অর্থ সঞ্চয় করিব, এই বাসনা এইক্ষণে অনেকেরই অন্তঃকরণে বলবতী হইয়াছে।

একমাত্র কার্য্য কি ব্যবসায় সর্ব্ব সাধারণের জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন হইলে সেই কার্য্য বা সেই ব্যবসায় তাদৃশ সুফল হয় না; যদি এই কার্য্য ও ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল সংস্থাপন না থাকে, তবে ইহাতে আরও অশান্তির বৃদ্ধি হয়; পল্লীবাসীর এই একমাত্র বহুল প্রচলিত ধান-চাষ এখন জীবিকার প্রধান অবলম্বন তায় আবার এই কার্য্য সুসম্পাদন জন্য একাল যাবৎ কোন নিয়ম সংস্থাপন হইতেছে না, কৃষি জীবিরা এখন এ বিষয়ে উদাসীন, সুতরাং এই কৃষি কার্য্য সেই অবাধ শিল্প বাণিজ্য, সেই অবাধ চাকরী অপেক্ষা অধিকতর অশান্তি জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শান্তিই যাবতীয় কার্য্য ও ব্যবসায়ের উন্নতির দ্বার স্বরূপ; পল্লীতে এখন এই ভেদাভেদ রহিত বা অবাধ কৃষিকার্য্যের সম্যক প্রচলন হওয়ায় অন্ধ, খঞ্জ, অবিরা স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, অশিতি বর্ষীয় অপুত্রক বৃদ্ধ, ভিক্ষোপজীবি বৈষ্ণব এবং কুলি বাউরি ধাঙ্গড় প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণী কৃষি জীবির ও ইহাদের দানোপভোগ রহিত ধন ধান্যের অভাব নাই। এইধান চাষের জন্য কৃষিজীবি মাত্রেরই স্ব স্ব প্রতিবেশীর সহিত সদ্ভাব তো দূরের কথা—গুরুশিষ্য, পিতা পুত্রে ভ্রাতায় ভ্রাতায়ও অসদ্ভাব জন্মিয়াছে,

নিত্যসহচর হইয়া পবিত্র পল্লী আজি কৃষি পিশাচের লীলা ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে, অনেকে এই একমাত্র ধান চাষের জন্য বিবাদ কলহে মাতিয়া ধন মান দুই হারাইতেছেন, বহুপোষক ন্যায় পথ:শ্রয়ী নিরীহ কৃষি জীবিরা কৌশলী না হওয়ায় স্ব স্ব ধান চাষে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না ; ধান চাষের সহায়তা কল্পে ধান-জমি ও কৃষাণ সংগ্রহের জন্য যাঁহারা অসচ্চরিত্র প্রতিনিধি দ্বারা নানা প্রলোভনে বিমুগ্ধ করিতেছেন, যাহারা কৃষাণের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন গৌরব বিবেচনা করিতেছেন, যাহারা ধান টাকা কর্জ্জদিয়া ও ইহাদিগকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিতে পারিতেছেন, সেই সকল ফিকির ফন্দীপটু কৃষিজীবিই এই ধান-চাষে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিতেছেন। এই ধান-চাষই মোকদ্দমার সংখ্যা শনৈঃ শনৈঃ দেশ মধ্যে বৃদ্ধি এবং নিরীহ ব্যক্তির পল্লীবাসীর অপ্রবৃত্তি অশান্তি জনক কার্য্যের অন্যতর কারণ:; কেন এরূপ সকল অশান্তি হইয়া এই কার্য্যের অবনতি ঘটিতেছে ইহা অদৃষ্ট বাদীর অবশ্যম্ভাবীর মধ্যে পরিগণিত না করিয়া কৃষিজীবী মাত্রেরই তাহা বিবেচ্য ও আলোচ্য।

অদ্য এই প্রবন্ধে পল্লীর ভাগ্য বিচারের আলোচনা না করিয়া আমরা কৃষির উন্নতি কল্পে কৃষির কয়েকটী অবনতির কারণ করুণাকর গবর্ণমেণ্টের ও সর্ব্ব-সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি আমাদের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা পল্লী কৃষিজীবী সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিতেছি না। পল্লীর অতি অল্প সংখ্যক কৃষিজীবী যথাবিহিত নিয়মে কৃষি কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রকাশিত কথাগুলি বর্ত্তিবেনা।

১। বাবু কৃষিজীবীর সংখ্যাধিক্যতা হলধারী কৃষিজীবীর অল্পতা।

আমাদের বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতীয়ের অবস্থা নিতান্ত হীন হইলেও ইহাদের মধ্যে স্বহস্তে হল চালনার প্রথা নাই, কৃষির অন্যবিধ পরিশ্রমেও ইহারা অক্ষম অপটু, সুতরাং ইহাদের মধ্যে এখন যাঁহারা কৃষাণ দ্বারা কৃষিকার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগকে বাবু কৃষিজীবী, যাহারা স্বহস্তে হল চালনাদি করিয়া কৃষিকার্য্য করে, তাহাদিগকে হলধারী কৃষিজীবী নামে অভিহিত করা যাইতেছে। আমাদের বৃদ্ধ কৃষি পরাশর বলিয়াছেন,—"সমর্থৈশ্চ কৃষিকার্য্যা স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ"—সমর্থ ব্যক্তিই কৃষিকার্য্য করিবে, কৃষিকার্য্য স্বয়ং পর্য্য-বেক্ষণ করিবে ; কিন্তু বাবু কৃষিজীবিগণের এখন এই কৃষিকার্য্যে সামথ্যও নাই, পর্য্যবেক্ষণও নাই ; ইহারা প্রায়ই রুগ্ন, কৃষি চর্চ্চায় নিয়মিত শরীর পরিচালন

বজায় রাখিতে না ছোড় বন্দা,—তাই অধিকাংশ সময় প্রবাসে, কুত্রাপি চাষে; কতকগুলি ধান টাকার মহাজনি ডিগ্রিদারি তহশীলদারি, গোলাগুলির আড্ডা এই সকল অশান্তি জনক কার্য্য ও ব্যবসায়কে ধান-চাষের জমি ও কৃষাণ সংগ্রহের ফাঁদ পাতিতে ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং ইহারা অনেকে স্ব স্ব বাড়ীতে এক-একটী প্রতিনিধি রাখিতেছেন, ইহারা আবার কৃষাণের দ্বারা ইহাদের কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন এমন কি ধান্যের মরাই বা জালাতে ধান্যগাছ আয় ব্যয়ের ভার ও বাবু কৃষিজীবিরা এই সকল প্রতিনিধির উপর অর্পণ করিয়া—'জোরু গোরু ধান্ তিন নজর আন্'—এই প্রবাদের সার্থকতা রক্ষা করিতেছেন না, ইহারা চাকরী প্রভৃতির চক্রে পড়িয়া দিন দিন দৈহিক দুর্ব্বলতায় ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। হলধারী কৃষিজীবিরা কৃষির যাবতীয় পরিশ্রম স্বয়ংই করে, সুতরাং ইহাদের দ্বারা কৃষিকার্য্যের সম্যক্ উন্নতি হয়। কিন্তু পল্লীতে এখন ইহাদের মধ্যে যাহারা কিছু সঞ্চয় পসার প্রতিপত্তি করিতেছে, তাহারা কেহ সম্মান রক্ষার্থে কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্ম উপাসক ( ভণ্ডতপস্বী ) ছলে; কেহ মোক্তারি কার্য্যে সক্ষম হইয়া তাহাদের স্ব স্ব কুল ক্রমাগত হল চালন প্রথাকে জঘন্য বোধে পরিত্যাগ করিতেছে, কৃষাণ দ্বারা কৃষিকার্য্য করিয়া বাবু কৃষিজীবী সাজিতেছে, অন্যান্যেরা ও রুগ্ন অলস বিলাসী ও গুলিখোর, ইহারাও উল্লিখিত অশান্তিজনক কার্য্য ও ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকে; সুতরাং ইহারাও অনেকে স্ব স্ব জামাতা শ্যালক কুত্রাপি ভাগিনেয়কে বাড়ীতে রাখিয়া তাহাদের প্রতি কৃষিকার্য্যের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক 'জন জামাই ভাগিনা, এরা নয় আপনা, শ্যালক গৃহনাশায় সর্ব্বনাশায় পাবক'—এই প্রবাদের সার্থকতা রক্ষা করিতেছে না, হলধারী কৃষিজীবিরা এইরূপে বাবু কৃষিজীবী সাজিয়া শ্রম শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। উক্ত উভয় শ্রেণীর কৃষিজীবী এখন কৃষির মধ্যে কেবল অধিক সংখ্যক ধান-চাষের জমি সংগ্রহ করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। অথচ এই সকল জমি নিয়মিত আবাদ করিতে না পারিয়া 'হাঁপিয়ে চাষ ধরে না পশে, তার দুঃখ চিরকাল এসে' এই প্রবাদেরও সার্থকতা রক্ষা করিতেছেন না; সুতরাং পল্লীতে এখন বাবু কৃষিজীবির সংখ্যা এইরূপে বৃদ্ধি হইতেছে, হলধারী চাষীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে; ইহাতেও অশান্তি হইয়া চাষবাসের সর্ব্বতোভাবে যে অবনতি ঘটিতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব কৃষিজীবী মাত্রেরই উল্লিখিত নীতি-বচনগুলির প্রতি সম্যক্ লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা বংশগত হলচালন করেন নাই, তাঁহাদের কৃষির অন্যবিধ পরিশ্রমে যাহারা

সামর্থ প্রয়োগ করা বিধেয়, বাবু কৃষিজীবী অথবা অন্যবিধ অশান্তিজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া চাসবাসের অবনতি করা কর্ত্তব্য নহে।

## ২। কৃষিজীবির দৈহিক-সামর্থ্য মর্য্যাদা ও আবশ্যক ভেদে জমির ও কৃষাণের অনির্দ্দিষ্টতা।

আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের জলাজমি ও কালা জমি নামক দুইপ্রকার জমিতে কৃষিকার্য্য হয়, জলজমিতে বর্ষাজলের অধিক আবশ্যক হয়, ইহাতে ধান্যই অধিক জন্মে এখনকার রপ্তানির অনুগ্রহে এই ধান্যে সর্ব্বাপেক্ষা অর্থও অধিক হয়; কালা জমিতে সেচ জলের অধিক আবশ্যক, এই জমি আবাদে কোদাল পাড়ন, জল সেচন প্রভৃতি কৃষিজীবির কায়িক শ্রম জলাজমি অপেক্ষা অধিক, এতৎ উৎপন্ন ইক্ষু কার্পাস, আলু, বেগুণ প্রভৃতি ফসল বিক্রয়ের আয় ধান্যের অপেক্ষা অল্প, কিন্তু অনাবৃষ্টির জন্য জলাজমি অপেক্ষা এই কালা জমি আবাদের ও তাহার উৎপন্ন ফসলের তাদৃশ ব্যাঘাত হয় না, সুতরাং অনাবৃষ্টির বৎসরে কালা জমির ফসলের দ্বারা কৃষিজীবিগণের তাদৃশ কষ্ট হয় না, কার্পাস তুলা অভাবে পরিধেয় বস্ত্রের যে হুলস্থুল পড়িয়াছে, আলু, বেগুন, তরকারী প্রভৃতির যে দর চড়িতেছে, আবশ্যক মত কালাজমি আবাদ হইলে, এ সকল অভাবও থাকে না; কালাজমির এই সকল উপকারিতা কৃষিজীবী মাত্রের অবিদিত নাই। কিন্তু ইহারা আয়ের অল্পতায় পরিশ্রমের আতিশয্যে স্ব স্ব উদ্বাস্তু কালা জমি পতিত রাখিয়া তাহার খাজনা দিতেছেন,এদিকে পশু-চারণ পতিত কালা জমি সকল ভাঙ্গিয়া অধিক আয়ের অল্প পরিশ্রমের কেবল জলাজমি বা ধেনো জমি সংগ্রহের জন্য অশান্তির বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয়ের অনেকেই এই ধান চাষকে এখন জীবিকার ও সদনুষ্ঠানের একমাত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই ধানচাষে ও ইহাঁদের ধেনোজমি ও কৃষাণ সংগ্রহে এখন এইরূপ বাধা বিপত্তি ঘটিয়াছে কৃষাণ অভাবে ইহাদের অনেকের বশত বাটিগুলিও ভূমিসাৎ হইতে বসিয়াছে, সুতরাং ইহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সর্ব্বতোভাবে দুরূহ হইতেছে অধিক কি এই যথেচ্ছাচারে ধান চাষের জন্য অধিকাংশ পল্লীতে মুটে মজুর সওয়ারী-পাল্কীবাহক (বেহারা) বাদ্যকার (ডোম) রজক ক্ষৌরকার স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করাতে অনেক মর্য্যাদাশালী কৃষিজীবির মহা অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে; ভদ্র কৃষিজীবিগণের দুর্দ্দশা দিন দিন সর্ব্বতোভাবে বাড়িতেছে, এ দিকে কুলী বাউরি ধাঙ্গড় প্রভৃতি অধম চাষীরা দিন দিনই ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিতেছে; সে কালের

এখন কোন নিয়ম বা শাসন নাই, কৃষিজীবিগণের মধ্যে যিনি যত সক্ষম জোতসত্ব খরিদের আইন বলে, তিনি তত ধেনো জমি খরিদ করিতেছেন, এদিকে অধম চাষীরা কৃষাণের দ্বারা ধানচাষ করিতেছে। যাহার ৫৲ বিঘা মাত্র ধেনো জমিতে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল, সে দরিদ্রচাষী আজি রপ্তানীর অনুগ্রহে জোত-সত্বের দর বাড়াইয়া ৫০৲ বিঘা ধেনো জমি খরিদ করিতেছে, যাহার ৫০৲ বিঘা জমি না হইলে সংসার চলে না, সেই নিরীহ ভদ্রচাষীর অধিক জমি খরিদ দূরে থাকুক তাহার যে কয় বিঘা ধেনো জমি ছিল, তাহাও তিনি কৃষাণ অভাবে। আবাদ করিতে অথবা হলধারী কৃষিজীবী অভাবে ভাগ সাঁজায় বিলি করাইতে অক্ষম হইয়াছেন, যদি কৃষিজীবী মাত্রেই স্ব স্ব দৈহিক সামর্থ্যও আবশ্যক মত জলা কালা উভয়বিধ জমি ক্রয় ও আবাদ করেন, যেসকল মর্য্যাদাশালী কৃষিজীবির হলচালন প্রথা নাই, এবং যাহাদের দৈহিক সামর্থ্য নাই, তাঁহারা স্ব স্ব আবশ্যকীয় জমি আবাদ জন্য কৃষাণ নিয়োজিত করিতে পারেন, তাহা হইলে কাহারও কোন বাধা বিপত্তি অভাব-অনিষ্ট অন্য অশান্তি হইবে না, কৃষি কার্য্যেরও সম্যক্ উন্নতি হইবে, অতএব এ সকল নিয়মে কৃষিকার্য্য সুসম্পাদনের প্রতিবিধান আবশ্যক।

## ৩। কৃষাণের অল্পতা রুগ্নতা অনভিজ্ঞতা এবং পারিশ্রমিক সময়ের বেতনের অনির্দ্দিষ্টতা।

কৃষাণের কায়িক শ্রম কৃষিকার্য্যের অন্যতম সহায়; ইহাদের মধ্যে কুলী, বাউরী, ধাঙ্গড় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পুরুষেরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রম দক্ষ; ইহাদের স্ত্রী-লোকেরা কৃষাণের কার্য্য করে, কিন্তু পল্লী সকলে এই সকল শ্রমদক্ষ কৃষাণের সংখ্যা অতি অল্প, এতদ্ব্যতীত যে সকল পল্লীতে কৃষাণ আছে তাহাদের মধ্যে কতক-গুলি ম্যালেরিয়াদি বিধাতৃ শাসনে, কতকগুলি দেশ ব্যাপক মাদক দ্রব্য খাইয়া অকালে কাল কবলিত হইতেছে, কতকগুলি কৃষাণ স্ব স্ব পল্লী অপেক্ষা অধিক বেতন প্রাপ্তি আশায় আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতেছে, এই সকল কারণে পল্লীর কৃষাণের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে; কুলী, বাউরী, ধাঙ্গড় সম্প্রদায় ব্যতীত কৃষাণগণের অনেকেই ম্যালেরিয়া বিধাতৃ শাসন, মাদক সেবনে, এবং শঠতা, প্রযুক্ত অল্প পরিশ্রম জনক কার্য্য অথবা পরিশ্রম ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইতেছে, পল্লীতে মাদকদ্রব্যের কৃপায় উহাদের সংসর্গে ও কুপরামর্শে অধিকাংশ কৃষাণ মত্ততায় চলৎশক্তি হীন হইতেছে। কৃষিকার্য্যের মধ্যে ধানগাছের 'ঝাড়া' গাছ চিনিতে পারিলে কৃষাণের প্রধান অভিজ্ঞতা হয়, এই সকল বাছা

গাছ দেখিতে ধানগাছের স্বরূপ. অযোগ্য ধান জমি অনুপযুক্ত ধান বীজের দোষে ইহা প্রতি বৎসর ধানগাছ সকলের মধ্যে মধ্যে জন্মিয়া থাকে, জলবায়ু মৃত্তিকা ভেদে ইহাদের বিভিন্ন আকৃতি হয়, ইহারা যখন ৮।৯ ইঞ্চি পরিমাণের হয় সে সময় ইহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত না করিলে, ইহাদের শীষে যে সকল ফল জন্মে তাহারা সুপক্ক হইবামাত্রই স্বতঃই ঝরিয়া পড়ে, বায়ু মৃত্তিকা শ্রোতজল পরে, ক্রমে ক্রমে নীত হইয়া প্রতি বৎসর অন্যান্য জমিতেও অঙ্কুরিত হয়, এই রক্ত বীজরূপ ঝাড়া ধান ফসলের বিঘ্নদায়ক। এখানকার প্রচলিত দূরবর্ত্তী কৃষি বিদ্যালয়ে সাধারণ কৃষাণ বা কৃষি বংশধরের এই অভিজ্ঞতাটী শিক্ষা করা সুকঠিন, অতএব ইহাদিগকে স্ব স্ব দেশের এই ঝাড়া গাছ তাহাদের উপযুক্ত অভিভাবক দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে চিনিতে শিখান কর্ত্তব্য যেহেতু কৃষিঘটিত অনেক বিষয়ে কৃষি-জীবির বা কৃষাণের কুল পরিচিত ও পুরুষ-পরম্পরাগতঃ অভিজ্ঞতা লাভ করাই স্বভাবসিদ্ধ শিক্ষা। কিন্তু এখন অধিকাংশ পল্লীতে অনুপদিষ্ট অল্প বয়স্ক গুলিখোর এবং কুলি, বাউরী ধাঙ্গড় প্রভৃতি বিদেশীয় কৃষাণ দ্বারা ধান চাষের এই অভিজ্ঞতার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। কৃষিজীবিগণের ধানচাষে আগ্রহ অলসতা পরস্পরের মনোমালিন্যতা এবং সামাজিক কোন শাসন বা নিয়ম নাই দেখিয়া অনেক নির্ভীক কৃষাণ 'কুড়ে গোরুর অমাবস্যা খোজের মত' নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত করিয়া প্রাতে ৮টা অপরাহ্নে ২টার সময় খাটিতে আসিতেছে এরূপ শঠ ও অসমর্থ কৃষাণেরা দৈনিক।• আনা খোরাকী সহ মাসিক ৩৲টাকা বেতনেও ইহারা সন্তুষ্ট নহে, ইহারা নূতন বাবু কৃষিজীবী বৃদ্ধি পাইতেছে, এদিকে মাদক ও বিলাস খরচের জন্য বেতনের হার ক্রমেই বাড়াইতেছে; উল্লিখিত কারণ সকলে পল্লীর এই অত্যল্প অনুপযুক্ত কৃষাণেরা যে কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, অথচ আবশ্যক মত কৃষাণ না হইলে যে এই কার্য্য চলিবে না ইহা সহজেই অনুমেয় অতএব কৃষাণেরা যাহাতে বিলাস, গুলী শঠতা পরিত্যাগ করে, স্ব স্ব দেশে থাকে, কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞ ওশ্রমদক্ষ হয়, উচিত মত বেতন লয়, ইহাদেরও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় এ সকলের প্রতিবিধান আবশ্যক।

## ৪। কৃষাণ কৃষিজীবির বশবাসের বিশৃঙ্খলতা।

আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশের কোথাও কৃষি জমি অধিক কৃষাণ বা কৃষিজীবি অল্প কৃষাণ বা কৃষিজীবি অধিক, বলা বাহুল্য—এই উভয়বিধ স্থলেরই অবস্থা শোচনীয় যেহেতু এই সকল পল্লীতে কৃষি ব্যতীত অন্যবিধ কার্য্য কি

তিনের সামঞ্জস্য না থাকিলে ইহাদের কাহারও উন্নতি হয় না, যদিও কোন কোন কৃষাণ ও কৃষিজীবী এরূপ অসুবিধায় স্ব স্ব জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতেছেন, কিন্তু 'দিনান্তে অন্ন না যুটুক পৈতৃক বাস ছাড়িব না' এরূপ কুসংস্কার এখনও অধিকাংশে কৃষাণ ও কৃষিজীবির হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, এই ভ্রমাত্মক কুসংস্কার অপনোদন করাইয়া কৃষাণ কৃষিজীবী বাধাবিপত্তি অভাব অনিষ্ট ঘুচান এবং কৃষি-কার্য্যের উন্নতি করান জন্য ইহাদের আবশ্যক মত বসবাস পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

## ৫। সেচ জলের অভাবনীয়তা।

যথা সময়ে বৃষ্টির জলের অভাব হইলে কৃষিমাত্রেরই সেচজলের আবশ্যক হয়' স্বভাব সিদ্ধ নদীখালে গবর্ণমেণ্টের খোদিত খালের জলে সর্ব্বত্র সুচারুরূপে এই অভাব ঘুচিতেছে না পুষ্করণীর জলে এই অভাব অপেক্ষাকৃত সর্ব্বত্র ঘুচিবার সম্ভব ; কিন্তু পল্লীতে যে সকল পুষ্করিণী ছিল তাহাদের পঙ্কোদ্ধার জন্যও সচেষ্ট হওয়া দূরে থাকুক স্বয়ং ভূম্যাধিকারী ও কৃষিজীবিগণের অনেকে ইহাদের অনতি-গভীর পুষ্করিণী গুলিকে ভরাট করাইয়া ধান জমিতে পরিণত করিতেছেন অবশিষ্ট-গুলিতে এখন ইহারা ৪।৫ বৎসর অন্তর কলমী-শাক, ধইঞ্চা-পাট, বৈতাল ও মৎস্য প্রভৃতি উৎপন্ন করাইয়া অর্থোপার্জ্জনে উৎসাহী হইয়াছেন। সেকালে গৃহস্থেরা কৃষিজীবিরা উচ্চমনা ছিলেন ধান-চাষ লইয়া এতব্যস্ত ছিলেন না, কৃষাণেরা বলিষ্ঠ ও সংখ্যায় অধিকছিল, এবং প্রতি মৃত্তিকা ঝুড়ি এককপর্দ্দক মূল্যে কাটাই হইত, তাই তখন এত সহজে এত অধিক সংখ্যক পুষ্করিণী খনন হইয়াছিল এখনও অতি অল্প সংখ্যক পল্লীতে এই হিসাবে মৃত্তিকা খনন হয়, অধিকাংশ পল্লীর কৃষাণেরা শঠতা ক্রমে চৌকা হিসাবে মৃত্তিকা খননের যে মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছে,তাহাতে পুষ্করিণী সকলের পঙ্কোদ্ধার বহু-ব্যয়-সাধ্য ; কৃষিজীবিগণের অধিক সংখ্যক ধান-চাষের জমিতে পল্লীর এই অত্যল্প কৃষাণ নিয়োজিত করাও ইহার অন্যতম অন্তরায়। যাহাতে ভূম্যাধিকারী ও কৃষি-জীবিরা এরূপ নীচমনা না হইয়া স্ব স্ব ধান-চাষেই কৃষাণ নিয়োজিত না করিয়া পুষ্করিণী সকলের পঙ্কোদ্ধার যথাসাধ্য মনোনিবেশ করেন, যাহাতে কৃষাণগণের এরূপ অন্যায় মজুরী রহিত হয় তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক।

## ৬। বানরের অত্যাচারিত।

এইক্ষণে পল্লীতে সর্ব্বভুক বানরের সংখ্যা ও উপদ্রব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, অপেক্ষণ কৃত ঘন সন্নিবিষ্ট আম্র তেতুল প্রভৃতি বৃক্ষ, কাঁচা জমির ফসল ও খোড়া ঘর না রাখিলে পল্লী কৃষিজীবির কোন ক্রমেই চলেনা, ইহারা প্রভু রামচন্দ্রের

কৃষিজীবির হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে তায় এখন কৃষিজীবিরা পরিশ্রমে অক্ষম, সুতরাং এই সকল বৃক্ষাদিকে আশ্রয় স্থল করিয়া বানরেরা নির্ভয়ে পল্লীতে বাস করিয়া রহিয়াছে। খড়ো ঘর সকলের উপর ইহাদের অত্যাচার অল্প নহে, কখন ধান গাছের অপক্ক শীষ খাইতে ও নষ্ট করিতে থাকে; কৃষিজীবিরা কালা জমিতে যে ফসল উৎপন্ন করিতে পারেন না,ইহাদের অত্যাচার তাহার অন্যতম কারণ যেহেতু ইহারা কালাজমি জাত প্রায় সমস্ত গাছের লতা পাতা ফল মূল ভক্ষণ করিতেছে ও নষ্ট করিয়া দিতেছে। কৃষিজীবী মাত্রেই ইহাদের পোষনার্থ ও যদি প্রভুত পরিমাণে কালাজমির ফসল প্রস্তুত করান, ইহাদিগকে তাড়াইবার জন্য ও যদি বদ্ধ-পরিকর হন তাহা হইলে যে ইহাদের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের এই ফসল প্রস্তুতের ব্যাঘাত হইবেনা।

কৃষির উল্লেখিত অভাব সমূহের প্রতিবিধান করিতে কৃষিজীবিগণের মধ্যে যে কেহ স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া উঠিবেন অথবা কৃষিজীবিরা যে সমবেত হইয়া কৃষির উন্নতি কল্পে দেশ-ব্যাপী ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন সে আশা দুরূহ; কৃষির উন্নতি ও গবর্ণমেণ্টের যত্ন ভিন্ন হইবেনা অতএব কৃষির উল্লিখিত অবনতির কারণ গুলির ও প্রতি বিধান জন্য সহৃদয় কৃষিজীবি গণের করুণাকর গবর্ণ মেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

——:*:——

# মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ।

লেখিকা—শ্রীমতী কামিনী কুমারী দাসী।

( ১ )

একদিন দেখা মৃত্যু সনে,
পর্ব্বতের আঁধার গুহায়—
প্রভাতের তারা সেই ক্ষণে
ডুবু ডুবু আকাশের গায়।

( ২ )

ভয়ে যেন মৃত্যুকে দেখিয়া
জ্যোতিহীন তারকা সুন্দরী—
হিমরাশি চৌদিকে বেড়িয়া—

( ৩ )

কে যেন কি শক্তিমোরে দিল;
জীবনের শত্রুর সম্মুখে,
কি জানি কি সাহস আসিল—
কহিলাম তারে মনোদুঃখে।

( ৪ )

কহিলাম রাক্ষসে সম্ভাবি—
"কেন তুমি এতই কঠিন?
কেন তব মুখে নাহি হাসি?

( ৫ )

"কেহ তোমা ভাল ত না বলে ;
যেই গৃহে করহ প্রবেশ,
( নীরবে চরণ তব চলে, )
সেই গৃহে যাতনা অশেষ ।

( ৬ )

"যেথা যাও ভয়ে কাঁপে সবে ;—
শ্বাসে তব—তুষার শীতল—
ছোট শিশু বাঁচে বল কবে ?
মরে চারু কুসুম সকল

( ৭ )

"জননীরে ক্ষমা নাহি কর—
পিতা পুত্র না ছাড় কাহারে—
অর্দ্ধতৃপ্ত প্রাণীগণে ধর—
অনিয়মে ধর যারে তারে ।

( ৮ )

"জীবনের আশার কাহিনী
শুনিতেছে মধুর স্বপনে—
সুখ পুষ্পে দিবস যামিনী
গাঁথে মালা বসি একমনে—

( ৯ )

"পাতাইয়া লইবে সংসার—
কত আশা পুষিতেছে মনে—
হে নিষ্ঠুর, করিছ সংহার
কোন্ প্রাণে, বল, হেন জনে ?

( ১০ )

"ধর্ম্মপ্রাণ ঋষি মহাজন,
তাঁহারে তুমি করিছ বিনাশ—
কেন এত নিরদয় মন ?

( ১১ )

"রহ গিয়া অরণ্য মাঝারে
হিংস্র জন্তু আছে যেইখানে—
সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক সবারে,
বাজপক্ষী—নাশ একপ্রাণে ।

( ১২ )

"লোকালয়ে আসিও না আর,
শিশুগণে বধিবার তরে—
গৃহগুলি করিতে আঁধার—
মারিবারে অর্দ্ধমৃত নরে ।

( ১৩ )

"কুসুমিত সুন্দর কাননে,
মরুভূমে করি পরিণত,
কি আনন্দ হয় তব মনে ?
সাধ তুমি কোন্ মহাব্রত ?

( ১৪ )

"বক্ষগুলি ভাঙ্গ একেবারে,
চক্ষুগুলি বৃথা অশ্রুময় ;
তোমাকে দেখিতে কেহ নারে—
কেন তব মৃত্যু নাহি হয় ?"

( ১৫ )

মৃত্যু তবে করিলা উত্তর,
বিস্ময়ে পূরিল মোর মন—
মৃদু হাসি, অতি নম্র স্বর,
ধীরে ধীরে কহিলা বচন ।

( ১৬ )

"বাক্য তব যুকতি-বিহীন—
ন্যায়শূন্য ভর্ৎসনা তোমার—
প্রভুকার্য্যে রত নিশিদিন

( ১৭ )
"আমি দাস—ঈশ্বর যে জন,
তাঁর কার্য্য সাধি অবিরত।
মেষপাল সম প্রাণীগণ—
করি সবে গৃহে সমাগত।

( ১৮ )
"মেষপাল নহে ত তোমার,
ঈশ্বরের—তাঁর ইচ্ছামত
তব প্রতি রাখিবার ভার—
তাঁর কাছে শেষে সমাগত।

( ১৯ )
পিতৃভাব জান ত অন্তরে—
তাহা দিয়া বুঝ তাঁর মন ;
পুত্র তব না ফিরিলে ঘরে,
কত চিন্তা, মন উচাটন।"

( ২০ )
নীরবিলা যমরাজ,—পুনঃ ;
কহিলাম মৃত্যুরে তখন—
"কিন্তু, মৃত্যু, বলি আমি শুন,
কেন অন্যে না কর প্রেরণ ?

( ২১ )
"সঙ্গীতের ভাষা আছে যার,
স্নিগ্ধতর আঁখির চাহনি,
হেন জন নাহি কি রাজার ?
দেবদূত নাহি কি এমনি ?

( ২২ )
তোমারে দেখিলে বড় ভয়,—
ভয়ে মরি মরণের আগে,—
জননী আসিলে ভাল হয়—

( ২৩ )
"নিরদয় তোমার মতন—
স্নেহ-হীন—তব সম কালো
তব সম ক্রুর দরশন
নহে যেবা, সেই ত গো ভাল।"

( ২৪ )
বুঝিয়াছি হৃদয় তোমার—
তুমি কিন্তু বুঝিতে নারিলে
আপনারে," কহিলা আবার—
"সাদা কথা কেন না বুঝিলে ?

( ২৫ )
"হিমারাশি বসন্তের আগে,
এ কথা ভাব না কভু মনে ;—
তাই মোর কর্কশতা ভাগে,
নাহি বুঝ, সেই সে কারণে।

( ২৬ )
"দেখে নাই জীবিত যে জন,
মৃত্যু শুধু পায় দেখিবারে ;
শান্ত কিবা বিকট বদন,
সেই শুধু বুঝিবারে পারে।

( ২৭ )
"আমি ফিরি মুখস পরিয়া ;
দেবদূত, চাহ তুমি যারে,
মোর পাছে দেখহ চাহিয়া,
অনায়াসে পাবে দেখিবারে।

( ২৮ )
"কখন(ও) বা জননীর রূপে,
কখন(ও) বা পিতার আকারে,
কখন(ও) বা প্রেমিক স্বরূপে,

( ২৯ )

"যেরূপেই দেই দরশন,—
মোরে ভাবি, ভাবিও ঈশ্বরে ;
কভু নাহি বল কু-বচন—
বহুরূপী মিত্র আমি নরে।"

( ৩০ )

তখনি গুহার রূপান্তর—
উজলিত কত যেন হাসি !
কত মূর্ত্তি গুহার ভিতর—
শোভে যেন সুষমার রাশি !

( ৩১ )

মৃত্যু কহে —"ইহারা আমার—
এই শস্ত আনিনু কাটিয়া ;—
আঁটি বাঁধি পূরিব ভাণ্ডার
প্রভু পদে দিব সমর্পিয়া।"

( ৩২ )

মৃত্যু গেল চলিয়া তখন—
আমিও ফিরিনু ধীরে ধীরে।
এই রবে পূরিল গগন—
ঘরের প্রাণীরা এল ফিরে।"

—০(*)০—

# রঙমহলে প্রেম।

## লেখক—শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

অতিমাত্র কর্কশস্বরে পাশা কহিলেন,—"ধৈর্য্য সহকারে এতক্ষণ আমি তোমাদের কথা শুনিয়াছি, এক্ষণে তোমরা আমার কথা শুন,—এই রংমহলের পবিত্রতা তোমরা নষ্ট করিয়াছ। একজন প্রকৃত ভাললোকের সংস্কারই এইরূপ। এরূপ গর্হিত কার্য্য যাহারা করিয়াছে, তাহারা যে বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইবে, তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই। তুমি লিউকস ভমিলো, তোমার নিজের কথা অনুসারে তুমিই প্রধান অপরাধী। তোমার কথায় বিশ্বাস করিলে,—আর বিশ্বাস না করিবারও বিশেষ কারণ দেখি না—আর ইহাও প্রকাশ যে তুমিই জিদ করিয়া, তোমার সঙ্গীদিগকে এখানে আনিয়াছ, সুতরাং আমার প্রতিহিংসা কুঠার তোমারই মস্তকে পতিত হইবে, স্থির জানিও। আর তুমি নিজেও স্বেচ্ছাক্রমে অগ্রের হইয়া, দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ।"

লিউকস নির্ব্বন্ধ সহকারে কহিলেন,—"আমি প্রস্তুত, ধর্ম্মাবতার, আপনি অপর সকলকে মুক্তি প্রদান করিলে, আমি নির্ব্বন্ধ সহকারে সকলের দোষের জন্ত মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি।"

সজলনেত্রে গুসনেয়ার কহিল,—"পিতা, পিতা—" তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।"

বালিকা, তোকে অন্ততঃ কিছু দণ্ড না দিয়া ছাড়িতে পারি না। তুই সকলের বড়, ভাবিয়া দেখ্ দেখি. তোর ছোট ভগ্নিদিগকে তুই কি শিক্ষা দিতেছিস্, তুই কি দৃষ্টান্ত তাহাদের সম্মুখে ধরিয়াছিস। যে সময় এই সকল যুবক তোদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তদ্দণ্ডে খোজাদিগকে ডাকিয়া উহাদিগকে গ্রেপ্তার করাইয়া দেওয়া এই রংমহলের পবিত্রতা রক্ষা করা তোরই কার্য্য। তাহা করা দূরে থাকুক, তুই তাহাদিগকে গৃহে বসিতে দিয়াছিস, আর তোরা যে তাহাদিগকে উৎসাহ দিস্ নাই, এ কথা বিশ্বাস করিতেও পারিতেছি না। আমি যখন এই গৃহে প্রবেশ করি, তখন কি তোরা অবগুণ্ঠনবতী ছিলি, না, তাত নয়, কাহারই মুখে অবগুণ্ঠন ছিল না। অপরিচিতের অপবিত্র দৃষ্টিতে অন্তঃপুর পরিচারিণী-দিগের বদন মণ্ডল কলুসিত না হয় এজন্য সুপবিত্র আইন ও সুসভ্য প্রথানুসারে যে অবগুণ্ঠন নিতান্ত আবশ্যক তাহা তোরা ত্যাগ করিয়াছিস্। গুলনেয়ার, সকল বিষয়েই তুই গুরুতর অপরাধী। লিউকস ভসিলো যেমন তাহার নিজের ও সঙ্গীদ্বয়ের জন্য দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তোকেও সেইরূপ তোর নিজের অপরাধ ও তোর ভগ্নিদ্বয়ের অপরাধের জন্য দণ্ড লইতে হইবে।"

কম্পিত স্বরে লিউকস কহিলেন,—"আপনি অপর সকলের জীবন দান করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।"

পাশা কহিলেন,—"আমার কন্যাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। তাহার এই হৃদয় দুর্ব্বলতা জন্য, ভবিষ্যতে যাহাতে সে ও তাহার ভগ্নিগণ শিক্ষা লাভ করে, এজন্য তাহাকে একটা দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। সে স্বচক্ষে তোমার মৃত্যু সন্দর্শন করিবে। ইহাই তাহার দণ্ড।"

গুলনেয়ারের বদন হইতে হৃদয় বিদারক চীৎকার বাহির হইল। খোজাগণ তাহাকে ধরিয়া না রাখিলে, সে তদ্দণ্ডে পিতার পদতলে পতিত হইয়া, ক্ষমা ভিক্ষা করিত। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দুঃখে নিতান্ত কাতরা ও অধীরা হইয়া, খির্জা সোফাতে পড়িয়া গেল। জুলেখা কাতরভাবে খালিলের দিকে চাহিতে লাগিল। যদি তিনি কোনরূপে পাশাকে নিরস্ত করিতে পারেন, তুর্ক যুবকের নিকট জুলেখা কাতর নেত্রে এই ভিক্ষাই করিতেছে।

খালিল কহিলেন,—"ধর্ম্মাবতারের বিচার যদি এইরূপই হয়। যদি আমার হতভাগ্য বন্ধু লিউকসের প্রাণদণ্ড করাই আপনার অভিমত হয়, তবে আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করুন। একবার আমাকে চিরদিনের মত বন্ধুর নিকট

পাশা কহিলেন,—"এ অনুরোধ আমাকে অবশ্য রক্ষা করিতে হইতেছে। কিন্তু বিলম্ব করিতে পারিবে না, যাহা বলিবার শীঘ্র বলিয়া লও, এ দৃশ্য যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই মঙ্গল।"

পাশা খোজাদিগকে সংকেত করিলেন তাহারা লিউকসকে বন্ধন মুক্ত করিল। খালিল তাহার হতভাগ্য গ্রীক বন্ধুর সম্মুখীন হইলেন। তড়িৎবৎ নিজ অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন, এবং দুই হস্তে লিউকসের গলা ধরিয়া, তুর্ক যুবক তাহার কাণে কাণে কহিলেন,—"ভয় নাই, ভগ্নোদ্যম হইও না, আমার বোধ হয়। পাশা শুদ্ধ তোমাকে ভয় দেখাইবার জন্য এরূপ করিতেছেন। শেষ মুহূর্ত্তে নিতান্ত সম্ভব তোমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু যদি বিষময় ফলই সংঘটিত হয়, যদি একান্তই তোমাকে বধ করা পাশার অভিপ্রায় হয়, যদি কিছুতেই তাঁহার এ ক্রোধ শান্তি না হয়, তবে—সেই অন্তিম সময়ে তাহার পূর্ব্বে যেন না হয়, এই অঙ্গুরীয় তাঁহাকে দেখাইবে, কাহার নিকট ইহা পাইলে, তাহাও বলিও, ইহার অদ্ভুত শক্তির উপর বিশ্বাস করিও।"

খলিল যখন লিউকসের নিকট এইরূপ বিদায় লইতেছিলেন, তখন জুলেকা ভিন্ন অপর সকলে মনে করিল, খলিল কেবল বন্ধুতার অনুরোধে এইরূপ করিতে-ছেন। জুলেকার মনে কিন্তু অন্য ভাব; সে অনিমেষ লোচনে খলিলের কার্য্য কলাপ দেখিতেছিল, সে খালিলকে স্বীয় হস্ত হইতে একটী অঙ্গুরী খুলিতে ও তাহা লিউকসের হস্তে দিতে দেখিল। এই ঘটনা দেখিয়া, তাহার মনে যেন কেমন একটা আশা সঞ্চারিত হইতে লাগিল। লিউকসের জীবন রক্ষা হইবে বলিয়াই তাহার বিশ্বাস জন্মিল।

জুলিয়ানও পাশার অনুমতি লইয়া, বন্ধুর নিকট শেষ বিদায় লইতে গেলেন। বন্ধুকে এ জীবনে আর দেখিতে পাইবেন না বলিয়া, তাহার এই শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া, জুলিয়ান যার পর নাই কাতর হইতেছিলেন, তাহার চক্ষে বরদরিত ধারা বহিতেছে, এমন সময় হঠাৎ তাহার হৃদয়ে অপর আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। লিউকস তাহার কাণে কাণে কহিল, "ভাই বিস্মিত হইও না, কোনপ্রকার চঞ্চলতা দেখাইও না, আমি জীবনে হতাশ হই নাই. আশা আছে, এখনও বিলক্ষণ আছে, নিশ্চিত জানিও আশা আছে। জুলিয়ান লিউসকে গাঢ় আলিঙ্গনদান করিয়া কহিলেন, "সুহৃদ্বর, তোমার মত উদারচেতা, তোমার মত পরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে পারে, এমত সুহৃদ আর কোথায় পাইব। ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ।" এই বলিয়া বার বার আলিঙ্গন দিতে লাগিলেন। পাশা

ভাবিলেন, বন্ধুকে মরণোন্মুখ জানিয়াই জুলিয়ান অতি দুঃখে এ সকল কথা কহিতেছেন।

"ইহাদিগকে শীঘ্র লইয়া যাও" বলিয়া ভলতাবান পাশা পশ্চাৎ ফিরিলেন। অপরাধীদিগের প্রতি আর কোনপ্রকার অনুগ্রহই দেখান যাইবে না, কাহারো কোন কথাই আর শোনা যাইবে না, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্যই যেন তিনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

পাশাকে এই সময় বৃদ্ধা দূতী আমিনার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে হইতেছে। কাফ্রিপাগাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সে দরদালানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং দ্বারের ছিদ্র দিয়া, গৃহে যাহা যাহা হইতেছে তাহা দেখিতেছে ও যে সকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা শুনিতেছে। তাহার মনে একটা বিষম উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে, কে কতদূর প্রকাশ করিয়া ফেলে, তাহার উপর কে কতদূর দোষ অর্পণ করে' তাহা জানিবার জন্য বৃদ্ধা বড়ই উৎকণ্ঠিতা। কিন্তু যখন সে শুনিল, লিউকস নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কল্পনা শক্তি প্রভাবে ও উদারতাগুণে কাহাকে লিপ্ত না করিয়া এবং তাহার বন্ধুদ্বয়ের এখানে আসিবার সঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য কারণ নির্দ্দেশ করিল, তখন তাহার হৃদয় হইতে একটা বিষম উদ্বেগ দূরীভূত হইল। সে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া শুনিল। যখন দেখিল আর অধিকক্ষণ সেখানে থাকিলে ধরা পড়িতে হইবে, তখন মৃদুমন্দ পদ বিক্ষেপে বরাবর পাশার পত্নী ইসমিলওার কক্ষে প্রবেশ করিল।

পাশা পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র গুলনেয়ার ও লিউসকে লইয়া, ক্রীতদাসগণ অগ্রসর হইল। খালিলও জুলিয়ানের সহিত পাশার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গ্রীক যুবকও তুর্ক যুবককে তিনি ইতিপূর্ব্বে তাহার সহিত যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। সেই কক্ষে কেবল থির্জা ও জুলেকা রহিলেন। যাইবার পূর্ব্বে খালিল জুলেখার দুটা আশ্বাসবাক্য কহিতে বা তাহার দিকে একবার সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিতে বিস্মৃত হন নাই। জুলিয়ানও শোকাকুলা থির্জার দিকে বার বার প্রেমজ্ঞাপক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সকলে গৃহের বাহিরে যাইবামাত্র জুলেকা ভগিনী থির্জার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার বক্ষের উপর তাহার নিজ মস্তক রক্ষা করিয়া কহিলেন, 'ভগিনী হতাশ হইও না, গুলনেয়ারের জন্য হতাশ হইও না, হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। আশায় বুক বাঁধ, আশা করিবার সম্পূর্ণ কারণ আছে।

থির্জার বদনে আনন্দ, বিস্ময় ও সন্দেহ যুগপৎ দেখা দিল, সে কহিল, "আশা,

জুলেকা উত্তর করিলেন, "থির্জা আমি আশার কথাই বলিয়াছি। গুলনেয়ারকে তাহার প্রণয় ভাজন উন্নতচেতা লিউকসের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিতে হইবে না। লিউকসকে মরিতে হইবে না। তিনি নিশ্চিতই সেই কঠোর দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবেন।"

থির্জা করযোড় করিয়া কহিল, "জগদীশ্বর, ইহা যেন সত্য হয়।" জুলেকার দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইবে?"

জুলেকা কহিল, "ভগিনি, আমি যাহা কহিলাম, তাহা বিশ্বাস কর, আমি অধিক আর কিছুই বলিতে পারিব না। লিউকসের অঙ্গুলিতে থালিল একটী অঙ্গুরী পরাইয়া দিয়াছেন, সেই অঙ্গুরী নিশ্চিতই অক্ষয় কবচের কার্য্য করিবে।

ক্রমশঃ।

——:০:——

# রাজকীয় বিদ্বৎসভা।

## লেখক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত।

বিলাতে বিদ্বৎসভা আছে অনেক। ভারতের তুলনায় অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিলাতে সর্ব্ববিদ্যারই বিদ্বৎসভা আছে। এক "রয়েল" বা "রাজকীয়" বিশেষণে বিশেষিত সভার তালিকা দিলেই পৃষ্ঠাপূর্ণ হইয়া যায়। বিলাতে আছে :—

রয়েল একাডেমি অব্ মিউজিক, রয়েল একাডেমি, রয়েল এগ্রিকল্‌চরাল সোসাইটি, ( ইংলণ্ডের ) রয়েল বোটানিক সোসাইটি, রয়েল কলেজ অব্ সার্জ্জন্স, রয়েল-জিয়গ্রাফিকাল সোসাইটি, রয়েল ইন্‌ষ্টিটুট অব্ আর্কিটেক্‌চার, রয়েল ইন্‌ষ্টিটুট অব্ পেণ্টার, রয়েল ইন্‌ষ্টিটুট অব্ পাব্‌লিক হেল্‌থ, রয়েল ইন্‌ষ্টিটুশন, রয়েল একাডেমি, ( আয়রলণ্ডের ), রয়েল একাডেমি মিউজিক ( লণ্ডের ), রয়েল একাডেমি, ( স্কটলণ্ডের ) রয়েল জিয়গ্রাফিকাল সোসাইটি ( স্কটলণ্ডের ), রয়াল সোসাইটি, রয়েল সোসাইটি ( এচিং চিত্রের )।

এই সকল রয়েল কেবল রাজার সাহানুভূতি ও যত্নের জন্য রাজকীয়, সরকারী অর্থসাহায্য বা কর্ত্তৃত্ব কোনখানে নাই। সকল রয়েল বিদ্বৎসভাই স্বাধীন।

যাহাতে রয়েল বিশেষণ নাই, এরূপ বিদ্বৎসভাও অনেক আছে। বিখ্যাত বিদ্বান

অব একাউন্টান্ট সভায় হিসাব দক্ষদিগের সমাগম হইয়া থাকে, চিত্রবিদ্বান্‌দিগের ভিন্ন ভিন্ন সভা থাকিলেও অয়েলপেন্টার বা তৈলচিত্র বিদ্বান্‌দিগের স্বতন্ত্র সভা আছে, চিকিৎসকদিগের বৃটিশ এসোসিয়েশন আছে। জ্যোতির্বিদ্‌গণের এষ্ট্রনমিকাল এসোসিয়েশনেরও সংখ্যা কম নহে। যক্ষ্মাদি ক্ষয় চিকিৎসকদিগের স্পেশাল এসোসিয়েসন আছে, কতকগুলি বিদ্বান ও বিদুষীদিগের সমাগম স্থান। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যারও ক্লব আছে, তালিকাভুক্ত ক্লব দেখিতে পাই ১২৫টীর কম নহে।

যাহাতে কেবল সাহিত্যচর্চ্চাই হইয়া থাকে, এরূপ সভা সমিতিও ত বিলাতে অল্প নহে। কয়েকটীর নাম করিলেই অবস্থা ব্যবস্থা বুঝিতেই পারিবেন, এই দেখুন,—

গ্রন্থকার সভা। বেকন সভা, সেক্সপীয়র সভা, চাষার সভা, সেলি-সভা, গেটে সভা, কার্লাইল সভা, দান্তে সভা, ৩টী পুস্তক সভা, ২ প্রাচীন প্রচলিত প্রবচণের সভা, প্রাচীন ইংরেজির সভা, প্রাচীন স্কচ ভাষার সভা, প্রাচীন আইরিষ ভাষার সভা, সংবাদ সংসৃষ্ট পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের সভা, স্বতন্ত্র সংবাদপত্র সভা, রয়েল সাহিত্য ভাণ্ডার, আয়রলণ্ডের সাহিত্য সভা, রয়েল লিটারেচার সভা, ভাষা তত্ত্বের সভা, দুই তিনটী ঐতিহাসিক সভা।

যাহাতে বিজ্ঞানাদিই প্রধান আলোচ্য এরূপ সভার ছড়াছড়ি। কতকগুলির বলিয়াছি। সকলগুলির কথা কহিতে গেলে, স্থান পাইব না। রসায়ণের সভা আছে দুই তিনটী, তাড়িত বিদ্যার আছে, তাড়িত শিল্পের আছে, উদ্ভিজ্জ-তত্ত্বের ন্যায় কৃষি তত্ত্বের আছে, উদ্যানতত্ত্বের আছে, কুঞ্জতত্ত্বের আছে, আইন-গণিত বায়ু খনি, অভিনয়, চিকিৎসা প্রভৃতির কত আছে! পদার্থবিদ্যার সভা বহুসংখ্যক। নব নব আবিষ্কারের নব নব বিদ্বৎসভার মধ্যে বৃটিশ এসোসিয়েসন ও রয়াল ইন্‌ষ্টিটুশনেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। শ্রেষ্ঠ সকল সভা, এই দুইটী শ্রেষ্ঠ মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠ, বয়সে বৃটিশ এসোসিয়েশন অপেক্ষা রয়েল ইন্‌ষ্টিটুশন অনেক জ্যেষ্ঠ, বৃটিশ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৮৩১ অব্দে। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, ভূগোল, অর্থশাস্ত্র, যন্ত্রশাস্ত্র, মানবতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রই এই সভার অধিকার ভুক্ত, সভার বার্ষিক অধিবেশন বৎসর বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইয়া থাকে।

রয়াল ইন্‌ষ্টিটিশন পুরাতন ১৭৯৯ অব্দে প্রতিষ্ঠিত, সাহিত্য বিজ্ঞানাদির

বক্তৃতায় উপদেশ প্রদান, পুস্তক পত্রিকায় জ্ঞানপ্রচার, দুই সভারই কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। বক্তৃতা পুস্তক পত্রিকাদি প্রচার সকল সভারই কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। বিলাতের সকল সভাই দেশের উপকার করিতেছে, যে সকল সভায় নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হইতেছে, শিল্প সভায় শিল্পের উন্নতি হইতেছে, অন্যান্য সভায় অন্যান্য বিদ্যা পুষ্টি ও বিস্তার হইতেছে, সকল সভাই চাঁদায় চলিতেছে, সভা অনেক, চাঁদাও অনেক অনেক; সভায় স্বদেশী বিদেশী দ্বিবিধ সভাই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কোন কোন বিদ্বানকেও কোন কোন বিলাতী সভায় সভ্যপদে দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতে যে, একটী রাজকীয় "সাহিত্য সভা" আছে তাহা অনেকেরই অবিদিত। ১৮২০ অব্দে রাজা চতুর্থ জর্জ্জ এই সভার প্রতিষ্ঠায় অর্থে সামর্থে পোষকতা করেন, তিনি এককালে ১০দশ হাজার টাকা দিয়া প্রতি বৎসর ১এক হাজার দিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সলস্‌বেরির বিশপ ভ্রমক্রমে বার্ষিক হাজারকেও দশহাজারে পরিণত করিয়াছেন। রাজা চতুর্থ জর্জ্জ প্রশংসায় তুষ্ট হইয়া ১০দশ হাজার বরাদ্দ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী চতুর্থ উইলিয়ম, কিন্তু হাজার টাকা বারাদ্দ করেন। শেষে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া হইয়া রহিত করিয়াছেন, এখন সাহিত্য সভাও অন্যান্য সভার ন্যায় কেবল নামে রাজকীয়।

এতগুলি বিদ্বৎ সভা সত্ত্বেও বিলাতের লোকের তৃপ্তি নাই। "বিলাতের জ্ঞান বিজ্ঞানাদি বিদ্যাধনেও দেখিতে পাই, "যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে তত চায়।" এটা দোষ নহে, গুণ, কেন না,—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

বিখ্যাত কন্টেম্পোরারির পত্র বিগত জানুয়ারি মাসে ফরাসী ও জর্ম্মণের 'রয়েল একাডেমির কথা তুলিয়া বড় আক্ষেপ করিয়াছেন, সমালোচক বলিতেছেন,—

"ফরাসি রাজ্যের রাজকীয় বিদ্বৎ সভা পাঁচ ভাগে বিভক্ত, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ও রাজনীতি বিজ্ঞান, এই সকল বিষয়ের ভার আছে পাঁচ সাথার হাতে, পাঁচ শাখার পাঁচ সভা, ইহার মধ্যে একাডেমি ফ্রান্স সাহিত্যের সকল অঙ্গেরই ভার লইয়া আছেন। সকল সংখ্যা বা সকল সভাই এক প্রকাণ্ড প্রাসাদে অবস্থিত। জগতের অশেষবিধ উপকার সাধন হইতেছে।"

পঞ্চশাখা সমন্বিত এই বিদ্বৎ সভায় ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বৎসরে ৪ চারি লক্ষ

যেমন নাম, তেমন মান, তেমনই উপযোগিতা। জর্ম্মণীর সভাও রাজধানী বার্লিন সহরে প্রতিষ্ঠিত, সে সভাও রাজকীয় সাহায্য পাইয়া থাকে, মান সম্ভ্রম তাহারও কম নহে। ফরাসী ও জর্ম্মণ সভা প্রায় এক ছাঁচে ঢালা।

কণ্টেম্পোরারির লেখক বিলাতেও এইরূপ রাজকীয় সভা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, সভায় রাজকীয় অর্থ সাহায্য লইতে চাহেন। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন, "এখন বিলাতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই উপযুক্ত লোককে বিনা পরীক্ষায় উচ্চ উপাধি দিয়া বিদ্যার ও বিদ্বানের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত উপাধি সম্মান অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, যখন নানারূপে গণ্য মান্য হন, তখন উপাধিলাভ করিতে পান। নব্য সমাজের শত শত লোকে যে জ্ঞান চর্চ্চায় জীবন ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও উপাধি সম্মানে সংবর্দ্ধিত করিতে পারেন না। প্রস্তাবিত রাজকীয় বিদ্বৎ সভা এইরূপ বিদ্বানদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র বিদ্বৎ সমাজকে উৎসাহিত করিবেন। এই সভার সভ্য হইলে আর কাহাকেই ঘরে বসিয়া নির্জ্জনে জ্ঞানগবেষণায় পর্য্যবসান করিতে হইবে না, কোন বিদ্বান কোন বিষয়ে কতদূর গবেষণা করিয়া তুলিয়াছেন, তখন সকলেই জানিতে পারিবেন, স্বাতন্ত্র্যনিবন্ধন যে অসুবিধা এবং ত্রুটি অভাব ঘটে, তাহা ঘটিতে পারে না। জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিদ্যা সম্বন্ধে কোনরূপ সরকারী বিধি ব্যবস্থা হইয়াছে, দেখিবেন এই রাজকীয় বিদ্বৎসভা দৃষ্টি রাখিবেন, গবর্ণমেণ্টের কার্য্য অনুমোদিত হইলে তাহা সমর্থিত করিবেন, সুপরামর্শ দিবেন, অনুমোদিত না হইলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রতিবাদ করিবেন, বিবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। জ্ঞান গবেষণার সুব্যবস্থা করিবেন, একজনের কৃত কোনরূপ আবিষ্কার সত্ত্বেও যাহাতে অন্য কেহ অনভিজ্ঞতা ও অবিদিত রহস্য নিবন্ধন সেই তত্ত্বের আবিষ্কারের বৃথা সময় নষ্ট না করেন, গবেষণার পুরস্কারে তাহার উপায় হইবে, যখন কোন ব্যক্তি কেবল অর্থাভাবেই কোনরূপ গবেষণায় কুণ্ঠিত অসমর্থ হইতেছেন, সেখানে সভা অর্থ সাহায্য করিবেন।"

প্রস্তাবিত সভাতে প্রত্নতত্ত্বে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে, কেবল বিলাতের নহে, উপনিবেশ এবং ভারতেরও প্রত্নতত্ত্বে সভাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সকলের কথা পশ্চিমোত্তর ভারতের কথা বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন, সে প্রদেশের প্রাচীন মন্দির দেউল প্রভৃতির দিকে ভারতের গবর্ণমেণ্টের যত্ন নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন,

আর যত লাট ও প্রধান কর্ত্তাকেও মনোযোগী হইতে বাধ্য করিয়াছেন, এ জন্য সরকারী তহবিল হইতে উচিতরূপ অর্থ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তাহা বোধ হয় কণ্টেম্পোরারির সমালোচক জানেন না!

যথেষ্ট সত্ত্বেও বিলাতের সমালোচক আরও একটী বিদ্বৎসভা চাহিতেছেন, একটী প্রকৃত রাজকীয় সভার জন্যই প্রচার করিতেছেন, তাহা সকলে বুঝিতে পারেন না, বিলাতেরই অন্যান্য পত্রে দেখিতেছি, এরূপ রাজকীয় বিদ্বৎ সভার জন্য কণ্টেম্পোরারির সমালোচক একাই চেষ্টা করিতেছেন এরূপ নহে। ইহারা অনেক সহযোগী আছেন, মনে হইতেছ, বিলাতী সরকারী সাহায্য ও সরকারী সংশ্রবে শীঘ্রই একটী সর্ব্ব বিদ্যার বিদ্বৎসভা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই সময় বড়লাট যদি ভারতেও ঐরূপ রাজকীয় সভার প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে, ভাল হয়। আমাদের এখানে একমাত্র "এসিয়াটিক সোসাইটিই" সভার মত সভা, এইটিই প্রকৃত বিদ্বৎসভা। ভারতের আদি বড় লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় জজ স্যার উইলিয়ম জোন্‌সের চেষ্টার ১৭৮৪ অব্দে এই সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সংস্কৃত, আরবী পারসী ভাষায়ও সাহিত্যে সার উইলিয়ম জোন্‌সের প্রবেশ হইয়াছিল, অনুবাদও ছিল, প্রাচীন ভাষা এবং প্রত্নতত্ত্বেই তাই সভার প্রথমেই দৃষ্টি ছিল, সভার প্রকৃতি এখনও সেইরূপ হইয়া আছে। যেরূপ রয়েল একাডেমি বা রাজকীয় বিদ্বৎসভার জন্য বিলাতে চেষ্টা হইতেছে, সেরূপ নানা বিদ্যা বিষয়িণী সভা এসিয়াটিক ঠিক নহে। বিলাতের বৃটিশ এসোসিয়েসন বা রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনের মত সভাও এসিয়াটিক সোসাইটী নহে। বিলাতে আরও যে নানাবিষয়িণী নানা বিদ্বৎসভা বিরাজ করিতেছে, আমাদের "এসিয়াটিক সোসাইটী" তাহাদের মতনও নহে। সুতরাং এসিয়াটিকে অভাবপূর্ণ হইতেছে না। রাজকীয় সাহায্য রাজপ্রতিনিধি বড়লাটের উচিত একটী রয়েল একাডেমি বা জ্ঞান বিজ্ঞানাদি ঘটিত নানা বিষয়িণী রাজকীয় বিদ্বৎসভার এই কলিকাতা সহরেই প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া, এক হইলেই পাঁচটি হইবে, কলিকাতায় হইলেই অন্যত্র হইবে ভিক্টোরিয়া ভবনে এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া ভবনটিকে কার্য্য করি বিদ্যালয় করা চলিবে, বড়লাট একটি প্রকৃত কার্য্য করিয়া সুখী হইতে পারিবেন।

# উৎকণ্ঠা।

লেখিকা—শ্রীমতী মৃণ্ময়ী দেবী।

বাসন্তি পূর্ণিমা-নিশি, চন্দ্রমা হাসিত দিশি,
নিকুঞ্জে শ্যামের বাঁশী, বাজিয়া উঠেছে আজ।
এ সুখ বসন্তে ধরা, হইয়া আপন হারা,
হের গো প্রকৃতি রাণী, পরেছে কুসুম সাজ।
বসন্তের আগমনে, কোকিল পঞ্চম তানে,
কুহরে প্রফুল্ল মনে, পিক বধু শিহরয়।
বসিয়া তমাল শাখে, ময়ুরী নাচিছে সুখে,
শারী শুকে মুখে মুখে, হের প্রেম কথা কয়।
দেখ গো মালতী ফুলে, গুন্ গুন্ রব তুলে,
গুঞ্জরি ভ্রমরা কুলে, ফুল কলি চায় হেসে।
যমুনা উজান তুলে, উছলিছে কূলে কূলে,
সেফালি ঝরিছে মূলে, হের গো মধু বাতাসে।
আজি এ ফাগুন দিনে, কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
চল সখি নিধু বনে, ত্যজি লোক লাজ ভয়।
বাজে বাঁশী নাম ধ'রে, বলনা কেমন ক'রে,
প্রাণ ধ'রে র'ব ঘরে, নীরবে বসিয়া হায়।
পরাণ আকুল ক'রে, নিকুঞ্জে যমুনা তীরে,
বাঁশী স্বর উঠে ধীরে, ধৈরজ ধরিতে নারি।
বাঁশীর মধুর তানে, কত কথা আনে মনে,
কত আশা ভাসে প্রাণে, কি বলিব সহচরি।
সখিরে ত্বরিতে আয়, নিশি না ফুরায়ে যায়,
আছে বসে সে আশায়, পথ চেয়ে মোর তরে।
হায় লো ও মধুতানে, কি সুধা যে ঢালে প্রাণে,
বুঝাব তোরে কেমনে, চল সখি ত্বরা ক'রে।

——:(*):——

# মণি-কর্ণিকা।

লেখক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম।

হে জাহ্নবি! পুণ্য-তোয়া এ তীর্থ-সৈকতে,
কি স্নিগ্ধ শান্তির নীড় করি দরশন!
মর্ত্ত-জন্ম-সুখ-স্পৃহা এ নির্দ্দিষ্ট পথে,
মুক্তি-আশা নরনারী করে বিসর্জ্জন!
মরণে শিবত্ব, মণি-কর্ণিকার কূলে,
কি জ্ঞানী অজ্ঞানী চিত্তে জপে সর্ব্বক্ষণ।
শিবত্বে কি মহাসুখী—বিস্মৃতির ভুলে
রচে কি নির্ব্বাণ-মুক্তি তত্ত্বদর্শী জন?
কারে করি প্রশ্ন হেথা? এ মহাশ্মশানে,
রচিব যে শক্তিবলে আনন্দ-কানন,
সেই চিদ্ময় বিশ্বগুরুপদ ধ্যানে,
হ'তে পারে এ জটিল সমস্যা পূরণ!
আমি ওহে বিশ্বনাথ এ রাজ্যে ভিখারী,
এ তথ্য নির্ণয় করি কি সাধ্য আমারি।

—:(০):—

# অভিমত।

আমরা কমলার বরপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "দি গ্রাণ্ড অপেরা পার্টি" নামক যাত্রা সম্প্রদায়ের প্রথিত নামা শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত "পিতৃ পরাজয়" এবং "বেদবতীর চিতারোহণ" গীতাভিনয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। অভিনেতাদিগের কৃতিত্ব, সঙ্গীতের নূতনত্ব এবং বহুমূল্য সাজ-পোষাকের চমৎকারীত্ব বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহার উপর সুবিখ্যাত নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ বাগ্‌চী এই উভয় গীতাভিনয়ের এরূপ সুন্দর সুন্দর নৃত্যের অবতারণা করিয়াছেন যে, দুইচক্ষে দেখিয়া আশা মেটে না। সম্প্রদায়ের সত্ত্বাধিকারী হরিপদ বাবু আমাদের ধন্য বাদার্হ।

—:(*):—

# বন্ধু হইতে প্রাপ্তপত্র।

## ( পৈতা পর )

কায়স্থকুলের গর্ব্ব, বঙ্গের রতন ?
ভবে আর তোমাদের হবে না পতন ?
ধরিছ ক্ষত্রিয় খ্যাতি, তোমরা সবাই,
বেঁচে থাকো, রাজা হও ভ্যালা মোর ভাই
ধরিতেছ ক্ষত্র চিহ্ন, উপবীত পরি,
বঙ্গক্ষেত্রে দেখা দাও ধর্ম্ম পরিহরি।
লেখনি চালনা করা বড় ছোট কাজ,
কেরাণী মুহুরী নামে লোক মাঝে লাজ।
ফেলে দাও হংসপুচ্ছ, লোহার লেখনি,
সমাজেতে খাড়া হও, ক্ষত্র চুড়ামণি !
কার্য্য দেখি তোমাদের লাগে চমৎকার।
সবে বলে, ক্ষত্র হল ভবনদী পার।
ফেলিতেছে যজ্ঞসূত্র ব্রাহ্মণের ছেলে,
জনমিয়া উচ্চ কুলে কচুপোড়া খেলে ?
তোমরা কুড়ায়ে লও, বেড়ে যাবে মান,
প্রকাশো ক্ষত্রিয় নাম, ধর ধনুর্ব্বাণ।
করপুটে তোমাদের নিবেদন করি,
দেখা দাও বঙ্গক্ষেত্রে লৌহবর্ম্ম পরি।
লও লও, যত পার, সূক্ষ্ম সূত্র লও,
আশীর্ব্বাদ করি সবে দীর্ঘজিবী হও !

—০:(*):০—




"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৫শ বর্ষ। | ১৩১৩ সাল। চৈত্র | ৯ম সংখ্যা।

# গৃহ-লক্ষ্মী।

লেখক—শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

নর ও নারীদিগের মধ্যে উভয়েরই স্বতন্ত্র কার্য্য অবধারিত আছে। এই উভয় জাতির শরীর ও মন, সেই সেই কার্য্যের উপযোগী করিয়া, সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষের শরীর সবল, শ্রম-সহ ও তেজস্বী; নারী-জাতীর শরীর ও মন উভয়ই কোমল, এবং অপেক্ষা-কৃত দুর্ব্বল। পুরুষেরা শ্রম-সাধ্য নানাবিধ গুরুতর সংসার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। সংসার-পালনের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদয় সংগ্রহ করেন। রমণী-গৃহ-মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, পুরুষ কর্ত্তৃক আনীত দ্রব্য সকল, সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক গৃহ-মধ্যে সুরক্ষিত, এবং পরিমিতরূপে ব্যয় করেন।

সংসারের যাবতীয় কার্য্য পরিদর্শন, পুত্রকন্তাদিগকে লালন পালন, আয় ব্যয় নিরূপণ, গৃহ-সামগ্রী সকল যত্নের সহিত সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যের ভার স্ত্রীজাতির উপর অর্পিত আছে। পুরুষের বাহিরের কার্য্য করিতে সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়। অতএব, গৃহের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে; সেই জন্ত রমণী-গণের উপর সেই সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পিত আছে। সংসার মধ্যে যাহার যে কার্য্য তাহার তাহা সম্পাদন করা আবশ্যক।

বালিকা বয়সে বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির সম্যক বিকাশ হয় না। অতএব সে সময় মাতাপিতার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া, জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়। তাঁহারা যখন যাহা আদেশ করেন, অনন্যমনে তাহা পালন করা উচিত। কারণ যাহাতে তোমরা পরম সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে কেবল তাহারই ব্যবস্থায় অনুক্ষণ ব্যাপৃত থাকেন। বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আন্তরিক সৌন্দর্য্যেরই গৌরব অধিক। যেমন পরমসুন্দর শাল্মলীকুসুম গন্ধ ও সৌকুমার্য্য বিহীন বলিয়া, কাহারও নিকট আদৃত হয় না, সেইরূপ পরম সুন্দরী বালিকাও আন্তরিক ভূষণ ও সৌকুমার্য্য অভাবে অনাদৃত হইয়া থাকে। দৈহিক সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী নহে; বার্দ্ধক্যে দৈহিক সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু আন্তরিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সৌন্দ-র্য্যেরও বৃদ্ধি সাধিত হইবে। ফলতঃ ধর্ম্ম ও জ্ঞানহীন অন্তঃকরণ মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক, নীরস এবং লোকের অপ্রীতিকর।

প্রত্যেক রমণী যদি আপনাকে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, তাহা হইলে সংসারে আনন্দের সীমা থাকে না। যে রমণী মাতা-পিতা গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, সমবয়স্কদিগের প্রতি অনুরাগিনী, সন্তানগণের প্রতি স্নেহান্বিতা, দাস-দাসীগণের প্রতি দয়াবতী, তিনিই গৃহলক্ষ্মী। যে নারী পরদুঃখ মোচনের জন্য আপনার সাধ্যানুসারে অর্থব্যয় করিতে পারেন,—তিনিই গৃহলক্ষ্মী। যে স্ত্রী গৃহ কার্য্যে নিপুণা, পরিমিত ব্যয়শীলা এবং সমদর্শিনী—তিনিই গৃহলক্ষ্মী। ধর্ম্ম যাহার একমাত্র লক্ষ্য, সত্য যাহার প্রাণপ্রিয়, এবং বাক্য যাহার অতি মধুর,—তিনিই গৃহ-লক্ষ্মী। যিনি আপনার সুখ ত্যাগ করিয়া, দুঃখী পরিবার ও দীনহীন জন-গণের সেবায় জীবন সমর্পণ করেন, যিনি সম্পদের সময় উন্মত্তা এবং বিপদ কালে অস্থির না হইয়া, স্থিরচিত্তে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, যিনি অহঙ্কার স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও সৎপথের পথিক হইতে পারেন—

রমণীগণ কর্ম্মিষ্ঠা, জ্ঞানবতী ও ধর্ম্মশীলা হইলে, যেরূপ গৃহলক্ষ্মী বলিয়া আদরণীয়া হইতে পারেন, শরীরের সৌন্দর্য্যে কখনই যেরূপ হইতে পারেন না। অনেকের আকৃতি অতিসুন্দর, কিন্তু প্রকৃতি যারপর নাই কুৎসিত দেখা যায়। তাঁহারা গর্ব্বিতা কটুভাষিণী, চঞ্চলা এবং সর্ব্বদা অসন্তুষ্টা; পরনিন্দা, পরহিংসা, কলহ ও বিষাদেই তাঁহাদের অত্যন্ত আদর, এরূপ নারীগণ অলক্ষ্মীর সজীব মূর্ত্তি। তাঁহারা যে গৃহে প্রবেশ করেন, সে গৃহ হইতে শৃঙ্খলা ও শান্তি পলায়ন করে, এবং সে গৃহ নিয়ত বিবাদ ও অসুখের স্থান হইয়া উঠে।

হিন্দু রমণীগণ বহুপরিজন মধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক, পরস্পরের সুখে সুখিনী ও দুঃখে দুঃখিনী হইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, নারীগণ সুশীলা হইলে, সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে আবার তাহাদিগের দোষেই অমৃতে বিষ উৎপন্ন হয়। স্ত্রীলোকের নম্রতা, দয়া, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি অনেক গুণ আছে; সেগুলি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সকল গুণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলে, রমণী গৃহলক্ষ্মী বলিয়া, সকলের নিকট আদরণীয়া হইয়া থাকেন।

অলক্ষ্মীভূতা নারী গৃহের কণ্টকস্বরূপ, তাহার অত্যাচারে কত শত সোণার সংসার ছারখার হইয়া যায়। পূর্ব্বে যেখানে সুখ, শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করিত দুষ্টস্বভাবা রমণী তথায় প্রবেশ করিয়া, সে স্থান নরক তুল্য করিয়া থাকে। রামায়ণে বর্ণিত ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ীর দুরভিসন্ধিতে রঘুকুলের কি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল। স্বামীর অপমৃত্যু, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস প্রভৃতি দুর্ঘটনার কথা মনে হইলে, কৈকেয়ীর প্রতি কাহার না ঘৃণা জন্মে? একদিকে গৃহের অলক্ষ্মী কৈকেয়ী, অপর দিকে গৃহলক্ষ্মী জনকনন্দিনী, একদিকে যেন কালরাত্রির কালিমা অপর দিকে যেন স্বর্গের বিমল জ্যোতিঃ।

—:(*):—

# অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী।

( ১ )

সাইপুর গ্রামে ইতর ভদ্র পঞ্চাশ-ঘর লোকের বসতি। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ তিনঘর, কায়স্থ পাঁচঘর, বৈদ্য একঘর, বাকী সব অন্যান্য জাতি। অধুনা সাহেবের

হইয়াছে, সকলে তাহা জানিতে পারেন না, বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় তাহা জানিবারও বিশেষ দরকার নাই; দরকার কেবল আসল কথা।

গ্রামের পশ্চিম দিকে একটি নদী; সেই নদীর ধারে সারি সারি গুটি-কতক দেবদারু বৃক্ষ; রৌদ্রের সময় অনেক দূর পর্য্যন্ত ছায়া পড়ে। সেই সকল বৃক্ষের নিকট দিয়া নদীর ঘাটে যাইবার পথ; গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সেই ঘাটে স্নান করে; বৈকালে পানীয় জল তুলিয়া লইয়া যায়। একটী বৃক্ষতলে একটি সন্ন্যাসী থাকিতেন; বড় বড় কাষ্ঠের গুড়িতে সর্ব্বদা অগ্নি জলিত। সাধারণ লোকে সন্ন্যাসীদের অগ্নিকুণ্ডকে ধুনী-জ্বালা বলে। সন্ন্যাসী বারমাস ধুনী জ্বালাইয়া রাখিতেন।

সন্ন্যাসীর বয়স অল্প, দেখিতে পরম সুন্দর, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, বড় বড় ছুটি চক্ষু, গেরুয়া বসনের পরিবর্ত্তে নীলাম্বর পরিধান, অঙ্গে ভস্ম বিলেপন, মুখখানি শ্মশ্রুবর্জ্জিত, চেহারাটী মানাইত ভাল, কেবল চুলগুলি লম্বা লম্বা তামার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, জটা বাঁধে নাই; অল্প গোঁপের রেখা, দাড়ি উঠে নাই।

শীতকাল। সন্ন্যাসীর শীত ছিল না; ভস্মলেপনে শরীরের লোমকূপ বন্ধ, সম্মুখে আগুন জলে, সন্ন্যাসীর শীত লাগে না। আগুন কেবল শীত নিবারণের জন্য নয়, সন্ন্যাসী হইলে গাঁজা খাইতে হয়, সেই জন্য সন্ন্যাসীদের কাছে সর্ব্বদা আগুন জলে। এ সন্ন্যাসীও গাঁজা খাইতেন; আর কি খাইতেন, তাহা কেহ জানিত না। প্রাতঃকাল হইতে প্রায় একপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে লোকের সমাগম হইত, ততক্ষণের মধ্যে সন্ন্যাসী একবারও আসন ছাড়িয়া উঠিতেন না, কিছুই আহার করিতেন না। স্ত্রীলোকেরাই বেশীর ভাগে সন্ন্যাসী দর্শনে যায়; বিশেষতঃ স্নানের ঘাটের রাস্তা, প্রত্যহই সেখানে স্ত্রীলোক জমিত, অনেকেই ভক্তি-বশে সন্ন্যাসীকে মিষ্টান্নাদি জলপানি অর্পণ করিত, কেহ কেহ ছুটি একটি পয়সাও দিত, সন্ন্যাসী কিছুই স্পর্শ করিতেন না। কেহ কেহ দেখিয়াছিল, ভিড় ঘুচিয়া গেলে ছোট ছোট রাখাল বালককে ডাকিয়া সন্ন্যাসী সেই সকল খাদ্য ও পয়সা বিতরণ করিয়া হাস্য করিতেন। এক একজন সন্ন্যাসীর যেমন অভ্যাস আছে, রোগ শান্তির ঔষধ দেওয়া, গ্রহশান্তির মাদুলী দেওয়া; এ সন্ন্যাসীর সে অভ্যাস ছিল না। ভাল সন্ন্যাসী।

চেহারা খুব ভাল, তাহা দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা বলাবলি করিত, সন্ন্যাসী হয়ত রাজপুত্র, কোন-প্রকার মনের কষ্টে বিরাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে; চতুর পুরুষেরা সন্দেহ করিত, হয় ত কোন বড় রকম অপরাধ করিয়া গ্রেপ্তারের ভয়ে

ভেকধারী হইয়াছে ; কিন্তু সন্ন্যাসী কিছু আহার করে না, আহার করিতে কেহ দেখিত না, সেইজন্য অনেক লোকের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইত।

( ২ )

কিছুদিন যায়, একদিন কিছু অধিক রাত্রে একটি লোক নিকটস্থ একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সন্ন্যাসীর গতিক্রিয়া পরীক্ষা করিতেছিল ; সে দেখিয়াছিল, রাত্রি যখন প্রায় আড়াই প্রহর, সেই সময় একজন স্ত্রীলোক চুপি চুপি আসিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে দাঁড়াইল, সন্ন্যাসী তখন গাঁজা খাইতেছিল, অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি জ্বলিতেছিল। কামিনীকে দেখিয়া গাঁজার কলিকা ফেলিয়া সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইল ; স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকে চলিল, পশ্চাতে পশ্চাতে সন্ন্যাসী।

কোথায় যায়, দেখিবার জন্য সেই বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি বৃক্ষ হইতে নামিয়া ঐ উভয়ের সঙ্গ লইল। যাহা যাহা দেখিল, কাহাকেও বলিল না, মনে মনেই রাখিয়া দিল, তিন রাত্রি এই রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে সন্ন্যাসী যায়, ভোর হইবার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া বৃক্ষতলে আবার ধুনী জ্বালায়। গুপ্ত দর্শক একরাত্রে এক খেলা খেলিল। যত রাত্রে স্ত্রীলোক আইসে, তাহার একঘণ্টা পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি নারী সাজিয়া একটু দূরে দর্শন দেয়, ক্রমে ক্রমে নিকটে গিয়া মুখে ঘোমটা দিয়া দাঁড়ায়, পরক্ষণেই দক্ষিণ দিকে গতি ; সন্ন্যাসী তাহার অনুবর্ত্তী।

সত্য স্ত্রীলোক যেখানে সন্ন্যাসীকে লইয়া যাইত, মিথ্যা স্ত্রীলোক সেখানে না গিয়া আপন বাটীর এক নির্জ্জন বৈঠকখানায় সন্ন্যাসীকে লইয়া গেল। পূর্ব্বেই আহারের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল, পঞ্চোপচারে সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় মিহি সুরে বলিল, "তোমার এমন বেশ দেখিয়া আমার দুঃখ হয় নবীন বয়সে জটাধারী হওয়া শোভা পায় না। রূপ মানায় না ; তুমি যদি বাবু হও, জীবন যৌবন তোমারে সমর্পণ করিয়া অধিক অনুরাগে চির-জীবন আমি তোমার দাসী হইয়া থাকি।

অনুরাগটা পাকা পাকি হইয়া ছিল, সন্ন্যাসী বলিল, "রাত্রে বাবু হইব, দিনের বেলা সন্ন্যাসী সাজিব, তাহাতে যদি তোমার আশা পূর্ণ হয় বল ; তাহাতেই আমি প্রস্তুত।" নারীরূপী পরীক্ষক একবার বাহির হইয়া গিয়া কতকগুলি জিনিষ আনিল, নারীবেশ ত্যাগ করিয়া পরামাণিক রূপ ধরিয়া সন্ন্যাসীকে ক্ষৌরী করিয়া দিল, ভাল ভাল কাপড় পরাইয়া বাবু সাজাইল, সন্ন্যাসী বাবু হইলেন—ক্ষৌরকার বাহির হইয়া গেল। সন্ন্যাসী কি একাকী রহিলেন ? না, সম্মুখে একটি কামিনী।

যে কামিনীর সঙ্গে সন্ন্যাসী নিত্য রাত্রে বিহার করিত সে কামিনী আসিল না। তাহার বদলে অন্য একটি রূপবতী কামিনী।

( ৩ )

সন্ন্যাসীকে এখন সন্ন্যাসী বলিতে হইবে কি বাবু বলিতে হইবে, তাহা বিচার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যাহা বলিলে পাঠক মহাশয় সন্তুষ্ট হন তাহাই বলা ভাল। বোধ হয় সন্ন্যাসী বলিলেই রসজ্ঞ পাঠক মহাশয়ের তুষ্টি সাধিত হইবে। তাহাই বলা যাউক।

সন্ন্যাসী একদৃষ্টে নূতন কামিনীর রূপদর্শন করিতেছে। কামিনী জাতি দরিদ্রের গৃহবাসিনী হইলেও পুরুষ বধের নিমিত্ত গুটিকতক অস্ত্র সন্ধান করে, এই কামিনীটি সন্ন্যাসীর সম্মুখে বসিয়া ওষ্ঠের, নয়নের ও বসনবিন্যাসের সঙ্কেতে সুশানিত অস্ত্র সন্ধান করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী আত্মবিস্মৃত হইল; দেবদারু তলের অগ্নিকুণ্ড, শিবপূজার উপকরণ, গঞ্জিকার সরঞ্জাম, সমস্তই ভুলিয়া গেল। লোকে জানিত এই সন্ন্যাসী দিবারাত্রি উপবাসী থাকে, কেবল—গঞ্জিকাধূমেই প্রাণধারণ; এই রাত্রে কিরূপ উপবাস হয় দেখা উচিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরামানিকরূপী পরীক্ষক ইত্যগ্রে কতকগুলি জিনিস সেই ঘরে আনিয়াছিল। কামিনী সেই সকল জিনিসের মধ্যে একটি জিনিস সম্মুখে বাহির করিয়া সন্ন্যাসীকে বলিল, "বাবুজী! এই জিনিস অমৃততুল্য; ইহা সেবনে আনন্দলাভ হয়, নবজীবন লাভ হয়, সেবন করিতে করিতে পরিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তরুতলে বসিয়া, ধূনী জ্বালাইয়া, গঞ্জিকাধূম পান করিয়া তুমি ইষ্ট দেবতাকে ডাকিতে, ইষ্টদেবতা উত্তর দিতেন না; এখন দেখ দেখি, এই সঞ্জীবনী সুধা একপাত্র পান করিয়া দেখ দেখি কত আনন্দ হয়; দ্বিতীয় পাত্র গ্রহণে নূতন জীবনে তুমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে; তৃতীয় পাত্রের পর ইষ্টদেবতাকে ডাকিলে, উত্তর ত পাবেই, তাহার উপর আরও বেশী পাইবে, ইষ্ট-দেবতা যদি পুরুষ হন, মূর্ত্তিমান হইয়া তোমার চক্ষের কাছে দাঁড়াইবেন, দেবতা যদি প্রকৃতি হন, মূর্ত্তিমতি হইয়া তোমার হৃদয় মন্দিরে আসন গ্রহণ করিবেন। তাহা সুপ্রসন্ন হইলে তুমি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে।"

আধারে ধরিয়া ছিল, একপাত্র পূর্ণ করিয়া, সন্ন্যাসীর সম্মুখে ধরিয়া, মৃদু হাসিয়া কামিনী বলিল, "ধর, ইষ্ট দেবতার নাম কর, তিনবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া এই পাত্র পান কর; হাতে হাতে ফল পাইবে।"

( ৪ )

নিত্য নিশীথ সময়ে সন্ন্যাসী যে কার্য্যে ব্রতী হইত, সে কার্য্যে এ অঙ্গ ছিল কিনা এখন প্রকাশ নাই; মদিরাপাত্র সম্মুখে দেখিয়া সন্ন্যাসী একবার মুখ বাঁকাইল; বাঁকামুখে বলিল, "ছি, ছি,—ছি? অপেয়, অস্পর্শীয়, দুর্গন্ধ! উহা আমি খাইব না।"

পাত্রটি নামাইয়া রাখিয়া, অভিমানে মুখ ভারি করিয়া, চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কামিনী বলিল, "খাইবে না? আচ্ছা, যদি না খাও তবে থাক, আমি চলিলাম।

গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত কামিনী চলিয়া আসিল, শিবনেত্র হইয়া চাহিয়া চাহিয়া সন্ন্যাসী তাহা দেখিল; ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। পেটে পেটে সব আছে, বাহিরে কেবল ভস্মাচ্ছাদন, কামিনী চলিয়া যায়, আশা ফুরায়, এই লক্ষণ বুঝিয়া সন্ন্যাসী তখন অস্থির হইয়া দাঁড়াইল, শীঘ্র শীঘ্র নিকটে গিয়া মিনতি বচনে কহিল, "না সুন্দরি, না, যাইতে পাইবে না; যাহা আমাকে প্রদান করিতেছিলে, ফিরিয়া আসিয়া তাহাই আমাকে দাও; পদ্মে মধু থাকে, তোমার ঐ পদ্ম হস্তে ঐ জিনিস আমার পক্ষে অমৃততুল্য হইবে। আইস, যেখানে ছিলে, সেই খানে আসিয়া বস; যেমন করিয়া আমার মুখপানে চাহিতেছিলে, তেমনি করিয়া চাহিয়া থাক; যেমন করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলে, তেমনি করিয়া হাসো; যেমন করিয়া অমৃদান করিতেছিলে, তেমনি করিয়া, আমার হস্তে অমৃত দাও; এইবার আমি অমৃতপান করিব।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তে একবার অধর দংশন করিয়া, তখনি আবার বিদ্যুতের মত ঈষৎ হাস্য করিয়া, কামিনী ফিরিয়া আসিল, উভয়ে সম্মুখী হইয়া বসিল, মধুপাত্র তুলিয়া যত্নে কামিনী সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করিল। সন্ন্যাসী তখন ভাবে বিভোর; দর্শনেন্দ্রিয়কে কামিনী বদনে বিন্যস্ত রাখিয়া, স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা পাত্রটি ওষ্ঠের নিকটে তুলিল; সম্মুখের বস্তু ইন্দ্রজাল প্রভাবে যেমন উড়িয়া যায়, ঐ পাত্রে যাহা ছিল, সেইরূপে তাহা উড়িল; পাত্র শূন্য হইয়া গেল।

সন্ন্যাসী মদিরা পান করিল। কামিনী কি ভাবিল; বলা যায় না, কিন্তু অন্য লোকে তাহা দেখিলে নিশ্চয় মনে করিত, ঐরূপ মধুপাত্রের মান রক্ষা করিতে সন্ন্যাসীটি দিব্য অভ্যস্ত। ঔষধ ধরিল কি না ধরিল, সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কামিনী গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। বসন ভূষণে এ কামিনী যুবতী বাঙ্গালীর ন্যায়, কিন্তু এ কামিনী মাঝে মাঝে হিন্দী কথা কয়, এই আভাসে সম্বোধন

সময়ে বাবুরূপী সন্ন্যাসীটিকে বাবুজী বলে ; গল্প ধরিবার অগ্রে মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাবুজী ! এ গ্রামে তুমি আছ, চেহারা ঢাকা থাকে, তথাপি রূপ দেখিয়া আমরা মনে করিতাম তুমি একটি রাজপুত্র ; পুরুষেরা মনে করিত, তুমি হয়ত কোনও গুরুতর অপরাধে অপরাধী, পুলিসকে ফাঁকি দিবার নিমিত্ত ছদ্মবেশে লুকাইয়া আছ।

কোনও একটা ভয়ের কথা শুনিলে মানুষ যেমন সহসা শিহরিয়া উঠিয়া অঙ্গ সঞ্চালন করে, কথা শুনিয়াই মানুষ যেমন ক্ষণকাল থর থর করিয়া কাঁপে, কামিনীর শেষ কথা শুনিয়া, সেইরূপে শিহরিয়া সন্ন্যাসী বাবুটি দুই তিনবার সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন করিল। কামিনী বুঝিল ঔষধ ধরিয়াছে। কামিনী বুঝিল, কেবল ইহাই নহে, সন্ন্যাসী স্বয়ং তাহাকে সেই ভাবটি বুঝিয়া লইতে বাধ্য করিল ; কেন না, পাত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সন্ন্যাসী সেই সময় দ্বিতীয় পাত্র চাহিল। যেমন চাহিল, তৎক্ষণাৎ পাইল ; সন্ন্যাসী দ্বিতীয় পাত্র উদরস্থ করিল। একটু পরেই দ্বিগুণ স্ফূর্ত্তি ;——পূর্ব্বের আতঙ্কটা যেন কিছু কামল।

কামিনী বলিতে লাগিল,আচ্ছা বাবুজি ! পুরুষের অনুমানটা যদি মিথ্যা না হয়, পুলিস যদি তোমাকে ধরিতে আইসে, তাহা হইলে তুমি কি কর ? তরুতলে অগ্নি জ্বালিয়া সদাই তুমি শিব পূজায় রত থাক, নিত্য নিত্য উপবাসী থাক, দণ্ডে দণ্ডে গাঁজা খাও ; শিব, উপবাস, গাঁজা, ইহারা কেহই সুচতুর ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ্ পুলিশের হস্ত হইতে তোমাকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না ; সত্য যদি ডিটেক্‌টিভ্ আইসে, তাহা হইলে তখন তুমি কি করিবে ?

সন্ন্যাসীর অঙ্গ এই সময় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগে কাঁপিয়া উঠিল। সুস্থ হইবার আশায় কিম্বা ভয় ভুলিবার অভিলাষে সন্ন্যাসী এই সময় তৃতীয় পাত্র প্রার্থনা করিল।

কামিনী তখন যেন সেই সন্ন্যাসী বাবুটির চির বশীভূতা আজ্ঞা-বাহিকা কিঙ্করী, দ্বিরুক্তি না করিয়া, মৃদু হাসিয়া, সেই সুপাত্রের হস্তে তৃতীয় পাত্র সমর্পন করিল। পূর্ণ মাত্রা।

কামিনী ক্ষণকাল সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া, সময়োচিত শর সন্ধান করিতে লাগিল ; যখন দেখিল অবসর আগত, তখন ক্রমে ক্রমে মনের কবাট খুলিতে আরম্ভ করিল ;—প্রথমে কহিল, বাবুজি ! অতি চমৎকার রূপ তোমার ! ঐ মোহন রূপের ফাঁদে পড়িয়া যে রমণী তোমার প্রেমপাশে বাঁধা পড়ে, প্রাণে প্রাণে যে রমণীকে তুমি ভাল বাস, সে রমণী পরম ভাগ্যবতী। আমি—

রূপের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, সন্ন্যাসী সেই সময়ে একবার আপন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; দেখিয়া বুঝিল, কামিনীর কথাই সত্য; অতি চমৎকার রূপ আমার? যাহার মুখে আমার রূপের গৌরব তাহার রূপ খানিও মন্দ নয়? ইহার সঙ্গে যদি আমার নূতন ভাবে মিলন হয়, তাহা হইলে এজন্মে এই বাবুবেশ আমি পরিত্যাগ করিব না?

সন্ন্যাসী এইরূপ ভাবিল। বাস্তবিক কথাও ঠিক। সন্ন্যাসীর তখন সন্ন্যাসী বেশ ছিল না; পরিচ্ছদে মহামূল্য বেনারসী জোড়, বেগুণি রঙের উপর ময়ূরকণ্ঠ রং; দেহেরবর্ণ কার্ত্তিকের মত সুগৌর, সেই বর্ণের উপর ঐ বসনের বর্ণ উত্তম মানাইয়াছে; মুখখানি নির্ম্মল সুন্দর; দীর্ঘ নাসা, দীর্ঘ নেত্র, সূক্ষ্ম ওষ্ঠ, সেই ওষ্ঠ আরক্ত-রাগ-রঞ্জিত; ধনুকাকার-ভ্রূ, ক্ষুদ্র ললাট, সমস্তই পরম সুন্দর; সেই রাত্রে পরামাণিক তাহার গলায় একছড়া হার ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল, সেই ভূষণে রূপের আরও জলুস বাড়িয়াছে; সব ভাল কেবল মাথার চুলগুলি কদর্য্য;—তৈল বিরহে জটা বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছিল, পরামাণিক ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া সিঁথে কাটিবার যোগ্য চুলের বাহার রাখিয়াছে, কিন্তু সে চুলগুলি সূর্য্যতপ্ত পিঙ্গল-বর্ণ। তাহা হউক, ঐরকম চুল থাকিলে গৌরবর্ণ লোকগুলিকে বিলাতের সাহেবের মত দেখায়; সেটাও কম গৌরব নয়? বস্তুতঃ সন্ন্যাসীর রূপ অতি চমৎকার।

কামিনী পূর্ব্বে যাহা বলিতে ছিল, সন্ন্যাসীকে নিজ ভাবনায় অন্য-মনস্ক দেখিয়া, বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়াছিল, এই অবসরে তাহার সুর ধরিল,—বলিল, "আমি তোমার রূপ দেখিয়া ফাঁদে পড়িয়াগিয়াছি! নিত্য বৈকালে আমি নদীর ঘাটে জল আনিতে যাইতাম, যাইতে আসিতে তোমাকে দেখিতাম; দেখিয়া দেখিয়া মনে করিতাম, তুমি যদি কোনও কামিনীকে বিবাহ করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমি তোমার পায়ে ধরিয়া প্রেম ভিখারিণী হইব, ইহাই আমার বাসনা ছিল; সেই বাসনা এখনও আছে; তখন তুমি সন্ন্যাসী ছিলে, বাসনা ফলবতী হইবার বড় একটা আশা ছিল না, এখন তুমি বাবু হইয়াছ,— লজ্জার মাথা খাইয়া বলিতেছি,—এখন তুমি আমার সেই বাসনা পূর্ণ কর;— তুমি আমাকে বিবাহ কর!

প্রেমের আহ্লাদে মত্ত হইয়া মত্ত সন্ন্যাসী পূর্ণ চতুর্থ পাত্র গ্রহণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল, সুন্দরি! এতদিন তুমি এ আশা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলে, এতদিন প্রকাশ করিলে, এতদিনে কবে আমি হ্লাকর সন্ন্যাসের ভেকটা ছাড়িয়া দিতাম।

সন্ন্যাসীর ক্ষুধা হইল। প্রেমের ক্ষুধা অপেক্ষা জঠরের ক্ষুধা প্রবল ;— ক্ষণেকের জন্য প্রেম প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ক্ষুধার্ত্ত সন্ন্যাসী প্রেম ভিখারী প্রেম ভিখারিণীকে ক্ষুধার কথা জানাইল ; ক্ষুধা নিবারণের সর্ব্বাঙ্গ প্রস্তুত ছিল। সন্ন্যাসীর তণ্ডামী ভাঙ্গিবার উদ্দেশে, সেই চতুর পরামাণিক ইতিপূর্ব্বে একসের আন্দাজ মুরগীর মাংস পলাণ্ডু সংযোগে পাক করিয়া রাখিয়াছিল, কামিনী তাহা বাহির করিয়া দিল।

পঞ্চম পাত্র গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী আহার করুক, আমরা এই সময় ঐ কামিনীকে একটু ভাল করিয়া পরিচয় দিব।

( ৫ )

কামিনীর নাম মানকুমারী, নিবাসছিল ভাগলপুরে, একটা দুর্ভিক্ষের বৎসরে ইহার মাতা ইহাকে এই সাঁইপুর গ্রামে এক গোয়ালার বাড়ীতে ২০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া যায় ; ইহার বয়স তখন আড়াই বৎসর, এখন অষ্টাদশ বর্ষ। মানকুমারী ব্রাহ্মণ কন্যা ; এই ষোড়শ বর্ষ কাল গোয়ালার বাড়ীতে প্রতিপালিত হইয়াছে, ইহার বিবাহ হয় নাই ; কেন হয় নাই ঈশ্বর জানেন, গ্রামের কেহ কিন্তু ইহার চরিত্রের দোষ ঘোষণা করে না। মানকুমারী এখন এই সন্ন্যাসীকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে ; কি রকম দাঁড়ায় দেখা যাউক।

বড় বড় পাঁচ পাত্র মদ খাইয়া, মানকুমারীকে বিবাহ করিবার আশা পাইয়া মানকুমারী ছাড়া আর সকল কথাই সন্ন্যাসী যেন তখন ভুলিয়া গিয়াছিল, স্বচ্ছন্দে অম্লান বদনে একসের মুরগীর মাংস ভক্ষণ করিল, একটি বার নাসিকাও বক্র করিল না ; সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম, মুরগী খাইব কেন, সে কথাটা একবারও ভাবিল না। কথাটা আশ্চর্য্য বটে। ভাবিলেই যেন মনে হয়, এ সন্ন্যাসীর হাঁস মুরগী খাওয়া অভ্যাস ছিল।

রাক্ষসের মত গ্রাসে গ্রাসে কুক্কুট ভক্ষণ দর্শন করিয়া, মানকুমারী ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে একপাত্র মদ ঢালিল ; আপনি খাইল না, মানকুমারী হয়তঃ মদ খায় না,—খায় কি না খায় মানকুমারীই জানে, এখানে কিন্তু একবারও খাইল না ; বার বার ঢালিয়া সন্ন্যাসীর হস্তেই প্রদান করিল, সন্ন্যাসীও বার বার বেশী বেশী মাত্রায় মদ খাইল।

সময় বুঝিয়া মানকুমারী বলিল, "আর কেন ?—ওগো বাবুজি মশাই ! আর

নব প্রেমের আশায় উন্মত্ত হইয়া, আনন্দে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া, টলিতে টলিতে উঠিয়া, সন্ন্যাসী বাবু প্রেমোল্লাসে মানকুমারীকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিল, এমন সময় ধাক্কা মারিয়া গৃহদ্বার খুলিয়া তিনটি লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই ;—একজনের নাম রমেশ বাবু, তিনি একজন রাজার দেওয়ান; একজনের নাম ভূধর বাবু তিনি একটি পুলিশ থানার দারোগা ; একজনের নাম মহিমাচন্দ্র, তিনি ঐ রাজ-দেওয়ানের ভাগিনেয়।

তিনটি নূতন লোককে অকস্মাৎ প্রবেশ করিতে দেখিয়া, মাতাল সন্ন্যাসী শশব্যস্তে স্বস্থানে গিয়া বসিল, মানকুমারী একটু ঘোমটা টানিয়া দেয়াল ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল।

লোক তিনটি প্রবেশ করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার বাহির হইয়া গেলেন। হঠাৎ তাঁহারা যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন, এইরূপ লক্ষণ বুঝা যাইতেছিল। তিনটি লোকের মধ্যে দুইটি লোক সন্ন্যাসীর পরিচিত, কেবল দারোগাটি অপরিচিত। তাহারা যখন বাহির হইয়া যায়, তখন সেই ঘরের দরজাটা পূর্ব্ববৎ আবৃত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন ; সন্ন্যাসী একজন চতুর লোক ; সেই অবকাশে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই দরজার ভিতর দিকে অর্গল আঁটিয়া দিল। মাতালের বুদ্ধির কতদূর দৌড় দেখুন।

বুদ্ধির দৌড় অনেক দূর, মাতাল কিন্তু প্রেমানুরাগে আত্মবিস্মৃত। আসনে উপবেশন করিয়া অনুরাগী সন্ন্যাসী মানকুমারীকে নিকটে ডাকিল, হাসিতে হাসিতে নিকটে গিয়া মানকুমারী ঘোমটা খুলিল সন্ন্যাসী মুখ দেখিয়া একটু চমকিত ভাবে বলিল একি !——তোমার কপালে ঘাম হইতেছে! উহাদিগকে দেখিয়া তুমি কি ভয় পাইয়াছিলে? ছি ছি ছি! ভয়টা দূর করিয়া দেও! এমন সুখের সময় কি ভয় করিতে আছে? উহারা নূতন লোক, কোন ঘরে প্রবেশ করিতে কোন ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, ভুল বুঝিতে পারিয়া চলিয়া গেল। দেখিলে না, কেমন অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল? তুমি এক কর্ম্ম কর,—আর একপাত্র অমৃত পান কর? ভয় দূরে যাইবে, লজ্জা দূরে যাইবে, কপালের ঘাম শুকাইবে, মেজাজ আবার তাজা হইয়া উঠিবে।

সন্ন্যাসী কথা কহিল না, মানকুমারীর মুখের দিকে পিপাসী চক্ষু স্থির করিয়া রাখিল, অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করিয়া মানকুমারী মৃদু-মৃদু হাস্য করিতে করিতে

মদ্যপান করিবামাত্র মানকুমারী চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, আর দেরী করিও না, আপন কার্য্য সারিয়া লও, তুমি আমারে বিবাহ কর।

সন্ন্যাসীর মেজাজ সত্য সত্যই তাজা হইয়াছিল, নব প্রেমের নব অনুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল, বসিয়া বসিয়া মানকুমারীকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষে যুগল বাহু বিস্তার করিল। গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ হইবে, ফুলের মালা কোথায়? এই প্রশ্ন করিয়া মানকুমারী পশ্চাৎ দিকে একটু হেলিয়া বলিল, সন্ন্যাসী কি কথা যেন বলিতেছিল, বলিতে না দিয়া মানকুমারী আবার বলিল, আর একটা বাধা! নিত্য রাত্রে তুমি গুপ্তকুঞ্জে যে রমণীর সহিত কেলী-কৌতুক করিতে, কিম্বা কর, সে রমণী এখন কোথায়? তাহাকে পরিত্যাগ না করিলে আমি তোমারে বরমাল্য দিতে পারিব না, তাহাকে বরং আমি ডাকিয়া দিতেছি, ফারখৎ লিখিয়া এই রাত্রে অগ্রে তাহারে পরিত্যাগ কর, তাহার পর নূতন বিবাহ।

হস্তবিস্তার করিয়া সন্ন্যাসী বলিল, ঢালো—ঢালো—তুমি, আর এক পাত্র অমৃত ঢালো, এখনই আমি ফারখৎ লিখিয়া দিব।

দ্বারে করাঘাত। বাহির হইতে কাহারা যেন জোরে জোরে দরজায় আঘাত করিতেছে, মানকুমারী সেইরূপ বুঝিল, পুনঃ পুনঃ করাঘাত। মানকুমারী উঠিয়া অর্গল মোচন করিয়া দিল, পূর্ব্বের সেই তিনটি লোক পুনঃ প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসীর শরীরে থরহরি কম্প।

যে লোকটির নাম রমেশ বাবু, তিনি সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নগেন! তোমার এ দুর্দ্দশা কতদিন? আমাদের বংশের তিলক তুমি, গৃহবাস ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলে, সে কথা আমরা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় আছ, কোথায় ছিলে, ঠিকানা জানিতে পারা যায় নাই। এখন দেখিতেছি তুমি আবার বাবু হইয়াছ, ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের নামে কলঙ্ক দিয়াছ, শুনিতেছি, এ গ্রামের একটি রমণীর সহিত আসক্ত হইয়াছ, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি আবার এই নূতন রমণীটিকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। এই সুন্দরী যুবতী,—মানকুমারী কে,—সে পরিচয় তুমি জান?

( ৬ )

একটা কোনও অধিক আনন্দের সংবাদ পাইলে, অথবা আনন্দবর্দ্ধক কোনও প্রকার অপ্রিয় ঘটনা উপস্থিত হইলে, নেশাখোরের নেশা ছুটিয়া যায়, রমেশ

গেল, নেশার স্থানটি ভয় আসিয়া অধিকার করিল, সন্ন্যাসী তখন একটিও কথা কহিতে পারিল না, কম্পান্বিত-কলেবরে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

রমেশ বাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন, নগেন! তুমি আমাদের বংশের তিলক; বৎসরে পঞ্চাশ হাজার টাকা উপস্বত্তের সম্পত্তির মালিক তুমি; তোমার সেই পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই; তুমি সন্ন্যাসী হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছ, ইহা যে কত বড় পরিতাপের বিষয়, তাহা তুমি হয়তঃ জানিতে পারিতেছ না, কিন্তু তোমার পিতা একপ্রকার অন্ন জল ত্যাগ করিয়াছিলেন। নগেন! বাড়ীতে তোমার কোনও অভাব ছিল না, তোমার চরিত্রেও কেহ কোন দোষ ধরিতে পারেন নাই; হা পরমেশ্বর! পুলিসের লোকেরা বলে, তুমি কোনও গুরুতর অপরাধে অপরাধী? নগেন! সত্য যদি তুমি অপরাধী হইয়া নিজগৃহে বাস করিতে, তাহা হইলে কেহ সাহস করিয়া তোমাকে শীঘ্র সে কথা বলিতে পারিত না; বাটি হইতে পলায়ন করাতে পুলিসের মনে মহাসন্দেহ প্রবল হইয়াছে, আরও দশ জনেও তোমার উপর সন্দেহ করিতেছে। আমার সন্দেহ জন্মে নাই; তোমার বাল্য জীবন আমি জানিতাম, গৃহত্যাগের পূর্ব্বেও সুচরিত্র বলিয়া জানিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়া যাহা শুনিলাম, এই রাত্রে এই ঘরে যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহাতে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেছে; স্নেহের সঙ্গে ঘৃণা লজ্জা আর ভয়মিশ্রিত হইয়া আমার হৃদয়ক্ষেত্রকে যেন রণক্ষেত্র করিয়া তুলিতেছে, স্নেহের সঙ্গে বিরুদ্ধ বৃত্তি সমূহের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে। নগেন! অন্ধকার শূন্য পথ হইতে কে যেন আমাকে বলিয়া দিতেছে, তুমি অপরাধি, তোমাকে রক্ষা করিবার উপায় নাই!

রমেশ বাবু এই সব কথা বলিলেন। কথার ভিতর পাওয়া গেল, সন্ন্যাসীর নাম নগেন্দ্রকুমার রাঢ়দেশে নিবাস; নগেন্দ্রের পিতা ভূপেন্দ্রকুমার একজন স্বনামখ্যাত উচ্চদরের ভূম্যধিকারী, নগেন্দ্রের নিরুদ্দেশের পর লোকমুখে নগেন্দ্রের কলঙ্কের কথা শ্রবণ করিয়া বহু অন্বেষণেও নগেন্দ্রের কোনও সন্ধান না পাইয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া ভূপেন্দ্রকুমার দেহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। লোকে কাণাঘুষা করে, আত্মহত্যা। রমেশবাবু নগেন্দ্রকুমারের মাতুল; তাঁহার পূর্ণনাম রমেশচন্দ্র; নগেন্দ্রকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন,

স্নেহ টলিত ভালবাসা এককালে উন্মুলিত হইল; নগেন্দ্রকে তিনি কুলাঙ্গার স্থির করিলেন।

রমেশ বাবুর বাম অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল; লক্ষণে তিনি অমঙ্গল সিদ্ধান্ত করিলেন; বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া অকপটে তিনি তখন স্পষ্ট কথা প্রকাশ করিলেন; নগেন্দ্রের দিকে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, নগেন ! তোমাকে রক্ষা করিবার উপায় নাই ! প্রস্তুত হও ! আমরা এখানে তিনজনে আসিয়াছি, আমি আর মহিম তোমার আপনার লোক ছিলাম, এখন তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমাদের পর হইয়া গিয়াছ, তবু আমরা তোমার আপনার; এই যে তৃতীয় লোকটি ভূধর বাবু, ইনি হইতেছেন পুলিশের দারোগা; এক বৎসরের অধিক কাল ইনি তোমার তত্ত্ব করিতেছেন; বাহির করিতে পারিলেন না বলিয়া উপর হইতে ডিটেক্‌টীভ নিযুক্ত হইয়াছে। নগেন! হা হতভাগ্য কুলাঙ্গার! যে অপরাধ তুমি করিয়াছ, তাহা কি এখন মনে হয়? ওঃ! আমার যেন বাকুরোধ হইতেছে! নারীহত্যা! অবলা অচেতনে ঘুমাইতেছিল, তুমি তাহার গলায় ছুরি দিয়াছ! বিনাদোষে স্ত্রী হত্যা করিয়াছ! তোমাকে রক্ষা করিবার উপায় নাই! এই বাড়ীতেই ডিটেক্‌টিভ। একজন কি পাঁচজন তাহা তোমার জানিবার দরকার নাই, আছে এইখানে এইটুকু জানিয়া রাখিলেই তোমার গায়ের রক্ত শুকাইবে! দেবদারু বৃক্ষতলে কোনও কোনও ডিটেক্‌টিভ ছদ্মবেশে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ছিল, গল্প করিয়াছিল, গাঁজা খাইবার জন্য দুটি একটি পয়সাও দান করিয়াছিল; তুমি তাহাদিগকে চিনিতে পার নাই! যাহার সঙ্গে তুমি এই বাড়ীতে আসিয়াছ, সে ব্যক্তি কে তাহাও তুমি জান না। যে ব্যক্তি পরামাণিক হইয়া তোমার জটা মুণ্ডন করিয়াছে তাহাকেও তুমি চিনিতে পার নাই! কে তোমাকে মদ্য মাংস দিয়া পূজা করিয়াছে তাহাও তোমার অজ্ঞাত! সমস্তই ডিটেক্‌টিভ! সমস্তই ডিটেক্‌টিভ এই দারোগা মহাশয়টি সেই ডিটেক্‌টিভের দলের সঙ্গে আছেন।

নগেন্দ্রের মুখে বাক্যও নাই। নগেন্দ্র বসিয়া ছিল, এত কথা শুনিয়াও উঠিয়া দাঁড়ায় নাই; বোধ হয় তাহার তখন বাহ্যজ্ঞানের অভাব হইয়া থাকিবে; তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া রমেশবাবু আবার আরম্ভ করিলেন, ডিটেক্‌টিভ পুলিস বড় হুসিয়ার। কতরকম বেশধারণ করিয়া টিক্‌টিকিরা গিরিগিটী সাজে, বড় বড় বুদ্ধিমান লোকেও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আপনাদের বহুরূপী সজ্জা

ডিটেক্‌টিভেরা অনেক জায়গায় কার্য্যসিদ্ধ করে। তোমার অদৃষ্টে এখানেও মেয়ে ডিটেক্‌টিভরা বিরাজ করিতেছে। সন্ন্যাস ধর্ম্মের সেবা করিবার সময়ে এ দেশের লোক অঙ্গে ছাই মাখে, তুমি সেই সন্ন্যাস ধর্ম্মের—ধর্ম্মের মুখে ছাই দিয়া একজন বারবণিতার প্রেমদাস হইয়াছিলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণর প্রেমদাস হইতে পার নাই! সেই বারবণিতা একটা ডিটেক্‌টিভ! আর ইএ মানকুমারী?—গোয়ালা-পালিতা ব্রাহ্মণ-কন্যা, মানকুমারী একরকম কুলাঙ্গনা, বিবাহ করে নাই, প্রকাশ্যে অসতীও নয়, জ্ঞানোদয় হওয়াতে গোয়ালাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র একখানি কুটীর বান্ধিয়া বাস করে। গোয়ালা গৃহে গুপ্তভাবে মানকুমারী কিছু কিছু সঙ্গীত বিদ্যা শিখিয়াছিল; গৃহস্থবাটির অন্দরমহলে গীত গাহিয়া কিছু কিছু পায়, গ্রামে একটা কীর্ত্তনের দল আছে, মাঝে মাঝে মানকুমারী সেই কীর্ত্তনীর গীতের দোহারকি করে, তাহাতেও কিছু কিছু লাভ হয়; এই রকমেই মান কুমারীর দিন চলে। সরকারী ডিটেক্‌টিভেরা মধ্যে মধ্যে ঐ রকম মেয়ে ডিটেক্‌টিভের সাহায্য লয়। লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলি, মান-কুমারীর রূপে তুমি মোহিত হইয়াছ, মানকুমারীর হস্তে মদ খাইয়া মান-কুমারীকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছ, মানকুমারী তোমাকে বিবাহ করিবে, সেই আহ্লাদে মত্ত হইয়া আছ, তুমি জান না, তোমার ঐ মানকুমারীও একটি মায়া রূপিণী ডিটেক্‌টিভ! মানকুমারী তোমাকে ধরাইয়া দিল, হাস্যমুখী মানকুমারী এখন বিষধরী হইয়া তোমাকে দংশন করিল। মন্ত্রৌষধে কেহ তোমাকে বাঁচাইতে পারিবে না, বিধাতা পারিবে না, পরে অন্য কথা।

কেন জান?—গৃহে তুমি বিবাহ করিয়াছিলে, মনে কর, পতিব্রতা সাধ্বী কুলবধূ তোমার অঙ্কে শয়ন করিয়াছিল, তুমি জমীদারের পুত্র, পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক, কিছুই তোমার অভাব ছিল না, তথাপি কি দুর্ব্বুদ্ধি বশে সেই বধূমাতার অঙ্গের অলঙ্কার গুলি তুমি চাহিয়াছিলে, বালিকা, অজ্ঞান, সরলা ভালমন্দ বুঝিতে পারে নাই, বৃদ্ধাদের মত বালিকাদেরও অলঙ্কারের প্রতি বেশী মায়া, স্ত্রী জাতির স্বভাবই এই, বালিকা তাহার গায়ের নূতন গহনাগুলি তোমাকে দিতে চাহে নাই, সেই অপরাধে নিদ্রিত অবস্থায় তাহার গলা কাটিয়া অলঙ্কার-গুলি লইয়াছ! যখন তুমি পলায়ন কর, দাসিদের চক্ষে পড়িয়াছিলে, কাপড়ে রক্তের দাগ ছিল, দাসীরা গোলমাল করিলে বাড়ীর আর আর সকলে জাগিয়া উঠিল, তুমি তত্তক্ষণে রাস্তা পার হইয়া অন্ধকারে মিশিয়াছিলে, বাড়ীর লোকেরা সে অবস্থায় তোমাকে দেখিতে পায় নাই; দেখিয়াছিল কেবল পাঁচজন দাসী,

তোমার জোরে তাহারা পারিবে কেন, তাহাতে তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই; তুমি স্বচ্ছন্দে পলায়ন করিয়াছিলে! পুলিসের ভয়েই হউক, কিম্বা জ্ঞানকৃত স্ত্রীহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যেই হউক তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছিলে! গোড়ার কথাটাই সত্য; পুলিসকে ফাঁকি দিবার মতলব! শেষের কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই নহে। প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কেহ বারাঙ্গনাবিলাসে উন্মত্ত হয় না, মদ্য মাংসের লোভে তাদৃশ সন্ন্যাসী কোনও পরামাণিকের বাড়ীতেও যায় না, মানকুমারীর মত কোনও সুন্দরীকে বিবাহ করিতেও চায় না! তুমি জান, তুমি পরামাণিকের বাড়ীতে আসিয়াছ, বাস্তবিক এটা পরামাণিকের বাড়ী নহে, সরকারী পুলিসের থানাবাড়ী। এইখানে তুমি বন্দী হইয়াছ, আর তোমার নিস্তার নাই।

এত কথা শুনিয়াও নগেন্দ্রকুমারের চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল না, সে হয়ত তখন ভাবিতেছিল, কেন সন্ন্যাসী থাকিলাম না, কেন বাবু সাজিলাম? বাবু না সাজিলে এমন করিয়া পিঞ্জরের ভিতর বন্দী হইতাম না! তাহার যদি তখন বাক্‌শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে হয়ত তখন মানকুমারীকে বলিত, রাক্ষসী! তুই আমাকে গ্রাস করিলি!

রমেশ বাবু ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, নগেন! আমরা চলিলাম। এতদিন তুমি আমাদের ছিলে এখন পুলিশের হইলে! পুলিস এখন তোমার আত্মীয় অভিভাবক, পুলিস এখন তোমার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা! পুলিস লইয়া তুমি থাক, তোমাকে লইয়া পুলিস থাকুক, আমরা চলিলাম। পাঁচজন দাসী এক বয়ানে সাক্ষ্য দিয়াছে, তুমি কাটিয়াছ, সেই রাত্রে বাটী হইতে পলায়ন করিয়া তুমিও সাক্ষ্য দিয়াছ, তুমি কাটিয়াছ! আর তোমাকে রক্ষা করিবার উপায় নাই!

মায়া কাটাইয়াও রমেশ বাবু সম্পূর্ণরূপে স্নেহবর্জ্জিত হইতে পারিলেন না, ভগিনীপুত্রকে যৎকিঞ্চিৎ প্রবোধ দিবার অভিপ্রায়ে শেষ কালে তিনি কহিলেন, নগেন! তুমি নির্দ্দোষ হও, আমার এই কামনা থাকিল। সত্য যদি তুমি দোষী না হও, ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করিবেন। ধর্ম্ম যদি রক্ষা করেন, তবে অবশ্যই তুমি রক্ষা পাইবে। কেন না, আমি জানি, সরকারী তদারকে এখন অনেক ঘটনা হইয়াছে, যেখানে সত্য অপরাধী পলাতক, সত্য অপরাধীর সন্ধানে অক্ষম অথবা বিমুখ হইয়া অবস্থাঘটিত সামান্য প্রমাণে পুলিসের লোকেরা একজন নির্দ্দোষ নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে যৎপরোনাস্তি পীড়ন করে; ধরে না,—প্রকাশ্যরূপে

আপনারাও সেই নির্দোষ লোকের সম্মুখে যায় না, হটলোকের দ্বারা যথায় তথায় বিষম দৌরাত্ম করে। দুই এক দিন নহে, এক এক স্থলে ১০।১২ বৎসর সেই লোকটিকে পুলিস গুপ্তভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, লক্ষন জানিতে পারিয়া মনের কষ্টে সেই নির্দোষ লোকটি ছয় মাসের পথ, নয় মাসের পথ, যেখানেই যায়, খাতা হুরন্ত পুলিসের পরওয়ানা সেইখানে গিয়া সেখানকার বিগ্রহগণের দ্বারা সমভাবে উৎপীড়ন করে; তাহার পর যদি কোনও গতিকে পলাতক সত্য আসামী ধরা পড়ে, তাহা হইলে গোলমাল চুকিয়া যায়। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তোমার মোকদ্দমাও যদি সেই রকমে ফিরিয়া দাঁড়ায় যদি বাঁচিয়া থাকি, ঘরে বসিয়া সেই সংবাদ শুনিয়া আমি সুখী হইব; কিন্তু তোমার মুখ আর আমি দেখিব না —

( ৭ )

মহিমাচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া রমেশ বাবু প্রস্থান করিল। দারোগা রহিলেন, রমেশ বাবুর মুখে আর কোনও নুতন কথা শ্রবন করিবার বাকী ছিল না, ভাবিয়াই দারোগা তাহাদের প্রস্থানের কোনও আপত্তি করিলেন না। দারোগা রহিলেন, আর মানকুমারী রহিল। উভয়েই পুলিস, একথা পাঠকমহাশয়ের শুনা হইয়াছে; মানকুমারীকে ডিটেক্‌টিভ দারোগা বলা যাইতে পারে, এখন দারোগাতে আর আসামীতে কাজের কথা চলুক, আমরা এই অবসরে একটা পারিবারিক সম্বন্ধের কথা বলিয়া লই।

মহিমাচন্দ্র স্ব সম্বন্ধে রমেশ বাবুর ভাগিনেয়, সন্ন্যাসী নগেন্দ্রকুমারও রমেশ বাবুর ভাগিনেয়; এক জননীর গর্ব্ভে দুজনের জন্ম নয়, জননী দুইজন। নগেন্দ্র-কুমার যখন বাড়ীতে ছিল, তখন ঈর্ষা বশেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, মহিমাচন্দ্রের প্রতি তাহার অত্যন্ত হিংসা ছিল, মহিমাচন্দ্র আগে মরিলে নগেন্দ্রকুমার একাকী মাতামহের সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে, নগেন্দ্রের এইরূপ আশা ছিল। মাতামহের একমাত্র পুত্র ঐ রমেশ বাবু; রমেশ বাবু নিঃসন্তান, পৈত্রিক বিষয়ের উপর রমেশবাবু স্বয়ং অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন; তিনি একজন স্বাধীন রাজার দেওয়ান বেতনও বেশী, খরচ বাদে বর্ষে বর্ষে অনেক টাকা জমে, নগদ টাকাও অনেক; রমেশ বাবু ঐ উভয় ভাগিনেয়কে সমান সমান অংশ করিয়া দিয়া যাইবেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন. সেই লোভ নগেন্দ্রের ছিল। নগেন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইলে মহিমাচন্দ্রের আহ্লাদ হইয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইবে, যদি আহ্লাদ হইয়াছিল, তবে কেন মহিমাচন্দ্র আপন মাতুলের সঙ্গে এতদুর পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের অন্বেষণে আসিয়াছিল।

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, মহিমাচন্দ্র স্নেহ বশে নগেন্দ্রের অন্বেষণে আইসে নাই, মতলব ছিল। তরুণ বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া, সন্ন্যাসধর্ম্ম যদি ভাল না লাগে, তাহা হইলে সন্ন্যাসী আবার ফিরিয়া আসিয়া গৃহী হইতে পারে; উহাকে সংসার হইতে এককালে তফাৎ করিতে পারিলে, নিষ্কণ্টক হওয়া যায় মহিমাচন্দ্র সেই স্থির করিয়াছিল। নগেন্দ্রকুমার নারীহত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে, কমলা কথাটা প্রমাণ করাইয়া নগেন্দ্রকে ধরিয়া যদি পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে দায়রার জজের বিচারে নগেন্দ্রকুমারকে বৈতরণী পারে যাইতে হইবে, মহিমাচন্দ্রের মতলব ছিল তাহাই।

হইলও তাহাই। মানকুমারী হাসিতেছিল। "সন্ন্যাসি তোমার সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রেমনায়িকা এখন কোথায়," এই শ্লেষ ঝাড়িয়া, পুলিসের ক্ষমতায়, মানের গৌরবে মানকুমারীর মুখে হাসি আসিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে মানকুমারী বলিল, "সন্ন্যাসি! তুমি বর সাজো! প্রেম নায়িকা গর্ভবতী হইয়াছে, হইতেই পারে, আমি এখন ভাবিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার কিছু আইসে যায় না, আমি তোমারে বিবাহ করিব। তুমি বর সাজো! মনোহর বর সাজিয়া, এই মজলিসে তুমি আমারে বিবাহ করো। আমি টোপর আনিয়াছি, বালা আনিয়াছি, নূপুর আনিয়াছি, ফুলের মালা আনিয়াছি, তুমি বর সাজো!"

মানকুমারীর মুখে এই সকল কথা। কেবল কথামাত্র নয়, কথার সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর হাস্য, কুটিল কটাক্ষ, সুললিত অঙ্গুলি সঙ্কেত। আসামী গ্রেপ্তারের অগ্রে দারোগা বাবু গুলিকে হাসিতে নাই, এ দারোগার মুখেও হাসি নাই।

গম্ভীর বদনে উগ্রস্বরে আসামীকে সম্বোধন করিয়া দারোগা বাবু বলিলেন, "তুমি একজন মাননীয় জমিদারের পুত্র, সরকার জানিত মাননীয় রাজদেওয়ান রমেশ বাবুর ভাগিনেয় তোমাকে বন্ধন করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না, কি করিব, আইন বড় বক্র। তোমার মামলাটাও বড় বক্র। তুমি খুনী আসামী! প্রমাণের উপর সন্দেহ থাকিলে সন্দেহ করা যাইত, প্রমাণের কোনও অঙ্গে সন্দেহের কণা নাই। বিবাহিতা পত্নীর ব্যভিচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া স্বামী যদি স্ত্রী হত্যা করে, আইনের চক্ষে সে অপরাধ লঘু বোধ হয়, বিচারে দণ্ডও অল্প হয়, তোমার অপরাধ সে প্রকার নহে, বিনাদোষে বালিকা পত্নীকে তুমি কাটিয়াছ, তুমি যতবড় নিষ্ঠুর, তোমাকে গহনা পরাইয়া দিলে আমি কদাচ তত বড় নিষ্ঠুর হইব না।"

এইরূপ বক্তৃতা করিয়া দারোগা বাবু একবার মানকুমারীর ঘূর্ণায়মান চক্ষের

দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। মানকুমারীর বস্ত্র মধ্যে ক্ষুদ্র একটি ঘণ্টা লুকায়িত ছিল, দারোগার সংকেত বুঝিয়াই, মানকুমারী তিনবার সেই ঘণ্টাটি বাজাইল। রমেশ বাবু বাহির হইয়া যাইবার পর ঘরের দরজায় একটা পরদা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ঘণ্টাধ্বনি হইবার অব্যবহিত পরেই, সড় সড় করিয়া সেই পর্দাটা সরিয়া গেল, পুলিশের পোষাকপরা একজন দাড়িওয়ালা লোক প্রবেশ করিল। প্রবেশকারী লোকটি দারোগাকে সেলাম দিল, নাকের কাছে অঙ্গুলি তুলিয়া, অভ্যর্থনা করিয়া দারোগা বলিলেন, "এসো ইস্‌মাইল!"

ইস্‌মাইল খাঁ কতকগুলি জিনিস আনিয়াছিল, অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া মানকুমারী সেই জিনিসগুলি গ্রহণ করিল, দারোগার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "জমাদার সাহেব আমাদের বিবাহের সজ্জা আনিয়াছেন,—সন্ন্যাসীর সম্মুখে গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই লও সন্ন্যাসি, এগিয়ে এসো, বরসজ্জা উপস্থিত সাজো।"

যেমন অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী, এ নাটকে সেইরূপ অপূর্ব্ব ক্রীড়া মানকুমারী স্বহস্তে তখনকার বাবু সন্ন্যাসীটিকে দিব্য বর সাজাইয়া দিল,—হাতে, পায়ে, গলায়, মাথায় ভাল ভাল গহনা পরাইল;—মাথায় উঠিল—আগা সরু রক্তবর্ণ কাগজের টুপি, গলায় উঠিল লম্বা একছড়া ওড়ফুলের মালা, হাতে উঠিল দিব্য লৌহময় প্যাঁচ কলের বালা, চরণে নূপুরের জায়গায় নূতন শৃঙ্খল, চলিয়া যাইবার সময় ঝুমুর ঝুমুর করিয়া বাজে বেশ!

ঝুমুর ঝুমুর বাজিতে লাগিল, আসামী লইয়া ডিটেক্‌টিভেরা অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভূধর বাবুর তখন ইউনিফরম পরা ছিল না সুতরাং তিনি তখনও একজন ডিটেক্‌টিভের মধ্যে গণ্য, ইস্‌মাইল খাঁ সে ক্ষেত্রে ডিটেক্‌টিভের জমাদার।

এইখানেই যবনিকা ফেলিয়া দিতে হইল। সে রাত্রে আসামী রহিল থানায়; মধু ঘোড়া পেষণে পেষণে কবুল করিল খুন, থানা হইতে আসামী গেল ম্যাজিষ্ট্রেটের হুজুরে, তারপর দায়রা। এতাদৃশ অভিযোগে দায়রার বিচার ফল যেরূপ, হয় পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন, আমরা তাহা লিখিতে পারিলাম না।

আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রের কোনও কোনও ছলান্বেষী মহাপুরুষ হয়তঃ তর্ক তুলিতে পারেন, এত বড় গল্পটাতে নীতিসার কি পাওয়া গেল?—সমাজে যাঁহারা মরালগুণ-বিশিষ্ট, তাঁহারা বুঝিবেন সমস্তই নীতিসার। দিন দিন আমাদের দেশে ছাইমাখা সন্ন্যাসীর সংখ্যাটা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতেছে। ছাই মাখিয়া গাঁজা খাইতে

পারিলেই মানুষেরা সন্ন্যাসী হইতে পারে, ঐ দলের মধ্যে হয়ত অনেকের এই-প্রকার সংস্কার। বুদ্ধদেবের অথবা চৈতন্যদেবের সুপবিত্র সন্ন্যাস ধর্ম্ম কিরূপ, এখানকার অনেক সন্ন্যাসী বোধ হয় তাহা জানা নাই; রাজদণ্ড এড়াইবার মতলবে কত লোক সন্ন্যাস দণ্ড গ্রহণ করে, প্রেমের দায়ে কতলোক সন্ন্যাসী হয়, দলের ভিতর হইতে তাহা বাছিয়া বাহির করা নিতান্ত দুষ্কর। বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে এই এক দৃষ্টান্ত নগেন্দ্র সন্ন্যাসী। যথার্থ সন্ন্যাসী ঠাকুরগুলিকে আমরা প্রণাম করিয়া, আমরা নিবেদন করিতেছি, পন্থাবিহারী সন্ন্যাসীগণ সতর্ক হউক, ভস্ম লিপ্ত রক্তনেত্র কৌপীনধারী মনুষ্যগুলিকে দেখিলেই সন্ন্যাসী বলিয়া ভক্তি করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহারাও সতর্ক হউন।

( সমাপ্ত। )

——:(*):——

# শান্তিলাভ।

লেখিকা—শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

( ১ )

সহস্র কুবের রত্ন—ক'ব তা' কাহারে—
ছিল মোর অধিকারে—অক্ষয়-ভাণ্ডারে,
ছিল ধন অগণিত, ছিল পরিজন—
মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, খুড়া-খুড়ি যত,
জ্যেষ্ঠতাত জেঠী, পিসা-পিসী, মামা-মাসী,
পুত্র-কন্যা, দাস-দাসী, আত্মীয়স্বজন,
প্রতিবাসী আসি' কত—সম্বন্ধ স্থাপিয়ে
রহিত নিয়ত নিত্য নিকটে আমার।
সতত উৎসব-উৎস উঠিত আলয়ে,
ছিল ধন-জন-রত্ন বিষয়-বিভব—
সম্মান-সমুচ্চ-শিরে ছিনু সমাসীনা,
বাসিত সকলে ভাল, তুষিত আদরে,
রহিত নিয়ত সাথে মোর তুষ্টি তরে,
শশাঙ্ক, বেষ্টিত যথা রহে তারাদলে।
সকলি সংসারে ছিল, বিনা 'শান্তি'-নিধি,
ছিল না অন্তরে সুখ, বিনা সেই ধন,
সতত বিবাদ, আর বাদ-বিসংবাদে
হইত বিগত দিবা নিশা একভাবে,
হ'য়েছিনু সুখ-হারা শান্তির অভাবে।
কাঁদিতাম ক্লান্ত-মনে বসিয়া বিজনে,
ডাকিতাম সকাতর দেব নারায়ণে
করিতে আমারে ত্রাণ, সংসার সঙ্কটে,
দারুণ-পীড়নে যা'র, উন্মাদিনী-প্রায়
হ'য়েছিনু' জ্ঞানহীনা আমি অবশেষে।

( ২ )

উপজিল, এ দাসীর, কাতর-রোদন
নারায়ণ সন্নিধানে ! কিছু কাল পরে
সদয় হইয়া বিভু—উদাসীন-বেশে
দিলেন দর্শন আসি' মদীয় আলয়ে।

হিত-শিক্ষা হেতু যাতা কহিলেন ক্রমে
কর্ত্তব্য আমার যাহা—নশ্বর সংসারে।
আশীর্ব্বাদ করি' অন্তে ত্যজিলা আলয়;
নারিনু চিনিতে তাঁরে বুদ্ধির বিকারে।

( ৩ )

যুক্তিমত তাঁ'র আমি শর্ব্বরীর শেষে
প্রবেশি শুদ্ধান্ত-পার্শ্ব-সুরম্য আরামে
হেরিনু' কুসুম-কলি ফুটিছে নীরবে
উষার পূর্ব্বের স্নিগ্ধ সমীর পরশে,
দুলি'ছে ব্রততী ব্রতে প্রণয়-প্লাবনে,
উঠি'ছে সলিলে উর্ম্মি অনিল-চালনে
কাঁ'পিছে কমলকুল 'পদ্ম সরোবরে',
কদাচিৎ পক্ষি-পক্ষ-শব্দ বিধূনন
পশিছে শ্রবণ-পথে তরু-শিরঃ হ'তে।
বহিছে প্রসূন-বাস দিক্ আমোদিয়া—
হাসিতে'ছে প্রকৃতি রাণী আপনার ভাবে।
স্মরি' 'গুরু'—অবগাহি' স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ-নীরা
'পদ্মসরোবর'-নীরে—অতীব আহ্লাদে,
হেরিনু' সু-তীরে তার', নারী নিরুপমা,
উজ্জ্বল আয়ত-নেত্রা, সু-শুভ্র বরণা,

প্রসন্নবদনা, হাস্যময়ী মনোরমা,
বিভাসিত দশদিক স্বরূপ-প্রভায়।
সংযতে কহিলা দেবী—অমৃত বরষি'
"পূর্ণ মনস্কাম বাছা! তোর এতদিনে,
দুঃখ-নিশা-অবসান, সুখ-ভানূদয়ে।
নশ্বর অলীক যাহা সুসার ভাবিয়া
করি'ছ আদর অতি আত্ম-সুখ-হেতু,
কর সমর্পণ তাহা দেব নারায়ণে।
করহ নিষ্কাম কর্ম্ম—বাসনা বর্জ্জিয়া,
প্রবৃত্তির পাপবৃত্তি কর পরিহার,
নিবৃত্তি আশ্রয়ে আমি রব' তব কাছে,
'আমার বলিয়া মাত্র জ্ঞান নারায়ণে'।
ধন জন-রক্ত-মায়া সম্যক্ বিনাশে
পাইবে 'শান্তি'রে তব চির দাসীরূপে,
ঘুচিবে বিষম বিঘ্ন, চিরদিন তরে।"

( ৪ )

পাইনু' পরমপ্রেম শ্রীগুরু প্রসাদে,
নষ্ট হ'ল জ্ঞান-সূর্য্যে অজ্ঞান আঁধার,

টুটিল মায়ার শক্তি, ঘুচিল সংশয়,
লভিনু' 'শান্তি'রে চির সহচরীরূপে।

—৪০২—

# অলকা।

## লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

মেঘদূত বিহারী কালিদাসের অমর দীর্ঘশ্বাস, ইহাতে একটী মাদকতা, একটি ব্যাকুলতা বর্ষা পবনে যুথি-পরিমলের মত মিশিয়া আছে। শ্রাবণের মালতী গুচ্ছের মত মেঘদূত কবির সুন্দর ভাবের সমষ্টি। বিরহী যক্ষ বিরহী কালিদাসের-ছদ্মবেশ মাত্র, শিখরীদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী যক্ষ বধূ কবির বিরহক্লিষ্টা প্রিয়-তমার কল্পনা-ছবি। আমরা মেঘদূতের মধ্যে দিয়া কালিদাসের হৃদয়ের একখানি করুণচিত্র দেখিতে পাই। সুদূর প্রবাসে কবি বরষার মেঘাবৃত আকাশ পানে চাহিয়া যে একটি অভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই মেঘদূতের ভিত্তি। অলকাকে কবির জন্মভূমির আদর্শ কল্পনা ছবি ( idealpicture ) বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বিদেশে বসিয়া কালিদাস কল্পনা-চক্ষে প্রিয় জন্ম ভূমিকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার মোহিনী তুলিকায় রঞ্জিত করিয়া ফুটাইয়াছেন। মিল্টনের বর্ণিত স্বর্গে যেমন লণ্ডনের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, কালিদাসের অলকাতেও তাঁহার জন্মভূমির একটী ছায়া পড়িয়াছে বুঝিতে পারা যায়। অলকা কবিকল্পনার বাসস্থান,—মানবকল্পনা আর ইহার ঊর্দ্ধস্ত চিতে পারে না। কবি-জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু দিয়া অলকার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, যাহা কিছু প্রিয়দর্শন, যাহা কিছু সুখদায়ক এবং যাহা কিছু মধুর কালিদাস বাছিয়া বাছিয়া অলকায় সজ্জিত করিয়াছেন। অলকা সৌন্দর্য্যের রাজধানী!

কবি অলাকে কোথায় স্থাপন করিয়াছেন, দেখুন,———

"তস্যোৎ সঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্ত গঙ্গাদুকুলং
নত্বং দৃষ্টা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিণন্।"

দেবগিরি কৈলাস দেবাদিদেব মহাদেবের বাস স্থান, পতিত-পাবনী মন্দাকিনী স্রোতস্বিনী কুলের অগ্রগণ্যা, কবি তাই অলকাকে প্রণয়ী কৈলাসের তৎসঙ্গে স্রস্ত দুকুলা প্রণয়নার ন্যায় স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের অযোধ্যা সরযূর তীরে আমাদের বৃন্দাবন যমুনার তীরে, আমাদের তীর্থস্থানগুলি, আমাদের সুন্দর নগর মাত্রেই কোন না কোন নির্ম্মল সলিলা স্রোতস্বিনী তটে অবস্থিত। কালিদাস যদি তাঁহার অলকাকে সুরধুনীর তীরে স্থাপিত না করিতেন, তাহা হইলে ইহাতা

অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য হানি হইত। অলকায় কিছুই অসম্পূর্ণ নয়, সকলই পূর্ণ, সকলই সুপরিণত। অলকার প্রাসাদগুলি অভ্রভেদী, পাদপগুলি নিত্যপুষ্প, ভ্রমর মুখর, সরোবরগুলি কুমুদকহ্লারে পূর্ণ, ভবন শিখিগুলি সমুজ্জ্বল কলাপ ধারণ করিয়া কেকারবের জন্য উদ্‌গ্রীব রজনীচির জ্যোৎস্নাময়ী। অলকায় দুঃখ নাই কন্দর্প তাপ ভিন্ন তাপ নাই, প্রণয় কলহ ব্যতীত অন্য কারণ প্রয়োজন বিরহ নাই, যৌবন ভিন্ন অন্য বয়স নাই। অলকায় দুঃখ নাই বটে, কিন্তু অশ্রুজলের অভাব কবি রাখেন নাই। কারণ, আনন্দাশ্রুতে যেখানে যক্ষ ও যক্ষ বধূগণের ললিত গণ্ডদেশ প্লাবিত। কবি অন্য তাপ রাখেন নাই বটে, কিন্তু মদন তাপকে অলকায় স্থান দিয়াছেন, কারণ, ইহাতে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে——'পত্রাণামি শোষনেন মরুতা পৃষ্ঠা মাধবী লতাইব' যুবতীরা ইহার স্পর্শে 'শোচ্যাচ প্রিয়দর্শনচ্চ' হইয়া উঠেন। যেখানে প্রেমমূর্ত্তিমান, সেখানে বিরহ বড়ই মধুর! বিরহ সকলই 'শ্যামময় করিয়া তুলে'—

"ত্রিভুবন মপি তন্ময়ং বিরহে।"

কালিদাস অলকায় কুসুমের অভাব রাখেন নাই। কিন্তু কোনটীই তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। যুবতীগণের হস্তে রাখিবার জন্য লীলাকমল, অলকের জন্য কুন্দ, কণ্ঠ শোভার পরাগের জন্য লোধ্র, কেশ-রঞ্জনের জন্য কুরবক. কর্ণের জন্য শিরিষ এবং সীমন্ত শোভার জন্য নীপকুসুম সৃজিত হইয়াছে। অলকায় কল্পবৃক্ষ বিরাজিত, অন্য কোন অভাবেরই সম্ভাবনা নাই। একা কল্পবৃক্ষ—বাস, ভূষণ, মধু, রূপরস সমস্তই উৎপাদন করিতে সক্ষম।

অলকায় সুখ মূর্ত্তিমান। সর্ব্বদাই নৃত্য, বাদ্য, গীত, হাস্য ক্রীড়া, কৌতুক। দুঃখ ক্লেশ অলকার সীমায় পঁহুছিতে পারে না।

অলকায় বৈভ্রাজক নামক সুরচিত উদ্যান, অলকায় মন্দাকিনী সুবর্ণ বালু কাময়ী, তীরভূমি ছায়াপ্রধান মন্দার তরুতে আবৃত যক্ষ বালিকাগণ স্বর্বণ কমলের মত তথায় বসিয়া থাকে না, সেখানে মুক্তা, প্রবাল, চন্দ্রকান্ত, নীলকান্তমণি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে,। চন্দ্রাতপ হইতে লম্বমান চন্দ্রকান্ত মণি সুধাংশু কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া শীতল জলকণা নিঃসারিত করিয়া কামিনীগণের শ্রম বিনোদন করিয়া থাকে। অলকার পবন মন্দাকিনীর পূত সলিল কণাবাহী কুসুম পরিমলে সুবাসিত। কোন মলিন দ্রব্য অলকায় স্থান পায় নাই।

# পরমকল্যাণ গীতা।

## লেখক—শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।

### বলিদানার্থ জীবহিংসা বিবরণ।

মনুষ্য হইতে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত জীব মাত্রেই সমভাবে ব্রহ্মরূপ ও সকলেই সমানভাবে সুখ দুঃখ অনুভব করে। মনুষ্য আহত ও ক্ষুৎপিপাসার যেরূপ কাতর হয়, অন্যান্য জীবেরও সেইরূপ। যে কারণে কষ্ট বা হত্যা করিলে পাপ হয় বা অন্যায় কর্ম্ম বলা হয়। সে কারণে অন্যান্য জীবহত্যারও সেই ফল। কতকগুলি গৃহপালিত পশু মনুষ্যের বিশেষ উপকারি. গরু, মহিষ, ঘোড়া উঠ, হাতী ইত্যাদি ইহারা কি হিন্দু কি ইংরেজ খৃষ্টান সকলেরই সমান উপকার করে। গাভী মহিষ যেমন হিন্দুর ঘরে দুগ্ধ দেয়, সেই প্রকার খৃষ্টানের ঘরেও দুগ্ধ দেয়। বৃষ যেমন হিন্দুর চাষে লাগে, সেই প্রকার অন্য জাতীরও চাষে লাগে। এই প্রকার সকল জীবই মনুষ্যের সমান উপকার করে। এই সকল জীবের মৃত্যুর পর উহাদিগের চামড়ায় জুতা আদি নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এমন কি ইহাদিগের বিষ্ঠা শুকাইয়া রন্ধনের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। এ প্রকার উপকারী জীবগণকে জীহ্বার আস্বাদ চরিতার্থের জন্য হত্যা করা কতদূর কৃতঘ্নতার পরিচয়। উপকারী জীবগণকে মনুষ্য মাত্রেরই রক্ষা করা উচিত।

জীবহত্যা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে, রক্ষা করাই সকলের মঙ্গল কর। পরমেশ্বর মনুষ্যের উপযোগী বিবিধ সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করিয়াছেন। তথাপি যদি আমাদের জন্য একান্তই মাংস আহার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বিচার পূর্ব্বক অব্যবহার্য্য জীব পশুর মাংস আহার করা উচিত। কিন্তু পরমেশ্বরের নামে অর্থাৎ দেব দেবী নামে বলি দিতেছি বলিয়া আপনাদিগের লালসা তৃপ্তির জন্য কিম্বা পুত্র কন্যাগণ নিজ পিতা মাতা আত্মীয়গণের কোন মঙ্গলের জন্য বা মঙ্গল কামনা করিয়া পরমেশ্বরের নামে বলিদান দিবে না। ইহাতে বিশেষ অমঙ্গল হইবে। জীব মাত্রই পরমেশ্বরের সন্তান। যেমন তোমার সন্তান কাটিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতে ইচ্ছা করা মূর্খতা, সেই প্রকার জীবহত্যা দ্বারা পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা করিলে বিপরীত ফলোৎপত্তি হয়।

মেষ মহিষ ছাগল প্রভৃতি অবলা জীব দিগকে দেব দেবীর নামে বলিদান কর; কিন্তু বলিদানের ফল ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে লেখা আছে যে, পশুর শরীরে যত লোম আছে, পশু হত্যাকারীকে তত হাজার বৎসর দণ্ড ভোগ করিতে হয়। সুরথ রাজার ইতিহাসে এ বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। অবিচার কর্ম্মের ফল নিতান্ত দোষনীয় ও অমঙ্গল কর। তোমরা যে কালী দুর্গা মার নামে বলিদান কর, তাহা কি কালী মাতার ভোগে আইসে? প্রথমে কাটিবা মাত্র উহার রক্ত মাটিতে পড়িয়া যায়। চামড়া ছাড়াইয়া ঢোল প্রভৃতি হয়। হাড়ও বিক্রয় হয়। মাংসে আপনাদিগের উদর পূর্ণ জিহ্বা চরিতার্থ কর। পাঁঠার আর কি বাকি রহিল যাহা কালী-মা দুর্গা-মা আহার করিলেন ও প্রসন্ন হইয়া মুক্তহস্তে বরদান করিবেন।এরূপ বিচার বুদ্ধি ও কর্ম্মকে শত শত ধিক্কার। আপনারা পশু হইয়াছ এবং কালী মায়ের পূজা পণ্ড করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। এ প্রকার মাতৃভক্তি পূর্ব্বকালে অতি বিরল ছিল। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ গুরু মাতা পিতারই নাম কালী দুর্গা স্বরস্বতি দেবীমাতা। পাথরের নাম কালী দুর্গা স্বরস্বতী মাতা নহে। নিজে পাথর জড় হইয়া শুদ্ধ চেতন্যময় জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাকেও জড় পাথর মনে করিতেছ। মাটী পাথর প্রভৃতির প্রতিমা করিয়া তাহাকে কালী-মা দুর্গা-মা বলিতেছ, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ, জগতের হিতার্থে সময় সময় শরীর ধারণ করিয়া কালী দুর্গা কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি নামে অবিহিত হন।

এবং কার্য্য সমাপ্তে শরীর ত্যাগ করিয়া পূর্ণরূপেই স্থিত থাকেন। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপের নামই দেব দেবীমাতা। নচেৎ মনুষ্য স্থাপিত পাথর প্রভৃতি কাটীয়া মুর্ত্তি প্রস্তুত করার নাম দেব দেবীমাতা নহে। সকল দেব দেবী মাতা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের মুখ অগ্নি। উত্তম উত্তম দ্রব্য হোম করিলে দেব দেবীমাতা প্রত্যক্ষ অগ্নি মুখে আহার করেন ও প্রশন্ন হন। তাহা না করিয়া পাথরের সম্মুখে তাহার নামে পাঁঠা বলি কর অথচ কালীমাকে জগত জননী পরম বৈষ্ণবী বল। যিনি জগত জননী তিনি কি পাঁঠার জননী নহেন? পরম বৈষ্ণবীকে কি তাহার সন্তান আহার করিতে দিলে তিনি কি অধিক সন্তুষ্ট হন? ইহা অতি বিচিত্র মাতৃভক্তি ও শ্রদ্ধা। কালী মাতার নামে এক ছটাক ঘৃত বা এক পয়সার তিল যব চিনি ধুনা দিতে বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু পাঁচ সিকার পাঁঠা দিতে কাতর নহেন, কারণ উহাতে কালীমাতা যত প্রশন্ন হউন আর না হউন পাঁঠা খাওয়া অনিবার্য্য। [illegible]

গহনা দিলে বহুফল এই প্রকার প্রকাশ করেন। স্বার্থ পরবশ হইয়া লোকে কি না করিতে পারে। কিন্তু যাহারা দেব দেবীমাকে নানাপ্রকার ভূষণাদি দেন, তাহাদিগের ত কিছু বিচার করিয়া দেখা উচিত। যিনি কালী-মা তাঁহাকে কে চিনে, ও কে দেখিয়াছে যে পাথরকে কালী-মা বলে তাহার কি কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে? যাহাতে মনুষ্যের ন্যায় তাহার সুখ দুঃখ লজ্জা বোধ হইবে। এক এক পয়সা দর্শনি লইয়া পরিবার প্রতিপালন করিবেন। একবার ভাবিয়া দেখ না যে কি করিতেছ। পরমাত্মা যে মনুষ্যদিগকে জ্ঞান দিয়া অন্যান্য পশু হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, ইহাই কি সেই জ্ঞানের পরিচয়। কতক লোক স্বার্থ-পরবশ হইয়া এবং কতক মূঢ়তা বশতঃ জগত মাতা পিতাকে কতদূর অপমান করিতেছ, তাহার সীমা নাই। এবং তাহার ফল স্বরূপ দুঃখ দরিদ্রতা বল তেজঃহীন হইয়াছেন ও হইতেছেন। এখন সেই বিষের জ্বালায় জ্বালায় জগত জ্বলিয়া মরিতেছে। কেহই তাহা দেখিতেছেন না, অহংকারে অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন। যে জগত মাতা পিতা গুরু তোমাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য কত পরিশ্রম করিতেছেন তোমরা কৃতঘ্ন হইয়া তাঁহার অবমাননা করিতেছ। অথচ তাঁহাকে ভক্তি সেবা করিতেছ বলিয়া থাক, তোমাদিগের এ প্রকার ভক্তি সেবাকে শত শত ধিক্কার। এবং তোমাদিগের মানব জন্মকেও ধিক্কার, এ প্রকার মানব অপেক্ষা পশু শ্রেষ্ঠ।

দয়াময় মাতা পিতা এখন তোমাদিগের প্রতি দয়া করিতেছেন, তাঁহাকে চিনিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা উপাসনা কর। তিনি প্রসন্ন হইয়া নিজগুণে জগতের কল্যাণ করিবেন। যথা শক্তি উত্তম উত্তম পদার্থ আহুতি কর। অভাবে আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে যাহাপার তাহাই আহুতি দেও। যদি কেহ একেবারে অসমর্থ হও উহাতে চিন্তা করিও না, তাঁহাকে পূর্ণরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা উপাসনা কর, সকল প্রকার মঙ্গল হইবে।

পরমাত্মার নামে কোন ও প্রকার জীব হিংসা করিবে না আজ হইতে যিনি আপন মঙ্গল কামনায় দেব দেবীর নামে বলিদান করিবেন, তাঁহাকে জন্ম জন্ম পাপ ভোগ করিতে হইবেক, এবং স্ববংশে বিনাশ হইবে। প্রত্যক্ষ এখনই নানা-প্রকার কষ্ট পাইতেছ, অধর্ম্মে আরও কষ্ট পাইবে। এখন হইতে মিথ্যা প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া সত্য অবগত হও। সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য এবং শত্রুকে মিত্র এবং মিত্রকে শত্রু মনে করিও না। আসন্ন কালে সকলেরই বিপরীত বুদ্ধি হয়, তোমাদিগেরও সেই দশা হইয়াছে, যাহাতে এই দুর্দ্দশা হইতে

# "স্বধর্ম্ম।"

লেখক—শ্রীহরকুমার সেন।

আহা! যখন আর্য্যকুল-গৌরব ঋষিবৃন্দ পুণ্যভূমি নৈমিষারণ্যে মনোহর আশ্রমে উপবেশন করিয়া সমতাল ও সমস্বরে দেবাদিদেব বিশ্বনিয়ন্তার স্তব স্তুতি করিতেন, কখনও বা ভাবাবেশে ভগবদ্ভক্তি সুধা পান করিতে করিতে তৎব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিভোর হইতেন। যখন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসন্তানগণ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব মনে করিতেন, যখন ভারতের প্রত্যেক সনাতন মতাবলম্বী সামাজিক সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বজাতি সেবায় তৎপর থাকিতেন; যখন ভারতের সৌভাগ্য আকাশে সনাতনধর্ম্ম সমভাবে উদিত থাকিয়া সমগ্র আর্য্যজাতিকে আলোকিত করিত তখন ভারতে কি আনন্দের স্রোতই প্রবাহিত হইত। আজ যদিও তাহা স্বপ্নের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে, কিন্তু তাহা স্বপ্নের ন্যায় অলীক নহে। আজিও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সন্তানগণ ভারতের অমৃতময় পুরাণ কথা স্মরণ ও শ্রবণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন ভাষায় লিখিয়া পুণ্যভূমি ভারতের মাহাত্ম্য আমরা অধিক আর কি কীর্ত্তন করিব। অনেক সময় পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ এই পুণ্যভূমি ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারতকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

হায়! এক সময়ে যে ভারতবর্ষ সুখ শান্তিতে স্বর্গের ন্যায় সুখময় স্থান ছিল—আজ সেই ভারতকে রোগ শোকময় হাহাকারপূর্ণ দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণ কুটীরের ন্যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কালের কি অপ্রতিহত গতি——! অকস্মাৎ দেববাঞ্ছিত ভারতের এইরূপ—অবস্থান্তর অবলোকন করিলে কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তির প্রাণে আঘাত না লাগে? কিন্তু আর্য্য সন্তানগণ আজ ভারতের এই দুঃসময়ে নীরব ও নিরুৎসাহ হইয়া রহিয়াছেন ইহার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। আজিও সেই ভারতবর্ষ—আজিও তাহার উত্তর প্রান্তে সেই মহিমময় হিমালয় অভ্রভেদী শৃঙ্গ উত্তোলন পূর্ব্বক জগৎপিতার মহান্‌মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আজিও সেই অকূল জলধিরাশি প্রতি হিল্লোলে হিল্লোলে তাঁহার মহিমা মাহাত্ম প্রচার করিতেছে। আজিও সেই চন্দ্র,

পূর্ব্ববৎ হস্ত, পদ, তুণ্ড, মুণ্ড বিশিষ্ট। পূর্ব্ববৎ অন্যান্য সমস্তই বর্ত্তমান আছে কিন্তু সেই পবিত্র স্বর্গীয় ধর্ম্মভাব আর নাই। সেই পবিত্র ভাবের অভাবেই স্বর্গসম ভারতবর্ষ—আজ শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আজিও যে পুণ্যভূমি ভারতের পরম পবিত্র ও গৌরবান্বিত সনাতনধর্ম্মের নামটী লোপ হয় নাই ইহাই ভারতের বর্ত্তমান অধিবাসীগণের সৌভাগ্যের ফল বলিতে হইবে। যে হেতু ক্রমে ক্রমে আচার ব্যবহার সমুদয়ই বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কিন্তু সহসা ভারতের এইপ্রকার অবস্থান্তর হইবার কারণ কি? একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হয় যে যতক্ষণ সরোবরে সুমিষ্ট ও সুশীতল জল থাকে ততক্ষণই—সরোবরের শোভা সৌন্দর্য্য ও গৌরব। যতক্ষণ উদ্যানে সুগন্ধি কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভের গুণে উদ্যানকে আমোদিত করে—ততক্ষণই উদ্যানের শোভা সৌন্দর্য্য ও গৌরব। ঠিক সেইরূপ ধর্ম্মাধিকারী অধিবাসীগণও দেশের শোভা সৌন্দর্য্যও সম্মানের কারণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অধিবাসীগণের উপর দেশের হিত এবং অহিত যুগপৎ নির্ভর করে। যদিও পূর্ব্বের তুলনায় ভারতের জনতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে এবং হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে ভারতের উন্নতিও স্বধর্ম্ম সাধনের জন্য কোনও কোনও উন্নতপ্রাণ ভারতবাসী সময় সময় কিঞ্চিৎ পরিমাণে চেষ্টা করেন সত্য। কিন্তু তাঁহারাও উপযুক্ত ও প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে পারেন না।

সাংখ্য কর্ত্তা ভগবান কপিল বলিতেছেন:—

"ধর্ম্মেণ গমানমুর্দ্ধং গমন মধস্তাৎ ভবতি অধর্ম্মো"

অর্থাৎ ধর্ম্মের বলেই উর্দ্ধগতি হয়, এবং অধর্ম্মের ফলেই অধঃপতন হইয়া থাকে। বাস্তবিক ধর্ম্মবল ব্যতীত কখনই কেহ কোনও বিষয়ের উন্নতি লাভ করিতে পারে না আজ ধর্ম্মের অভাবেই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের এবম্বিধ ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে যতক্ষণ প্রদীপে প্রচুর পরিমাণে তৈল থাকে ততক্ষণেই প্রদীপটী উজ্জ্বল ভাবে প্রজ্বলিত থাকিয়া দশদিক আলোকিত করে। যখনই ঐ প্রদীপের তৈল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন কোথায় সেই উজ্জ্বলতাও কোথায় সে আলোক অমনি ঘোর অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। ঠিক তদ্রূপ যতক্ষণ অধিবাসীগণের অন্তরে স্ব-স্ব ধর্ম্মভাব প্রবল থাকে ততক্ষণই দেশেরও মহিমা মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকে। তখন দেশে আর সুখ শান্তির অবধি থাকে না। আবার

হয় অমনি দেশ এবং দেশবাসীর অবনতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইতে থাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ দৈন্য ও অসুখ অশান্তি আসিয়া দেশ অধিকার করিয়া বসে।

আমরা শৈশবকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার যাঁহারা ধর্ম্মবলে বলবান্ তাঁহারাই মানব জীবনের যথার্থ লক্ষ ভেদ করিতে সক্ষম। তাঁহারাই জননী জন্মভূমির আদরের সন্তান। স্বর্গাপেক্ষা পূজনীয়া জননী জন্মভূমির পূজা করা মনুষ্যের যেমন কর্ত্তব্য, তেমন স্বীয় আত্মার উন্নতি-সাধন করাও প্রত্যেকেরই জীবনের লক্ষ্য। উক্ত উভয় কার্য্য সাধনের পক্ষেই ধর্ম্মবল একমাত্র উপকরণ। যেমন অসম্ভব তেমনি ধর্ম্মবল ব্যতীত আত্মোন্নতি সাধন দূরের কথা বরং ক্রমশঃ আত্মাবনতিই বৃদ্ধি হয়। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই অখণ্ড জ্ঞানের বিকাশ হয় এবং মনুষ্যকে সম্যক্ উন্নতির দিকে অগ্রসর করে।

জন্মভূমিকে অলঙ্কৃত করিতে হইলে মানব জীবনে উন্নতি লাভ করিতে হইলে ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মবলে মনুষ্যগণ মনুষ্যত্ব পরিহার পূর্ব্বক দেবত্বলাভ করিতে পারে। বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্ট প্রাণিবর্গের মধ্যে বুদ্ধি বিশেষতঃ আকার প্রকারে মনুষ্যকে দেবতাদিগের অতি নিকটবর্ত্তী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল মনুষ্য ধর্ম্মপরায়ণ, নিরভিমানী, এবং আত্মোন্নতি যাহাদের অন্তরে স্থান পাইয়াছে তাহারাই শুধু দেবত্বলাভে সক্ষম। আর বাহ্যদৃষ্টি পরায়ণ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বর্জ্জিত সে সকল মনুষ্য শুধু আহার নিদ্রা ও মৈথুনেরই বশবর্ত্তী তাহাদের তুলনায় এবং পশুর তুলনায় কোনও প্রভেদ নাই— নদী প্রবাহে পতিত পতঙ্গ যেমন অল্পকালের মধ্যেই একস্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয় কিন্তু তাহাদের উদ্ধারের কোনও উপায় থাকে না। ঠিক তদ্রূপ ঈদৃশ অপরিণামদর্শী অন্তঃসার শূন্য মনুষ্যগণও চিরকাল সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকে তাহাদের উদ্ধার হওয়া অতি দূরের কথা বরং তাহারা ক্রমশই নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হয়।

# প্রকৃতির সেবা।

লেখক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি,।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় অসংখ্য প্রাকৃতিক নিয়ম আবহমানকাল বর্ত্তমান আছে। এই সকল নিয়ম অনুসন্ধান করা প্রকৃতির এক প্রকার শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই সকল নিয়মের জ্ঞান হইলে মানব প্রকৃতির অনুগ্রহে অনেক প্রকার অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারেন। ভগবানের অনন্ত শক্তি। মানবের বুদ্ধিতে ভগবানের শক্তি যেরূপ প্রকাশ পায়, এমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোব প্রভৃতি কোন তত্ত্বেই প্রকাশ পায় না। মানবের মন যখন সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক ধর্ম্ম ত্যাক করিয়া স্থির হয়, তখন সেই মনের মন নাম থাকে না, তখন উহা স্থির বুদ্ধিতে পরিণত হয়। একজন নর্ত্তকী রঙ্গমঞ্চে যেমন কখনও নর্ত্তকী. কখন মালিনী বা কখনও রাণী সাজিয়া আসে, তদ্রূপ একই মন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বুদ্ধি স্থির করা আবশ্যক। চঞ্চল মনে কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। কোন বিষয়ে দৃঢ় ভাবনা করিতে করিতে বুদ্ধি স্থির হয়, এবং সেই স্থির বুদ্ধিরূপ নির্ম্মল দর্পণে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ হয়। যে, যে, বিষয়ে একাগ্রচিত্তে মননিবেশ করে, তাহার সেই বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞানলাভ হয়।

মার্কিণ দেশে এডিসন্ প্রভৃতি মহাত্মারা বৈদ্যুতিক শক্তির আলোচনা করিতে করিতে যে সকল বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আজকাল জগতের অধিকাংশ লোকই জানেন।

• বৈদ্যুতিক শক্তির অনুসন্ধান করিতে করিতে যে সকল বৈদ্যুতিক নিয়মের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই সকল নিয়মের জ্ঞানলাভ করায় আজ বৈদ্যুতিক শক্তি মানবের দাসী হইয়া সহস্র সহস্র ভাবে মানবের সেবা করিতেছে। এই সকল শক্তির জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে জগতের এতলোক বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে উপকার পাইত না। মানব চেষ্টা করিলে প্রকৃতির নিকট হইতে অনেক উপকার পাইতে পারেন। যথানিয়মে প্রকৃতির নিয়মাবলী অনুসন্ধান করাই মানবের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনেকেই জানেন যে, মানব বুদ্ধির প্রভাবে জীবিত

প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারেন। চীন দেশে ঝিনুকের ভিতর সূক্ষ্ম বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রবেশ করাইয়া কিছুদিন পরে সেই ঝিনুক হইতে মুক্তাময় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। সেই প্রতি মূর্ত্তিটীর উপর স্তরে স্তরে মুক্তা যে পদার্থে প্রস্তুত, সেই পদার্থের আবরণ পড়ে। মানবের চেষ্টায় উদ্যানে বহুপ্রকার ক্রোটনবৃক্ষ ও নানারকমের গোলাপ দৃষ্ট হয়। মনুষ্য বুদ্ধিবলে প্রকৃতির নিয়ম অবলম্বন করিয়া একজাতীয় বৃক্ষ হইতে নানা জাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্পের সৃষ্টি করিতেছে। প্রকৃতিতে ২।৩ জাতি ক্রোটন ও গোলাপ দেখিতে পাওয়া যাইত, মানবের চেষ্টায় আজ শত শত প্রকার গোলাপ ও ক্রোটন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় কোপি বা কলা যেরূপ হইত, মানবের চেষ্টায় দেখুন আজ সেই সকল কোপি ও কলা কত সুন্দর হইয়াছে। কিরূপ সার মাটী দিলে কিরূপ শস্য হয়, বুদ্ধিবলে এই সকল নিয়মের জ্ঞানলাভ করিয়া উদ্ভিদ জগতের কত উন্নতি করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বৃক্ষ লতা গুল্ম উপযুক্ত দেশে মানবের চেষ্টায় নীত হইয়া জগতে অনেক উপকার সাধন করিতেছে মার্কিণের তামাক সিন্‌কোনা বৃক্ষ ও কোকাবৃক্ষ (যাহা হইতে কোকেন প্রস্তুত হয়) ভারতবর্ষে উপযুক্ত স্থলে মানবচেষ্টায় প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতেছে। পশুগণের মধ্যে মানবের চেষ্টায় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। কত জাতীয় ঘোড়া কুকুর প্রভৃতি মনুষ্যের চেষ্টায় হইয়াছে। মনুষ্য, প্রকৃতির নিয়ম অনুসন্ধান করিয়া সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সকল সত্যের জ্ঞানলাভ করিয়া মনুষ্য সৃষ্টির অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। ঘোটকী ঋতুকালে যেরূপ বর্ণের ঘোটক দেখে, সেই ঘোটকের দৃঢ় ভাবনায় তাহার সন্তানও অনেকটা যে ঘোটকের আকার ও বর্ণ তাহার চিত্তে অঙ্কিত ছিল, সেই ঘোটকের সদৃশ হইয়া থাকে। আরবদেশীয় অশ্ব কিম্বা তাহার পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্ত্তি ঘোটকীর নিকট ঋতুকালে রাখিলে সেই আরব অশ্বের ধ্যান তার মনে চিত্রিত হয়, তৎপরে সেই ঘোটকীর চক্ষু বাঁধিয়া অন্য কোন ঘোটকের দ্বারা গর্ভধারণ করাইলেও যে ঘোটকের আকৃতি ঋতুকালে তাহার চিত্তে অঙ্কিত ছিল, তাহার সন্তান অনেকটা সেই ঘোটক সদৃশ হয়।

জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শিবাইজয় সিংহ যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তখন এই উপায়েই তিনি মধ্যে অশ্ব সংগ্রহ করেন। কথিত আছে, মহামন্ত্রী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বিদ্যাধর জ্যোতিষীর পরামর্শ মতে মহারাজ সুলক্ষণাক্রান্ত মৃণ্ময় অশ্ব নির্ম্মাণ করাইয়া সেইদিকে এক ঋতুমতী বড়বাকে ধাবিত করেন, বড়বা সেই মৃণ্ময় অশ্বকে সত্য অশ্ব ভাবিয়া তৎপ্রতি

ইত্যবসরে বড়বার চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হয়, অথচ বড়বাকে সেই অশ্বের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। বড়বা অশ্বের সমীপস্থ হইলে অন্য অশ্ব দ্বারা তাহার গর্ভাধান করাইয়া অশ্বকে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বড়বার চক্ষু খুলিয়া দিয়া দ্রুত আকর্ষণে সেই স্থান হইতে বড়বাকে আনয়ন করা হয়। সেই গর্ভে বড়বারও যে সন্তান হয়, তাহা সম্পূর্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞোপযুক্ত লক্ষণাক্রান্ত মৃণ্ময় অশ্বের অনুরূপ হইয়াছিল। মহারাজ সেই অশ্ব দ্বারা অশ্বমেধযজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন।

উদ্ভিদ জগতে ও পশু জগতে যে সকল ঘটনাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, মানবের চেষ্টায় সেই সকল বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে ও হইতে পারে। মনুষ্য প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসন্ধানে আপন জাতিরও অনেক উন্নতি করিতে সমর্থ। ঋষিরা সুসন্তান কিসে হয়, এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়া নিয়মাবলী লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল নিয়ম পিতা, মাতা, উভয়ে পালন করিলে বংশে সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

গ্রহ নক্ষত্রগণের মনুষ্য দেহে কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে, আজকালকার অনেক বৈজ্ঞানিকেরা এরূপ বিশ্বাস করিতে চাহেন না। সূর্য্যকান্তমণি ( আতুসি কাচ ) সূর্য্যের সহিত সমসূত্রপাতে রাখিলে সেই কাচের প্রভাবে কেন্দ্রীভূত সূর্য্য রশ্মিতে কাগজাদি জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু এই কাচ সূর্য্যের সহিত সমসূত্রপাতে না রাখিলে সূর্য্য এবং আতুসি কাচ উভয়ে বর্ত্তমান থাকিলেও আতুসি কাচের সাহায্যে কাগজ জ্বালা যায় না। এইরূপ স্থানের এবং অবস্থার গুণে ফলের তারতম্য হয়, এ বিষয়ে সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সামান্য আতুসি কাচের স্থান ভেদে যদি গুণের তারতম্য হয়, তবে বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহ গণের স্থান ভেদে জগতের উপর ফলের পার্থক্য হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? সৌর জগতে গ্রহগণের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ আছে, নতুবা মধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাবে পৃথিবী কোথায় থাকিত? সমুদ্রেএবং অনেক নদীতে যে জোয়ার ভাটা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চন্দ্র এবং সূর্য্যের আকর্ষণের তারতম্যে হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে যখন সমুদ্রের জল আকৃষ্ট হইতে পারে, তখন জল অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম জীবনী শক্তির উপর চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের যে ক্রিয়া হয়, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার বিশেষ কি কারণ আছে? মুমূর্ষ রোগিগণের মৃত্যু প্রায়ই জোয়ার আসিবার সময় দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রের আকর্ষণে যেমন

স্থূল দেহ ত্যাগ করে, অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারেন যে, চন্দ্রের কলা বর্দ্ধনের সহিত পুষ্পে মধুও বর্দ্ধিত হয়। শুক্লপক্ষে মধুমক্ষিকারা পুষ্প হইতে অনেক মধু সংগ্রহ করিয়া চাক সঞ্চয় করে, এই কারণে পুর্ণিমা তিথিতে সকল দিনাপেক্ষা অধিক মধু পাওয়া যায়! অমাবস্তার ঠিক ইহার বিপরীত। চন্দ্রের মানব দেহের উপর বিশেষ আকর্ষণ আছে। অন্যান্য গ্রহদের ফলাফল চন্দ্রই জগতে বিতরণ করেন। ঋষিরা তাঁহাদের দিব্য দৃষ্টি দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, চন্দ্র ভ্রমন করিতে করিতে পাপগ্রহের কিম্বা পাপগ্রহের দৃষ্টি স্থানে উপস্থিত হইলে, তখন মনুষ্য শরীরে ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। চন্দ্র যখন রবির নিকটে কিম্বা রবি হইতে ৪৫, ৯০, ১৩৫ ও ১৮০ অংশ অন্তরে উপস্থিত হন তখন চন্দ্রের প্রতি রবির অশুভ দৃষ্টি থাকে বলিয়া লঘু আহার করিবার বিধান দিয়াছেন, এবং কোন প্রকার অনিয়ম করিবার নিষেধ করিয়াছেন। চতুর্থী, অষ্টমী, একাদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র উক্ত অশুভ স্থানে উপস্থিত হন, তজ্জন্য ঐ সকল তিথিতে সকলেরই বিশেষতঃ রোগীর আহার বিহারাদি সাবধানে করা উচিত। অমাবস্তার পরে প্রতিপদ এবং পূর্ণিমার পরের দ্বিতীয়া অবধিও এই নিয়ম। আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চন্দ্রের বলাবল দেখিয়া শুভদিনে ঔষধ সংগ্রহ বা প্রস্তুত করা বিধেয়। পুষ্যা নক্ষত্রে ঔষধ সংগ্রহ করিলে যেরূপ ফল হয়, মঘা নক্ষত্রে সংগ্রহ করিলে সেরূপ ফল হয় না। অষ্টমী অমাবস্যা প্রভৃতি দিবসে পারদাদি ঘটিত রসায়ন ঔষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে ঔষধ অনেকাংশে নির্বীর্য্য হয়, এইরূপ ঋষিদিগের উপদেশ। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে সুসন্তান হইবার যে সকল নিয়মাবলী লিখিত আছে,সেগুলি মানিয়া চলিলে বংশে সুসন্তান জন্মে এবং সেইরূপ সুসন্তানদ্বারা স্বদেশের মঙ্গল হওয়া সম্ভব। ঋষিদিগের আবিষ্কৃত নিয়মাবলী অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা যথেচ্ছাচার করেন, তাঁহাদিগকে রোগ শোক এবং কুলাঙ্গার সন্তানের যন্ত্রনায় জর্জ্জরিত হইতে হয়।

আমাদের দেশে অনেক লোকের বিশ্বাস যে আমরা হাত পা বাঁধা জীব; আমাদের কিছু স্বাধীনতা নাই। শুষ্ক পত্রের ন্যায় আমরা নিশ্চেষ্টভাবে দৈবের দ্বারা চালিত হইতেছি, পুরুষকারের কিছুই হয় না।

পুরুষকারের দ্বারা কোন সুফল ফলিতে পারে না, ইহা অতি ভুল ধারণা। আর্য্য শাস্ত্রকারগণের লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট হইতে উপদেশ দেন নাই। সর্ব্বতোভাবে আত্মোন্নতি করিবারই

হইতাম,তাহা হইলে বেদে আমাদের পালনের জন্য এত বিধিনিষেধ থাকিবে কেন? জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে কোন্ গ্রহের সূক্ষ্ম শক্তি কি প্রকারে কোন্ মানবের শুভ ফল প্রদান করিতে পারে, এইরূপ বিচার করিয়া পূর্ব্বে চিকিৎসকেরা ঔষধ প্রদান করিতেন। মঙ্গলগ্রহ কাহারও পক্ষে বিরুদ্ধ হইলে তাহাকে প্রবাল ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, চন্দ্র গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে তাহাকে রৌপ্যঘটিত ঔষধ দিয়া, প্রতিকার করিবার বিধি আছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রত্ন ধাতু, উদ্ভিদ প্রভৃতি ব্যবহার করিবার নিয়ম হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্য বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত নিয়মাবলী তন্ন তন্ন বিচার করিয়া কিসে মানব আত্মোন্নতি করিতে পারে, সেবিষয়ে পুরষকারপ্রয়োগ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি করা আমাদের চেষ্টা সাপেক্ষ। প্রদীপে তৈল এবং সলিতা থাকিতে যেরূপ ঝড়ে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইতে পারে, কিন্তু যত্ন করিয়া রাখিতে পারিলে তৈল এবং সলিতার ক্ষয় পর্য্যন্ত প্রদীপ জ্বলিতে পারে। পুরুষকারের বলে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় জন্মাইয়াও ব্রহ্মর্ষি হইতে পারিয়াছিলেন। তপস্যাদ্বারা মার্কণ্ডেয় ৭ দণ্ড পরমায়ুকে বর্দ্ধিত করিয়া চিরজীবী হইতে পারিয়াছিলেন, সমাধি নামক বৈশ্য, ভগবতীর কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ভূষণ্ড নামক দাঁড়কাক প্রবল পুরুষকারের দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের উৎপত্তিরূপ স্থিরপ্রাণে মনঃ সংযোগ করিয়া চিরজীবী হইয়াছিলেন।

সকল মহর্ষিগণের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের সারতত্ত্ব এই যে, সদ্গুরুর উপদেশ লইয়া প্রকৃতিরূপ মাতার সেবা কর, তাহা হইলে তাঁহার সাহায্যে জগৎপিতাকে প্রাপ্ত হইয়া নিত্য সুখভোগ করিবে, ঋষিদিগের মতে জীবনী শক্তি বা প্রাণই সকলের উপাসনার বিষয়। প্রাণের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নাই। প্রাণের সাহায্যে মহাপ্রাণ বা পরমাত্মা অর্থাৎ যে সূত্রে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা আছে, সেই সূত্রের জ্ঞান হয়। মন এবং প্রাণের সহিত ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার কৃপায় তাঁহার পাদপদ্মে অচলা ভক্তি হয়, এবং সেই অচলা ভক্তির সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ অনুভব করা যায়। ভগবানের পাদপদ্মে মন প্রাণ সংযোগ করা অপেক্ষা পুরুষকার আর নাই। তাঁহার পাদপদ্মে অচলা ভক্তিইপ্রকৃতির চাবি, এ চাবি পাইলে সকল বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞানলাভ করা যায়। ভগবানের কৃপায় জ্ঞানলাভ করিয়া পাঁচ অন্ধের ন্যায় হস্তিকে স্তম্ভাকার সর্পাকার ইত্যাদিরূপে আংশিক বর্ণনা করিতে হয় না। বিধিপূর্ব্বক সদ্গুরু-প্রদর্শিত মার্গে প্রকৃতির সেবা করিলে প্রকৃতিরূপ মার অনুগ্রহে ইচ্ছা না করিতে করিতেই সফলমনোরথ হওয়া যায়। বৃথা তুষ কুটিয়া বা আকাশে মুষ্টাঘাত করিয়া পুরুষকার হয় বটে, কিন্তু তাহা নিস্ফল।

# সামাজিক ইতিবৃত্ত।

লেখক—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মানব সমাজে ব্রাহ্মণগণ, চিরকাল উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু অধুনা ইঁহারা যেরূপ নীচ ও লোক-বিগর্হিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহাদিগকে ক্রমশঃ উচ্চাসন পরিত্যাগ করিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে হইতেছে। তত্রাচ এদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। কুটিল কালের গতির বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাদের মানাপমান ও ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহারা এতই হীন হইয়াছেন যে পাপকার্য্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। পরে এ বিষয় বিবৃত হইবে।

এই ব্রাহ্মণ দিগকে রাজা লক্ষণ সেনের পূর্ব্ব পুরুষ আদিশূর বা বীরসেন খৃঃ ১০ ম শতাব্দীর শেষ এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ দিগকে বেদানভিজ্ঞ দেখিয়া কান্যকুব্জ দেশ হইতে শাস্ত্র বিশারদ ১ ম শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্ট নারায়ণ, ২ য় কাশ্যপ গোত্রীয়, দক্ষ ৩ য় ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ, ৪ র্থ সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ ও ৫ ম বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড় এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত রাজবংশের পঞ্চম ভূপতি বল্লাল সেন উক্ত ব্রাহ্মণ গণের কৌলিন্য প্রথা সংস্থাপন করেন। কৌলিন্য প্রথা সংস্থাপনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ।

আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবোধা কুললক্ষণং॥

এই নয় প্রকার গুণ থাকিলেই যথার্থ কুলীন পদবাচ্য হইত, কিন্তু পরে কৌলিন্য গুণ গত না হইয়া বংশগত হওয়ায় বহু বিবাহাদি নানা দোষে দূষিত হইয়াছে।

অধুনা লক্ষণানুসারে কুলীন ধরিতে গেলে বা কুলীনের অনুসন্ধান করিতে গেলে "কুলীন" এই শব্দটি বঙ্গ ভাষার অভিধান হইতে বাদ দিতে হয়। তবে বংশগত কুলীন থাকায় কখনও কখনও ঐ শব্দটি কর্ণপটহে আঘাত করিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে যথার্থ কুলীন আর নাই।

ভূদেব বাবু পুরাবৃত্তসার নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে, দেশ কাল পাত্রের পরিবর্ত্তন অনুসারে সামাজিক শাসন পদ্ধতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন আব

নূতন আখ্যায় আখ্যাত হওয়া উচিত হইয়াছে! বর্ত্তমান কুলীনগণ কেহ বা প্রত্যক্ষ ভাবে কেহ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে অভক্ষ্য ভক্ষণ ( দ্রব্য বিশেষের নামোল্লেখ করিলাম না ) করিয়া কেহ বা সংস্পৃষ্টদোষে দুষ্ট হইয়াও সমাজে যেমন তেমনই আছেন। সুতরাং প্রথমেই আচারে বিচার বিহীন। তার পর সন্ধ্যাহ্নিক পূজাদিও করেনই না, নাম পর্য্যন্ত শুনিয়াছেন কি না, তাহাও বলিতে পারি না এই ত গেল প্রথম লক্ষণের কথা, শেষ লক্ষণের কথা আর কি বলিব ? ইঁহারাই আবার কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। অন্য সময়ে ইঁহাদের নাম শ্রুত হয় না কেবল বিবাহের সময়, তাহাও বিবাহের সব সময় নয় কেবল উচ্চহারে পাত্রপক্ষে টাকা লইবার সময়। এক জনের দেখাদেখি সকলেই সমান হইয়াছেন। সকলেই যদি সমান হয় হউক, আর্থিক অবস্থা সকলের সমান নহে। নরক ভয়ে কন্যা কেহ অবিবাহিত অবস্থায় রাখিতে পারেন না। দুরাবস্থায় নিপতিত হইয়া যিনি কন্যার বিবাহ দিতে যান তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত জমিজায়গা বেচিয়া ও ঋণজালে জড়িত হওয়া বই আর কিছুই ফল হয় না ; ইহাও তাঁহাদের বুঝা উচিত। ঐ দুঃখি লোকটির যদি আর কন্যা থাকে তাহা হইলে তার বিবাহে তিনি কি করেন ? অতএব এরূপ কুলীনের কুল-রক্ষা করিবার জন্য আর ব্যতিব্যস্ত বা প্রাণপণ চেষ্টার কোন প্রয়োজন হয় না। এই ত গেল কুলীনদের কথা।

এই ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে যাঁহারা কন্যা বা পুত্রের পণ গ্রহণ করেন না, অথচ কন্যার বিবাহের সময় পাত্রের বংশ অবস্থা ও শিক্ষার বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া যথাসাধ্য আভরণাদি সহ কন্যা দান করেন, তাঁহারাই উত্তম। ইহাদিগের দ্বারা সমাজে কাহার ও কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মণ সমাজের যে কত দুর অনিষ্ট হয়,তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। ইহারা কন্যার বিবাহে অতি উচ্চহারে শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকেন।তাঁহারা নবম বা দশমবর্ষের কন্যাকে পঞ্চাশৎ বা ষষ্ঠিতম বর্ষের পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে কিছু মাত্র শঙ্কিত হন না ; পাত্র যত বর্ষের বা যেরূপই হউক, অধিক টাকা পাইলেই তাঁহার হইল। এরূপও দেখা যায় যে কোন ব্যক্তির অবস্থা অতি হীন তিনি বিবাহের ইচ্ছা করিলে কন্যাকর্ত্তা সর্ব্বসমেত ৭০০ টাকা চাহিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসাশ্রম প্রভৃতি অপেক্ষা গৃহস্থাশ্রম উত্তম মনে করিয়া যে কোন প্রকারে অর্থাৎ ঋণাদি করিয়া তিনি হয়ত ঐরূপ বিবাহে মত করিলেন। এক বিবাহ করিয়া, তিনি ঋণগ্রস্থ হইলেন। কিন্তু কোথা হইতে এত টাকা সংগ্রহ

হইবে, ঋণ হইলে জামাতা কিরূপে ঋণ পরিশোধ করিবেন, কন্যার পিতা এ সকল লক্ষ্য ও করেন না। তাঁহার কন্যা যে কিরূপ অবস্থায় থাকিবে,বা কিরূপে আহারাদি পাইবে, কন্যার কর্ত্তৃপক্ষ্য এ বিষয় দেখিতে চাহেন না। আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি যে এইরূপ ভাবে, যে সকল কন্যার বিবাহ হইয়াছে ; সেই কন্যাই অতি দুঃখে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। ব্যক্তি বিশেষের নামোল্লেখ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে আমি তাহাও আদর্শ সাধনের সম্মুখে ধরিতে প্রস্তুত আছি। এ সকল ব্রাহ্মণ সমাজের কত দূর গ্লানিকর' তাহা কি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে? কন্যার পিতা ধনী হইলেন বটে,কিন্তু কন্যার কি দুর্দ্দশা হইবে,ইহাও একবার ভাবিয়া দেখিলেন না। এমন নিষ্ঠুর, অবিবেকী পিতা বা কন্যার অভিভাবক হওয়া উচিৎ নহে। যখন দুহিতা স্বীয় গৃহে রাখিবার নহে, তখন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য যে যাহাতে অনায়াসে বা অল্পায়াসে চির জীবনে চারিটী খাইতে পায়। অর্থাভাবে যদি কাহার ও কন্যার বিবাহ আটকায় তাহা হইলে ও তিনি পণ না লইয়া যদি বলেন, "আমি খরচ কিছু করিতে পারিব না, কেবল কন্যাদান করিব, তাহা হইলেও এমন অনেক লোক আছেন, যিনি তাহাও লইতে পারেন। এরূপ অবস্থায় পণগ্রহণ অতি গর্হিত কর্ম্ম। মনুসংহিতা বা তন্ত্রাদিতে এ বিষয় বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অবস্থা উন্নত হইলে কেহই এরূপ পণ দিয়া বিবাহ করিতে যান না। যাহার অবস্থা হীন, তাঁকে উক্তপণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়, আর যদি তাঁহার ছোট ভ্রাতা বা ভগ্নি থাকে ; তাহা হইলে তাঁহাদের কি উপায় হইবে, এ সকল মহাজনগণ চিন্তা না করিলে অন্যের চিন্তায় ইহাতে সু-ফলের আশা নাই। অতএব হে প্রাজ্ঞগণ, আপনারা সকলে এ বিষয় বিশেষ বিবেচনা করতঃ ব্রাহ্মণ সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির উপায় করুন।

উপসংহারে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণের শীর্ষস্থানীয়। উচ্চের অধঃপতনে নিম্নের পতন অনিবার্য্য। কারণ নিম্ন উচ্চেরই অনুকরণ করিয়া থাকে।

# কর্ম্ম-কথা।

লেখক—শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

( ১ )

আমাদের এগারটি ইন্দ্রিয় আছে।

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা। শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করি, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করি, চক্ষুদ্বারা দর্শন করি, রসনা দ্বারা আস্বাদন করি, নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণ করি। শ্রবণ করি, স্পর্শ করি, দর্শন করি,—ইত্যাদি বলিলাম, কিন্তু একটু ভুল বুঝিবার শঙ্কা আছে। বাঙ্গালা ভাষার দোষে এই শঙ্কা; কেন না, এ গুলি আমরা করি না; এ গুলি হয়। যাহা করি তাহা কর্ম্ম, যাহা হয় তাহা জ্ঞান। শ্রবণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচের গ্রহণই জ্ঞান। যে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই সকল গ্রহণ হয়, সে ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই সকল ইন্দ্রিয়ের মূলে মন থাকে, মন না থাকিলে জ্ঞানেন্দ্রিয় কাজ করিতে পারে না। অতএব মনও জ্ঞানেন্দ্রিয়।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ,—এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা কহি,—এই এক কর্ম্ম। পাণির দ্বারা গ্রহণ করি—গ্রহণ এক কর্ম্ম। পাদের দ্বারা চলি—চলা কর্ম্ম। পায়ুর দ্বারা মলমূত্রাদি ত্যাগ করি,—বিসর্জ্জন বা বিসর্গ এক কর্ম্ম। উপস্থ দ্বারা আনন্দন করি,—মৈথুন এক কর্ম্ম। আর, কোন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মূলে মন না থাকিলে, সে ইন্দ্রিয় সাধ্য কর্ম্মই হইতে পারে না। এ হিসাবে মনও এক কর্ম্মেন্দ্রিয়।

মন উভয়াত্মক,—জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। মন সমেত এগারটি ইন্দ্রিয়; পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর মন উভয়াত্মক ইন্দ্রিয়।

কোনও কর্ম্ম করিলে আমাদের ইষ্টলাভ হয়; আর কোনও কর্ম্ম করিলে আমাদের ইষ্টলাভ হয় না, হয়ত অনিষ্ট হয়। যাহা ইচ্ছা করি, তাহাকেই বলে ইষ্ট। যাহা ইচ্ছা করি না, অথবা যাহা না হউক ইচ্ছা করি তাহা অনিষ্ট। কর্ম্ম-ফল বলিলে ঐ ইষ্ট আর অনিষ্টই বুঝায়। যত প্রকার ইষ্ট হইতে পারে, সেই সকল প্রকার ইষ্টের সাধারণ নাম সুখ। সুখ ভাল লাগে।

যাহা অনিষ্ট, যাহা আমরা চাহি না, যাহাতে আমাদের কষ্ট হয়, যাহা ভাল লাগে না, তাহাই দুঃখ। সুখ—দুঃখ দুই' কর্ম্মেরই ফল। এই জন্যেই মানুষে কর্ম্ম বিচার করে, অথবা বিচার করিতে চায়। কিন্তু কর্ম্ম বিচার করাই বড়

কঠিন। কর্ম্ম বিচার করা সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে। কর্ম্ম বিচার যতদূর আবশ্যক, ততদূর আমাদের শাস্ত্রে করা আছে। শাস্ত্র মানিয়া চলিলে কোন দুর্ভাবনাই ভাবিতে হয় না।

মোটামুটি কর্ম্ম দুই প্রকারের। এক (১) প্রবৃত্তিমুখে কর্ম্ম (২) নিবৃত্তি মুখে কর্ম্ম। যখন কর্ম্ম করি, তখন হয় কোন ক্রিয়াতে বৃত্ত হই, না হয় কোন ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হই। যেমন গ্রহণ একটি কর্ম্ম; দেবতার পূজা করিতে পুষ্প গ্রহণ করিতে হয়, যদি পুষ্প গ্রহণ করি, তাহা হইলে সেই পুষ্প গ্রহণ-ক্রিয়াটি প্রবৃত্তি মুখে হইল। আবার মনে কর, একটি ঘটি আছে, ঘটিটি আমার হউক, এমন ইচ্ছা হইল, কিন্তু তখনই মনে হইল ঘটিটি পরের; মনে হইলেই সেই গ্রহণ ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইলাম। এ স্থলে নিবৃত্তি মুখে কর্ম্ম করা হইল। গ্রহণের দিকে চেষ্টা হইলেও ক্রিয়া, গ্রহণের বিপরীত দিকে চেষ্টা হইলেও ক্রিয়া। ক্রিয়ার বিষয় হইলেই কর্ম্ম, অর্থাৎ যে সময়ে কর্ম্ম ক্রিয়মাণ হয়, তখন সেই কর্ম্মই ক্রিয়া হয়। ক্রিয়মাণ ও অক্রিয়মাণ উভয় অবস্থারই সাধারণ নাম কর্ম্ম। গমন এক প্রকার কর্ম্ম; যখন গমনই করি তখন সেই গমনই ক্রিয়া। যখন গমন করিতেছি না, তখন গমন ক্রিয়া নহে—কর্ম্ম বটে।

ক্রিয়ামাত্রেরই একজন কর্ত্তা থাকে; কর্ত্তার ইচ্ছা থাকে;—কৃতি যত্ন প্রযত্ন বা চেষ্টা—যে নামেই বল,—থাকে একটা ইষ্টফলের দিকে দৃষ্টি থাকে, আর সেই ক্রিয়ার বিষয়ীভূত কর্ম্ম করিলে, সেই ইষ্টফল পাওয়া যাইবে এ জ্ঞান থাকে। এতগুলি থাকিয়া তবে কোন ক্রিয়া হয়।

একটা কথা আছে যে, "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে" যে ব্যক্তি মন্দ, সেও যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন কোন একটা প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে; প্রয়োজনে লক্ষ্য না থাকিলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। আর, সে প্রয়োজনে ইষ্ট-বুদ্ধি থাকে; অর্থাৎ এই এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই আমার ইষ্টলাভ হইবে এইরূপ বোধ থাকে। কিন্তু প্রায় কর্ম্মেরই মিশ্র ফল,—কতক ইষ্ট, কতক অনিষ্ট। হয়, এখন ইষ্ট, পরে অনিষ্ট, না হয়, এখন অনিষ্ট, পরে ইষ্ট, না হয় একাংশে ইষ্ট, অন্যাংশে অনিষ্ট, মিশ্রফলক কর্ম্মের বেলায় কাজে কাজেই মহাগোল উপস্থিত হয়, সেই গোল মিটাইতে আমরা ইষ্টানিষ্টের বলাবল বিবেচনা করিয়া থাকি, অর্থাৎ যে কর্ম্মে মিশ্রফল দেখিতে পাই, ইষ্ট এবং অনিষ্ট এবং অনিষ্ট দুই ফলই আছে দেখি, সেখানে ইষ্টাংশ বলবৎ, কি অনিষ্ট অংশ বলবৎ, এইটুকু বিবেচনা করিয়া সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, অথবা সে কর্ম্ম হইতে

নিবৃত্ত হই, ইষ্ট যদি বলবৎ হয়, অনিষ্ট তাহাপেক্ষা হীনবল হয়, তবে সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, আর অনিষ্ট যদি বলবৎ হয়, আর ইষ্ট হীনবল হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হই, ইষ্টানিষ্টের বলাবল নিশ্চয় করিতে অনেক সময়ে ভুল হয়; প্রমাদ বশতঃ অর্থাৎ অসাবধান থাকে বলিয়া ভুল হয়, কিংবা মোহ অর্থাৎ বুদ্ধি অভিভূত বা আচ্ছন্ন থাকায় ভুল হয়, ভুল হউক, কিন্তু কর্ম্ম করিবার সময়ে কর্ম্মফলের অর্থাৎ ইষ্টানিষ্টের বলাবল বিচার করা হয়ই হয়। এমন কি, বলবৎ অনিষ্টের আশঙ্কা প্রবল হইলেও যে কোন প্রকারে সেই আশঙ্কাকে সন্দেহের স্থলে ফেলিয়া—অর্থাৎ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে মনে করিয়া—সেই সন্দেহের বলে সেই আশঙ্কাকে দুর্ব্বল করিয়া মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বা নিবৃত্ত হয়, লোকে যখন বলে বা ভাবে যে, "যা থাকে ভাগ্যে আমি এই কাজ করিব বা করিব না—তখন ঠিক এই অবস্থাই হয়। অর্থাৎ সেই কর্ম্মফলের ইষ্টাংশে তাহার দৃষ্টি পড়ে,—অনিষ্টাংশে তাহার দৃষ্টি পড়ে—অনিষ্টাংশ বলবৎ তাহা মনে হয়—হইয়াও সেই অনিষ্টাংশ হয়ত ফলিবে না,—এইরূপে মনকে বুঝাইয়া অনিষ্টাংশের বলবত্তা মনে মনে নষ্ট করিয়া, মানুষ সে কর্ম্ম করিয়া থাকে।

ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক ক্রিয়াতে কর্ত্তা দেখেন যে, এই ক্রিয়া আমার ইষ্টসাধন কি না, অর্থাৎ ইহার দ্বারা আমার ইষ্ট সিদ্ধ হইবে কি না, কর্ত্তা আরও দেখেন যে, এই ক্রিয়া আমার কৃতিসাধ্য কিনা, অর্থাৎ আমার প্রযত্নে বা চেষ্টায়, আমার কৃতিতে এ ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে কিনা, কর্ত্তা আরও দেখেন যে, ইহা বলবৎ অনিষ্টের অনুবন্ধী কি অননুবন্ধী, অর্থাৎ অনিষ্টাং বলবৎ কি বলবৎ নহে। সর্ব্বত্রই ক্রিয়াকালে ইষ্টসাধনতা, কৃতিসাধ্যত্ব এবং বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধিত্ব থাকিবেই থাকিবে।

(ক্রমশঃ)




"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৫শ বর্ষ। | ১৩১৪ সাল। বৈশাখ। | ১০ম সংখ্যা।

# কেন ভয় হয়।

"যে দেশে বান্ধব নাই, দয়া নাই ধর্ম্ম নাই,
সে স্থানেতে থেকে কাজ নাই।
চল তাই বনে যেয়ে, বৃক্ষ কাছে মেগে খেয়ে,
অবশিষ্ট জীবন কাটাই।"

পল্লী কবি।

আমাদের পুরাণ-শাস্ত্রে চারিযুগের উল্লেথ আছে। চারি যুগের নাম পর্য্যয়-ক্রমে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। যে তিনটি যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্য যুগে সত্য এবং ধর্ম্ম সম্পূর্ণ, ত্রেতার

ত্রি-পাদ, দ্বাপরে অর্দ্ধেক বর্ত্তমান কলিযুগে একপাদ মাত্র অবশিষ্ট। ইহার উপরেও মতান্তর আছে। একটি বচনে দৃষ্ট হয়, কলিযুগে,—"সত্যঞ্চ দূরং গতঃ।" বড়ই আক্ষেপের বিষয় সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে এই শেষ কথাটিই সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমাদের পাঠক মহাশয়েরা ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমাদিগকে অর্ব্বাচিন বলিয়া তিরস্কার করিবেন না, দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। আমাদের অনুমান হয়, যাঁহারা প্রকৃতরূপে মানবকুলের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারা অসঙ্কোচে নিশ্চয়ই এই বাক্যে সায় দিবেন।

সংসারের মানব প্রকৃতি পরিদর্শন করিয়া আমরা যেন বুঝিতে পারিতেছি, এক্ষণে বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—মানবের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অভ্যুদয় দর্শনে মানবেরা প্রায়ই সুখী হন না। মানবের অমঙ্গলে মানবের আনন্দ হয়, স্বার্থপরতা প্রবল হওয়াতে হিংসা, ঈর্ষা ও পর-শ্রী-কাতরতা অসম্ভব বাড়িয়া উঠিয়াছে—নির্দ্দয়তা আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে।

একটা পুরাতন উপকথার কিয়দংশ এইখানে প্রসঙ্গানুরোধে উদ্ধৃত করিতে হইল,—"একটা প্রশস্ত ময়দানের মধ্যে একটা লৌহ নির্ম্মিত কাঠগড়া,—সেই কাঠগড়ার মধ্যে একটা ভীষণ ব্যাঘ্র আবদ্ধ ছিল। কাঠগড়ার প্রবেশ-দ্বার সুদৃঢ় লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ। যেখানে সেই কাঠগড়া তাহার অদূরে মনুষ্য চলাচলের রাস্তা। যত লোক সেই রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়, ব্যাঘ্র মিনতি করিয়া তাহাদের প্রত্যেককেই বলে, 'শিকলটা খুলিয়া দাও, আমাকে মুক্ত কর, আমি তোমাদিগকে নিরাপদে যাইতে দিব।' ব্যাঘ্রকে মুক্ত করিয়া প্রাণ হারাইবার ভয়ে কেহই তাহার বাক্যে কর্ণপাত করে না। একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ একবাড়ীতে যাজনক্রিয়া করিয়া ফল তণ্ডুলাদি লইয়া সে স্থান দিয়া যাইতেছিল, জানু পর্য্যন্ত ধুলা, সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মধারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। ব্যাঘ্র তাহাকে দেখিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল,—"এতদিনের পর আমার উদ্ধারের উপায় হইল, তুমি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের হৃদয়ে অসীম দয়া, আমি অনেক দিন অনাহারে এই লৌহ পিঞ্জরে আটক থাকিয়া বহু কষ্টভোগ করিতেছি, তুমি দয়া করিয়া আমায় মুক্ত কর, শিকলটা খুলিয়া দাও।" প্রবাদ আছে, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই অবোধ হইয়া থাকে, ব্যাঘ্রের কাতরতা দেখিয়া ব্রাহ্মণের দয়া হইল, তৎক্ষণাৎ শিকলটা খুলিয়া দিল, ব্যাঘ্রটা বাহির হইয়া ভীষণ দন্ত-বিকাশ করিয়া ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত। প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "আমি তোমাকে মুক্ত করিলাম, তাহার কি এই ফল?" ব্যাঘ্র বলিল,"ভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিব, তাহাতে

আবার 'ফলাফলের বিচার কি?" প্রাণ যায়—নিরুপায়, হঠাৎ ব্রাহ্মণের একটা উপস্থিত বুদ্ধি যোগাইল, সাহসে ভর করিয়া বলিল, "আমার চারিজন মধ্যস্থ আছে,—তাহারা যদি তোমাকে প্রাণ: সংহার করিতে বলে, তবে তুমি আমায় ভক্ষণ করিও।" ব্যাঘ্র বলিল, কে, কে তোমার মধ্যস্থ শীঘ্র নাম কর, আমার বড় ক্ষুধা, বিলম্ব করিতে পারিব না।" ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ চারিটি নাম করিল, চারিজন মধ্যস্থের মধ্যে আমরা এখানে কেবল দুটি মধ্যস্থের পরিচয় দিব। প্রথম মধ্যস্থ একটি গাভী, সম্মুখস্থ তৃণক্ষেত্রে সেই গাভীটি চরিতেছিল, অস্থিচর্ম্ম-সার অতিশয় প্রাচীনা, ব্যাঘ্র সেই গাভীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই মনুষ্য আমাকে উদ্ধার করিয়া পরম উপকার করিয়াছে; আমি ইহাকে ভক্ষণ করিতে পারি কিনা? গাভী উত্তর করিল, এখনই খাইয়া ফেল, এখনই খাইয়া ফেল, মানুষ? রাখিতে নাই, মানুষ বড় ভয়ঙ্কর জানয়ার একজন মানুষের বাড়ীতে আমি ছিলাম। আমার বয়স অল্প ছিল, বৎস প্রসব করিয়া নিত্য নিত্য সেই মানুষকে দুগ্ধ প্রদান করিতাম, মানুষ পরম যত্নে আমার সেবা করিত, আমার শয়নের জন্য তক্তা পাতিয়া দিত গাত্র মার্জ্জন করিয়া শৃঙ্গ পদ প্রক্ষালন করিত, প্রচুর পরিমাণে আহার যোগাইত, তাহার পর আমি বৃদ্ধ হইলাম, বৎস হয় না, দুগ্ধ দিতে পারি না, আমার আহার বন্ধ হইল, সেবা যত্ন দূরে গেল, মানুষ আর আমাকে একগাছিও তৃণ দিল না, ছাড়িয়া দিত, মাঠে মাঠে বিচরণ করিয়া কষ্টে আমি প্রাণধারণ করিতাম, অনেক দিন সেই মানুষের বাড়ীতে ছিলাম, মায়া বসিয়াছিল, সন্ধ্যাকালে সেই বাড়ীর গোয়াল ঘরে গিয়া শুইয়া থাকিতাম, মানুষ তাহা সহ্য করিতে পারিল না, সন্ধ্যা হইবার পুর্ব্বেই বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিত, পাছে আমি প্রবেশ করি; সেই জন্য রাত্রিকালে দ্বার খুলিত না, তথাপি সেই বাড়ীর উপর আমার বড়ই মায়া, প্রতি রাত্রে সদর দরজার বাহিরে শয়ন করিয়া থাকিতাম, মানুষের তাহাও অসহ্য হইল, প্রভাতে দরজার বাহিরে আমাকে দেখিতে পাইয়া বড় বড় বাঁশ লইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল, কাজে কাজেই আমি এখন দিবা রাত্রি মাঠে মাঠেই বাস করি, অনবরত চক্ষের জলে ভাসি, মানুষ এত দূর নিষ্ঠুর, এত দূর স্বার্থপর, এত দূর ভয়ঙ্কর, পৃথিবীতে মানুষ রাখিতে নাই, এখনি খাইয়া ফেল এখনি খাইয়া ফেল। অপর দুইটি মধ্যস্থ (বটবৃক্ষ ও নদী) ঐরূপ রায় দিল, চতুর্থ মধ্যস্থ একটা কৃশ শৃগাল। সেই ধূর্ত্ত শৃগাল উত্তম কৌশলে বাঘটাকে পুনরাবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল।

ভীষণতা প্রায় পদে পদেই পরিলক্ষিত হইতেছে। জগত পিতা সর্ব্ব জীবের মধ্যে মনুষ্য জাতিকে জ্ঞান বুদ্ধি প্রদান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন,সেই মনুষ্য যদি এরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে জগতপিতার অভিপ্রায় অসিদ্ধ হয়, মনুষ্য অবশ্যই পাপি হইয়া থাকে।

এখন কথা হইতেছে, মানুষকে দেখিয়া মানুষের কেন এত ভয়? এ প্রশ্নের উত্তর মানুষেরাই অহরহঃ প্রদান করিতেছে; মানুষেরাই মানুষের শত্রু, পশুরা স্ব-জাতির প্রতি হিংসা করে, তৎ বিষয়ের দৃষ্টান্ত অধিক দৃষ্ট হয় না। গ্রাম্য পশুর মধ্যে গরুতে গরুতে কুকুরে কুকুরে বিড়ালে বিড়ালে ঝগড়া হয়, মিশামিশি হইলে, সে ভাবটা সারিয়া যায়, অপরাপর পশুর বিবাদ কলহ অতি বিরল, একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত আছে, জোঁকের গায়ে জোঁকবসে না, অরোণ্য মধ্যে পালে পালে বন্য পশু বিচরণ করে বিহঙ্গকুল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যায়, তাহাদের মধ্যে শত্রুতা আছে, সচরাচর কেহই তাহা অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ জাতি নিত্য নিত্য বিপরিত ভাব দেখায়, পূর্ব্বকালে এতটা ছিল না, আজ কাল অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোকে বলে, অধুনা পূর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষা ও সভ্যতার সমধিক বিস্তার, আমরা দেখি হিংসা ও বিরোধ কলহের সমধিক বিস্তার। শিক্ষা ও সভ্যতার যদি এরূপ পরিণাম হয়, তাহা হইলে জগত হইতে শিক্ষা ও সভ্যতা যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, ততই মঙ্গল দলকে দল আকর্ষণ করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে বুঝিবার বড় কষ্ট হইয়া থাকে, বুঝাইবার ও অসুবিধা ঘটে, এ কারণে এক বচনের উপর জোর রাখাই আবশ্যক বোধ করা গেল; মনে করুন,রাম একটি গৃহস্থ যুবক, রাম নিরীহ নিষ্কলঙ্ক শান্ত স্বভাব রাম দুইবেলা আহার করিয়া দুই বেলা আঁচায় শ্যাম তাহা দর্শন করিয়া অন্তরে অন্তরে ফাটিতে থাকে মুখামুখি দেখা হইলে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বৈদ্য নাথের গরুর মত মাথা নাড়ে, অন্তরের ভাব অন্য প্রকার, অকারণে কিংবা সামান্য কারণে রাম যদি বিপদে পড়ে শ্যামের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে, রামের বিপদ যাহাতে বর্দ্ধিত হয়,রাম যাহাতে অধঃপাতে যায়,শ্যামের তাহাতে আন্তরিক উৎসাহ, গোপনে গোপনে আন্তরিক যত্ন আন্তরিক ইচ্ছা, আন্তরিক চেষ্টা, এমন রাম শ্যাম এজগতে কত স্থানে কত আছে, গণনা করা দুর্ঘট। এক জনের অধঃপাতের প্রকৃত কারণ না থাকিলেও আর এক জন মিথ্যা গ্লানি রটাইয়া, মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া স্বতঃপরতঃ তাহাকে জব্দ করিবার পন্থা অন্বেষণ করে; কেবল অন্বেষণ নহে, পন্থা পরিস্কার করে। অনেক স্থানে দুরভি-সন্ধিতে কৃতকার্য্য ও হইয়া থাকে।

দশ জনে যাহাকে ভাল বলে তাহার ...

লোকের পরমানন্দ হয়। এই কারণেই বড় দুঃখে বলিতে হয় মানুষেরাই মানুষের পরম শত্রু।

জানা ছিল,শুনা ছিল,পুস্তকেও পাঠ করা হইয়াছিল ; নিরিহ লোকের শত্রু হয় না ; বোবার শত্রু নাই,এটা যেমন চলিত কথা নিরিহ লোকের সম্বন্ধে ও সেইরূপ, ইহাও এক প্রকার চলিত কথাছিল. বহুদর্শনে এখন জানা যাইতেছে ; এখনকার যুগে সেই মূল কথাটা অমূলক, এখনকার মানব সমাজে নিরিহ লোকের উপরেই অসীম দৌরাত্ম্য বিষয় লোভের আকর্ষণে প্রবলে প্রবলে মহাবিরোধ হয়, বড় বড় মোকর্দ্দমা হয়, লাঠালাঠি হয়, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ প্রথা ; কিন্তু দুর্ব্বল নিরিহ লোকের প্রতি প্রবলের অত্যাচার আজ কাল অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সকলে পদানত হইয়া থাকে, ক্ষমতাশালি প্রবল মনুষ্যের তাহাই বাসনা। দুর্ব্বলেরা কায়িক শ্রমে নির্ব্বিরোধে কষ্টে শ্রেষ্ঠে জিবিকা সংগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ মনের সুখে বাস করে, প্রভুত্ব লোভি প্রবলের তাহা একেবারেই অসহ্য ? বহু ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনা আমাদের মনে পড়িতেছে, একটি লোক নিজের যত্নে কর্ম্মক্ষম হইয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিত, যথাসাধ্য পাঁচজনের উপকার করিত, শিষ্টাচারে সহাস্য বদনে সকলের সহিত প্রিয় সম্ভাষণ করিত, মৌখিক শিষ্টাচারে প্রতিবাসী লোকেরা তাহার কিছু কিছু প্রশংসা করিত "মুখে মধু হৃদে বিষ"এই যে এক প্রবাদ তাহা সেইখানে সপ্রমান হইত,বেটা কিসে নষ্ট হয়, অনেক লোক মনে মনে সেই ইচ্ছা পোষণ করিত, দশ চক্রে ভগবান ভুত এবাক্যে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। যে লোকটির কথা বলা হইতেছে, অকস্মাৎ দশ চক্রে সেই লোকটি একটা দারুণ অপবাদে বিপদ গ্রস্ত হইয়া পড়িল, কি যে সেই অপবাদ লোকটি তাহার কিছু জানিল না চক্র প্রভাবে সমস্তই গোপন, সমস্তই মিথ্যা আশ্চার্য্য কুটিল চক্র, যার বিরুদ্ধে চক্র, চক্রভেদ করিয়া প্রতিকারের উপায় করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল, বাহিরে বাহিরে যাহারা তাহার বন্ধু এইরূপ ভান করিত, তাহারা সকলেই বন্ধুত্ব ভুলিয়া শত্রু ভাব ধারণ করিল। লোকটি যাহাদিগকে আপন বলিয়া জানিত, প্রকাশ পাইল তাহারাই প্রবল বৈরী কি যে অপবাদ মুখে কেহই বলে না,বাহিরে বাহিরে হুলস্থুলব্যাপার যে কার্য্য করিয়া সেই লোকটি পরিবার পোষণ করিত, চক্রজালে সে কার্য্যটি হারাইল, তাহার পরিবারেরা দিন কতক অর্দ্ধাশনে থাকিয়া উপবাসের আশঙ্কায় হাড়ে হাড়ে কম্পিত হইতে লাগিল, মজা শোন, মানব চক্রের কি চমৎকার খেলা, পরিবারস্থ লোকের ও

কথাটা তাহারা শুনিল মিথ্যা বলিয়া বুঝিল না, সত্য ভাবিয়া লইল, কিন্তু চাপিয়া রাখিল দিবা রাত্রি অশান্তি, বাহিরে দিবা দ্বিপ্রহরে বাজে লোকের হু হুঙ্কার টিট্‌কারী খেউড় গালাগালি নিশাকালে ও সেই প্রকার লোকেরা হাসে, আজ ধরিবে এইবাঁরেই কর্ম্ম রফা চিৎকার করিয়া আস্ফালন পূর্ব্বক এই সকল কথা বলে, ক্রমাগত এক বৎসর ঐরূপ হওয়াতে লোকটি অনাহারে অনিদ্রায় মনের কষ্টে শেষ কালে পাগল হইয়া গেল, পরিবারেরা অনাথ হইল, চক্রান্তকারি দলের মনস্কামনা পূর্ণ।

মানুষেরাই মনুষের শত্রু, দেখিয়া শুনিয়া যাঁহারা ইহা জানিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। একজন গৃহস্থ তাঁহারা দশ ভাই, প্রকাণ্ড ভদ্রাসন ভাই ভাই বিরোধ ক্রমাগত মোকর্দ্দমা জিনিষ পত্র বিভাগ, অবশেষে বাটয়ারা ভদ্রাসনে দশটা প্রাচীর দশটা, দরজা কোথায় কোন দরজা বসিলে মানায় তাহা ঠিক করিয়া দিবার জন্য পল্লিস্থ শত শত লোক কোমর বাঁধিয়া মুরাব্বি-গিরী করিতে লাগিল সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া গেল শান্তি সলিলে আগুণ জ্বলিল, মুরুব্বিদের আনন্দ বাড়িল এমন ঘটনা অনেক।

বিবাদ বিশংবাদ না থাকিলে ও একটু দেনা পাওনার সম্পর্ক থাকিলে মানুষে মানুষে অদ্ভুত খেলা হয়, একটা ধুঁয়া উঠিয়াছে দেন-দারের বাড়িতে পাওনাদার উপস্থিত হইলে প্রায়ই শুনিতে হয় বাবু বাহির হইয়া গিয়াছেন আমাদের এক জন বন্ধু একদিন একজন দেনাদারের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, প্রথমেই শুনিলেন বাঁধিগদ—বাবু বাড়ীতে নাই পাওনাদার খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, ইতি মধ্যে দেখিলেন, একজন দাসী। তামাক, সাজিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর যাইতেছে, পাওনাদার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার তামাক দাসী উত্তর করিল, "বাবু খাবে"—একটু পরে একজন বালক বাহির হইল, পাওনাদার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু কোথায় ? বালক উত্তর করিল, বাবা আর মা উপরের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছেন। পাঠক মহাশয়েরা এরূপ সংবাদ অনেক জানেন কলিকাতার সহরে এই রোগটা আজ কাল বেশী হইয়াছে। এ বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে বারান্তরে কতক গুলি চিত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

# ব্রাহ্মণের আত্ম পরিচয়।

## লেখক—শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ব্রাহ্মণের আত্মপরিচয় দিবার জন্য কতকগুলি সামাজিক নিয়ম আছে; সেই নিয়ম অনুসারে কেহ পরিচয় দিতে না পারিলে ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন না। "তুমি কি জাতি" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যদি কেহ বলে "আমি ব্রাহ্মণ" তাহা হইলে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি প্রশ্নের উত্থাপন হইবে। সেগুলি সংক্ষেপতঃ এই,—তোমার নাম ও উপাধি কি? তুমি কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ? তোমার পিতা ও মাতামহের নাম কি? তোমাদের বেদ কি এবং তোমরা কাহার সন্তান? কি গাঁই কি গোত্র? প্রবরের নাম কি? তোমরা কি কুলীন? যদি কুলীন হও তাহা হইলে মেল বা পটীর নাম কি? তোমারা কি নৈকষ্য কুলীন? যদি "ভঙ্গ" হও তাহা হইলে কয় পুরুষ ভঙ্গ? এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া আবশ্যক, কিন্তু সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। বিবাহাদি সম্বন্ধ নির্ব্বাচণের সময় অবশ্য সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিয়া বিস্তৃত পরিচয় দিতে হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদ্বারা ব্রাহ্মণের পূর্ব্ববর্ত্তী ও বর্ত্তমান বংশের সম্যক পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। অতীত ইতিহাসে জ্ঞানলাভ করা প্রত্যেক গৃহস্থ, প্রত্যেক সমাজ এবং প্রত্যেক জাতির পক্ষে নানাকারণে পরম কল্যাণ কর। "ব্রাহ্মণের আত্ম পরিচয়" নামক বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি ব্রাহ্মণ জাতির বেদ, গাঁই, গোত্র, মেল, কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আকাঙ্খা করি। ইহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ সন্তানগণ তাঁহাদের আত্ম-পরিচয় ব্যঞ্জক সামাজিক নিয়মগুলি বুঝিয়া লইতে পারিবেন। প্রথমে দুইটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইয়া দিব। নিম্নের কথোপকথনে পাঠক তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

প্রশ্ন—তুমি কি জাতি? উত্তর—আমি ব্রাহ্মণ। প্র—কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ? উ—রাঢ়ী শ্রেণী। নাম কি? ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পিতার নাম কি? নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; আমার মাতামহের নাম হরিহর চট্টোপাধ্যায়। আমরা কামদেব ঠাকুরের সন্তান।

সামবেদী ব্রাহ্মণ; নৈকষ্য কুলীন, মুখুটি গাঁই। আমাদের বেদের শাখা কুথুম। ইত্যাদি। আর একজনকে প্রশ্ন করা হইল; তুমি কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ? উত্তর হইল, আমি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। নাম শশীভূষণ লাহিড়ী; সামবেদী কুথুম শাখী ব্রাহ্মণ; সাণ্ডিল্য গোত্র; কুলীন। পিতার নাম যাদবচন্দ্র লাহিড়ী, মাতামহ ভৈরবকুমার সান্যাল। আমাদের গাঁইএর নাম ——ইত্যাদি।

পূর্ব্বকালে অনেক ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য জাতির লোক ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। আত্মপরিচয় কালে ইহাও বুঝা যায় যে, পরিচয় দাতার পূর্ব্ব পুরুষ বিশুদ্ধ সনাতন ব্রাহ্মণ বীর্য্যে সমুৎপন্ন বিশ্বাগুণ অথবা তপস্যা অথবা অন্য কারণে ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন ইহাঁরা কতকালের ব্রাহ্মণ তাহাতে আত্মপরিচয় কালে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

বেদ, পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থাপেক্ষা প্রাচীনতম। ইহাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ আর নাই। ইহা অপৌরুষের অর্থাৎ ভগবান ব্রহ্মার মুখকমল বিনির্গত বাক্য। স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ধর্ম্মের সংস্থাপন ও জীবের কল্যাণ জন্য. যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ ধর্ম্মনীতি এবং ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশাদি প্রদান করিতেন, তৎকালের ঋষিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া কণ্ঠস্থ করিতেন। এইরূপে তখন অনেককাল পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমে বেদবাক্য সমূহ কণ্ঠস্থ থাকিত, এই কারণে বেদের অন্য নাম-"শ্রুতি"। শ্রবণ করিয়া ইহা মুখস্থ করা হইত বলিয়া ইহার আদি নাম শ্রুতি। ক্রমে লেখা পড়া প্রথার সৃষ্টি হইলে ঋষিসন্তানগণ কণ্ঠস্থ ব্রহ্মবাক্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন; প্রথমে বেদ শাস্ত্রকে বিভক্ত করা হয় নাই; "এক এব পুরা বেদ: প্রণবঃ সর্ব্ব বাঙ্ময়ঃ।" আদিতে এক বেদ ছিল, কিন্তু তাহা আকারে এত বৃহৎ এবং তাহার সমুদয় আয়ত্ত করা এত কঠিন ছিল যে, সমগ্র বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করা কঠিন হইতে কঠিনতর হওয়া উচিত; এই কারণে মহামতি ব্যাস দেব সমগ্র বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ছিলেন; তাহাদের নাম এই—— ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব। এই রূপে চারি অংশে বেদ শাস্ত্র বিভক্ত হইয়া গেলে তাহা পাঠ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে সহজ হইয়া উঠিল; যাঁহারা ঋক বেদাধ্যায়ী হইলেন তাঁহারা ঋগ্বেদী, যাঁহারা সাম বেদ গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা সামবেদী, যাঁহারা যজুর্ব্বেদ লইলেন তাহারা যজুর্ব্বেদী এবং যাঁহারা অথর্ব্ব বেদ গ্রহণ করিলেন তাঁহারা অথর্ব্ববেদী বলিয়া খ্যাত হইলেন। কিন্তু বিপুল বেদ শাস্ত্র চারি অংশে

একটী বেদের এক একটী শাখা মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাই অধ্যয়ন করিতে লগিলেন। ক্রমে ক্রমে বেদ এবং বেদ শাখা অনুসারে ব্রাহ্মণগণ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। দৃষ্টান্ত—তোমার বেদ কি? উত্তর—সামবেদ। প্রশ্ন হইল, তোমাদের বেদ শাখা কি? কুথুম। আবার আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার বেদ কি? উত্তর হইল—যজুর্ব্বেদ। তোমাদের বেদ শাখা কি? মাধ্যন্দিনী শাখা। ইত্যাদি। বঙ্গদেশে প্রধানতঃ সামবেদী ব্রাহ্মণই অধিক। ঋগবেদী ও যজুর্ব্বেদী কম; অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা কয়েক ঘর মাত্র। প্রকৃত বাঙ্গালী গৃহস্থে অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কোন্ বেদে কি আছে তাহা সংক্ষেপে জানিয়া রাখা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথমে জানা উচিত, মূল বেদ কি? ইহা কবে প্রচারিত হয়? ইহার আদি কোথায়? বলা বাহুল্য, হিন্দু ধর্ম্মের মুলই বেদ। এই আদি শাস্ত্র বেদ হইতেই সমস্ত ধর্ম্ম তত্ত্ব ও সমস্ত শাস্ত্র নিঃসৃত হইয়াছে। ইহা ব্রহ্ম বাক্য; ইহা অপৌরুষের অর্থাৎ মনুষ্যের মন, মস্তিষ্ক বা শ্রমের ফল নহে, ইহা পরব্রহ্মের প্রত্যাদিষ্ট বাক্য। পরমেশ্বর অনাদি, তাঁহার জ্ঞান ও আশনি এবং অনন্ত। বেদশাস্ত্র তাঁহারই জ্ঞানোপদেশে পরিপুর্ণ, সুতরাং বেদও অনাদি এবং ইহার অভ্যন্তরস্থ জ্ঞানেরওঅন্ত নাই। বেদ শব্দ বিদ ধাতু হইতে উৎপন্ন বিদ ধাতু অর্থে জানা বা জ্ঞাত হওয়া। অর্থাৎ যে অপার জ্ঞানময় অপৌরুষের শাস্ত্র দ্বারায় ভগবান কে জানা যায় এবং ধর্ম্ম ব্যবস্থা বুঝা যায় তাহাই বেদ। ইহা পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্যকৃত নহে, সুতরাং অপৌরুষেয়। যে সময়ে লেখা পড়া প্রথা পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কৃত বা প্রচলিত হয় সে সময়ে বেদশাস্ত্র বর্ণমালার সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছিল। যদি সেই সময়ের নির্ণয় করা যায়,তাহা হইলেও বেদ বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার শাস্ত্র বলিয়া গণ্য হয়।

যে বেদ চারিটি বিভাগের কথা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বিভাগের পরেও ইহার আয়তন কম হয় নাই, সুতরাং এক একটি অংশ সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ব করাও কঠিন হইয়া উঠিল, এই কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণেরা আপনাপন বেদের এক একটী শাখা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; যেমন সামবেদী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে কেবল কুথুমিক শাখাটী গ্রহণ করিলেন; যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে কেবল মাধ্যন্দিনী শাখাটি গ্রহণ করিলেন; এবং ঐ শাখা অনুসারে পরিচিত হইতে লাগিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা বলে দুইটী বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা দ্বিবেদী নামে পরিচিত ইঁহারা অপভ্রংশ দোবে বলিয়া সম্বোধিত

হয়েন। যাঁহারা তিন্‌টি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা ত্রিবেদী বা তেবে বলিয়া প্রসিদ্ধ; যাঁহারা চারিটি বেদ লইয়াছিলেন, তাঁহারা চতুর্ব্বেদী বা চোবে বলিয়া বিখ্যাত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মধ্যে দোবে, তেবে, চোবে প্রায়ই নাই। অধিকাংশ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সামবেদী।

ঋগ্বেদে পরমার্থ তত্ত্ব ও ভাগবৎ উপাসনা আছে। বেদের এই ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। যজুর্ব্বেদ মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্যবস্থাকাণ্ড নিহিত আছে। যজুর্ব্বেদ হইতেই ব্যবস্থাশাস্ত্র নিঃসৃত হইয়াছে। ক্রিয়া কাণ্ডে ইহার বিশেষ আয়োজন।

কর্ম্ম কাণ্ডি ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই যজুর্ব্বেদী। যজুর্ব্বেদ দুই অংশে বিভক্ত; শুক্ল যজু এবং কৃষ্ণ যজু। সামবেদে ভগবৎ উপাসনা ও ঈশ্বর তত্ত্ব নিহিত আছে। ইংরাজি Psalm শব্দ সংস্কৃত সাম শব্দের অর্থব্যঞ্জক। সামবেদ অতি পবিত্র; বিশেষতঃ ইহার ঋক সমূহ অতীব মধুর; এই কারণে সামবেদ সুন্দর গান করা যাইতে পারে। বেদ সমূহ গান করিতে হইলে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতি স্বর বা সুরের আশ্রয় অবলম্বন করিতে হয়। সামবেদোক্ত ভাগবৎ প্রার্থনা ( Hymns and prayers ) অতীব মধুর। ঋগ্বেদের অনেক অংশ বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে হয় কিন্তু সামবেদ প্রগাঢ় বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তি দ্বারা আয়ত্ত করা যায়। সামবেদ অপেক্ষাকৃত সরল এবং সর্ব্ব বেদাপেক্ষা মধুরতম। ভগবৎ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন "বেদানাং সামবেদোস্মি" বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। ইহাতে সামবেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত্য হইল। বস্তুতঃ ঋক, যজু ও সাম এই তিনটি লইয়াই বেদ; এজন্য বেদের অপর নাম "ত্রয়ী"। চতুর্থবেদ তুলনায় আধুনিক সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা শেষ বেদ; ইহার নাম অথর্ব্ব বেদ। এই বেদে ব্যবহার তত্ত্ব আছে এবং এই বেদ হইতে আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। সংগীত, চিত্রবিদ্যা, কৃষি, চিকিৎসা, সমর নীতি প্রভৃতির মূল অথর্ব্ব বেদ।

যাহা হউক, সমুদয় বেদই অপার জ্ঞানে পরিপুর্ণ। সমস্ত শাস্ত্রের ইহা মূল। সুতরাং বেদ অতীব পবিত্র এবং অতীব প্রয়োজনীয়।

অতঃপর গাঁই, গোত্র, মেল প্রভৃতির কথা আলোচনা করা যাইতেছে। ব্রাহ্মণের আদি পুরুষেরা যে যে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই গ্রামের অধিবাসী। গাঁই শব্দ গ্রামীশব্দের অপভ্রংশ। এখনও গ্রামী শব্দ ব্যবহৃত হয়। নবীপুর নামক গ্রামের অধিবাসী নবপুর গ্রামী, জগদীশপুর গ্রাম

পুরুষ কোন্ স্থানের ( কোন্ গ্রামের ) অধিবাসী ছিলেন তাহা বুঝা যায় ; এতদ্বারা আদি পুরুষের জন্ম স্থান নির্ণীত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ জাতির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বিবরণ কালে গাঁই শব্দের বিশেষ ইতিহাস প্রদত্ত হইবে। গোত্র শব্দের অনেকে অনেক প্রকার অর্থ করেন, কিন্তু গোত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ গো পালন, গো চারণ ও গো রক্ষণ। গোত্র শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইল, এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। গোত্র দ্বারা আদিপুরুষের নাম বুঝা যায়। গোত্র সমূহ ঋষি বা মুনি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং কোন্ ব্রাহ্মণ কোন ঋষি বা মুনির বংশধর, গোত্র দ্বারা তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণেরও গোত্র আছে কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ ঋষির সন্তান নহে। যে ঋষি বা যে মুনির তাহারা অনুগত ছিল অথবা যে যাহার গুরু তদনুসারে তাহাদের গোত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের গোত্র, গুরুর গোত্র অনুসারে অথবা আদি প্রভু ঋষি বা মুনির গোত্রানুসারে হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণের গোত্র তাহার আদি পুরুষ ঋষি হইতেই সমুৎপন্ন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বর্গের মধ্য প্রধানতঃ পাঁচটি গোত্র প্রচলিত ; এই পাঁচটি গোত্র কান্যকুব্জ নগর হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; যথা—শাণ্ডিল্য ( আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ ) কাশ্যপ ( দক্ষ ), বাৎস ( ছান্দড় ), ভরদ্বাজ ( শ্রীহর্ষ ), সাবর্ণ ( বেদগর্ভ )। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব পুরুষগণ ঐ পঞ্চ গোত্রের লোক ছিলেন।

বঙ্গের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেবল উপরি উক্ত পাঁচটি গোত্র প্রচলিত আছে তাহা নহে, বহু গোত্রের প্রচলন দেখা যায়। যথা—১। অগস্ত্য, ২। অগ্নিবেশ্য, ৩। অত্রি, ৪। অনাবৃকাক্ষ, ৫। অব্য, ৬। আঙ্গিরস, ৭। আত্রেয়, ৮। আগ-ম্যান, ৯। উদ্দালক, ১০। উপমনু ১১। ঋষিভ ১২। উতথ্য, ১৩। কুম্ব, ১৪। কপিঞ্জল, ১৫। কণ্বিশ, ১৬। কাকন, ১৭। কাশ্যয়ন ( অথবা কাম্বায়ণ )। ১৮। কাত্যায়ন। ১৯। কামকারণ, ২০। কাশ্যপ, ২১। কুশল, ২২। কৃষ্ণাত্রের ২৩। কৌণ্ডিল্য, ২৪। কৌশিক, ২৫। কৌৎস্য, ২৬। কৌস্তভ, ২৭। গর্গ, ২৮। গোতম, ২৯। ঘৃত কৌশিক, ৩০। গৌতমী, ৩১। জাবালি, ৩২। তৈত্তেরিয়, ৩৩। জাতুকর্ণ, ৩৪। জামদগ্ন, ৩৫। জৈমিনি, ৩৬। তুতিমাষ, ৩৭। পরাশর, ৩৮। পৌলস্ত্য, ৩৯। পৈচিনসি, ৪০। বৃদ্ধ, ৪১। ভরদ্বাজ, ৪২। বৃহস্পতি, ৪৩। ভার্গব, ৪৪। মৌদ-গল্য, ৪৫। মৌনস, ৪৬। যাজ্ঞবল্ক্য, ৪৭। রথীতর, ৪৮। রোহিত, ৪৯। রজত-কৌশিক, ৫০। বশিষ্ঠ, ৫১। বাৎস্য, ৫২। বাসুকি, ৫৩। বিশ্বামিত্র, ৫৪। বিষ্ণু,

৫৫। শক্তি, ৫৬। শাণ্ডিল্য, ৫৭। পৌসক, ৫৮। শুনক,৫৯। সাংকৃতি,৬০। সাবর্ণ ৬১। সৌকালীন, ৬২। সৌপায়ণ, ৬৩। হারীত, ৬৪। স্বর্ণ কৌশিক,৬৫। সঙ্কর্ষণ, প্রভৃতি প্রায় এক শতাধিক গোত্র প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে উপরি উক্ত গোত্র গুলিই প্রধান।

গোত্র শব্দ, সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে, পুলিঙ্গ এবং ক্লিবলিঙ্গ উভয় লিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্লীব লিঙ্গে গু+ত্র; পুংলিঙ্গে গো+ত্রৈ=ড। অর্থ—কুল, আদিপুরুষ, সন্ততি, অরণ্য, ক্ষেত্র, ছত্র, গোগৃহ, পথ, পৃথিবী, ভূমণ্ডল, পর্ব্বত ইত্যাদি। গো অর্থে বাক্য, দিক, বাণ, সূর্য্য, চন্দ্র, বজ্র, রশ্মি, স্বর্গ, চক্ষু, মাতা, পৃথি, ধর্ম্ম, কুল, ধন, সম্পত্তি, লক্ষ্মী, গো জাতীয় পশু, প্রভৃতি। গো বা গো রক্ষণ করা অতি পুরাকালে হইতে হিন্দুর পক্ষে পরমধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। গাভী অতি পবিত্রা এবং মাতার মাতা স্বরূপিণী, সুতরাং গাভী পালন, রক্ষণ বা চারণ হিন্দুর পক্ষে পরম ধর্ম্ম। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ইহা শ্রেষ্ঠ ভূষণ। যে হিন্দুর গৃহে গো পালিতা অথবা রক্ষিতা কিম্বা আহৃত না হয়, অথবা যে হিন্দুর গৃহে কোন প্রকার গব্যদ্রব্য ব্যবহৃত না হয় সে গৃহ মরুভূমি তুল্য পরিত্যজ্য। গাভী পালনে হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা হয়। গৃহস্থের পক্ষে চারিটি নিয়ম অবশ্য পালনীয়, এই চারিটার মধ্যে একটাও যে হিন্দুর গৃহে পালিত না হয় সে গৃহ হিন্দুর গৃহ নহে, ম্লেচ্ছ যবনের গৃহ অথবা অরণ্য বলিয়া গণ্য। গৃহী লোকেরা এই চারিটি নিয়মকে অথবা অন্ততঃ এই নিয়ম চতুষ্টয়ের মধ্যে একটিকেও পালন না করিলে তাহাদের গৃহ "গৃহস্থ" বলিয়া গণ্য হইবে না। ঐ চারিটি নিয়ম এই——আশ্রম, বিগ্রহ, গো ও বালক। গো অর্থে গাভী পালন করা বালক অর্থে সন্তান; বিগ্রহ অর্থে দেবদেবীর পূজা এবং আশ্রম অর্থে অতিথি সৎকার, মুষ্টি ভিক্ষা দান, সমাগত বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, কুটুম্ব; গুরু প্রভৃতির অভ্যর্থনা ও সেবা। এই চারিটি অথবা অন্ততঃ ইহাদের একটিও না থাকিলে গৃহ গৃহ নহে, পরিবারটি গৃহস্থ বলিয়া গণ্য নহে; অরণ্য বলিয়া গণ্য। গৃহে গো পালন করিলে ঐ কয়েকটি নিয়ম পালন করার ফললাভ করা যায়। অতএব গৃহে গো পালন করা অতীব সুন্দর ব্যবস্থা। যে গৃহস্থে পালিতা গাভী থাকে সে গৃহস্থে লক্ষ্মী বিরাজিত থাকেন। ঋষিরা গোপালন করিতে বড় ভাল বাসিতেন, তাহাদের কন্যাগণ গাভীর দুগ্ধ দোহণ করিতেন বলিয়া কন্যার অপর নাম "দুহিতা" হইয়াছে। গোপালনের, গোচারণের ও গো রক্ষার জন্য ঋষিদের আশ্রমে একটি

সেই ঋষি তদনুসারে গোত্রি স্বামী, গোত্রিপতি অথবা গোত্র বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। ঋষি সন্তানেরা এবং ঋষি শিষ্যগণ ঐ ঋষি বা মুনির গোত্র অনুসারে পরিচিত হইতেন। এইরূপে গোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কন্যাগণও পিতার গোত্র মতে গোত্রজাবলিয়া পরিচিতা হয়েন কিন্তু বিবাহের পরে শ্বশুর গোত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। 'প্রবর' জানিবার তাৎপর্য্য এই যে, এক নামে অনেক গোত্র প্রচলিত হইবার পরে, সেই গোত্রের প্রবর্ত্তক ঋষির নাম জানিতে সক্ষম হইলে স্বগোত্র কি গোত্রান্তর তাহা প্রতীয়মান হইয়া পড়ে। প্রত্যেক গোত্রে যতগুলি প্রবর নির্দ্দিষ্ট আছে, ভিন্ন গোত্রের মধ্যে তাহার একটিও প্রবর উক্ত থাকিলে পরস্পরের বিবাহ হইতে পারে না, ইহাই বিধি। স্বগোত্র ও সমান প্রবরে বিবাহ হইলে ব্রাহ্মণ সমাজচ্যুত হইবেন। সুতরাং আবশ্যক হইলে গোত্রের সঙ্গে প্রবরের পরিচয় দিতে হয়। উর্দ্ধতন বা অধস্তন কোন পুরুষের সঙ্গে কোন সংশ্রব আছে কিনা, তাহা প্রবরের দ্বারা জানা। 'কুলীন' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। যে সকল ব্রাহ্মণ আচার, বিনয়, বিদ্যা, যশ তীর্থাদি দর্শন, নিষ্ঠবৃত্তি, তপ, দান এই নয়টি গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য তাঁহারা কুলীন বলিয়া সম্মানিত।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিঃ তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥" (১)

শ্রেষ্ঠ যদি শ্রেষ্ঠের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন অর্থাৎ কুলীন যদি কুলীনের ঘরে সম্বন্ধ রাখিতে থাকেন তাহা হইলে উভয় গৃহই কুলরক্ষক অর্থাৎ কুলীন বলিয়া গণ্য হয়েন। কুলীন যদি অকুলীনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন তাহা হইলে তাঁহার কুল ভঙ্গ হওয়ায় তিনি আর কুলীন থাকেন না। যিনি কুলভঙ্গ করেন তিনি "স্বকৃত ভঙ্গ" বলিয়া পরিগণিত হয়েন তাহার পরে ১ পুরুষে, ২ পুরুষে ভঙ্গ, ইত্যাদি রূপে পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু দুই পুরুষাপেক্ষা বেশী হইলে আর "ভঙ্গ" বলা চলে না। যাঁহারা কুলক্ষয় করিয়াছিলেন তাঁহারা বংশজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বংশজ দিগের মধ্যে অনেক ভাল ভাল পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা হিন্দু সমাজে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেন, তাঁহারা ঘটক নামে আখ্যাত হয়েন। ঘটক দিগের নিম্ন লিখিত গুণ গুলি থাকা উচিত। (১) বংশাবলীর বিবরণ অবগত হওয়া, (২) পরিশ্রম

(১) 'কু' শব্দের অর্থ বেদ, 'লীন' শব্দের অর্থ পারদর্শিতা।
[illegible] ও জ্ঞানবান পুরুষেরা কুলীন নামে খ্যাত॥

স্বীকার করা, (৩) ভ্রমণে পটুতা, (৪) মিষ্ট ভাষীত্ব; (৫) বহু লোকের সহিত পরিচয়, (৬) বংশের দোষ গুণ অবগত হওয়া, (৭) কৌলিন্য মর্য্যাদা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা, (৮) সাবধানতা, (৯) শান্ত স্বভাব, (১০) তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্বা।

যখন ব্রাহ্মণ সন্তান কে জিজ্ঞাসা করা যায় "তোমরা কাহার সন্তান?" তখন বুঝিতে হইবে যে, প্রশ্ন কর্ত্তা উত্তর দাতার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। যে ব্যক্তির দ্বারায় বংশের মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই গুণবান ব্যক্তির নামোচ্চারণ কে "সন্তান পরিচয়" কহা গিয়াছে। "তুমি কাহার সন্তান?" উত্তর হইল "বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান" "তুমি কাহার সন্তান?" কামদেব ঠাকুরের সন্তান। ইহাতে বুঝিতে হইবে, প্রথম উত্তর দাতার বংশে বিষ্ণু ঠাকুর নামক প্রশংসিত পুরুষ এবং দ্বিতীয় উত্তর দাতার বংশে কামদেব ঠাকুর বংশ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে কালের সুযোগ্য ঘটক গণ প্রধান প্রধান বংশের এই সকল কথা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা রাখিতেন। সে কালের কুলাচার্য্য গণের নিকটে সমুদয় বংশের সম্পুর্ণ ইতিহাস রক্ষিত হইত; কুলাচার্য্য গণ ঐ ইতিহাস লিখিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, এবং ভাল ভাল ঘটকেরাও তাহাই করিতেন।

'ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশক স্তথা।
দূশকং স্থাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতা॥
কেনো বিদন্তি পুরুষাঃ পুরুষানুপূর্ব্বী মুর্ব্বীতলে কুলভৃতাং কুলবর্ধনং বা
অত্যন্ত সূক্ষমপি যে কুলতারতম্যং জানন্তি তেহি ঘটকানতু যোজকাস্তাঃ॥
অংশ বংশ তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নাম গ্রহণাৎ পরম্॥"

(কুলদীপিকা)

ফলতঃ সুযোগ্য ঘটক মহাশয় দিগকে সকল বিষয়েই সমাচার রাখিতে হয়। এইজন্ত ব্রাহ্মণ ঘটকগণ এক সময়ে অত্যন্ত সন্মানিত ও সমাদৃত ছিলেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য এবং বহুদর্শিতাও যথেষ্ট ছিল। সমান বা উৎকৃষ্ট বংশ হইতে কন্যা গ্রহণ কে "আদান" এবং সমান বা উৎকৃষ্ট পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের নাম "প্রদান"। কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যাদানকে "কুশত্যাগ পরিবর্ত্ত" এবং ঘটকের সম্মুখে বাক্য মাত্র দ্বারা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক পরস্পর কন্যাদান ও গ্রহণকে "ঘটকাগ্রেপ্রতিজ্ঞা" কহা হইয়া থাকে। ঐ চারিটি প্রথার নাম "পরিবর্ত্ত"। ঘটকেরা এই সমস্ত সমাচার সংগ্রহ করিতেন। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে কে সিদ্ধ, কে সাধ্য অথবা কে অরি বা "কষ্ট" শ্রোত্রিয় তাহাও ঘটকেরা জানিয়া রাখিতেন।

কোন কোন ব্রাহ্মণ সমাজ বা গৃহস্থ কোন কোন দোষে নিন্দিত হইয়াছিলেন, কাহার কি মেল তাহা জানা গেলে কাহার বংশে কি দোষ ঘটিয়াছিল তাহা অবগত হইতে পারা যায়। সুরাপান, নীচ জাতির সহিত সংশ্রব প্রভৃতি নানা প্রকার দোষে নানা গৃহস্থ নিন্দিত হইয়াছিলেন। নিন্দিত ব্যক্তি বর্গের এক একটি দল বা থাক হইত, তাহার নাম মেল। কতক গুলি মেলের নাম নিম্নে লিখিত হইল। প্রধানতঃ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে ৩৬ টি এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বর্গ মধ্যে ৮ টি মেল প্রধান। তদ্যথা——

ফুলিয়া, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী, বল্লভী, সুরাই, আচার্য্যশেখরী, পণ্ডিরত্নী, বাঙ্গাল, গোপাল ঘণ্টা, ছায়া নরেন্দ্রী, বিজয় পণ্ডিতী, চাঁদাই, মাধাই, বিদ্যাধরী, পরিহাস, শ্রীরঙ্গ ভট্টী, মালাধরখালী, কাকুস্থী, হরিমজুমদারী, শ্রীবর্দ্ধনী, প্রমোদানী, দশরথ-ঘটকী, শুভরাজখানি, নড়িয়া, রায় মেল, চট্টোরাঘবী, দেহলীছড়ী, ভৈরব ঘটকী, আচাম্বিতা, ধরাধরি, রাণী রাঘব, ঘোষলী, শুদ্ধ সর্ব্বানন্দী, সর্ব্বানন্দমালী, চন্দ্রবতী। এই গুলি ( রাঢ়ীয় মেল )।

নিবারিল, ভূষণা, রোহিলী, ভবানীপুর, বেণী, আলখানি, কুতবখালী, জোনালী। এই কয়েকটী ( বারেন্দ্র পটী )।

---

# রঙমহলের প্রেম।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

## পঞ্চম স্তবক।

### অক্ষয় কবচ।

ডলতাবান পাশার দল ইত্যবসরে সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া, নিম্নতলে পাড়িবারাণ্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে আসিয়া পাশাথালিল ও জুলেকাকে কহিলেন "আমার সঙ্গে আইস"।

এই বলিয়া পাশা সম্মুখস্থ একটি দরজা খুলিলেন। ঐ দরজার চাবি তাঁহার নিকট ছিল। ঐ দ্বার দিয়া তিনি প্রাসাদের নিম্ন তলস্থ একটী কক্ষে যুবকদ্বয় কে লইয়া গেলেন।

পাশা কহিলেন "আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, তুমি ততক্ষণ এই খানেই

থাক। আমি ফিরিয়া আসিয়া, তোমার বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ তোমাদিগকে দিব। বসফোরসের গভীর সলিলেই তাহার মৃত্যু জানিও। তোমাদিগের জীবনের মায়া থাকিতে যাহাতে আর কখন এস্থানে না আইস, এই প্রাসাদ হইতে বিদায় দিবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে সেইরূপ দুইটা উপদেশ আমি ফিরিয়া আসিয়া দিব। কিন্তু সাবধান, আমার অনুপস্থিতিকালে পলায়নের চেষ্টা করিও না। দাসগণ উন্মুক্ত অসি হস্তে বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত থাকিবে।

এই কথাবলিয়া পাশা দ্রুতপাদক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

গৃহটী অতি সুন্দর ও আলোময়। পাশা বাহির হইয়া যাইবামাত্র জুলিয়ান খালিলকে কহিলেন,—"প্রিয়তম খালিল, তুমি কি মনে কর, বৃদ্ধ পাশা আমাদের সহিত প্রতারণা করিবে। ছল করিয়া আমাদের হত্যা করিবে ?

খালিল কহিলেন,—"পাশার সেরূপ অভিপ্রায় আছে বলিয়া ত আমার সন্দেহ হয় না।"

জুলিয়ান কহিলেন,—"লিউকস কি তোমাকে কিছু বলিয়াছিল ? 'আশা আছে' এমন কোন কথা কি তোমাকে তিনি বলেন নাই ?"

যুবক কহিলেন,—"আমিই সে আশার কথা তাহার কাণে বলিয়াছিলাম।

জুলিয়ান বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"তুমি—খালিল তুমি কিরূপে—নিজে তুমি এখানে বন্দী—

অবিচলিত ভাবে অথচ নিজের একটুও বাহাদুরি প্রকাশ না করিয়া, যুবক কহিলেন,—"বন্ধুবর, উদ্বিগ্ন হইও না, নিশ্চিতই তোমার বন্ধুর জীবনের আশা আছে যিনি তোমার ও আমার অপরাধের জন্ত স্বীয় জীবন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন সেরূপ উদারচেতা পুরুষের জীবন রক্ষার উপায় নিকটে থাকিতে কি—

জুলিয়ান বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিতভাবে কহিলেন,—"উপায় নিকটে থাকিতে, কি উপায় ?

খালিল কহিলেন,—"উপায় অন্ত কিছুই নহে, একটি অঙ্গুরীয় মাত্র। আমি সেই অঙ্গুরীয় লিউকসের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছি। এইমাত্র জান ও বিশ্বাস কর যে, ঐ অঙ্গুরীয় অক্ষয় কবচের কাজ করিবে।"

ইত্যবসরে ডলতাবান পাশা খোজাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা তাহারা গাড়ি বারাণ্ডায় বন্দীদ্বয় কে লইয়া, তাঁহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতে-

করিয়া বাঁধিল। দুই জন খোজা খালিল ও জুলিয়ানের গৃহে পাহারা দিতে চলিল। প্রণয়ী যুগল পরস্পর কোন কথা কহিতে না পারে, এজন্য ডলতাবান পাশা নিষ্কাসিত অসি হস্তে উভয়ের মধ্যে রহিলেন। এক জন রক্ষি দৃঢ় মুষ্টিতে লিউকসকে ধরিয়াছে, অপর দাস গুলনেয়ারের পাশে পাশে চলিয়াছে। তাহার প্রিয়তমের জীবনের যে কোন আশা আছে, শোকাকুলা যুবতি তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। খালিল লিউকসের কর্ণে যাহা বলেন সে তাহা শুনে নাই, লিউকসও এ যাবৎ তাহাকে কোন কথা বলিবার সুযোগ পান তাই।

তাঁহারা উদ্যান ভূমি অতিক্রম করিয়া, যেখানে সেই ক্ষুদ্র নৌকা সোপান শ্রেণীর নিম্নে বাঁধা থাকে, সকলে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতক্ষণ গুলনেয়ার অন্যের বিনা সাহায্যে পায় পায় অগ্রসর হইল। ভয়ে সে নিতান্ত অভিভূত, নিতান্ত ব্যথিত না হইলে, হয়ত সে এতক্ষণ প্রিয়তমের জীবন-দান করিবার জন্য পিতার নিকট দশ বার ভিক্ষা প্রার্থনা করিত; কিন্তু আতঙ্কে তাহার বাকশক্তি একরূপ রহিত হইয়া গিয়াছে, সে যেন স্বপ্নেই বিচরণ করিতেছে। যখন সে সোপানাবলীতে পাদক্ষেপ করিল, যখন বসফোরসের জলকল্লোল তাহার কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিল,খালের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ শাখায় সমাচ্ছন্ন থাকায় বসফোরসের গভীর জল রাশি দৃষ্টিপথে পতিত না হইলেও সে যখন ভাবিল তাহার প্রিয়তম অকালে সেই সলিল স্রোতেই জীবন হারাইবে, তখন আর সে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। তাহার সংজ্ঞা লোপ হইল,পার্শ্বস্থ রক্ষি বাহু-প্রসারণে তাহাকে ধারণ না করিলে সে নিশ্চয়ই ভূপতিত হইত।

গুলনেয়ারের যখন প্রথম সংজ্ঞা লাভ হইল,সে যখন প্রথম চক্ষুরুন্মীলন করিল, তখন সে আপনাকে বসফোরস নদীর মধ্যস্থানে সেই ক্ষুদ্র তরণীতে শায়িত দেখিল। চন্দ্রালোক শোভিত নৈশ জগতের অপূর্ব্ব শোভা তাহার নয়ন পথে পতিত হইল। তখনও তাহার হস্তদ্বয় আবদ্ধ। তাহার প্রাণাধিক লিউকস তাহারই পার্শ্বে উপবিষ্ট। তাহারও হস্তদ্বয় সেইরূপ বদ্ধ। দাসদ্বয় ক্ষেপনী হস্তে স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট পাশা তরণীর মধ্যস্থলে উন্মুক্ত অসি হস্তে দণ্ডায়মান। চন্দ্রালোকে সে অসি ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

এ দৃশ্য অতীব মনোহর। জল ও স্থলের শোভা একত্র সম্মিলিত। বৃক্ষ শ্রেণী মধ্যস্থলে পাশার অপূর্ব্ব উদ্যান বাটী, জ্যোৎস্নালোকে মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। তুষার ধবল কত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ সৌধরাজি উভয় তীরে বিরাজমান রহিয়াছে। দূরে প্রধানা নগরী

বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও ধর্ম্ম মন্দিরের সহিত চন্দ্রকিরণ ভাসিত বসফোরসের বিমল জলে প্রতিফলিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভারই সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু হায় এসকল সৌন্দর্য্যে হতভাগিনী গুলমেয়ারের লাভ কি? সংজ্ঞা হারা হইয়া সে এতক্ষণ শান্তিময়ী বিস্মৃতির কোমল ক্রোড়ে গা ঢালিয়া সুখে নিদ্রিত ছিল, সংজ্ঞা আসিবামাত্র, স্মৃতি জাগরিত হইয়া দারুণ আধিব্যাধি তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। সে দেখিল তরণী বসফোরসের বক্ষে ভাসিতেছে। অচিরে এই জলরাশি তাহার প্রাণাধিক প্রিয়তমকে চিরদিনের মত গ্রাস করিয়া ফেলিবে, ভাবিয়া প্রাণ অতিমাত্র ব্যাকুল হইল। সে অতিমাত্র কাতর হইয়া হৃদয় বিদারক স্বরে—— সে কাতরতা দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়—যুবতি কহিল, "পিতা, পিতা ক্ষমা করুন, যুবকের প্রাণ দান করুন, আমাকে সে ভীষণ হৃদয় বিদারক দৃশ্য সন্দর্শন ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিন। সে দৃশ্য দেখিলে আমি প্রাণে বাঁচিব না, যদি একান্তই সংঘটীত হয়, তবে আমি নিশ্চিত পাগল হইয়া যাইব।"

পাশা গভীর নিনাদে কহিলেন,—"পাপীয়সি! চুপ্ কর, তোর প্রণয়ীর জীবন রক্ষা কিছুতেই হইবে না। কোন মতেই তাহার রক্ষা নাই।"

লিউকস কহিলেন,—"ধর্ম্মাবতার, এ তুচ্ছ জীবনের জন্য আমি আপনাকে কোন অনুরোধই করিব না। শুদ্ধ আপনার কন্যার জীবনের জন্যই আমি আপনাকে অনুনয় করিতেছি। আপনি সদয় হউন। জানি আমি অপরাধ করিয়াছি, আচার ব্যবহার ও প্রথামত আমার জীবন গ্রহণে আপনি সম্পূর্ণ অধিকারী, কিন্তু আপনি জানেন, মানব হৃদয়ে দয়া একটা প্রধান গুণ, ক্ষমতা ও অধিকার স্বত্বেও, যদি দয়া করিয়া, আপনি আমার জীবন দান করেন, তবে সে আত্ম প্রসাদের সুখ আপনি আজীবন উপভোগ করিতে পারিবেন, সে সামান্য সুখ নহে। আমার জীবন রক্ষা করুন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি,এই দণ্ডে আমি কনষ্টাণ্টিনোপল ছাড়িয়া যাইব, জীবনে আর কখনও এ মহানগরীতে পদার্পণ করিব না।"

পাশা কহিলেন—"তোমার কথা শুনিলাম। কিন্তু তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে কোন মতে পারিব না। এমত স্থল অনেক আছে, দয়া প্রদর্শন যে খানে মহাপাপ বলিয়া গণ্য হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি সেই বুদ্ধিতেই কার্য্য করিতেছি, তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। তোমার স্বীয় ধর্ম্মানুসারে শেষ সময়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়া লও। যদি ভগবানকে ডাকিতে চাও ডাকিয়া লও। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই তোমার জীবন বায়ু শেষ হইবে।"

হইতে লাগিলেন, তাঁহার ইঙ্গিত মাত্র একজন খোজা ক্ষেপণী ত্যাগ করিয়া, তাঁহার নিকট আসিল এবং তরণীর মধ্য হইতে একটী বৃহদাকার থলিয়া বাহির করিল। গুলনেয়ার ঘাড় ফিরাইয়া তাহা দেখিল, দেখিয়া, তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল সংজ্ঞালোপ হইবার উপক্রম হইল, এমত সময়ে লিউকস তাহার কানে কানে কহিলেন,—"ভয় নাই' প্রিয়তমে, ভয় নাই, জীবনের সম্পূর্ণ আশা আছে।"

গুলনেয়ারের কর্ণে এ ধ্বনি যে কি মধুর লাগিল তাহা বর্ণনাতীত। অনির্ব্বচনীয় উত্তাল আনন্দলহরী সর্ব শরীরে খেলিতে লাগিল। লিউকস নয়ন ভঙ্গি দ্বারা তৎক্ষণাৎ আবার তাহাকে কোন প্রকার ভাবান্তর দেখাইতে নিষেধ করিলেন। গুলনেয়ার তাহা বুঝিয়া স্থির হইয়া রহিল।

লিউকস পাশাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ধর্ম্মাবতার! আপনার নিকট এ অধম এই শেষবার দয়া ভিক্ষা চাহিতেছে।"

পাশা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—"না, তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। তোমাকে মরিতেই হইবে।"

লিউকস কহিলেন,—"একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, একবার চিন্তা করিয়া বুঝুন—একটা কাজ করিয়া ফেলিলে, তখন আর———"

পাশা কহিলেন,—"তোমার অনুনয় বিনয় বৃথা। সে সময় আর নাই। এখন চুপ কর।"

যুবক এবার নির্ব্বন্ধ সহকারে কহিলেন,—"আর একটাকথা ধর্ম্মাবতার, আর একটী মাত্র কথা শুনুন। আমার অঙ্গুলিতে একটা অঙ্গুরীয় আছে, ক্ষণকালের জন্য সেইটী একবার আপনি অনুধাবন করিয়া দেখুন।"

পাশা হাত নাড়িয়া, মুখভঙ্গি করিয়া কহিলেন,—"এ তুচ্ছ কথায় বৃথা কেন সময় নষ্ট করিতেছ?"

লিউকস কহিলেন,—"তুচ্ছ হ'লেও এটা মুমূর্ষু ব্যক্তির শেষ অনুরোধ। যাহাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন, তাহার শেষ কথাটী তুচ্ছ হ'লেও শোনা উচিত।"

ডলন্ডাবান ক্রোধে ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। এবং অধীর হইয়া, যেখানে গুলনেয়ার ও লিউকস ছিল, তথায় গেলেন। লিউকসের হস্তদ্বয় পশ্চাৎ ভাগে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। পাশা সেই হস্তের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, লিউকসের

কারের হীরক শোভা পাইতেছে। অপরটীতে একখানি প্রশস্ত মণি বসনে, তাহার মধ্যস্থলে খুদিয়া একটী শূন্তের আকার বাহির করা হইয়াছে এবং উহার চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও গঠনের অদ্ভুত অদ্ভুত চিহ্ন সকল অঙ্কিত। এই অঙ্গুরীয়তে দৃষ্টি পড়িবামাত্র ডলতাবান চমকিয়া উঠিলেন, দারুণ বিস্ময়ে তাঁহার মুখ হইতে একটা অস্ফুট চীৎকার ধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল। লিউকস বুঝিলেন, খালিল তাঁহাকে অলীক আশায় আশ্বাসিত করেন নাই। গুলনেয়ারের মনে আশা জন্মিল, কিন্তু কিরূপে যে অঙ্গুরীয়টী তাহার প্রাণাধিকের জীবনরক্ষা বিষয়ে অক্ষয় কবচের কাজ করিল, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। ডলতাবান পাশা আবার অঙ্গুরীয়টী দেখিলেন। বিশেষ মনোযোগের সহিত উহার প্রকৃতি ও গঠন প্রণালী লক্ষ্য করিলেন। দেখিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অবাক্ হইয়া গেলেন। কি বলিবেন, কি করিবেন কিছুই স্থির বুঝিতে পারিতেছেন না;

এবার একটু শান্তভাবে পাশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ অঙ্গুরীয় তুমি কিরূপে এবং কোথায় পাইলে?"

লিউকস তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"খালিল, ইতিপূর্ব্বে যে যুবক আমাদের সঙ্গে হুজুরের উদ্যান বাটীতে আসিয়াছেন, আমি তাহার নিকট এই অঙ্গুরীয় পাইয়াছি।"

ডলতাবান ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, তাঁহার বিস্ময়ের বেগ এখনো এক তিল মাত্র হ্রাস হয় নাই। গ্রীক যুবককে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন,—"সত্য বল, তুমি এই খালিলকে কতদিন হইতে জান, কোথায় তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ? ফল কথা সমস্ত কথা খুলিয়া বল, যাহা কিছু এ যাবৎ গোপন করিয়াছ, সে সমস্ত খুলিয়া বল।"

লিউকস কহিলেন,—"কয়েক ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে খালিলের সহিত জুলিয়ান মেলেডা ও আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে। একটী সুরালয়ে হঠাৎ তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাহার সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কিছুই জানি না। যাহা বলিতে বলিতেছেন বলিলাম। হুজুরের নিকট অন্য কোন কথাই গোপন করি নাই।"

ডলতাবান আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর, তিনি জনৈক খোজাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ পাশার অভিপ্রায় বুঝিল এবং

গুলনেয়ারের বন্ধন খুলিয়া দিলেন। পাশা এতই অন্যমনস্ক হইয়াছেন যে লিউকসের এই কার্য্য তিনি লক্ষ্য করিলেন না।

লিউকসকে লক্ষ্য করিয়া পাশা পুনরপি কহিলেন,—"স্মরণ রাখিও যে একটী অমূল্য জীবন থাকা না থাকা, তোমারই কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে; সত্য বল, খালিল সম্বন্ধে তুমি আর কিছু জান কিনা?"

অঙ্গুরীয়ের অদ্ভুত শক্তির কথা চিন্তা করিয়া লিউকসও বিস্মিত হইলেন, তিনি পাশার প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন,—"না ধর্ম্মাবতার আমি আর কিছুই জানি না।"

ডলতাবান কহিলেন,—"এ বড়ই আশ্চর্য্য"। পাশা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই স্থির হইতেছে না, বিস্ময়ের বেগ কিছুতেই কমিতেছে না। অনন্তর মৃদুস্বরে আবার কহিলেন,—"অন্ধকার রজনীতে এই অদ্ভুত পরিণাম দাঁড়াইল। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, কি দুর্ব্বোধ উপায়ে——

লিউকস বুঝিলেন তাহার জীবন এক্ষণে নিরাপদ হইয়াছে। তিনি পাশাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"যাহাই হউক, আপনি এ অধমকে দয়া করিতেই বোধ হয় স্থির করিয়াছেন। বোধ হয় পূর্ব্ব সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবেন না, আপনার কন্যাকে সে ভীষণ দৃশ্য দর্শন ক্লেশ হইতে অব্যাহতি——

গুলনেয়ার পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিল,—"পিতা, পিতা, যে কারণে হউক, আপনি এই যুবকের জীবনরক্ষা করিয়া, আমার হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনার চরণে শত সহস্র প্রণাম। যে জীবন আমার স্বীয় অপেক্ষা সহস্রগুণ প্রিয়তম, সে জীবন আপনি কৃপা করিয়া রক্ষা করায় আমিও প্রাণ পাইলাম। ডলতাবান পাশা যদিও বাধ্য হইয়া, লিউকসের জীবনদান করিলেন, তথাপি কিন্তু তিনি সে বাহাদুরি টুকু নিজের করিয়া লইতে ছাড়িলেন না।

পাশা কহিলেন,—"জগদীশ্বরের কৃপায় তোমাদের দুইজনকে যেরূপ ভয় প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছি। এইরূপ যে শিক্ষা তোমরা পাইলে তাহাতে বোধ হয়, তোমাদের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ইহা স্মরণ থাকিবে। এবং আর কখনও বোধ হয় এরূপ গর্হিত কার্য্য করিবে না। সে যাহা হউক, খালিল নিজের সম্বন্ধে কিরূপ বলে তাহা দেখিতে হইতেছে।

এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ পাশা নীরব হইলেন এবং দাসদিগকে সঙ্কেত

সমাচ্ছন্ন খালের দিকে তীরবেগে চলিল। পাশা নৌকায় উপবেশন করিয়া অবনত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রণয়ী-যুগল সেই সুযোগে চোখে চোখে পরস্পর ভালবাসা জানাইতে ও হৃদয়ের অপার আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। নৌকা সেই গাঢ় অন্ধকারময় খালের মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখের মানুষ দেখা যায় না। তাহাদের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। না হইবেই বা কেন, দশ মিনিট পূর্ব্বে মৃত্যু চিরদিনের মত তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে আবার পরস্পর পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন দানে সক্ষম হইয়াছে। যদিও তাহারা জানে না, এই ঘটনার পরিণাম কি দাঁড়াইবে, কঠিন হৃদয় পিতার আজ্ঞাক্রমে কতক্ষণ পরে, তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবে, তথাপি তাহারা এক্ষণে সুখী, আশার পূর্ণ বিকাশ তাহাদের হৃদয়ে উদয় হইয়াছে। তাহাদের এ শুভ মিলনে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

এক্ষণে আমরা আবার পাঠককে পাশার উদ্যান বাটীতে লইয়া যাইব। ইত্যবসরে সেখানে কি হইয়াছিল, তাহা পাঠককে জানাইতে হইবে। পাঠকের স্মরণ আছে, খালিল ও জুলিয়ানকে পাশা নিম্নতলে বন্দী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। গৃহের বাহিরে বন্দীগণ নিষ্কাসিত অসি হস্তে পাহারা দিতেছে। পাশা স্বয়ং দ্বার বন্ধ করিয়া, চাবি সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। গৃহাভ্যন্তরে যুবকদ্বয় মাত্র রহিয়াছে। পাছে তাঁহার অনুপস্থিত কালে থির্জা বা জুলেকা তাহাদের প্রেম ভাজনদ্বয়কে মুক্ত করিয়া দেয়, এই আশঙ্কাতেই পাশা চাবি লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু চাবি লইয়া গেলে কি হইবে? রঙমহল মধ্যে ঐ দ্বারের অপর একটী গুপ্ত চাবি ছিল। ঐ চাবি যাহার হাতে থাকা সম্ভব থাকুক না কেন, এক্ষণে আমিনার হস্তে আসিয়াছে।

ডলতাবান পাশা যুবকদ্বয়কে ঐ গৃহে আবদ্ধ করিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই বাহির হইতে চাবি খুলিবার শব্দ বন্দীদ্বয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধা দূতী আমিনা নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং সম্মুখে গিয়াই উন্মুক্ত গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, সঙ্কেতে জানাইল যে, উচ্চস্বরে কথা কহিলে, বাহিরে, খোজারা শুনিতে পাইবে। বৃদ্ধা খালিলের নিকটে গিয়া তাহাকে কহিল,—"আমার সঙ্গে আইস।"

বৃদ্ধার ন্যায় খালিলও অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—"যদি আমাকে মুক্তি

দিবার ইচ্ছা থাকে, তবে নিশ্চিত জানিও, আমার এই বন্ধুকে সঙ্গে না লইয়া আমি কিছুতেই এখান হইতে যাইব না।”

বৃদ্ধা কহিল,—“তাহা অসম্ভব। তোমার বন্ধুর কোন অনিষ্টই হইবে না। পাশা একজনের প্রাণ লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা ত শুনিয়াছ।

খালিল কহিলেন,—“তাহা হইলে, আমারই বা এরূপ গোপনে পলাইবার প্রয়োজন কি ?”

আমিনা ব্যস্তভাবে কহিল,—“আমি বলিতেছি, আবার সঙ্গে আইস, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি।”

জুলিয়ানও মৃদুস্বরে কহিলেন,—ক্ষাত কি, বৃদ্ধার কথা শুনায় ক্ষতি কি, যাওই না।”

খালিল ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন; পরে বৃদ্ধাকে কহিলেন,—“অগ্রে অগ্রে চল, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।

আমিনা খালিলকে সঙ্গে লইয়া গৃহের বাহিরে আসিল। পূর্ব্ববৎ গুপ্ত চাবি দ্বারা দ্বার বন্ধ করিয়া, চাবিটি নিজের নিকট রাখিল দূতী ক্রমে সোপান অতিক্রম করিয়া চলিল। খালিল বিনা বাক্যব্যয়ে নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিতেছেন! যুবকের মনে হইতেছে, হয় ত তাঁহাকে তাঁহার প্রাণাধিকা জুলেকার সম্মুখেই লইয়া যাইবেন। সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়াই, বৃদ্ধা স্বীয় ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলিস্থাপন করিয়া, খালিলকে নীরবে অগ্রসর হইতে সঙ্কেত করিল। যে দিকের কক্ষ শ্রেণীতে পাশার কন্যারা অবস্থিতি করে, বৃদ্ধা তাহার বিপরীত দিকের একটী দ্বার নিঃশব্দে উন্মোচন করিল। খালিলও বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এ আবার কি, আবার কি নূতন ঘটনা ঘটে! তাঁহার মনে বিস্ময় জন্মিতে লাগিল; কিন্তু যাহাই ঘটুক শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে সঙ্কল্প করিলেন।

# স্থির ও চঞ্চল প্রাণ।

লেখক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি।

প্রাণের দুই অবস্থা, স্থির ও চঞ্চল। সকলেই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারেন যে, মৃত্তিকাতে অনন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। ডাইনামো নামক যন্ত্রের সাহায্যে মৃত্তিকাস্থিত স্থির বৈদ্যুতিক শক্তি চঞ্চল বা জাগ্রত হইয়া উঠে। বৈদ্যুতিক শক্তি আপনার চঞ্চল অবস্থায় নানা প্রকার কার্য্য সাধন করে। ট্রামগাড়ি টানা, আলোক প্রদান, ময়দা প্রভৃতি পেষা, গিল্টিকরা, পাখা ঘুরান, নানাবিধ কার্য্য জাগ্রত বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা চালিত হয়। স্থির অবস্থায় বৈদ্যুতিক শক্তি কোন ক্রিয়া করে না। জাগ্রত হইলে এই শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হয়, যথা পজেটিভ ও নেগেটিভ বা স্ত্রী ও পুরুষ। চুম্বক বা লৌহকর্ষকেও স্থির ও চঞ্চল প্রাণ দেখিতে পাওয়া যায়। একখণ্ড লৌহে, লোহাকর্ষণ করিবার শক্তি নিদ্রিত ভাবে (যোগ নিদ্রায়) থাকে। একখণ্ড লোহাকর্ষক লৌহখণ্ডের সহিত স্পর্শ করাইলে লৌহখণ্ডের নিদ্রিত লোহাকর্ষণ শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে। চুম্বকের সংস্পর্শে একখণ্ড লৌহ আর একখণ্ড লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিতে পারে। চুম্বকে লোহা কর্ষণ শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হয়, একটী তাহার উত্তর প্রান্তে আর একটী তাহার দক্ষিণ প্রান্তে প্রকাশ পায়। চুম্বকের ঠিক মধ্যস্থলে লৌহকর্ষণ শক্তি প্রকাশ পায় না, অথচ এই স্থির মধ্যস্থলে না থাকিলে চুম্বকের দুই প্রান্তে লোহাকর্ষণ শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে না। চুম্বকের এই স্থির মধ্যস্থলকে দুইপ্রকার লোহাকর্ষক শক্তির সন্ধি-স্থল বলা যাইতে পারে। সকল শক্তির সন্ধিস্থল সর্ব্বদাই ক্রিয়াশূন্য। কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে গেলে শক্তিগণ এক স্থির মধ্যস্থলকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় ক্রিয়া রূপ স্পন্দন সম্পাদন করে। আজ কাল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই স্পন্দন মাত্র। ভিন্ন জাতীয় স্পন্দনে জগতে যতপ্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্থির কেন্দ্র সে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি অহরহ নৃত্য করিতেছে। বৈজ্ঞানিক জগতের এই প্রকৃতির সুন্দর বা নৃত্যও সুক্ষ্ম রাস লীলা। রাস লীলার সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কায়া বূহ রচনা করিলে দুইটী গোপিনী মধ্যে আপনাকে স্থাপন করিয়া এই প্রকৃতির সূক্ষ্ম লীলাকে স্থূলভাবে দেখাইয়াছিলেন। ভগবানের প্রত্যেক মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া দুইজন গোপিনী নৃত্য করিয়াছিলেন। সূক্ষ্মভাবে প্রকৃতিতে এইরূপ লীলা সর্ব্বদাই হইতেছে। একটুকু স্থির

হইয়া বুঝিয়া দেখিলে সকলেই এই প্রকৃতির রাসলীলা অনুভব করিতে পারেন। মানব দেহে প্রাণ ও অপাণ নামক দুইটী শক্তি স্থির মহাপ্রাণকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদাই নৃত্য করিতেছে। এই মহাপ্রাণ যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাণ ও অপাণ নৃত্য করিতেছে তিনিই জীবাত্মা। যোগবাশিষ্টে এই স্থির প্রাণ বা চিদংশ্বার উপাসনাই ভুষণ্ড নামক দাঁড়কাকের জ্ঞান এবং চিরজিবীত্ব লাভের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে (নির্ব্বাণ প্রকরণ অধ্যায়) যে শক্তির দ্বারা বাহ্য বায়ু হৃদয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ নিশ্বাস লওয়া যায় তাহাকে প্রাণ কহে। যে শক্তির দ্বারা বক্ষঃস্থলস্থিত উষ্ণ বায়ু বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় বা নিশ্বাস ফেলা যায়, তাহাকে অপাণ কহে। দেহ হইতে মল মূত্র প্রভৃতি যে শক্তির দ্বারা বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হয় তাহাকে অপাণ কহে। শীতল বাহ্য বায়ু ফুস্ ফুসের মধ্যে যাইলে দেহ স্নিগ্ধ এবং আপ্যায়িত হয় বলিয়া নিশ্বাস লওয়া শক্তিকে চন্দ্র কহে। ফুস্ফুস্ হইতে উষ্ণবায়ু যে শক্তির প্রভাবে বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হয় এই নিশ্বাস লইবার শক্তি-কে সূর্য্য কহে ; শ্বাস লইবার আর একটী স-কার—কারণ শ্বাস ফেলিবার আর একটি নাম হ—কার।

( হকারো নির্গমে দোক্ত সকারস্ত প্রবেশনে। )

প্রত্যেক মনুষ্য স্বাভাবিক ভাবে মিনিটে ১৫বার এবং অহোরাত্রে ২১৬০০বার শ্বাস লয় ও ফেলে, এই শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া ফেলাতে সকল মানুষেরই অধিকার আছে। শ্বাসের পূর্ব্বোক্ত দুই সন্ধিতে মন রাখিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিলে, প্রকৃত মন এবং প্রাণের ঐক্য করিয়া ভগবানকে স্মরণ করা হয়। সাধুরা বলেন, যে রাম নাম সকলেই করেন কিন্তু দশ ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া কেহই করেন না, দশ ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া একবার রাম নাম করিলে কোটি জন্মের ফল হয়। ( রাম নাম তো সব কইকহে দশরথ না কহে কই, একবার যদি দশরথ কহে তিন কোটী জনমকা ফল হই। ) পুনঃশ্চ শুনিতে পাওয়া যায় যে ( একবার হরিনামে যত পাপ হরে, পাপী হয়ে তত পাপ করিবারে নারে ) এইরূপ হরিনাম মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া করিলে তবে প্রকৃত ফলপ্রদ হয়। এই অজপা জপ সম্বন্ধে কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। "অজপার সঙ্গে জপ গুরু দত্ত ধন। ( মন॰) কর জপে মালা জপে কিবা প্রয়োজন॥ হয়ে তার প্রেমের ভুক, গুরুপদে হাজির থাক, প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে ডাক, হয়ে সচেতন॥ কি সকাল সন্ধ্যা কিবা সদা জপ রাত্র, দিবে, হৃদ্‌কমলে প্রকাশিবে, সে নীল রতন॥ গুরুনানক তাঁহার গুণমণি নামক গ্রন্থে প্রতিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত গোবিন্দকে স্মরণ করিতে উপদেশ

দিয়াছেন,—"শাঁসি শাঁসি ভজ গোবিন্দ কি নাম।" তন্ত্রেও এই ভাবের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাসগ্রহণ করাকে তন্ত্রে রাত্রি কহে এবং শ্বাস ফেলাকে দিবা কহে। এ ছাড়া বাম নাসিকায় শ্বাস বহাকে রাত্রি কহে এবং দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহাকে দিবা কহে। এক নাসিকা রন্ধ্র হইতে অপর নাসিকায় শ্বাস সংক্রমণ হইবার সময়কে সন্ধ্যা কহে। এবং শ্বাস ফেলিবার শেষ, লইবার গোড়া, এবং লইবার শেষ, ফেলিবার গোড়া, এই দুই সন্ধিকে সন্ধ্যা কহে। শ্বাসের সন্ধিতে জপ করিবার উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

"( দিবান পূজয়েৎ দেবীং। রাত্রৌ নৈবচ নৈবচ সর্ব্বদা পূজয়েৎ দেবীং দিবা রাত্রৌ বিবর্জ্জিত )" এই শ্লোকে দিবা রাত্রি বর্জ্জন করিয়া দেবীর পূজা করিতে বলা হইতেছে। ইহাতেস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্বাস ফেলিবার শেষ এবং লইবার গোড়া এবং লইবার শেষ ফেলিবার গোড়া, এই দুই সন্ধিতে দেবীর পূজা করা উচিত। পুনশ্চ সুষুম্না নাড়ি বহিবার সময় অর্থাৎ যখন শ্বাস বাম ও দক্ষিণ এই উভয় নাড়ী ত্যাগ করে তখনই দেবীকে পূজা করিবার প্রশস্ত সময়। কিন্তু এই সময় সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা অন্তর শ্বাস এক নাসিকা ছাড়িয়া অপর নাসিকায় বহিবার পূর্ব্বে এই সুষুম্না নাড়ী বহে। এই সময় দেবীর পূজা করিতে হইলে সর্ব্বদা পূজা করা চলে না! এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা অন্তর অতি অল্পক্ষণের জন্য এই সুযোগ পাওয়া যায়। স্থির প্রাণ যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাণ এবং অপাণ ( শ্বাস প্রশ্বাস ) চলিতেছে তাঁহাকেই বাসুকি বা কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি বা মহাপ্রাণ কহে। এই স্থির প্রাণে যাঁহার যত লক্ষ্য পড়িবে তাঁহার তত ব্রহ্মানন্দ অনুভব হইবে এবং ভয় দূর হইবে। প্রতিদিন এই স্থির-প্রাণে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলে মন বিন্দু হইয়াও সিন্ধুর জল আকর্ষণ করিতে পারে।

# বিধবা-বিলাপ।

লেখিকা — শ্রীমতী বসন্তলতা দেবী।

( ১ )

অতীতের স্মৃতি উঠিতেছে মনে
পাগল হ'তেছে পরাণ তায়
কুমুদিনী-সম সুধাংশু বিহনে
দু-নয়নে নীর বহিছে হায়!

( ২ )

সহনে না যায় যাতনা বিষম
বিহনে তাঁহার আঁধার সব,
কি যেন কি ছিল কিযেন কিনাই
সকল (ই) মনেতে হ'তে শব॥

( ৩ )

নিরজনে বসি ভাবিরে যখন
কে যেন মনেতে উদিত হয়,
দেখিতে দেখিতে বিদ্যুতের প্রায়
সে যেন আবার কোথায় যায়॥

( ৪ )

সেই একদিন গিয়াছে আমার
আসিবে নাকি তাহা ফিরিয়ে আর।
অভাগী কেবল কাঁদিতে রহিল
বহিতে বিফল জীবন ভার॥

( ৫ )

কোথা সে আরাধ্য গিয়াছে চলিয়া
স্মৃতি জাগে তাঁর হৃদয় পটে
সেইরূপ রাশি থাকিয়া থাকিয়া
এখন কেনরে হৃদয়ে ফোটে॥

( ৬ )

এখন(ও) তাঁহার সুধাময় বাণী
শ্রবণে প্রবেশে নিয়ত যেন,
ফুরায়েছে তাঁর সবলীলা খেলা
স্মৃতিটুকু এবে না যায় কেন?

( ৭ )

যে দিন শ্মশানে হ'য়ে গেছে ছাই
এ নারী জীবন অমূল্য ধন।
সেই দিন হ'তে সন্ন্যাসিনী আমি
সংসারের সুখ করি বর্জ্জন॥

শশ্রূর প্রতি—

( ৮ )

হায় মাগো কেন তুমি চির অভাগীরে;
স্নেহ মমতায় আর করিছ পালন।
ভাসাইয়া দেহ মোরে জাহ্নবীর নীরে
এমুখ দেখিয়া আর পাবে না বেদন॥

( ৯ )

কেন দয়া কর মাগো শাশুড়ী আমার;
বৃথা স্নেহ যত্ন আর কর মা আমার।
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে হায় কপাল যার;
স্নেহ বিড়ম্বনা মাত্র জানিও তাহারে॥

( ১০ )

সব সাধ মিটিয়াছে হতাশ জীবনে;
সুখ শান্তি অভাগীর কিছু নাহি আর।
ঘুচিবে মা যন্ত্রণা ক্ষণ কত দিনে;
শুধু এই এক চিন্তা হতেছে আমার॥

## আত্ম বিলাপ।

( ১১ )

না হ'ত বিবাহ যদি থাকিতাম ভাল ;
নাহি জানিতাম স্বামী, কেমন রতন।
আজন্ম কুমারী হ'য়ে সুখে চিরকাল ;
রহিতাম; দহিত না নৈরাশে জীবন ॥

( ১২ )

অনন্ত মরুর মাঝে তপ্ত বালুকায় ;
দুঃখ জপি কতকাল রহিব বাঁচিয়া।
অধীর হ'তেছে প্রাণ দারুণ তৃষায় ;
বাঁচাইবে কেবা বল- সলিল সিঞ্চিয়া ॥

( ১৩ )

শৈশবে জীবন যদি হ'ত অবসান ;
দহিতে হ'ত না আজি এঘোর অনলে।
আজীবন ল'য়ে বক্ষে যন্ত্রণা পাষাণ ;
ভাসিতে হ'ত না মোরে নৈরাশ্য সলিলে ॥

( ১৪ )

ইচ্ছা করে ছুটে যাই গহন কান্তারে ;
জানাইতে তরুবরে আমি অভাগিনী।
এ দুঃখ-কহিব কারে সমাজ সংসারে;
কে শুনিবে কে বুঝিবে এ'দুখ কাহিনী ॥

ঈশ্বরের প্রতি–

( ১৫ )

কেন বল জগদীশ সৃজিলে আমায় ;
সৃজিলে যত্তপি কেন করিলে দুখিনী।
দুখিনী করিলে যদি কেন বা না তায় ;
পাঠাইলে- তথা যথা গেছে গুণমণি ॥

---

# অদৃষ্ট তত্ত্ব।

## লেখক— শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সনাতন আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রে বিশ্বাসবান্ ব্যক্তিমাত্রই অদৃষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু অদৃষ্ট কাহাকে বলে, অদৃষ্টের স্বরূপ কি ও কিরূপে অদৃষ্টের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ। বিশেষতঃ অশিক্ষিত প্রাকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে অদৃষ্ট সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লোকেরা বলিয়া থাকে, অদৃষ্টের অর্থ কপালের লিখন। মানব শিশুর জন্মকালে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ যাবতীয় ঘটনাবলী স্বয়ং বিধাতা পুরুষ কর্তৃক ললাট দেশে লিখিত হয় এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে

ক্রমে তাহারই ফল ফলিয়া থাকে। কিরূপে ও কতদিন হইতে এইরূপ সংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে আমরা অসমর্থ। তবে বলা বাহুল্য যে, ইহা নিতান্তই অসার ও ভ্রান্তিমূলক সংস্কার। অতএব আমরা এই প্রবন্ধে শ্রুতি দর্শন শাস্ত্র সম্মত অদৃষ্ট-তত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

অদৃষ্ট বুঝিতে হইলেই ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ অগ্রে বুঝা আবশ্যক। কেননা অদৃষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্মেরই একটা প্রকার ভেদ বা অবস্থাবিশেষ মাত্র। অতএব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এই দুইটী কথার অর্থ কি, প্রথমে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

সমগ্র ভূ-মণ্ডলের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশীয় লোকের ধর্ম্ম যেরূপ মনুষ্যকল্পিত বিধিবাক্য মাত্র এবং সমাজরক্ষা ও সমাজে সুশৃঙ্খলা স্থাপনই যেমন তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, আমাদের আর্য্যধর্ম্ম সেরূপ কাল্পনিক পদার্থ নহে; এবং 'চুরি করিও না' 'মিথ্যা কথা বলিও না, ইত্যাকার দুই চারিটী উপদেশ বাক্যের নামও আর্য্যধর্ম্ম নহে। প্রত্যুত এই ধর্ম্ম অধ্যাত্ম বিজ্ঞান মূলক প্রাকৃতিক পদার্থ। অর্থাৎ ইহা মানবজাতির প্রকৃতির সহিত, অস্তিত্বের সহিত একেবারে বিজড়িত; ফলতঃ আর্য্যধর্ম্মের প্রত্যেক সিদ্ধান্তই ভারতীয় মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত বলিয়া, কালশক্তি প্রভাবে নানাপ্রকার গুরুতর বিঘ্ন বাধা পাইলেও এখনও ইহার অস্তিত্ব এককালীন বিলুপ্ত হয় নাই; কখন যে হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। এবং ইহা সাধারণ মানবজাতির ধর্ম্ম বলিয়াই, অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহার স্বতন্ত্র কোন নামকরণ হয় নাই; আমাদের আর্য্যধর্ম্ম 'সনাতন ধর্ম্ম' নামেই কথিত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি কি?

সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধান মতে অবস্থানার্থ "ধৃ" ধাতুর উত্তর মন প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্মপদ সাধিত হয়। অর্থাৎ যে পদার্থ বিশেষ থাকাতেই বস্তুর বস্তুত্ব যাহা না থাকিলে সে বস্তুর অবস্থিতি থাকিতে পারে না, যাহা বস্তুর প্রকৃতি স্বরূপ বা গুণ স্বরূপ, তাহাই সেই বস্তুর ধর্ম্ম। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম তাপত্ব ও জলের ধর্ম্ম শৈত্য, তদ্রূপ মানবের ধর্ম্ম বলিলে, যে সূক্ষ্মতম শক্তি বা গুণ বিশেষ থাকাতেই আমরা মনুষ্য ও পশ্বাদি ইতর জীব হইতে পৃথক, সেই শক্তি বা গুণবিশেষকেই মানবের ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এবং ইহাও বুঝিতে হইবে যে, যেমন তাপত্ব না থাকিলে, অগ্নির অগ্নিত্ব ও শৈত্য গুণ না থাকিলে, জলের জলত্ব থাকিতে পারে না, তদ্রূপ মানবীয় ধর্ম্মশক্তি না থাকিলে, মানুষের মনুষ্যত্বই থাকিতে পারে না। আবার ভগবান কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনেও কথিত হইয়াছে,—

"যতোহভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সঃ সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।

যে শক্তি বা গুণবিশেষ দ্বারা আত্মার সদ্গতি ও ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ হয়, তাহার নামই ধর্ম্ম। এখানে ধর্ম্মের লক্ষণ কথিত হওয়ায়, অধর্ম্মের লক্ষণও এতদ্বারা স্বতঃই সূচিত হইতেছে। কেননা ধর্ম্মের যাহা বিপরীত, তাহাই ত অধর্ম্ম। অর্থাৎ যে শক্তি বা গুণবিশেষ দ্বারা জীবাত্মা অধোনত এবং ঈশ্বর হইতে দূরবর্ত্তী হয়, তাহার নামই অধর্ম্ম। এখানে বলা আবশ্যক যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মূলে এক একটী পদার্থ হইলেও অবস্থাভেদে তাহার অপরিসংখ্যেয় বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের মূল বীজের নাম সত্ত্বগুণ, আর অধর্ম্মের মূল বীজের নামই রজঃ ও তমোগুণ। শাস্ত্র বলিয়াছেন।

"ধর্ম্মোজ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যং সাত্ত্বিক মেতদ্রূপং, তামসমস্মাদ্বিপরীতম্।"

সাঙ্খ্যকারিকা।

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য স্বত্বগুণেরই কার্য্য এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য, এগুলি রজঃ ও তমঃ গুণ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলেই মূল বীজ স্বরূপ স্বত্বগুণ হইতেই সমস্ত ধর্ম্মের এবং রজঃ ও তমঃগুণ হইতেই নিখিল অধর্ম্মের বিকাশ হয়, এই কারিকার এইরূপই তাৎপর্য্য।

পূর্ব্বে যে শক্তি বা গুণ বিশেষকে মানবের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, বাস্তবিক সেটি কি পদার্থ, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিতেছি যে, মানব দেহে জীবাত্মার শক্তি সকল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, দেহের অভ্যন্তরে ও বাহিরে ক্রিয়া করিতেছে। সংখ্যায় বহু হইলেও মূলে কিন্তু দুইটী শক্তি হইতেই ঐ সমস্ত শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ দুইটি শক্তিই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সাধনের সময় ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার একের নাম নিরোধ শক্তি ও দ্বিতীয়ের নাম ব্যুত্থান শক্তি। যে শক্তি দ্বারা মন, বুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয়াদির চাঞ্চল্য ও বিষয়াভিমুখী গতি বা বাহ্য বিষয়ে পরিচালনা অবরুদ্ধ হইয়া স্থির ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম নিরোধ শক্তি বা ধর্ম্ম শক্তি। আর যে শক্তির বলে উহারা বাহ্য বিষয়ে পরিচালিত বা দর্শন, শ্রবনাদির জন্য প্রেরিত হয়, তাহারই নাম ব্যুত্থান বা অধর্ম্মশক্তি। ধর্ম্ম শব্দের যৌগার্থ দ্বারা যদিও এই ব্যুত্থান শক্তিকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, কিন্তু নানাপ্রকার নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান দ্বারা ব্যুত্থান শক্তি হইতেই ঈর্ষা, অসূয়া, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ও অভিমান প্রভৃতি কুৎসিত গুণ সমূহ সমুৎপন্ন হয় বলিয়াই ইহা অধর্ম্ম বা অপধর্ম্ম নামেই

নিরোধ ও ব্যুত্থান শক্তির ক্রিয়া প্রণালী বুঝাইবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিব। মনে কর, তুমি অপর এক ব্যক্তির উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া দেখিতে পাইলে যে, একটী প্রলোভনীয় সুপক্ক আম্র ফল বৃক্ষ শাখায় ঝুলিতেছে। দেখিবা মাত্রই উত্তেজক কারণ বশতঃ মনোমধ্যে লোভ প্রবৃত্তির উদয় হওয়ায়, তোমার মনটীও প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত ও সেই আম্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, সেই দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু তোমার দেহ মধ্যে আর যে একটী প্রতিদ্বন্দ্বিনী শক্তি আছে, যদ্দ্বারা ঐ কার্য্যের দোষ গুণের বিচার করিয়া ও আম্রটী না লইয়াও মনের ঐ পরদ্রব্য গ্রহণের প্রবৃত্তিকে তুমি তৎক্ষণাৎ সংযত করিলে। এই স্থানে যে শক্তির ক্রিয়া-দ্বারা আম্র গ্রহণে তোমার মন প্রথমে আকৃষ্ট ও ধাবিত হইয়াছিল, তাহার নাম ব্যুত্থান শক্তি ও যে শক্তি দ্বারা এক্ষণে তুমি মনকে সংযত করিতে পারিলে, সেই শক্তির নামই নিরোধ শক্তি। ফলকথা উক্ত ব্যুত্থান শক্তির বলে প্রতিনিয়তই আমাদের মনোমধ্যে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ ও কামাদি নানাপ্রকার অসৎ প্রবৃত্তির উদ্দীপন হইতেছে এবং একমাত্র নিরোধ শক্তির সাহায্যেই আমরা তাহা প্রতিরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইতেছি। পশু, পক্ষ্যাদি ইতর জীবজন্তুগণের দেহ মধ্যে প্রায়শঃই ব্যুত্থানের ক্রিয়া হয়। নিরোধ শক্তি তাহাদের শরীরে এত অল্প মাত্রায় আছে যে, তদ্দ্বারা কোন ক্রিয়া সাধনই হইতে পারে না। সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণে নিরোধ শক্তির অভাব বশতঃ মনোবৃত্তিকে সংযত করিবার সামর্থ্য না থাকায়, তাহারা আপন আপন প্রবৃত্তির বশেই পরিচালিত হইয়া থাকে। বোধ হয়, এই একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারাই নিরোধ ও ব্যুত্থানের ক্রিয়া প্রণালী পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, এই নিরোধ শক্তির বীজ একমাত্র মানবাত্মার পূর্ণমাত্রায় নিহিত আছে। এবং এই শক্তি আছে বলিয়াই, মানব পশ্বাদি ইতর জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ ও তাহাদের উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা স্থাপন করিয়া, জগতের নানা উপকার সাধন করিতেছে। অতএব এই নিরোধ বা সংযমশক্তি মানবের প্রকৃতি স্বরূপ বা গুণ স্বরূপ হওয়াতেই, তাহা সাধারণ মানব জাতির ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত একমাত্র নিরোধ শক্তিই কার্য্যভেদে প্রধানতঃ দশ প্রকার ধর্ম্মরূপে দশ নামে কথিত হইয়া থাকে। যথাঃ—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্॥"

মনুঃ।

অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ। বস্তুতঃ এই দশ প্রকার লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মই যে, একমাত্র নিরোধ শক্তির কার্য্য-ভেদে সংজ্ঞা ভেদ, সেই কথাটা বুঝাইবার জন্য ঐ দশ সংখ্যক ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

১। ধৃতি,—অর্থে ধারণা করা বা স্মরণ রাখিবার শক্তি বিশেষ।

২। ক্ষমা,—কেহ অপকার বা অপমান করিলে, ব্যুত্থান শক্তির বলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য স্বভাবতই মনের প্রবৃত্তি হয়। সেই প্রবৃত্তিকে যে শক্তির দ্বারা দমন করিতে পারা যায়, তাহার নাম ক্ষমা।

৩। দম,—শোক, তাপ ও ভয়াদি দ্বারা চিত্ত বিকৃত বা মোহাচ্ছন্ন হইলে, যে শক্তির বলে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারা যায়; তাহার নাম দম।

৪। অস্তেয়,—অবৈধরূপে পরস্ব হরণের প্রবৃত্তিকে যে শক্তির সাহায্যে নিরুদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহার নাম অস্তেয়।

৫। শৌচ,—শরীর ও মনের নির্ম্মলতা সাধনের নামই শৌচ। শৌচ দ্বিবিধ; বাহ্য শৌচ ও অন্তঃশৌচ। জল মৃত্তিকাদির দ্বারা দেহ শুদ্ধির নাম বাহ্য শৌচ এবং ভাব শুদ্ধিই অন্তঃশৌচ।

৬। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,—আমাদের ইন্দ্রিয় সকল প্রতিনিয়তই চঞ্চল ভাবে নানা বিষয়ে সঞ্চালিত হইতেছে। যে শক্তির বলে উহাদের চাঞ্চল্য বা বিষয়াভিমুখী-গতিকে সংযত করিতে পারা যায়, তাহার নাম ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।

৭। ধী,—শাস্ত্রাদি আলোচনা দ্বারা পদার্থের স্বরূপ তত্ত্ব নির্ণয় ( যে তত্ত্বে ভ্রম-প্রমাদ থাকিবেনা ) যে শক্তির বলে সম্পাদিত হয়, তাহার নাম ধী-শক্তি।

৮। বিদ্যা,—যে শক্তি বিশেষের দ্বারা পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়, আপনাকে দেহত্রয় (স্থূলদেহ, লিঙ্গদেহ, ও কারণ দেহ ) হইতে পৃথক পদার্থ বলিয়া ধারণা হয় এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তরঙ্গ পদার্থ সকল পৃথক পৃথক রূপে মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই নাম বিদ্যা।

৯। সত্য,—শরীর, মন ও বাক্য, এই তিনের দ্বারা যথার্থ আচারন করার নাম সত্য।

১০। অক্রোধ—যে শক্তির বলে ক্রোধকে নিরুদ্ধ করা যায়, তাহারই নাম অক্রোধ।

পূর্ব্বকথিত দশ প্রকার লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মশক্তির মধ্যে ধৃতি শক্তির যে সংক্ষিপ্ত

পারিবেন না। অতএব কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝান আবশ্যক। কোন একটি বিষয় বা ব্যাপার একবার মাত্র দেখিয়া বা শুনিয়া, সাধারণত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়না; পুনঃ পুনঃ দর্শন বা শ্রবণ জন্য চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এইরূপ স্থলে যদি ঐ দর্শনীয় বা শ্রবনীয় বিষয়ের উপর মন ও ইন্দ্রিয় শক্তিকে কিয়ৎকালের জন্যও নিরোধ (আটক) করা যায়, তাহা হইলে সেই ক্রিয়ার একটি সংস্কার (স্মরণ জনক শক্তি বিশেষ) এমন ভাবে মনোমধ্যে অঙ্কিত হয় যে, তাহা চিরকালের জন্য স্মৃতি-রূপে মনেই অবস্থিতি করিবে। কিন্তু দৃষ্ট বা শ্রুত আদি বিষয়ে মনকে নিরুদ্ধ করিতে না পারিলে, তাহার সংস্কার সুস্পষ্টরূপে পড়িতে পারে না; সুতরাং সে বিষয়টী স্মরণও থাকে না। একটা দৃষ্টান্তের অনুসরন করা যাউক। মনে কর, তোমার জীবনের মধ্যে অদ্য তুমি আমাকে প্রথম দর্শন করিতেছ। এরূপ স্থলে যদি তুমি তোমার দর্শনেন্দ্রিয়সহ মনকে কিয়ৎকালের জন্য অন্য দিকে যাইতে না দিয়া আমার অবয়বটীর উপরেই নিরোধ কর, তাহা হইলে আমার অবয়বের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব তোমার মনোমধ্যে ফটোগ্রাফের ন্যায় অঙ্কিত হইয়া যাইবে এবং উহা সংস্কার বা স্মৃতি রূপে চিরকালের জন্য মনেই থাকিবে। আবার যে যে সময়ে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ ঘটিবে, সেই সেই সময়ে ঐ স্মৃতিরূপ সংস্কারের বলে আমাকে তুমি চিনিতে পারিবে। কিন্তু তুমি বহু জনতাপুর্ন হাটে উপস্থিত হইয়া একই সময়ে অসংখ্য লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে। এখানে তোমার দর্শন-ইন্দ্রিয়সহ মনকে হট্টস্থিত প্রত্যেক মনুষ্যের অবয়বের উপর এককালীন নিরোধ করিবার উপায় নাই বলিয়াই, উহাদের প্রত্যেকের অবয়বের সংস্কার তোমার মনোমধ্যে সুস্পষ্টরূপে পড়িতে পারিল না। সুতরাং উহাদিগকে তোমার স্মরণও থাকিবে না। বস্তুতঃ কোন কারণে আমরা অন্যমনস্ক থাকিলে, আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া মানুষ চলিয়া গেলেও যে আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারি না, মনের নিরোধ না হওয়াই তাহার একমাত্র হেতু। অতএব বুঝা গেল যে, ধৃতি শক্তি নিরোধ শক্তিরই অবস্থাভেদ মাত্র।

এখানে সংক্ষেপে যে দশ লক্ষনক ধর্ম্মের বর্ণনা করা গেল, ইহারা প্রত্যেকে ঐ নিরোধ শক্তিরই রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র। অর্থাৎ একমাত্র নিরোধ শক্তি হইতেই ঐ সমস্ত ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আবার ঐ সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কেন না আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, মানুষের আধ্যাত্মিকী চরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়, মানব কৃতকার্য্য হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্।"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যোগ সাধনা দ্বারা আত্মদর্শন করাই পরম ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বোক্ত দশ লক্ষণক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, দয়া, সন্তোষ, বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য প্রভৃতি আরও অনেক গুলি ধর্ম্মের স্ফুরণ হয়। নিরোধ শক্তির কার্য্য বলিয়া, এগুলিও ধর্ম্ম নামে কথিত হইয়া থাকে। পরন্তু দশ লক্ষণক ধর্ম্মের ফলস্বরূপ বিধায়, ইহাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে মূলের মধ্যে ধরা হয় নাই। ফলকথা এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যে নিরোধ শক্তিকে ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, তাহা "কারণধর্ম্ম" এবং এখন ধৃত্যাদি যে সকল ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা হইল তাহাই "কার্য্যধর্ম্ম"। এই কারণধর্ম্ম ও কার্য্যধর্ম্মের বীজ মনুষ্যাত্মায় থাকে বলিয়াই, ইহা মানব সাধারণের ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

উক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের দ্বিবিধ অবস্থা হইয়া থাকে। একটা ব্যক্তাবস্থা বা বিকাশিতাবস্থা ও দ্বিতীয়টী অব্যক্তাবস্থা বা লীনাবস্থা। যখন ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যক্তাবস্থা হয়, তখন উহাকে 'প্রবৃত্তি' বা 'বৃত্তি' বলা যায়। আবার যখন অব্যক্তাবস্থা বা লীনাবস্থা হয়, তখনই তাহার নাম সংস্কার। ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যক্তাবস্থার কার্য্য সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট বা অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু অব্যক্ত বা লীনাবস্থার কার্য্য অতীব সূক্ষ্ম বলিয়া, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না; হয় ত সময়ে সময়ে কিছুমাত্র অনুভবেই আইসে না। মনে কর ভক্তি একটী ধর্ম্ম। ইহা যখন মনোমধ্যে বিকাশিত হয়, তখন তাহার ফলস্বরূপ সর্ব্বদেহব্যাপী আনন্দময় ভাবটী পরিষ্কার রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ঐ ভক্তির ভাবটী বিলীন হইয়া সংস্কার অবস্থায় থাকে, তখন আর তাহার অস্তিত্বই অনুভবে আইসে না। আরও দেখ, ক্রোধ একটী অধর্ম্ম। যখন ইহার ব্যক্তাবস্থা হয়, তখন চক্ষুদ্বয়ের রক্তিমাকার ও ফুসফুসাদির বেগবত্তা প্রভৃতি লক্ষণ গুলি পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। কিন্তু ক্রোধবৃত্তির লীনাবস্থায় আর তাহার অস্তিত্বের উপলব্ধি মাত্রও হয় না

পূর্ব্ববর্ণিত ভক্তিরূপ ধর্ম্ম ও ক্রোধরূপ অধর্ম্মের লীলাবস্থার কথা শুনিয়া কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, উক্ত ভক্তি ও ক্রোধ একবার মাত্র মনোমধ্যে উদিত হইয়াই তাহা চির কালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গেল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা যায় না। কেননা যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, বাল্যকালের অভ্যস্ত-ক-কারাদি বর্ণমালা অথবা কত প্রকার গল্প পদ্য এখনও মনে আছে; যাহা একবার দেখিয়াছি

উত্তেজক কারণ পাইলেই ঠিক স্মরণ হয়, তখন ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের মনোমধ্যে যে কোন প্রবৃত্তি অথবা যে কোন ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহার কোনটীই একবারে বিনষ্ট বা অন্তর্হিত হয় না। পরন্তু উহা সূক্ষ্মভাবে সংস্কাররূপেই মনোমধ্যে থাকিয়া যায়। বস্তুত যদি মনের ক্রিয়া একবার মাত্র বিকাশিত হইয়া পরক্ষণেই তাহা বিনষ্ট বা অন্তর্হিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা শত চেষ্টা করিয়াও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনা কখনই স্মরণ করিতে পারিতাম না। বলা বাহুল্য যে, সকল প্রকার ধর্ম্ম ও অধর্ম্মবৃত্তির অথবা মনোবৃত্তি মাত্রেরই ক্রিয়া প্রণালী ঐ একই প্রকার। দর্শন শাস্ত্রের স্থিরতর সিদ্ধান্ত এই যে,—

"নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ। নাশঃ কারণলয়ঃ॥"

সাংখ্য দর্শন।

যাহা নাই, তাহা কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না। আবার যাহা আছে, তাহাও এককালীন বিনষ্ট হয় না।

ফলতঃ সমস্ত বস্তু, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত ক্রিয়াই এক একটী মূল বস্তু বা মূল শক্তি হইতেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং ব্যবহারিক ভাষায় ইহাকেই উৎপত্তি বলে। আবার ধ্বংসের সময়েও উহারা কেবল সূক্ষ্মাবস্থায় স্ব স্ব কারণে বিলীন হয় মাত্র। পরন্তু তাহাদের এককালীন অভাব ঘটেনা। অতএব এই নিয়মানুসারে আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মও এক একটী মূল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতেই বিকাশিত হইয়া পরিশেষে তাহা সূক্ষ্মভাবে সংস্কাররূপে মনোমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে। যদি জীবাত্মার পূর্ব্ব সঞ্জাত বৃত্তিগুলি সংস্কাররূপে না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের দেহমধ্যে আত্মা ও মন নামক দুইটী পদার্থের অস্তিত্বই আমরা অনুভব করিতে পারিতাম না। কেননা অসংখ্য সংস্কার রাশির উপরেই ত আমার আমিত্ব ও মনের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

"সংস্কার সাক্ষাৎ করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্।"

পাতঞ্জল দর্শনম্।

"দ্বার ধর্ম্মী সংস্কারাঃ স্মৃতিক্লেশ হেতবো-বাসনারূপাঃ
বিপাকহেতবো ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাস্তে পূর্ব্বভবাভি সংস্কৃতাঃ
পরিণামচেষ্টা নিরোধশক্তি জীবনশক্তি বদপরিদৃষ্টা-শ্চিত্তধর্ম্মাঃ।"

বেদব্যাস ভাষ্যম্।

মর্ম্মার্থ এই যে আমাদের মনমধ্যে কোন শক্তি বা ক্রিয়ার বিকাশ হয়, তাহা

স্মরণ ও অবিদ্যাদির কারণ, তাহাদের নাম বাসনা। আর যে জাতীয় সংস্কার আমাদের জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ, তাহাদেরই নাম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। এই সমস্ত সংস্কার পূর্ব্বকৃত ক্রিয়া দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। যেমন পরিণামশক্তি, চেষ্টাশক্তি ও জীবনীশক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলি আমাদের দেহমধ্যে থাকিলেও তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না, তদ্রূপপূর্ব্বোক্ত সংস্কারগুলিও কোন প্রকারে অনুভব করিতে পারা যায় না।

ফলকথা দেবার্চ্চনা ও যাগযজ্ঞাদি কোন বিহিত ক্রিয়া অথবা নরহত্যাদি কোন অবিহিত ক্রিয়া দ্বারা মনোমধ্যে যে সকল সংস্কার সঞ্চিত হইয়া থাকে, সেই সকল সংস্কারের নামেই ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বরূপ "অদৃষ্ট" বা "অপূর্ব্ব।" তন্মধ্যে যে গুলি উন্নতি বা সুখসাধক গুণের ( ধর্ম্মের ) সংস্কার, তাহার নাম শুভাদৃষ্ট। আর যেগুলি অমঙ্গলজনক গুণের ( অধর্ম্মের ) সংস্কার, তাহারই নাম দুরাদৃষ্ট। এই শুভাদৃষ্ট ও দুরাদৃষ্টের নামান্তরই পুণ্য ও পাপ।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে বৃত্তির গতিপ্রণালী পরস্পর ঠিক বিপরিত। ধর্ম্ম-বৃত্তির গতি উর্দ্ধাভিমুখী ও অধর্ম্মবৃত্তির গতি নিম্নাভিমুখী। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্দীপন কালে শরীরস্থ স্নায়ু মণ্ডলের অনুরাশীর মধ্যে যে কম্পন বিশেষ অনুভূত হয় তাহা অন্তর্মুখীন; আর অধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনা কালে ঐ স্নায়ুর কম্পন বহির্মুখীন হইয়া থাকে। এইজন্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে উর্দ্ধস্রোতস্বিনী বৃত্তি ও অধর্ম্মবৃত্তিকে অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তি বলা যায়। যাঁহারা সাধনার অনুষ্ঠান করেন, সর্ব্বদা তাঁহাদের উর্দ্ধ-স্রোতস্বিনী বৃত্তিই হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত,

"ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেন।"

সাঙ্খ্যতত্ত্ব কৌমুদী।

ধর্ম্মবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা আত্মার উর্দ্ধগতি ও অধর্ম্মবৃত্তির চালনা দ্বারা অধোগতিই হইয়া থাকে।

অতঃপর দৃষ্টান্ত সহকারে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মবৃত্তির ক্রিয়া প্রণালী বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ক্রিয়াটা শরীরের কোন্ স্থান হইতে কিভাবে সম্পাদিত হয়, এবং বুদ্ধি, মন, অভিমান ও ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপ কি ? সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে আমাদের শরীরের মধ্যে যত প্রকারের ক্রিয়া হইতেছে, তৎসমস্তই জীবাত্মার শক্তি সমূহ দ্বারা সম্পাদিত। সমস্ত শক্তিময় জীবাত্মা আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বাস করিয়া, স্বীয় শক্তি পরিচালনা দ্বারাই দেহের উপর রাজত্ব করিতেছেন। মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশে শুক্লবর্ণ ঘৃতাকার যে তরল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই নাম মস্তিষ্ক।

হইতে দুইটি স্থূলাকার মূল স্নায়ু পর্ব্ব-বিসর্পিত হইয়া, শরীরের নিম্নাভিমুখে গুহ্য দেশের প্রান্তভাগে গিয়া শেষ হইয়াছে। গলদেশের উভয় পার্শ্বে লক্ষ্য করিলে বাহির হইতেও ঐ দুইটীর অবয়ব সংস্থান স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ঐ দুইটী মূল স্নায়ু হইতেই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অসংখ্য স্নায়ু শাখা সকল বহির্গত হইয়া হস্ত পদাদি সমগ্র শরীরাবয়বে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জীব দেহ মধ্যে এমন সূচাগ্র প্রমাণ স্থানও দৃষ্ট হয়না, যেখানে কোন প্রকার স্নায়ুরই অস্তিত্ব নাই। ক্রিয়া সাধনের সময় জীবাত্মার শক্তি সকল চিত্তবৃত্তি রূপে মস্তিষ্ক মধ্যে প্রথমে পরিস্ফুটিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত স্নায়ুপথে শরীরের সর্ব্ব স্থানে সঞ্চালিত ও প্রয়োজনানুসারে শরীর সংলগ্ন বাহ্য বস্তুতেও সংযুক্ত হইয়া থাকে। আত্মার সকল প্রকার শক্তির প্রথম পরিস্ফুরণ কালে যে অবস্থা গ্রহণ করে, সেই অবস্থার নাম বুদ্ধি। ইহার ক্রিয়া স্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশ। পরে ঐ অবস্থার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইয়া শক্তিটী যখন ক্রিয়া সাধনোন্মুখী হয়, তখন তাহার আর এক অবস্থা হইয়া থাকে। এই অবস্থার নাম অভিমান বা অহঙ্কার। ইহার ক্রিয়া স্থান মস্তিষ্কের মধ্যেই বটে, কিন্তু প্রান্ত সীমায়। তৎপরে ঐ শক্তিটী যখন ক্রিয়া করণে যত্নবতী হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়; তখন তাহার নাম মন। ইহার ক্রিয়া স্থান মস্তিষ্ক ও মূল স্নায়ুদ্বয়ের সংযোগ স্থান। তদনন্তর ঐ শক্তি আরও বিস্তৃত ও অবস্থান্তরিত হইয়া যখন স্নায়ু মণ্ডলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়, সেই সময়ে এক অবস্থা হয়, তাহার নাম ইন্দ্রিয়শক্তি এবং অবস্থান্তরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নাম্নী শক্তি বিশেষ। এই অবস্থার পরেই ঐ শক্তি শরীরের বহিস্তরে অথবা বাহ্য বস্তুতে সংযুক্ত হইলে, তখন ক্রিয়ার পরিসমাপ্ত হয়। বস্তুতঃ একই শক্তি অবস্থা ভেদে বুদ্ধি, অভিমান, মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এইবার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বৃত্তির ক্রিয়া প্রণালী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক মনে কর, তোমার ভৃত্য রামদাস কোন অপ্রীতিজনক কার্য্য করায় তুমি তাহার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছ। এই সময়ে দেখিতে দেখিতে তোমার হৃদয়, মুখ ও হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিকম্পিত ও চক্ষুদ্বয় রক্তিমাকার হইয়া উঠিল। এবং হৃৎপিণ্ডাদি শারিরীক যন্ত্র সকল অতি বেগে নর্ত্তন করিতে লাগিল। এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে যে, তোমার দেহ মধ্যে এখন অধর্ম্মবৃত্তির অন্তর্গত ক্রোধবৃত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এবং ইহাও

এরূপ ভাবান্তর হইবে কেন? একমাত্র শক্তি ব্যতীত আর কোন পদার্থই জড় বস্তুকে বিকৃত, পরিচালিত বা প্রতিহত করিতে পারেনা? ফলকথা তোমার ঐ ক্রোধরূপ অধর্ম্মবৃত্তি যে, প্রথম মস্তিষ্ক মধ্যেই পরিস্ফুটিত হইয়া স্নায়ু পথে শরীরের সর্ব্বাবয়বে সঞ্চালিত হইয়াছে ও তাহার গতি যে বহির্মুখী, প্রস্তাবিত ঘটনায় তাহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইল। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক অধর্ম্মবৃত্তির গতির নিয়ম ঐ একই প্রকার।

অতঃপর ধর্ম্মবৃত্তির গতির নিয়ম বুঝিবার জন্য আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর মনে কর, তোমার ঐ উদ্দিপ্ত ক্রোধাবস্থা থাকিতে থাকিতে ঐ অপরাধি ভৃত্য রাম-দাস তোমার ঐ প্রকার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া, ভয়বিহ্বব চিত্তে তোমার পদানত হইয়া কর যোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এই সময় ভৃত্যের কাতর ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া, তোমার মস্তিষ্ক মধ্যে স্বতঃই ধর্ম্মবৃত্তির অন্তর্গত দমবৃত্তির স্ফুরণ হওয়ায়' এই দমবৃত্তি স্নায়ুপথে প্রবাহমান ও ইতস্ততঃ বিসর্পিত ক্রোধবৃত্তিকে ক্রমশঃ সংযত ও প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিল। এবং যেখান হইতে ঐ ক্রোধবৃত্তি প্রথমে উত্তে-জিত হইয়াছিল, দমবৃত্তির ক্রিয়া দ্বারা সেই মনোমধ্যেই আবার তাহা প্রত্যাকৃষ্ট হইতে লাগিল। এখন তুমি মৃদু হাস্য করিয়া ভৃত্যের সকল অপরাধই ক্ষমা করিলে। অতএব ধর্ম্মবৃত্তির গতি যে, ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী, এই একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারাই পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক ধর্ম্মবৃত্তির উদ্দীপন কালেই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত দুর্ব্বোধ আধ্যা-ত্মিক তত্ত্ব কথা একাগ্রচিত্তে আন্তরিক অনুভূত বা মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত ও ফলজনক।

আমরা এপর্য্যন্ত যে সকল কথার আলোচনা করিলাম, সম্ভবতঃ তদ্দ্বারা পাঠক-গণ ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ, লক্ষণ ও ক্রিয়া প্রণালী এবং ঐ ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতেই কিরূপে অদৃষ্টের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা একরূপ বুঝিতে পারিবেন। অতঃপর আমরা অদৃষ্ট সম্বন্ধে অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবান্তর কথার আলোচনা করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আমাদের মনোমধ্যে যে কোন প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ার বিকাশ হয়, তাহা হইতে দুই জাতীয় সংস্কার সঞ্চিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে জাতীয় সংস্কার অবিদ্যা ও স্মরণাদির কারণ, তাহাদের নাম বাসনা আর যে জাতীয় সংস্কার সকল জীবের জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ, তাহাদেরই নাম

আয়ুর্জনক অদৃষ্ট ও ভোগজনক অদৃষ্ট, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল সংস্কারের ফলে দেব, দানব, মানব ও পশুপক্ষ্যাদি নানা যোনিতে জীবের জন্ম লাভ ঘটিয়া থাকে, তাহাদের নাম জন্মজনক অদৃষ্ট, যে সকল সংস্কারের দ্বারা আয়ু বা জীবনী শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি বা তারতম্য ঘটে তাহাদের নাম আয়ুর্জনক অদৃষ্ট আর যে সমস্ত সংস্কারের ফলানুসারে সুখ দুঃখের ভোগ হয় তাহাদেরই নাম ভোগজনক অদৃষ্ট। আবার ইহাদের মধ্যে অবান্তর ভেদও এত আছে যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাদের প্রত্যেকের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তবে দিগ্‌দর্শনের জন্য দুই একটী স্থূল বিভাগের নাম মাত্র এইস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। যেমন ভোগজনক অদৃষ্ট প্রসূত সুখ দুঃখের কারণ ভেদে কেহ ধনলাভ জনক অদৃষ্টক্রমে বিপুল ধনের অধীশ্বর, কেহ বা দারিদ্র জনক অদৃষ্ট বশতঃ নিজের গ্রাসাচ্ছাদনেরও সংস্থান করিতে অসমর্থ। কেহ রোগজনক অদৃষ্ট বশতঃ চিরজীবনটা স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত, আবার কেহ বা আরোগ্যজনক অদৃষ্টের ফলে সচ্ছন্দ শরীরে দিনযাপন করিতেছে ইত্যাদি।

শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্টরূপ সংস্কার সকল পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের দ্বারাই সঞ্চিত হইয়া থাকে, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং এক জীবনের কৃত কর্ম্মের সংস্কার সমূহ ভাবী জীবনের অদৃষ্টরূপে পরিণত হয়। অদৃষ্টজনক কর্ম্মও দুইপ্রকার; প্রারব্ধ ও সঞ্চিত। যে সকল প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে আমাদের এবারকার জন্মলাভ হইয়াছে, আমাদের আয়ু নিয়মিত হইয়াছে এবং সুখ-দুঃখের ভোগ সম্পাদিত হইতেছে, তৎ সমস্ত কর্ম্মের নামই প্রারব্ধ কর্ম্ম। কিন্তু সকল কর্ম্মের ফলভোগ একই জন্মেশেষ হয় না। এমন অনেক কর্ম্ম আছে, যাহার ফলভোগ করিবার জন্য বারম্বার জন্মের আবশ্যক হইয়া থাকে। সেই সমস্ত ভোগবিশিষ্ট কর্ম্মরাশির নামই সঞ্চিত কর্ম্ম। এই সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ জন্ম জন্মান্তরে ক্রমে ক্রমেই হইয়া থাকে। ফলে সঞ্চিত কর্ম্মের জের কোন কালেই মিটেনা। কেননা এক একটা কর্ম্মের ভোগ শেষ হইতে না হইতে, জীব আবার নূতন নূতন কর্ম্মের দ্বারা অদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)।

## স্মৃতি।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

কেভবে রাখিবে স্মৃতি কল্পনা সুন্দরি !
নির্ব্বাপিত কবি কত বিস্মৃতি আঁধারে !
কি সাধে বিদগ্ধ তৃষা লয়ে ঘুরে মরি,
কি মোহ জড়িত আছে এ ভব সংসারে ?
দীন মর্ত্যজীব যত শ্মশানের রেণু !
জীবনে জাগ্রত আধ কেন আকাঙ্খায় ?
কি ঐশ্বর্য্য যশোতৃষা কাম কল্প ধেনু—
স-অশ্রু নয়নে শেষে অনলে নিভায় !
কি মোহমদির স্বপ্নে উন্মাদ অজ্ঞান,
আত্মতৃপ্তিহেতু সুধু হৃদয়ে বিকল ;
স্বার্থবিষে জর্জ্জরিত করি মন প্রাণ,
মূঢ় অন্ধ অহঙ্কারে হয়েছে বিহ্বল !
উন্মত্ত প্রলাপে স্মৃতি রহে কি ধরায় !
কি মহানির্ব্বাণে বিশ্বে অবনিতে যায়।

---

## সমালোচনা।

তাম্বুল বণিকের উপবীত। শ্রীযুক্ত হরিপ্রিয় কোঁচ সংকলিত। মূল্য /০ এক আনা। সংক্ষেপে তাম্বূলি জাতির সুন্দর ইতিবৃত্ত হরিবাবু সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। রাজা বল্লাল সেন একবার বঙ্গচ্ছেদ করিয়া বাঙ্গালাকে চারি খণ্ড করেন, লর্ড কার্জ্জন এবং রিজ্‌লী সাহেব ও রাজা বল্লাল সেন এবং তাঁহার সভা পণ্ডিত গোপাল ভট্ট এই চারি জন এক শ্রেণীর লোক তাহাও এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আভাস পাইলাম। ক্রয় করিলে ৪টা পয়সার সার্থক আছে।




"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৫শ বর্ষ। } ১৩১৪ সাল, জ্যৈষ্ঠ। { ১১শ সংখ্যা।

# জাপানের অভ্যুদয়।

লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র।

( চৈতন্য লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশনে পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা )।

এশিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে কতকগুলি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া জাপান সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিপন্, কিউসিউ, সিকক্, যেশো, ফরমোসা এই পাঁচটী দ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। জাপান সাম্রাজ্য তুলনায় ইংলণ্ড, ওয়েলস্ স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের দ্বিগুণ, এবং জর্ম্মণ সাম্রাজ্য ও ফ্রান্সের সমতুল্য হইবে। জাপানের লোক সংখ্যা ৪ কোটী ৭০ লক্ষের উপর। জাপানের রাজধানী "টোকিও"। এই নগর এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

উন্নত ও বাণিজ্য প্রধান। ভারতীয় ভূ-তত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশ ও দ্বীপ পুঞ্জাদির কথা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। প্রাচীন যুগে হিন্দু বণিকেরা পোতারোহণ পূর্ব্বক যাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে গমনাগমন করিতেন। এই সমস্ত স্থানে অদ্যাপিও হিন্দু উপনিবেশের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। হিন্দুরা যে জাপানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না তাহার প্রমাণ কয়েকটী পাওয়া গিয়াছে।

জাপানের একস্থানে ৪২ হস্ত উচ্চ একটী দেবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্ত্তির গাত্রে সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলি কথা খোদিত আছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় খৃষ্ট জন্মিবার বহুশতবৎসর পূর্ব্বে এই দেবমূর্ত্তি ভারতবর্ষ হইতে জাপানে আনীত হইয়াছিল। জাপানের প্রাচীন নাম "সুদর্শন" দ্বীপ। রামায়ণের একস্থানে চারুদর্শন সুদর্শন দ্বীপ এবং সূর্য্য-রাগ-রঞ্জিত মনোহর স্বর্ণ পর্ব্বতের উল্লেখ আছে।

কালক্রমে সুদর্শন নামের অপভ্রংশে 'নিপন' নাম হইয়াছে। প্রাচীন সুবর্ণ পর্ব্বত হইতে আধুনিক 'ফুজিসান' পর্ব্বতের নাম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

মহর্ষিবাল্মিকী সুদর্শন দ্বীপকে সূর্য্যোদয়ের স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। জাপানী ভাষায় 'নিপন' শব্দেরও বোধ হয় ঐ অর্থ।

আমাদের বৈবস্বত মনুর ন্যায় জাপান রাজবংশের আদিপুরুষ সিণ্টো সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। জাপান রাজ বংশধরেরা অদ্যাপিও আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া অভিহিত করেন।

"অতি প্রাচীন কালে সিণ্টো নামক জনৈক মহাপুরুষ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করেন; তাঁহার সন্তান সন্ততিরা বহুযুগ ধরিয়া পৃথিবী সুশাসন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে, নিপন রাজ্যে অতি ভয়াবহ দেবাসুর সংগ্রাম হয়। ভগবতী বসুমতী দানব কর্ত্তৃক প্রপীড়িতা হইয়া প্রভাকর পত্নী 'অমৃত-রাশির' আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহাদেবী বসুন্ধরার কাতর ক্রন্দনে বিগলিতা হইয়া 'মিকাডো' নামক জনৈক মহাবীরকে দানব-দলনার্থ প্রেরণ করেন বহুবর্ষ ধরিয়া দেব দানবে মহাযুদ্ধ হয়। তাহাতে দানবেরা পরাজিত হইয়া দেশত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে; যুদ্ধাবসানে মিকাডো স্বয়ং নিপনের সম্রাট হন।" ইহাই জাপানের পৌরাণিক ইতিহাস।

জাপান দ্বীপের উৎপত্তি ও তথায় লোকের বসতি সম্বন্ধে অনেক অপূর্ব্ব আখ্যান প্রচলিত আছে। তাহার অধিকাংশই ভারতীয় পৌরাণিক আখ্যায়িকার ন্যায় অপূর্ব্ব রহস্যে বিজড়িত।

জাপানীদিগের বিশ্বাস অতিপ্রাচীন কালে এই দ্বীপে দেবতারা রাজত্ব করিতেন। বহুযুগ পরে সেই দেববংশে মানব ও দেবধর্ম্মবিশিষ্ট একপ্রকার মনুষ্যের জন্ম হয়। ইহার বহুবর্ষ পরে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইতে বর্ত্তমান জাপানীদিগের উৎপত্তি। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের অনুমান যে, চীন হইতে জাপানীদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু উভয় জাতির ধর্ম্ম ও ভাষার অসাদৃশ্য। রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের পার্থক্য, মানসিক গতি ও চরিত্রের বিভিন্নতা দর্শনে কিছুতেই উক্ত অনুমানের সার-বত্তা উপলব্ধি হয় না।

পাশ্চাত্য, মানব তত্ত্ববিদেরা মনুষ্যবর্গের বর্ণ মুখশ্রী ও গঠনাদির বিভিন্নতা অনুসারে সমগ্র মানবজাতিকে ককেশীয়, মোঙ্গলীয়, ইথিওপিয়, মালয়, ও আমেরিক এই পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চীন বর্ম্মা, শ্যাম, জাপান, এশিয়াস্থ রুশিয়া এবং তিব্বত প্রভৃতি দেশের অধিবাসীগণ মোঙ্গলীয় শ্রেণী ভুক্ত। ইহাদের বর্ণ পীত, কেশ-স্থুল ও ঋজু, শ্মশ্রুবিরল, মুখ প্রশস্ত ও চেপ্‌টা, গণ্ডাস্থি উন্নত এবং চক্ষু বাদামাকৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ জাপানীগণের গঠনাদি অনেকাংশে মোঙ্গলীয় ভাবাপন্ন হইলেও, জাপানের শিক্ষিত ও উন্নত বংশীয়দিগের বর্ণ ও শারীরিক গঠনাদি অনেকাংশে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ জাতিগণের অনুরূপ। তাহাদিগকে সহসা দর্শন করিলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালি বলিয়া ভ্রম হয়।

তাঁহাদিগের বর্ণ গৌর, কেশ-দীর্ঘ, নাসিকা উন্নত ও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত। আমরা জাপান সম্রাট, মার্কুইস আইটো, এড্‌মিরাল টোগো, সেনাপতি অকু প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ জাপানীগণের আলোক চিত্র দর্শন করিয়া এ বিষয়ের সত্যতা অনুভব করিতে পারি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, দূর অতীতের কোন এক সময়ে ভারতীয় আর্য্যগণের কোন এক শাখা সুদর্শন দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মহাঘটনা আর্য্য জাতির অতীত গৌরবের সুবর্ণ যুগে কি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ যুগে ঘটিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করিবার অবসর উপস্থিত হয় নাই।

মিকাডো বংশে জীমুত মনু নামক জনৈক মহাপ্রতাপশালী নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। দেববংশ সম্ভূত বলিয়া জীমুত মনু রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মিবার ৬৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রজাগণ সিণ্টো

ব্যয় করিত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম কোন সময়ে জাপানে প্রথম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধ সভ্যতার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমাদের বিশ্বাস জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশের বহুপূর্ব্বে তথায় প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল। কারণ খৃঃ পূঃ ৬৫০ অব্দে জাপানীরা স্বদেশজাত দ্রব্যাদি লইয়া চীন ও কোরিয়ার সহিত সমুদ্র পথে বাণিজ্য করিত।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের অনুমান যে, চীন বাসীগণই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব প্রথম জাপানে লইয়া যায়। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজকেরা যে, সপ্তম শতাব্দ হইতে দশম শতাব্দ পর্য্যন্ত জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও বৌদ্ধ নীতির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে জাপানীদিগের মধ্যে বিবিধ কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। তাহারা বলিত পৃথিবীর নিম্নে একটী বৃহদাকার তিমি আছে, ঐ মৎস্য মস্তক নাড়িলেই ভূমিকম্প হয়। তাহাদের বিশ্বাস ছিল অধার্ম্মিকগণ মরণান্তে শৃগাল যোনি প্রাপ্ত হয়, মানুষ কুদিনে মরিলে ভূত হয়। আর এই সময়ে তাহাদের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত দূষিত ছিল। বিবাহের কোনরূপ ভালনিয়ম ছিল না, ভালবাসাই বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত; বিবাহিতা রমণীর জীবন ও কুমারীর জীবনে কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। স্বামি মহাশয় মধ্যে মধ্যে দর্শন দানে পত্নীর নয়ন রঞ্জন করিতেন। ইহাই কুমারী হইতে বিবাহিতার স্বাতন্ত্র্য। মাতাই সন্তান বর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ভগিনী মাতুল ও ভাগিনেয়ী পরস্পরের বিবাহ করিত। এতাদৃশ আরও অনেক ভয়ানক ও জঘন্য পাপ আচরিত হইত, এই সকলের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাসন ছিল না। জাপানে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা প্রচলিত ছিল না, পিতা প্রায়শঃ কনিষ্ঠ পুত্রকেই উত্তরাধিকারিত্বে বরণ করিতেন।

ক্রম বিকাশ প্রভৃতির নিয়ম। আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক হইবে না, যে জাপানের অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল, তত্রত্য লোকের অধিকাংশ নিরক্ষর, কুসংস্কারাপন্ন ও একতাহীন, ইয়ুরোপীয় রাজশক্তি নিচয়ের ভয়ে জাপান ত্রস্ত ও চকিত। সেই জাপান এই অল্পদিনের মধ্যে স্বকীয় অবস্থার কিরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে তাহা স্মরণ করিতে শরীর লোমাঞ্চিত হয়।

ভাগ্যচক্রের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। [illegible]

সঙ্গে সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়া অগৌরবের বিষয় মনে করেন না। বঙ্গের অমর কবি "হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়" তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীত কবিতায় "অসভ্য জাপান" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সেই জাপান কি কৌশলে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরাক্রমশালী ও সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইল তাহা বর্ণিত হইতেছে।

১৮৫৮ অব্দে পেরি নামক জনৈক মার্কিণ নৌসেনাধ্যক্ষ ৪খানি রণতরি লইয়া জাপানে আগমন করেন। জাপান ও মার্কিণ সাধারণ তন্ত্রের মধ্যে একটী বাণিজ্য সন্ধি স্থাপন করাই তাঁহার অভিলাষ; কিন্তু জাপান সেনাপতি-পেরির প্রস্তাবে কর্ণপাত না করায়, তিনি কুপিত হইয়া পোতস্থিত কামানের সাহায্যে উপকূলবর্ত্তী নগর সকলের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করেন। ইহাতে সম্রাট ও সেনাপতি উভয়েই ভীত হইয়া পেরির প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন।

এই ঘটনা হইতে জাপানে নবযুগ আরম্ভ হইল। ইহাতে জাপানবাসীর হৃদয়ে যে গভীর ক্ষত উৎপন্ন হইল, অদ্যাপিও তাহার রক্ত নির্গমন বন্ধ হয় নাই। পেরি জাপান ত্যাগ করিলে সকলেরই মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। সকলেই বুঝিলেন আর রক্ষা নাই। এখন হইতে সাবধান না হইলে অনতিকাল মধ্যেই সমগ্র রাজ্য শত্রুর করাল কবল গ্রস্থ হইবে। জাপানের গৌরব চিরতরে অস্তমিত হইবে। বাগ্মীগণ হৃদয় বিলোড়ন কারিণী, বক্তৃতা দ্বারা সুলেখকগণ অন্তর প্রজ্বালন কারিণী, রচনাদ্বারা স্বদেশীয় শ্রোতৃবর্গ ও পাঠক বৃন্দের চিত্ত উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন। পরিশেষে অতি অল্প দিন মধ্যে সকলেই একবাক্যে স্থির করিল যে, স্বদেশ হিতব্রতে স্বার্থপশু উৎসর্গ না করিলে কোন উপায়েই জননী জন্মভূমির কল্যাণ রক্ষা হইবে না।

সর্ব্ব প্রথমে জাপানের অদ্বিতীয়শক্তিধর সেনাপতি "কিকি" স্বদেশ হিত ব্রতে আত্ম স্বার্থ বিসর্জ্জন দিলেন। তিনি রাজ্য, সিংহাসন, সম্মান সমস্তই সম্রাট চরণে উৎসর্গ করিয়া কেবল এক খানি মাত্র অসি গ্রহণ করিলেন। একে একে সমস্ত ভূম্যধিকারী সেনাপতির মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। লক্ষপতি স্বেচ্ছায় পথের ভিখারী হইলেন।

এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া নিরক্ষর সৈনিকেরা পর্য্যন্ত আপনাপন নিষ্কর-ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্রাট সমক্ষে কর যোড়ে দণ্ডায়মান হইল। এইরূপে ১৮৬৭

সামাজিক উন্নতি এবং রীতি নীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতি—সাধারণতঃ জাপানীদিগকে সাতভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—১ম সম্ভ্রান্ত বংশীয়, ২য় যাজক, ৩য় রাজকর্ম্মচারী, ৪র্থ বণিক, ৫ম সৈনিক, ৬ষ্ঠ শিল্পী এবং ৭ম শ্রমজীবী। উচ্চশ্রেণীস্থ পুরুষদিগের বর্ণ গৌর, শরীর দীর্ঘ ও মুখমণ্ডল শ্মশ্রুল। তাঁহাদের আকৃতি ও বেশভূষা অনেকাংশে ইউরোপীয়দিগের ন্যায়। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের বর্ণ পীত, আকৃতি খর্ব্ব; অধরোষ্ঠ স্থূল ও নাসিকা চেপ্‌টা। ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং কষ্ট সহিষ্ণু।

জাপানী রমণীদিগের গঠন অতি সুন্দর। বর্ণ উজ্জ্বল, গৌর, নয়নদ্বয় ভাসমান ও স্থির কটাক্ষ বিশিষ্টা, ভ্রমর কৃষ্ণ কেশরাশি পশ্চাৎভাগে অপূর্ব্ব কৌশলে বিন্যস্ত। পাশ্চাত্য যুবতীসুলভ বিলাস বিভ্রম নাই, যুবজনের চিত্তহরণ নাই স্পৃহা নাই কিন্তু তথাপিও প্রথম দর্শনে দর্শক মাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। "কাইমনো" জাপানবাসী পুরুষ ও রমণীগণের জাতীয় পরিচ্ছদ। ইহা দেখিতে অনেকাংশে দেশীয় আলখেল্লা বা বিলাতি অলষ্টারের অনুরূপ। ইহা স্কন্ধ দেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত লম্বিত, ইহার ভিতর ভাগ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পকেটে পরিপূর্ণ। "ওবি" নামক নাতি প্রশস্ত ৭।৮ হাত দীর্ঘ বস্ত্র খণ্ড দ্বারা কটিবন্ধের কার্য্য হইয়া থাকে। কাইমনো ও ওবি সাধারণতঃ কার্পাস সূত্রে নির্ম্মিত হয়। অবস্থাবানেরা রেশম নির্ম্মিত পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। জাপানে অলঙ্কার ব্যবহারের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না।

জাপানে বালক বালিকারা বাল্যকাল হইতে পিতা মাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনের আদেশ প্রতিপালনে অভ্যস্ত হয়। ইহার ফলে জাপানীগণের পারিবারিক জীবনে কোন অশান্তি পরিলক্ষিত হয় না। জাপানী বালিকারা শৈশব হইতেই রন্ধন, গৃহ মার্জ্জন, শয্যা রচন, নিমন্ত্রিতগণের ভোজ্যাহরণ প্রভৃতি আবশ্যকীয় গৃহকার্য্য সমুদয় অতি যত্নের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকে। ঘুড়ি উড়ান, নদীরজলে কাগজের নৌকাচালন, কৃত্রিম যুদ্ধ, বিবাহাভিনয়, ধূলাখেলা প্রভৃতি এদেশীয় বালক বালিকাগণের প্রধান ক্রীড়া।

জাপানে বিবাহের গড় বাইশ বৎসর পাত্রপক্ষে, এবং ১৬ বৎসর পাত্রীপক্ষে দৃষ্ট হয়। পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকেরাই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকেন। ইহাতে কোনপক্ষ বিরাগ প্রদর্শন করে না, এক সম্প্রদায়ের পাত্রের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের পাত্রীর বিবাহ হইতে পারে না। সম্প্রদায় বিশেষে কন্যাপণ ও বরপণ প্রচলিত আছে।

বিবাহ রজনীতে পান ভোজন ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংস্রব নাই। স্ত্রী আচার প্রচলিত আছে। বিবাহান্তে বর বধূ তুষার শুভ্র মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক গুরুজনের নিকট সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিবাহের একটী নিষ্ঠুর প্রথা এই যে, দম্পতী যুগলের একের বা উভয়ের মৃত্যু হইলে, শব-দেহ আবৃত করা হইবে বলিয়া, পরিণয়ের নবীন পরিচ্ছদ অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত হইয়া থাকে। বালিকা বধূ বিবাহের কয়েক বৎসর পরে পতিগৃহে গমন করিয়া থাকে। তথায় তাহাকে শ্বশ্রূঠাকুরাণির সম্পূর্ণ শাসনাধীনে থাকিতে হয়। জাপানী যুবতীরা আপনাকে পতির সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা করে না। তাহারা স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে। জাপানী বধূর ভালবাসা অপরিসীম হইলেও তাহা ইউরোপীয় ললনাগণের ভালবাসার ন্যায় উদ্দাম ও চাঞ্চল্য পরিপূর্ণ নহে। জাপানে বহুবিবাহ অতি বিরল। উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। অতি পুর্ব্বে সম্ভ্রান্ত বংশে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে রাজাদেশে তিরোহিত হইয়াছে। এদেশের অন্যান্য পারিবারিক প্রথা অনেকাংশে বঙ্গদেশের অনুরূপ।

জাপানে কুস্তিগীর পালোয়ান দিগকে "সাতজুমা" কহে। ইহাদের দৈহিক বল অসাধারণ। সাতজুমাগণ শরীরের মর্ম্মস্থান নির্ণয়ে অসামান্য পটুতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহারা মল্ল ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে কন্যাদান করে না। গেইসা' জাপানের নৃত্যকারিণী রমণী। এই অপ্সরা বিনিন্দিত সুন্দরী বালিকাগণের নৃত্য দর্শন ও গীত শ্রবণ জন্য জাপানীরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাদের কমনীয় মুখশ্রী' বিচিত্র বেশ বিন্যাস, অঙ্গ ভঙ্গিমা প্রভৃতি দর্শন করিলে মনে হয় যেন জগতের চক্ষু পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই গেইসা রমণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহাদের চরিত্র দুষিত নহে। ইহারা পিতা, মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে থাকিয়া নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। উপযুক্ত সময়ে বিবাহ হইলে আর কখনও সাধারণ সমক্ষে বহির্গত হইতে পারে না।

অন্ন মৎস্য ও শাক্ সবজী জাপানীদিগের প্রধান খাদ্য। সুরম্য প্রাসাদবাসী সম্রাট হইতে পর্ণকুটীর বাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই পরিতোষ সহকারে এবং পরম রুচি সহকারে ভাত, মাছ, শাক আহার করিয়া থাকে। জাপানে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে প্রত্যহ আমাদের ন্যায় ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করা হয়। কেবল মাত্র নামের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যথা:—

| জাপানী নাম। | বঙ্গীয় নাম। |
|---|---|
| মিয়া | লিম্ সুক্ত |
| সুইমনো | মাছের ঝোল |
| স্থাসিমা | চিংড়ি মাছ ভাজা |
| টেরায়াকি | মাছের চড়চড়ি |
| গোছেন | চাউলের পায়স |
| নিজাকানা | আলু ও মাছের কালিয়া। |

মধ্য শ্রেণীর পরিবারে ভাত, চিংড়ি মাছ, সিদ্ধ, কাঁকড়ার কাবাব ও চাঁদা মৎস্যের অম্ল রন্ধন হইয়া থাকে। জাপানী পাচকেরা তরকারিতে অধিক মাত্রায় ঝাল ব্যবহার করে।

জাপানে শূকর ও গোমাংস ভক্ষণের প্রচলন নাই। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যেও অনেকে গোমাংস ভক্ষণ করে না। ইউরোপ প্রত্যাগতদিগের মধ্যে অনেকেই টবিনেব অর্থাৎ মুরগী ভক্ষণ করিয়া থাকেন। জাপানীরা পরমান্ন ও পিষ্টকাদি ব্যতীত কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করে না, তরকারিতে দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাপানের অধিকাংশ নরনারীই প্রত্যহ চা পান করিয়া থাকে। সাকিওসয় জাপানের জাতীয় সুরা সকলেই উহা আনন্দ সহকারে পান করিয়া থাকে। সাকি চাউল হইতে প্রস্তুত হয়। জাপান সাম্রাজ্যে চিকিৎসকের অনুমতি ব্যতীত কেহই অহিফেন সেবন করিতে পারে না।

এখানে সিগারেট প্রভৃতি বিবিধ তাম্রকুট সেবনের প্রথা প্রচলিত আছে। জাপানীরা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে। অনেকে প্রত্যহ ৩ বার স্নান করিয়া থাকে। এখানে প্রত্যেক গৃহস্থ বাটীতে কয়েকটী ফুলের গাছ, এক খণ্ড ক্রীড়া ভূমি ও একটী কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানীরা প্রাণ ভরিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করিতে পারিলে বড় প্রফুল্ল হয়। জাপানীরা বাল্যকাল হইতে শীতল বায়ু সেবনে অভ্যস্থ হইয়া থাকে। তাহারা প্রচণ্ড শীত রজনীতেও গৃহের জানালা, খড় খড়ি প্রভৃতি উন্মুক্ত করিয়া রাখে। সকলেই স্ব স্ব শয়ন ও উপবেশন কক্ষে অগ্নি পাত্র রক্ষা করিয়া থাকে, অনেকে বলেন যে, জাপানীরা শীতল বায়ু সেবনে অভ্যস্থ বলিয়াই যক্ষ্মা, হাঁপ, ব্রণকাইটিস্, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি বক্ষ ও স্বরণালী পীড়া হইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে;

জাপানের ন্যায় বৈদ্য বহুল দেশ সমগ্র পৃথিবীতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জাপান ভাষায় হাতুড়িয়া বৈদ্যের নাম "কুইসা" ইহাদের প্রস্তুত গণ্ডার বটীকা, মহিষ-

মিশ্রণ, ছাগারিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ সর্দ্দিজ্বর ও বিবিধ জটিল রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাপানী ভৈষজ্যশাস্ত্রে মৃগনাভিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা হইয়াছে। জাপানী বৈদ্যেরা পীড়ার কোন অবস্থাতেই রোগীর পক্ষে অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন উপবাস নিবন্ধন বল হ্রাস হইলে পীড়া আরোগ্য করা অধিক আয়াস সাধ্য। জাপানী চিকিৎসকেরা ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানেও অসামান্য উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে যে সিণ্টো ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই সিণ্টো ধর্ম্মই জাপানের প্রাচীন ধর্ম্ম। এক্ষণে এই ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে সিন্জু কহে। সূর্য্য সহধর্ম্মিণী অমৃতরাশি বা উষাদেবী সিন্জুগণের আরাধ্যা দেবী। ইহারা দেবতার সম্মুখে দর্পণ শুভ্রবস্ত্র, পানপাত্র স্থাপন করিয়া বিবিধ ফলমূলাদি সহযোগে উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। দেশের নানাস্থানে মিয়া সিয়া নামে সিন্জুদিগের ধর্ম্ম মন্দির আছে। যাজকেরা নেগি নামে অভিহিত। সিন্জুগণ মস্তক মুণ্ডন করে না, বিবাহ গৌরবের বিষয় মনে করে।

সিনজু দিগের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহারা গাত্রে ও টুপিতে স্বকীয় নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়া রাখে। ইহারা রাজাজ্ঞা পালন তীর্থ ভ্রমণ, দরিদ্র ভোজন, পুণ্যদিনে দানকরণ ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করে। এক্ষণে জাপানে অধিকাংশ ব্যক্তিই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। প্রায় প্রতি পল্লীতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মমন্দির ও যাজক দেখিতে পাওয়া যায়। আজি কালি ইয়ুরোপায় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভিত্তি দিন দিন শিথিল হইয়া আসিতেছে।

১৫০২ অব্দে মেণ্ডেজ পাইণ্টো নামক একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক ভগ্ন-পোত হইয়া জাপানের উপকূলে বিক্ষিপ্ত হয়েন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় জাপানে প্রবেশ করে নাই। জাপানীগণ পাইণ্টোকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করে। তাঁহার লিখিত জাপানী বিবরণ পাঠ করিয়া অনেক ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ, এবং স্পেন দেশায় বণিক জাপানে আগমন করে। সুপ্রসিদ্ধ ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম প্রচারক ফ্রান্সিস জেভিয়ার ( Francis Xavier ( সেই সময় ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। অঞ্জিরো নামক জনৈক জাপানী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এবং জাপানে আসিয়া ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। ১৫৪৯ অব্দে জেভিয়ার টোকিও গমন করেন। কিন্তু সে

সমেত ৩ বৎসর জাপানে ছিলেন। জেভিয়ারের যত্নেই জাপানে খৃষ্ট মাহাত্ম্য প্রথম প্রচারিত হয়, তাঁহারই চেষ্টায় জাপানের প্রায় সমস্ত নর নারী খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এই সময় হইতে জাপানে খৃষ্ট ধর্ম্ম অতি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল প্রকার লোকই এবং এমন কি বৌদ্ধ পুরোহিতগণ পর্য্যন্ত দলে দলে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। জেভিয়ারের পর আরও অনেক প্রচারক জাপানে গমন করিয়াছিলেন, এবং অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ১৫৮৭ অব্দে সেনাপতি টয়োটমার আদেশানুসারে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকেরা জাপান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তদবধি তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত খৃষ্ট ধর্ম্ম জাপানে মস্তকোত্তোলন করিতে সাহসী হয় নাই।

অধুনা জাপানে খ্রীষ্ট শিষ্যগণের সংখ্যা সামান্য নহে। আজ কাল অল্‌কটের থিয়সফি, আনিবেসান্টের বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম মত জাপানে বিদ্যমান আছে।

আজিও জাপান বাসীদিগের মধ্যে অনেকগুলি কুসংস্কার বর্ত্তমান আছে। এখানে রাত্রে লবণ ধার করিতে নাই। মাসের শেষে শনিবারে বস্ত্র ধৌত করিতে নাই। বিবাহের দিনে বর কন্যার পরিচ্ছদ লাল বা বেগুণি বর্ণের হইলে উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য বন্ধন স্থায়ী হইবে না। কোন বালক দর্পণে মুখ দেখিলে তাহাকে যৌবনে যমজ সন্তানের জনক হইতে হয়। কুকুর কাঁদিলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। মোরগ চালে উঠিলে গৃহ দাহের আশঙ্কা আছে। গ্রামে বসন্ত প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইলে গৃহস্থের দ্বার দেশে লিখিয়া দেয়, এবাটীতে একটীও বালক বালিকা নাই। এখানে ভূতের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক, তাহারা, রাত্রে রমণী বেশে ও শৃগাল বেশে মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে।

জাপানে যে সমস্ত গল্প উপকথা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে দুই চারিটী গল্পের সহিত এদেশীয় কোন কোন উপকথার অপূর্ব্ব ঐক্যতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ—বিহগ বিহগীর ( ব্যাগমা, ব্যাগমী ) উপাখ্যান ও সাত ভাই চম্পার কথা বলা যাইতে পারে। জাপানী উপকথায়, দেব দানবের সহিত মানবের বিবাহ, ব্যাঘ্র ও শৃগালাদির মনুষ্যের রূপ ধারণ, মন্ত্র বলে মৃতদেহে জীবন সঞ্চারণ প্রভৃতি অনৈসর্গিক কথা শ্রুত হওয়া যায়।

( ক্রমশঃ। )

# অদৃষ্ট তত্ত্ব।

লেখক—শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

( ২ )

শাস্ত্রে আছে—

"মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং॥"

অর্থাৎ ভোগ ব্যতীত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। শুভ হউক, অশুভ হউক, কর্ম্ম মাত্রেরই ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। তবে এখানে একটা কথা বলিবার আছে। যে যে স্থলে অদৃষ্ট অপ্রবল, অথচ পুরুষকার প্রবল, সেই সেই স্থানে প্রবল পুরুষকারের দ্বারা দুর্ব্বল অদৃষ্টকে খণ্ডিত করা যাইতে পারে। কিন্তু অদৃষ্ট প্রবল হইলে সেখানে পুরুষকারের প্রতিষ্ঠাই নাই। সেই জন্যই ব্যাধি অসাধ্য হইলে, চিকিৎসা-দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় না। সেরূপ স্থলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

জীবের ভোগের জন্যই জড় জগতের সৃষ্টি। নতুবা ইহার অন্য কোন প্রকার উপযোগিতা নাই। সুতরাং সৃষ্টি প্রবাহ যেমন অনাদি, তদ্রূপ জীব ও জীবের কর্ম্মপ্রবাহও অনাদি। সেই অনাদি কাল হইতেই এইরূপে প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত জীবগণকে জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া, লক্ষ লক্ষ বার সংসারে আসিতে হইতেছে। যাবৎ নির্ব্বাণ মুক্তি না হইবে, সেকাল পর্য্যন্ত এ ভোগের আর বিরাম নাই। জীবগণকে কেবল কর্ম্মানুসারেই উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে নানা যোনি ভ্রমণ করিতে হইতেছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"স্থাবরাস্ত্রিংশ লক্ষশ্চ জলজা নবলক্ষকঃ।
কৃমিজা দশ লক্ষশ্চ রুদ্র লক্ষশ্চ পক্ষিণঃ॥
পশবো বিংশ লক্ষশ্চ চতুর্লক্ষশ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥"

স্থাবর জন্ম ( বৃক্ষ, পর্ব্বতাদি ) ত্রিংশ লক্ষ, জলজ জন্ম নব লক্ষ, কৃমিজ জন্ম ( কৃমি কীটাদি ) দশ লক্ষ, পক্ষী জন্ম একাদশ লক্ষ ও পশু জন্ম বিংশতি লক্ষের পর, জীব সাধারণ মানব জন্ম লাভ করে। তদনন্তর আরও চারি লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তর আর্য্যকুলে দ্বিজত্ব ( ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজ শব্দবাচ্য )

শাস্ত্রমতে আর্য্য ও অনার্য্য ভেদে মানব জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ভারতবর্ষ বাসী ভারতসন্ততিগণ, যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অধীন, তাঁহারাই আর্য্য জাতি। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত মানবগণ আর্য্য জাতির অন্তর্গত। এই আর্য্য জাতির দেহ কর্ম্ম দেহ বলিয়া, কেবল ইহাঁদেরই কৃতকর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের সংস্কার সঞ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্ভিন্ন আর সকলেই অনার্য্য জাতি। অনার্য্য মানব দেহ, পশুপক্ষ্যাদি ইতর জীবদেহের ন্যায় ভোগদেহ বলিয়া তাহাদের কৃতকর্ম্মের দ্বারা অদৃষ্ট সঞ্চয় অথবা পাপ পুণ্য কিছুই হয় না। তবে ভোগাবসানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবার তাহারা আর্য্যকুলে জন্মলাভ করিতে পারিবে। মর্ত্ত্য লোকের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই কর্ম্মভুমি। অন্যান্য দেশ কেবল ভোগ তৃপ্তির জন্যই অবস্থিত। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং যদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥

* * * *

ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্মভুমৌ বিধীয়তে॥

* * * *

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন কচিৎ॥
তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ॥
পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো বিষ্ণুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোহন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্ম সহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি, ধন্যাস্তুতে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদ মার্গভূতে, ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিততৎ ফলানি, সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্ম রূপে।
অবাপ্যতাং কর্ম্ম মহীমনন্তে, তস্মিল্লঁয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি॥

জানীম নৈতৎ ক বয়ং বিলীনে, স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যাম ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা, যে ভারতে নেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ॥

মহা সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে যে বর্ষ অবস্থিতি করিতেছে, যেখানে ভারত সন্ততিগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহারই নাম ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ হইতেই মানবগণ স্বর্গ, মোক্ষ, মধ্য ও অন্ত, অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক ও পাতাল লোক প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন স্থানেই মর্ত্ত মানব কর্ম্মভূমির মাহাত্ম্য জানে না ও বুঝেনা। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই যুগচতুষ্টয় কেবল মাত্র ভারতবর্ষের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। অপর বর্ষে যুগ ভেদের প্রয়োজন নাই। মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে এইস্থানে বসিয়াই তপস্বী জনেরা তপস্যা করিতে পারেন, এইস্থানে বসিয়াই যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞে আহুতি দিয়া থাকেন এবং পরলোকের আদরার্থ যে কিছু দানকার্য্য, তাহাও এইস্থানে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুকে যজ্ঞপুরুষ জানিয়া, এই জম্বুদ্বীপের লোকেরাই যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। অন্য দ্বীপের ব্যবস্থা এরূপ নহে। জম্বুদ্বীপ মধ্যে আবার ভারতবর্ষই পারলৌকিক কার্য্যানুষ্ঠান পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতভূমিই কর্ম্মভূমি; অপর সমস্ত দেশই ভোগতৃপ্তির জন্য অবস্থিত রহিয়াছে। প্রাণীগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর, কদাচিৎ পুণ্যবলে এই পুণ্যভূমি ভারতে মানবজন্ম লাভ করিয়া থাকে। স্বর্গবাসী দেবতারা বলিয়া থাকেন, "ভারতবাসীগণ দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ওধন্য। কেননা তাঁহাদের জন্মভূমি স্বর্গ ও মোক্ষ, উভয় প্রাপ্তিরই হেতু স্বরূপ। ভারতের নির্ম্মল ও নিষ্পাপ লোকেরা তাঁহাদের সমুদয় কর্ম্মফল পরমাত্মা স্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া, তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকেন।" স্বর্গপ্রদ পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয় হইলে, আবার আমরা সমুদয় ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করিব, এইরূপ কামনা দেবতারা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন।

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতভূমিই কর্ম্মভূমি ও এখানকার অধিবাসী বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাধীন আর্য্যজাতির দেহই কর্ম্মদেহ, একথাটা বিকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত, পাশ্চত্য ভাবে বিভোর, স্থূলদর্শী সাম্যবাদীগণের মনঃপুত না হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা ব্যবহারিক জগতের সর্ব্বত্র ছোট বড়, ভাল মন্দ, উচ্চ নীচ, ইত্যাকার বৈষম্য বা বৈচিত্র্যভাবই দেখিতে পান, সেই সমস্ত সূক্ষ্মদর্শী মনীষীগণের নিকট ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। বস্তুতঃ ভারত ও ভারতের অধিবাসী আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জল, বায়ু ও ভূমির

কারণে মানবপ্রকৃতির পূর্ণতা সংসাধিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল ভারতেই সম্ভবে। ফলে এই ভারতবর্ষই, যে, সমগ্র পৃথিবীর অনুকৃতি স্বরূপ এবং পৃথিবীর অন্যত্র যাহা কিছু আছে, তাহা ভারতেও আছে, একথা সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতির মধ্যেও অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। আবার "যাহা নাই, ভারতে, তাহা নাই মরতে" এইরূপ প্রবাদ বচনও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন একটা কথা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। এই যে জড় জগৎ ও জীব জগতের মধ্যে সর্ব্বত্রই বৈষম্য বা বৈচিত্র্য ভাব লক্ষিত হইতেছে,—কেহ রাজা কেহ প্রজা; কেহ ধনী, কেহ নির্ধন; কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ; কেহ প্রাণপণে পুরুষকার দেখাইয়াও অভিলষিত সিদ্ধি পক্ষে বিফলমনোরথ হইতেছে, আবার কেহ বা বিনাযত্নে ইষ্ট সাধন করিয়া লইতেছে, ইত্যাকার বৈচিত্র্য ভাবের হেতু কি? ইহা কি কেবল মাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি প্রসূত? না সেই ইচ্ছার মূলে অন্য-কোন গূঢ় কারণ আছে? বস্তুতঃ ইহাকে কেবল মাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি প্রসূত বলিলে, আবার ইহাও বলিতে হয় যে, ঈশ্বর রাগদ্বেষ-মূলক পক্ষ-পাতিত্বের বশবর্ত্তী হইয়াই এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে এরূপ দোষের আশঙ্কা হইতেই পারে না। অতএব নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, জীবগণের জন্ম জন্মান্তর সঞ্চিত কর্ম্মফল বা অদৃষ্টই এই বৈচিত্র্যের মূলকারণ; ঈশ্বর কেবল কর্ম্মের ফলবিধাতা মাত্র।

আরও একটা কথা নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি। শাস্ত্র প্রমাণ এবং যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহকারে পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যাহা নাই, অথবা ছিলনা, এমন বস্তুর নূতনরূপে উৎপত্তি হইতেই পারে না। সুতরাং যাঁহারা কোন একটী বস্তুর নূতন আবিষ্কার করিলেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত। কেন না ঐ বস্তুর নির্ম্মাণ কৌশলের সংস্কার পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের মনোমধ্যে সঞ্চিত না থাকিলে, কথাটা মনে উঠিল কিরূপে? আমরা পূর্ব্বে যাহা কখন দেখি নাই, শুনিনাই, ভাবিনাই, অথবা যাহার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় গ্রামের কোন ক্রিয়াই হয় নাই, এমন বস্তুর কথা ত কখনই মনে আসিবেনা? অতএব ইহা নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের মনোমধ্যে প্রতিনিয়তই যে সমস্ত সদসদ্‌বৃত্তি বা ভাবের উদয় হই-তেছে, তৎসমস্তই পূর্ব্বকৃত ক্রিয়াজনিত সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে মনেই সঞ্চিত ছিল। এই যে পাশ্চাত্য জাতি পুণ্যভূমি ভারতের রাজা হইয়াছেন, এবং

দ্বারা লোকসকলকে চমকিত করিতেছেন, ইহাও নূতন হয় নাই। প্রতি সৃষ্টির প্রত্যেক কলিযুগেই তাঁহারা ভারতের রাজ সিংহাসন অধিকার এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কার বলে এইরূপেই রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ প্রভৃতির উদ্ভাবনা দ্বারা লোক সকলকে চমৎকৃত করিয়া থাকেন। নতুবা কলিকালোপযোগী আপাত মনোরম ও পরিণাম বিরস এই প্রকারের মোহময় কীর্ত্তিকলাপ না দেখিলে, সহজে লোক ভুলিবে কেন? এবং আচারভ্রষ্ট বা ধর্ম্মভ্রষ্টই বা হইবে কেন? বস্তুতঃ কলি প্রবল হইলেই যে, এইরূপ হয় একথা শাস্ত্রেও উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে—

"যদা তু ম্লেচ্ছজাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ।
ভবিষ্যন্তি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥"

যাহারা অদৃষ্ট স্বীকার করেন না বা জন্মান্তর মানেন না, তাঁহাদিগকে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সদ্য প্রসূত গোবৎস মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরক্ষণেই যে সংস্কার বলে অন্যের বিনা সাহায্যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃস্তন খুঁজিয়া লইয়া দুগ্ধ পান করে, সেই সংস্কার তবে কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জীবের মনোমধ্যে পূর্ব্ব ক্রিয়া জনিত যে সংস্কার সঞ্চিত হয়, তাহাই বাসনা বা প্রবৃত্তিরূপে মনে উদিত হইয়া থাকে। তর্কস্থানে এখানে মাতৃগর্ভই যদি গোবৎসের প্রথমোৎপত্তি স্থান কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে গর্ভমধ্যে ঐরূপ সংস্কার সঞ্চিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, গোবৎসের পূর্ব্ব-জন্ম সঞ্চিত সংস্কারই তাহার দুগ্ধপান প্রবৃত্তির একমাত্র হেতু। বলা বাহুল্য যে, এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে জন্মান্তর বা অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে গত্যন্তর নাই। অতএব নিসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, এক মাত্র অদৃষ্টই জগদ্বৈচিত্র এবং জীবগণের উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট জন্ম আয়ু বা জীবনীশক্তির তারতম্য ও নানা প্রকার সুখ দুঃখ ভোগের হেতু স্বরূপ।

উপসংহারকালে আমাদের বক্তব্য এই যে যখন পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র হইতে চতুরঙ্গ বলান্বিত সুরম্য প্রাসাদবাসী রাজরাজেশ্বর পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই অদৃষ্ট জনিত সুখ দুঃখের ভোগ অবশ্যম্ভাবী, তখন যত প্রকারের দুঃখ সন্তাপই উপস্থিত হউক না কেন, তাহাতে বিচলিত ও মুহ্যমান না হইয়া, ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে হইবে যে,—

"যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।"

হে ভগবন্ পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে আমার যাহা হইবার, তাহা হইয়া যাউক। আমি যেন অকাতরে তাহা সহ্য করিতে পারি, এই শক্তি দাও প্রভো! ইহা ভিন্ন এই অশান্তিময় সংসারে শান্তি সুখের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

# ভক্তের মান।

## লেখক—শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ।

কোন গ্রামে ভগদ্ভক্ত জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সন্তান সন্ততি না হওয়ায় তাঁহার মন সর্ব্বদাই বিষাদপূর্ণ থাকিত। কিন্তু তাহা বলিয়া ভগবানের প্রতি তাঁহার ভক্তি কমে নাই। তিনি ঈশ্বরারাধনা, অতিথি সেবা প্রভৃতি সাধু কার্য্যেই সময়াতিপাত করিতেন। অপত্য লাভের জন্য কত যাগ, যজ্ঞ, ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিছুতেই দ্বিজ-দম্পতীর মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই। শেষে দৈব চেষ্টায় বিরত হইলেন।

একদা সন্ধ্যার প্রাকালে রাজ পথ দিয়া জনৈক সন্ন্যাসী বলিতে বলিতে যাইতে ছিলেন, যিনি তাঁহাকে যতখানি রুটি দিয়া অতিথি সৎকার করিবেন, তাঁহার ততটী গুণধর পুত্র লাভ ঘটিবে। দ্বিজ-পত্নির কর্ণে এই বাণী প্রবেশ করিল। প্রসিদ্ধ গণৎকারগণ তাঁহাদের অপত্য যোগ নাই বলিয়া বারবার জানাইলেও, সহধর্ম্মিনীর প্ররোচনায়, নন্দন মুখ সন্দর্শন লালসায় ব্রাহ্মণ সেই সন্ন্যাসীটীকে পরম যত্নে গৃহে আনিলেন ও পাঁচ খানি রুটী দিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। সাধুও পরম পরিতুষ্ট হইয়া পঞ্চ পুত্র লাভ হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অচিরকাল মধ্যেই ব্রাহ্মণের কুটীরে সুকান্তি পঞ্চ তনয়ে আলোকিত হইল! ব্রাহ্মণের পুরী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। অপত্য স্নেহের সুখসাগরে তাঁহারা ডুবিয়া গেলেন। এই সময় দেবর্ষি নারদ একদিন ভগবান কমলা-পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঠাকুর ইতিপুর্ব্বে ঐ ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া আমিই কতবার আপনাকে উহাদের মনোক্ষোভ দুর করিতে অনুরোধ করিয়াছি। আপনি বিরক্তির সহিত উত্তর দিয়াছেন ব্রাহ্মণের ভাগ্যে এবার তাহা পুর্ণ হইবার নয়! আজ দেখি তাহাকে পাঁচটি তনয় দান করিয়াছেন। কত মাথা কুটিয়া সে একটী সন্তান পায় নাই, আজ তাহার প্রতিপালন করিতেই কষ্ট! আপনার লীলা বুঝা ভার! যাহা হউক, আজ হইতে মিথ্যা কথনের শাস্তি উঠিয়া গেল, নিজেই পথ দেখাইলেন।"

ঈষদ্ধাস্য করিয়া কমলেশ বলিলেন, "নারদ, সম্প্রতি আমার নর-মাংস

কহিলেন—"ভগবন্! আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিব এমন সাধ্য নাই, আপনার সবই অদ্ভুত!" একটু বিদ্রুপের স্বরে পুনরায় বলিলেন,—"জীবিত মনুষ্যের মাংস, না মরা হইলে চলিবে?" রমেশ কহিলেন, "নারদ সত্যই বলিতেছি, আজ আমাকে নর—মাংস ভোজন করাইতে হইবে, তজ্জন্য তুমি চিন্তা করিতেছ কেন? সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই আমার অভিলাস জ্ঞাপন করিবে, তাহারা আমার পরম ভক্ত, অবশ্যই ইহার উপায় করিবে।"

বৈকুণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া নারদ একে একে সকলের নিকট গমন করিলেন, কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না, পরন্তু তাহা লইয়া দেবর্ষিকে উপহাস করিতে লাগিল। বিফল মনোরথ হইয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ঠাকুর কহিলেন, "নারদ, তুমি সকলের নিকট যাও নাই, আচ্ছা আর একবার কষ্ট করিয়া—ঐ বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট সাধুটীর নিকট যাও, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিও না।" বিরক্তির সহিত নারদ এই অসম্ভব আদেশ লইয়া সেই সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও ভগবানের বাসনা জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে যতীন্দ্র ভক্তি গদ্‌গদ্ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এই দাসের প্রতি কি ভগবানের এত করুণা হইয়াছে? হতভাগ্যের কথা কি এতকাল পরে মনে পড়িয়াছে? তাঁহার সেবায় এই শরীর লাগিবে, এ আনন্দ আজ আমি কোথায় রাখিব?" বলিতে বলিতে মাংসল উরুদেশ হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া ঋষি-হস্তে দিলেন! নারদের চক্ষুঃ স্থির! তাঁহার ধারণা ছিল, তিনিই প্রধান ভক্ত, আজ সে গর্ব্ব একজন নগণ্য সাধুর নিকট চূর্ণ হইল! ভাবিতে ভাবিতে তিনি যাইতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসী তাঁহাকে ফিরাইয়া কহিলেন, "ঠাকুর, উহা নিক্ষেপ করুন, আমার ভ্রম হইয়াছে, বিধাতার সঙ্গে আবার কার্পণ্য কেন? তিনিই দিয়াছেন, তিনিই চাহিতেছেন। চরণের মাংসে তাঁহার সেবা কদাচ হইতে দিব না। এই বক্ষের মাংস গ্রহণ করুন। ইহাই তাঁহাকে দিবেন।"

নারদের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, তিনি কি শুনিলেন, কি প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে পৌঁছিল না। মৃত ব্যক্তির ন্যায় প্রভু-সন্নিধানে উপনীত হইলেন। বিশ্বপতি অগ্রেই সমস্ত বুঝিয়াছেন, নারদের মনোভাবও তাঁহার অবিদিত নাই। ঋষিকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "—কেমন নারদ, পাইয়াছ ত? ঐ সেই রুটী ভোক্তা সন্ন্যাসী। পুত্রের বর দিয়া ৫খান রুটী খাইয়াছিল এবং আমাকেও মিথ্যাবাদী করিয়াছে। বল দেখি বৎস! এমন ভক্তের জন্য কি করিতে হয়? উহাকে মিথ্যাবাদী করা অপেক্ষা নিজে মিথ্যাবাদী হওয়া উচিত কি না?" নারদ লজ্জিত হইলেন। ভগবান এমনই ভক্তবৎসল বটে।

# চক্ষের ছানিচিকিৎসা।

## লেখক—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু *।

১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি বাতরোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হই। প্রায় [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করি; আরোগ্যলাভ করিবার কিছুদিন পরে [illegible] ঈষৎ ছানি পড়িয়াছে, এবং দৃষ্টিরোধ হইতেছে। এই ছানি পড়িবার [illegible]ক, আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে বার্দ্ধক্যই যে পীড়ার প্রধান কারণ, এ কথা নিশ্চিত। কাহারও বার্দ্ধক্যে দন্ত যায়, কাহারও চক্ষে ছানি পড়ে। ধাতু বিশেষে এরূপ ঘটিয়া থাকে। আমার শরীরের ধাতুই এরূপ যে বার্দ্ধক্যে দন্তের তত হানি হয় নাই, কিন্তু চক্ষে ছানি পড়িল। আমার স্বর্গীয় পিতার বার্দ্ধক্যে দন্ত ও চক্ষু দুই ভাল ছিল, কিন্তু মাতার চক্ষে ছানি পড়িয়াছিল। অনুমান হয়, সেই মাতৃ শোণিতের দোষে আমারও বার্দ্ধক্যে চক্ষে ছানি পড়িয়াছে। নাহলে তৎপূর্ব্বে আমার চক্ষের দৃষ্টি বরাবর অতি সতেজ ছিল; এমন কি রাত্রিতে প্রেসের প্রুফ এত সুন্দর দেখিতাম যে, তাহা প্রায় নির্ভুল হইত। যে কারণেই হউক চক্ষে ছানি পড়াতে আমি একদা আশ্চর্য্য ও ভীত হইলাম। তখনি একজন বন্ধু এলোপ্যাথিক ডাক্তারকে চক্ষু দেখাইলাম। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় ছানি পড়িতেছে। কিন্তু বড়ই ভরসা দিলেন, ইহার জন্য ভাবনা কি, ছানি পাকিলেই অস্ত্র করিয়া দিলেই আবার পূর্ব্বেকার মত চক্ষের দৃষ্টি খুলিবে। তবে যতদিন না পাকে ততদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। কাহারও বিলম্ব হয়, কাহারও অল্প দিনেই পাকিয়া যায়। কিন্তু অস্ত্রকরাই সদুপায়; অন্য ঔষধ নাই। অস্ত্রের নাম শুনিয়াই আমার হৃৎকম্প হইল। কিন্তু ডাক্তার বন্ধু আশ্বাস দিয়া বলিলেন, ছানি কাটাইতে কোন কষ্ট নাই। অস্ত্র প্রধান এলোপ্যাথিক চিকিৎসার এই ব্যবস্থা। অস্ত্র করাইতে আমি কোনমতে রাজি নহি; কারণ ছানি কাটাইয়া আমার বৃদ্ধ মাতা অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

---

* লেখক "সাহিত্য-চিন্তা, ফলশ্রুতি, কাব্যচিন্তা, কাব্যসুন্দরী, সমাজতত্ত্ব, সমাজচিন্তা, দেবসুন্দরী, হিন্দুধর্ম্মেরপ্রমাণ, সৃষ্টিবিজ্ঞান, প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, এবং বাঙ্গালাসাহিত্যের সুলেখক ও সূক্ষ্ম সমালোচক, ইহাঁর কৃত সকল পুস্তকই যুক্তি প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে [illegible]

সে যাহা হউক, এই ব্যবস্থা পাইয়া আমি ভাবিলাম, ছানি পাকিতে যে সময় লাগিবে, সেই সময়ের মধ্যে কোনরূপ ঔষধ লাগাইবার চেষ্টা করা উচিত। যদি ঔষধে একান্তপক্ষে কিছু প্রতিকার না হয়, তখন কাজে কাজেই ছুরী বসাইতে হইবে। দেখা যাউক ঔষধ প্রধান হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা কি বলেন? তখনি একজন হোমিওপ্যাথিক বন্ধু ডাক্তারের নিকট গেলাম। তিনি Calcaria Phosphorus সেবনের ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবস্থা গ্রহণ করিলাম। আরও বলিলেন, চক্ষে একটী প্রয়োগ করিবার ঔষধ আছে বটে, কিন্তু তাহা তত নিশ্চিত নহে। অথচ ঔষধ অতি দুর্মূল্য। প্রতি শিশি ৫৲ টাকা দামে অনেক শিশি লাগিবে। সে ঔষধে তিনি তত ভরাভর না দেওয়াতে তাহা গ্রহণে আমারও ইচ্ছা হইল না। Calo, Phos, সেবন করিতে লাগিলাম।

প্রায় একমাস সেই ঔষধ সেবনে বিপরীত ফল হইল। বোধ হয় উহার ঠিক নিয়ম পালন করা হয় নাই। তাই রোগের কিছু প্রতিকার হওয়া দূরে থাক্ শরীরে অন্য একটী রোগের উৎপত্তি হইল। প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত দেখা দিল। কারণ হোমিওপ্যাথিকে যাহা যাহার নিবারক, অধিক ব্যবহারে তাহাই তাহার উৎপাদক। এই রক্ত প্রস্রাবের কথা অন্য একবন্ধু ডাক্তারের কাছে বলিলাম। তিনি সে ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেন। বলিলেন, এ রক্তপাতে কোন ভয় নাই, তাহা রক্তপিত্তজ অধোগামী স্রাব মাত্র। তিনি আর একটা ঔষধ দিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি আবার Calcaria fluorica. সেবন করিতে বলিলেন। এ ঔষধ সেবনেও উক্ত বিপদ ঘটিল। তাহ তাহাও বন্ধ করিয়া দিয়া আর কোন ঔষধ সেবন করি নাই।

একদিন পেন্সন আনিতে গিয়া শুনিলাম আর একজন পরিচিত পেন্সর তাহার চক্ষের ছানিতে কি একটা ঔষধ কয়েক দিবস হইতে প্রয়োগ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট গিয়া শুনিলাম, এ সেই ঔষধ যাহার কথা আমিও পূর্ব্বে বন্ধু ডাক্তারের মুখে শুনিয়াছিলাম। সে ঔষধ শুধু প্রয়োগ করিতে হয়, প্রয়োগ-কালে চক্ষে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই, বরং চক্ষু ঠাণ্ডা বোধ হয়। সেই ঔষধের নাম :— Cineraria Maritima.

তাহা মাদ্রাজ হইতে আনাইলে সস্তা পড়ে; এক ড্রাম ১৸৶০ মাশুল। কিন্তু এখানকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে এই ঔষধের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। তিনিও মাদ্রাজ হইতে ঔষধ আনান। তবে মাদ্রাজ হইতে আনাইতে প্রায়

একপক্ষ লাগে। ঔষধ আনাইতে Father Muller কে এই ঠিকানায় পত্র পাঠাইলে তিনি ভিঃ পিঃ ডাকে তাহা পাঠাইয়া দেন :—

Father A. Muller.

Homoeopathic Poor Dispenisary.

Kamkanady

Mangalore.

এই ঔষধ আনাইয়া চুই মাসে চুই শিশি ব্যবহার করাতে চক্ষের ছানি ঈষৎ পাতলা বোধ হইল। কিন্তু এই দুই মাসে আর এক বিপদ উপস্থিত। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ চক্ষেরও দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে এরূপ জ্ঞান হইল; তখন আর এক জন এলোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে চক্ষু দেখাইতে গেলাম। তিনি বলিলেন, বাম চক্ষুর ছানি পাকিয়াছে ও কাটিবার যোগ্য হইয়াছে এবং দক্ষিণ চক্ষের তারা ছানিদ্বারা প্রায় আধাআধি ঘেরিয়া আসিয়াছে; আর কিছুদিন পরে একেবারে দৃষ্টিরোধ হইয়া গেলে দুই চক্ষুই অন্ধ হইয়া যাইবে। এইবেলা বাম চক্ষুর ছানি কাটান উচিত।

মহাবিপদের কথা। মন অস্থির হইল। কিন্তু তখনি যেন কে অন্তর হইতে বলিয়া দিল—"যে ঔষধ ব্যবহার করিতেছ উহাই আরও কিছুদিন লাগাইয়া দেখ না। যদি তাহাতে উপকার না হয়, তখন বাম চক্ষের ছানি কাটাইও।" এই কথাই শিরোধার্য্য করিলাম। ভাবিলাম এ ঔষধের সম্পূর্ণ পরীক্ষা কাল দেওয়া উচিত। এজন্য ডাক্তার বন্ধুকে বলিলাম, আমি যে ঔষধ লাগাইতেছি, তাহা আর কিছুদিন না দেখিয়া ছানি কাটাইব না; না হয় ততদিনে দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে। দুই চক্ষু অন্ধ হইলে তখন না হয় এক চক্ষের ছানি কাটাইব। তাহাতে তিনি ঔষধের কথা শুনিয়া বলিলেন, ছানি কি কথনও ঔষধ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাহা যে প্রায় এক একটা মটরের মত বড় ও শক্ত। এই কথা বলিয়া ডাক্তার খানার লোককে বলিলেন, আন ত ঐ শিশিটা যাহাতে অস্ত্রদ্বারা বহিস্কৃত ছানি রক্ষিত হইয়াছে। সেই শিশি আনিত হইলে দেখিলাম, সত্যই ত এক একটী ছানি এক একটী মটরের মত বড় ও শক্ত। ঔষধ দ্বারা কি এত শক্ত দ্রব্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়?

মনে বড় ভয় হইল। কিন্তু তখনই স্মরণ হইল, ছানি যে নানা জাতীয়। যে ছানি দেখিলাম, তাহা কোন জাতীয়? আর আমার ছানিই বা কোন্ জাতীয়?

হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ হইতে পড়িতে শুনিয়াছি, ছানি ছয়শত প্রকার আছে। তাই যদি হয়, আমার চক্ষে যে জাতীয় ছানি পড়িয়াছে, হয় ত সে জাতীয় ছানি, দৃষ্ট নমুনা অপেক্ষা তরল হইতে পারে, নহিলে ভাবিলাম, দুই মাসের মধ্যে আমার ছানি এত পাতলা বোধ হইতেছে কেন? এই ভাবিয়া ডাক্তার বন্ধুকে বলিলাম, যাহাই হউক, আমি আর কিছুকাল গৃহীত ঔষধের পরীক্ষা না করিয়া ছানি কাটাইব না?

তৎপরে সেই ঔষধ আর চারি শিশি ব্যবহার করিয়াছি। পূর্ব্বে শুদ্ধ বাম চক্ষে ঔষধ প্রয়োগ করিতাম; এখন দুই চক্ষেই প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। সকাল বিকালে দুই ফোঁটা করিয়া প্রতি চক্ষে দিতে লাগিলাম। এই ঔষধ প্রায় ছয়মাস দিতেছি; ফল এই হইয়াছে, দক্ষিণ চক্ষের দৃষ্টি অনেক দূর সাফ হইয়া গিয়াছে এবং বাম চক্ষের ছানি এতদূর পাতলা হইয়া গিয়াছে যে, এখন সকল স্থূল দ্রব্যই দেখিতে পাই, সূক্ষ্মদ্রব্য তত দেখিতে পাই না। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা বোধ হয় দশ আনা ছয় আনা দৃষ্টির তফাৎ হইয়া গিয়াছে। এখন দশ আনা রকম দেখিতে পাই। ঠিক তারার উপর একটু পাতলারকম ছানি তাহা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আর তিন চারি শিশি ঔষধ দিলে সে টুকুও একেবারে যাইবে, এরূপ আশা বিলক্ষণ আছে। এই ঔষধ প্রয়োগে এতদূর আরোগ্য লাভ করাতে তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার জন্ত এই প্রবন্ধ লিখিলাম। যাহাদের চক্ষে ছানি পড়িয়াছে বা পড়িতেছে, তাঁহারা একবার এই ঔষধ দুই তিন মাস পরীক্ষা করিয়া দেখুন। যদি তদ্দারা ছানি কিছুমাত্র পাতলা বোধ হয়, এই ঔষধই বরাবর ব্যবহার করিলে বোধ হয় অস্ত্রের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। নহিলে বৃদ্ধ বয়সে ছানি অস্ত্র করা বড় সহজ কথা নহে। অস্ত্র করিলেই যে সকলে সিদ্ধ হইবেন, তাহার ও কিছু নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যে জাতীয় ছানি আমার চক্ষে পড়িয়াছে, সেই জাতীয় ছানি Cineraria Maritima. সাত আট মাস ব্যবহারে অধিকাংশে পাতলা হইয়া আসিবে এবং চক্ষের দৃষ্টি ক্রমশই খুলিয়া আসিবে।

ঔষধ ব্যবহারের প্রকরণ এই:—

১। সকাল বিকাল দুইফোঁটা করিয়া প্রতি চক্ষে প্রয়োগ করিয়া থাকি। ফোঁটা তোলা সহজ নয় বলিয়া পায়রার পালকে করিয়া তুলিয়া দিয়া থাকি। দুই চারিদিন অন্তর পালক বদলাইতে হয়।

২। প্রয়োগের পর দুই চারি মিনিট চক্ষু বুজিয়া থাকিতে হয়। যখন জল

কাটিয়া চক্ষু ঠাণ্ডা বোধ হয়, তখন চক্ষের পাতা খুলিয়া থাকি। তৎপূর্ব্বে খুলিলে চক্ষু একটু জ্বালা করিয়া থাকে।

৩। কিছুক্ষণ পরে চক্ষের জল বা জলীয় দ্রব্য পড়িয়া গেলে পর ঠাণ্ডা জলদিয়া চক্ষু ধুইয়া ফেলি।

৪। ঠাণ্ডা জল চক্ষের এক মহৌষধ, এজন্য মধ্যে মধ্যে অবসর পাইলেই শীতল জলদিয়া চক্ষু প্রায় ধুইয়া থাকি।

Father Muller কে এই বলিয়া পত্র লিখিলেই তিনি ভিঃ পিঃ ডাকে অবিলম্বে ঔষধ পাঠাইয়া দেন :—

*Sir*,—Please Send me as soon as possible a phial of Cineraria Maritima ( dram ) by V. P. parcel and oblige.

ঔষধ এক কালীন এক ড্রাম বই আনাই না। কারণ, ঔষধ বেশী দিন থাকিলে বিকৃত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা; বিশেষতঃ উহা একটু খোলা থাকিলেই উপিয়া যায়। এজন্য শিশির ছিপি খুলিয়াই বন্ধ করিতে হয়।

ঔষধ ফুরাইবার এক পক্ষ আগে পত্র লিখিলেই ঠিক সময় তাহা আসিয়া পড়ে। কাহার ছানি কয়শিশি ব্যবহার করিলে যে একেবারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে, তাহা ঠিক বলা যায় না। ছানি পড়িতে পড়িতে দিতে আরম্ভ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায়।

---

# অদৃষ্ট।

## লেখক—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ।

বিশ্বেশ্বর প্রাণীগণের ভাগ্য অগোচর রাখিয়া বিশ্ব-কার্য্য পরিচালনা করেন। এই জন্যই ভাগ্যের একটী নাম "অদৃষ্ট"। ইহা কেহই পূর্ব্বে জানিতে পারে না। কিন্তু মানব একেবারে নিবৃত্ত হইবার পাত্র নহে। পূর্ব্বে জানিবার জন্য সে কতই চেষ্টা, কতই যুক্তি, কতই বহু-দর্শনের সহায়তা গ্রহণ করিল, তথাচ ক্ষান্ত নাই। জ্যোতিষ যে সেই চেষ্টার ফল, তাহা বলাই বাহুল্য। ফলতঃ ভাগ্য চক্রের অন্তরালে না থাকিলে সংসারে যে কত অশিব ঘটনার স্রোত প্রবাহিত

হইত, তাহা কল্পনাও করা যায় না। আলস্য আমাদের সহচর হইত! চেষ্টা-উদ্যম, পরিশ্রম, কাহাকে বলে, কেহ জানিত না। বিশৃঙ্খলতার একশেষ হইত, সন্দেহ নাই। আমরা আমোদ-প্রিয় পাঠকদিগকে একটী উপাখ্যান শুনাইব।

হরিহর নামক জনৈক রাজ-কুমার বৈদেশিক রাজনীতি পরি-দর্শন জন্য বহু-পর্য্যটনের পর, অন্য রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সে দেশের ভূপতি পরম ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ও অমায়িক। হরিহরের সুন্দর কান্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় সভার পারিষদ করিয়া রাখিলেন। অত্যাল্প কালের মধ্যেই হরিহর সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। এমন কি, পুরোমহিলাগণ পর্য্যন্ত তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিবারস্থ একজন জ্ঞান করিতেন। তিনি যে রাজারসন্তান, ইহা গোপন রহিল।

ক্রমে হরিহরের উপর সকলের বিশ্বাস এতই বৃদ্ধি পাইল, যে অন্তঃপুরে যাইতেও তাঁহার বাধা ছিল না। ইতিমধ্যে রাজার একটী পুত্র হইল। হরিহর পুরোরক্ষী নিযুক্ত হইলেন। ষষ্ঠনিশা সমাগতা হইলে, বিধাতা নৃপ-নন্দনের ললাট-লিপি করিতে আসিলেন ও হরিহরকে দ্বার-মোচনের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এমন সময় তিনি সূতিকাগারের দ্বার ছাড়িবেন কেন? অবশেষে বিধাতা আত্ম-পরিচয় দিলে হরিহর দ্বার-ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ভাগ্য-দেবকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল, যে যাইবার কালে রাজকুমারের ভাগ্য-লিপি তাঁহাকে শুনাইয়া যাইবেন।

যামিনী প্রভাত হইবার উপক্রম দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বিধাতা অনিচ্ছাসত্বেও হরিহরকে বলিলেন "ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রমকালে রাজ-পুত্র পিতা, মাতা, সমস্তই হারাইবেন। মৃগ-শীকার করিয়া প্রত্যহ দিনপাত করিতে হইবে," হরিহরের শরীর শিহরিত হইল। তিনি বিষন্ন ভাবে কহিলেন, "তবে ইহাকে রাজগৃহে দেওয়া কেন?" ঈশ্বর বলিলেন, "হরিহর, আমি কি করিব? জীবগণ জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-বশে সংসারে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, আমি সেই ফল লিখিমাত্র। তবে কিছুকাল এইরূপ কষ্টভোগের পর, ইহার শুভ দিন আসিবে, পুনরায় রাজ-ভোগ ঘটিবে।" কিন্তু দেখিও, কদাচ এইসব গুহ্য কথা প্রকাশ না হয়।" এই বলিয়া—তিনি অন্তর্ধান করিলেন।

জনক জননীর স্নেহে রাজ-তনয় শশীকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিলেন। বর্ষ-ত্রয় না যাইতে,রাজ-মহিষী একটী পরমাসুন্দরীকন্যা প্রসব করিলেন। এবারও

দ্বারদেশে হরিহরকে দেখিয়াই তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইল! হরিহরও ছাড়িবার ছেলে নয়। অগত্যা পূর্ব্ববৎ ধাতা অঙ্গিকারে আবদ্ধ হইয়া সূতিকাগারে প্রবেশাধিকার পাইলেন। সময় বিশেষে ভগবানকেও মনুষ্যের হাতে পড়িতে হয়। যাহা হউক, ললাট-লিপি শেষ করিয়া গোপনে হরিহরকে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল! "কন্যাটী একাদশ বর্ষে বিবাহিতা, দ্বাদশে পতি-ত্যক্তা ও ত্রয়োদশে জনক-জননী হারা হইয়া পথের ভিখারিণী হইবেন!" হরিহর বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি পুণ্যফলে তবে রাজ-ঘরে জন্ম, আর তাহার ভোগই বা কি? বরং গরিবের ঘরে হইলে কষ্ট ভোগ করিতে অভ্যস্ত থাকিতেন।' ধাতা কহিলেন—"না, উপবাস করিতে হইবে না, প্রত্যহ ফুলের মালা বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহিত হইবে। নিত্য আয়, নিত্য ব্যয়, সঞ্চয় থাকিবে না। রাজ কুমারের মত ইনিও কিছুদিন পরে পতি-সোহাগিনী হইয়া সুখিনী হইবেন।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন, হরিহর একান্তে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর ঘুম হইল না;

দেখিতে দেখিতে কালপূর্ণ হইল। হরিহর রাজ-সন্ততিদ্বয়ের স্নেহে মুগ্ধ হইয়া নিজ রাজ্যে যান নাই। রাজ-দম্পতিও তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। এখন সন্তান দুইটীর ভাগ্যফল দেখিতে তাঁহার কৌতুহল জন্মিল।

জগদীশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল, রাজা মরিলেন, রাণীও মরিলেন, সময় বুঝিয়া বিদেশীয় শত্রু জমিদারি আক্রমণ ও অধিকার করিল! রাজ-কুমার নিষাদ-দলে মিশিয়া অতিকষ্টে দিনান্তে একটী করিয়া মৃগ-হনন করিতেন ও তাহা বিক্রয় করিয়া দুই চারি আনা পাইতেন। রাজ-কুমারীও ফুলমালা বিক্রয় দ্বারা দিনপাত্ করিতে লাগিলেন! হরিহর এতদিন মায়াবশে রাজপুত্রকে ছাড়েন নাই, কি জানি, কি ভাবিয়া এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন!

নিষাদগণের সহিত যে বনে রাজ কুমার মৃগ-শিকার করিতে যাইতেন, জনৈক ব্রহ্মচারী তথায় আসিয়া পর্ণকুটির স্থাপন করিলেন। দুর্দ্দশায় পড়িলে, কবে তাহা ঘুচিবে, জানিবার জন্য সকলেরই মন ব্যাকুল হয়, বিশেষতঃ সাধু-মহন্ত দেখিলে তাঁহাকেই মুক্তি-দাতা বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া আমাদের রাজকুমারও তাঁহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন ও মধ্যে মধ্যে স্বীয় ভাগ্যফল জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। একাকী পাইয়া একদিন সাধুবর তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলে, রাজ-তনয় কাঁদিয়া ফেলিলেন। সিদ্ধ-

তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। তিনি কহিলেন—"অদ্য হইতে নিষাদ-সঙ্গ-ত্যাগ কর। আমার কুটীর সম্মুখে বসিয়া মৃগ-শীকার করিবে। না পাও, আমি আহার্য্য দিব।" খাদ্যাভাব ঘটিবে না ভাবিয়া নৃপ-নন্দন তাহাতে সম্মত হইলেন ও সন্ন্যাসী-আদেশ মত সেইস্থানে ফাঁদ-বিস্তার করিয়া মৃগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজ-কুমারীর কর্ণে এই সিদ্ধব্রহ্মচারীর কথা পৌছিল। তিনিও তাঁহার ভূত-ভবিষ্যৎ-দর্শন-শক্তির এতই পক্ষপাতিনী হইলেন, যে ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া তাঁহার আশ্রমের অপর পার্শ্বে স্বীয় কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন, ও বন-ফুলের মালা রচনা করিয়া ক্রেতার আশায় থাকিলেন।

মধ্যস্থলে সাধুর আশ্রম, উভয় পার্শ্বে রাজ-সন্ততি-দ্বয়ের পর্ণ-কুটীর। ব্রহ্মচারীর আদেশে কেহ কাহাকে দেখা দেন না বা পরিচয় লন না। নিবিড় জঙ্গল ভিন্ন কেহ কিছু দেখিতে পান না। সিংহ সার্দ্দূলাদি হিংস্র প্রাণীর উচ্চ উচ্চ ভীম-নাদে বনস্থলী সমাকুলিত। সে ভীষণনাদে অতিমাত্র সাহসী বীর পুরুষের হৃদয়ও ভীতি-বিহ্বল হয়। এই গহনবনে সেই অল্প বয়স্ক বালক বালিকার প্রাণে কি ভাব হইল, সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হইলেই কি হয়? ভাগ্যের অধীন হইয়া সবই সহ্য করিতে হয়। যাঁহারা পরিচারক—পরিবেষ্টিত না হইয়া কক্ষান্তরে যাইতেন না, আজ তাঁহারা দীনবেশে বনচারী ব্রহ্মচারীর প্রতিবাসী হইয়াও সুখী মনে করিতেছেন। বিধাতার লীলা মানুষের বুঝিবার সাধ্য কি?

যেরূপ স্থলে রাজ-কুমারের পাশ-জাল বিস্তৃত, সেখানে মৃগ আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, তজ্জন্য নৃপ-তনয় একটু উদ্বিগ্ন না হইলেন, এমন নয়। মৃগ পাইলেই বা ক্রেতা কোথায়? যাহা হউক, ব্রহ্মচারীর আজ্ঞাক্রমে সারাদিন বসিয়া রহিলেন, কিছুই পড়িল না। সন্ধ্যার প্রাকালে একটী হরিণ আসিয়া অকস্মাৎ জালে পতিত হইল, ও অল্পক্ষণ পরেই একজন ক্রেতা তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। এদিকে নৃপ-বালা ফুল-মালা বিক্রয়ের জন্য বসিয়া আছেন, সন্ধ্যা অতীত হইতেই একজন ভদ্রলোক তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া গেলেন। প্রাতে সাধু শুনিয়া কহিলেন, "আজ একশত মুদ্রার কমে কেহ বিক্রয় করিও না, ক্রেতা না মিলে, আমি খাইতে দিব।"

বিশ্বেশ্বর বড়ই বিপদে পড়িলেন। যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অব্যর্থ। কাজেই সমস্ত দিবস মৃগ তাড়াইয়া রাজ কুমারের জালে ফেলিয়া আবার ফুলবাবু সাজিয়া

কোথায়? উপবাসীও রাখিবার ব্যবস্থা নাই। দিবারাত্রি এইরূপ পরিশ্রম করিয়া তাঁহার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল! চিন্তা বড় সহজ জিনিস নয়। বিধাতা হন, ভূপতি, কি কৃষক হন, চিন্তা যাহাকে দখল করিয়াছে, তাহার সুখ-শান্তি দূরে গিয়াছে। দৈত্যভয়ে দেবাদিদেব ইন্দ্রকেও এই রাক্ষসীর হাতে পড়িতে হইয়াছিল। রামচন্দ্রও জানকী হারাইয়া বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন! সাধে কি কবিগণে ইহাকে মৃত্যু অপেক্ষা গরীয়সী বলিয়াছেন? আজ ব্রহ্মচারীর কূট-মন্ত্রণা বলে ভগবানের সন্ধ্যাবন্দনাদির অবকাশ পর্য্যন্ত রহিত হইল। সারাদিন মৃগ তাড়না করিয়া বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে পর্য্যটন, পরে উহা ক্রয় করিয়া স্কন্ধে বহন, আবার নিশিযোগে নৃপ-বালার কুটীরে গমন ইত্যাদিতে তাঁহার শরীর একেবারে অবসন্ন হইতে লাগিল। উপায় নাই। বিশ্বের চিন্তা কি করিবেন, বিশ্রামেরই শেষ নাই। অমর না হইলে তাঁহার প্রাণ লইয়াই টান পড়িত।

কুমার কুমারী যাহা যে দিন পান, ঐ ব্রহ্মচারীর পরামর্শে তাহাই সে দিন খাদ্য, পোষাক, পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যয় করেন, সঞ্চয় রাখিবার ভাগ্য নয়। ক্রমে দশ সহস্র মুদ্রায় বিক্রয় করিবার উপদেশ দিয়া দান ধ্যান করাইতে লাগিলেন। দেশময় প্রচারিত হইল, একজন সিদ্ধপুরুষ দুইজন শিষ্য লইয়া বিজন বনে অকাতরে ধনদান করিতেছেন। সহস্র কণ্ঠে সংবাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কেহ ভিক্ষার্থে, কেহ কুতূহল তৃপ্তির জন্য দলে দলে লোক নিশিযোগে সেই পর্ণ কুটীরে আসিতে লাগিল। সকলেরই ধারণা বিধাতা বুঝি এই অজস্র ধনরাশি যোগাইতেছেন। সুযোগ বুঝিয়া ব্রহ্মচারী দুইদিকে দুইটী রাজপুরী একরাত্রে নির্ম্মাণ জন্য অসংখ্য লোক নিযুক্ত করিলেন। অধিক প্রত্যাশায় শ্রমজীবীগণ তাহাই করিল। দেবালয়, জলাশয়, অতিথিশালা ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। বলিতে কি, অত্যল্প কাল মধ্যে সেই বনভূমি রাজধানীতে পরিণত হইল। স্ব স্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কতজনে নূতন নগরে গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। তুল্যভাবে দুই বাড়ীতে নিত্য যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠান চলিতে লাগিল। জন কোলাহলে সর্ব্বদাই পূর্ণ। আর এখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের বাসস্থল নয়।

সকল বিষয়েরই সীমা আছে। বিধাতার আর সহ্য হইতেছে না; তাঁহার মহিমা অসীম থাকিলে কি হয়? সন্ন্যাসীর চক্রে আজ তাঁহাও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে! শরীরে না সহিলে করিবেন কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই ব্রহ্মচারীর শরণ লইলেন। নির্জ্জনে তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাপু হরিহর! ক্ষান্ত

হেও। এই জন্যই ভাগ্য অগোচর রাখি। তুমি একা জানিয়াছ, তাহাতেই আমার আহার, নিদ্রা গিয়াছে, সৃষ্টির চিন্তা করিতে সময় পাই না। এখন ইহার প্রতিকার কর।"

হরিহর লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"যখন কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে, আপনারও তাহা খণ্ডন করার সাধ্য নাই, তখন আমার দ্বারাই বা তাহার প্রতিকার সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে?" ভগবান কহিলেন "বক্রোক্তি পরিত্যাগ কর, যাহাবলি, শুন। ইহাদের দুঃসময় গিয়াছে, অত্যল্প বাকি আছে। শীঘ্রই রাজ-কুমারী পতি,সম্মিলিতা হইবেন। সেই কয়দিন আমাকে অব্যাহতি দেও।" দায়ে পড়িলে বিধাতাকেও মানবের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র বানরকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

এতদিন রাজ-কুমার মৃগ শীকারে বিপুল অর্থোপার্জ্জন ও ব্যয় করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এখন দার-পরিগ্রহ করিতে বাসনা হইল। নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। সহোদরার সম্বাদ জানিবার জন্য সন্ন্যাসীকে ব্যস্ত করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীও এতদিন কি অভিপ্রায়ে তৎসম্বন্ধে নীরব ছিলেন, এখন সময় বুঝিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন। শুভ কর্ম্মের সময় আত্মীয় স্বজনের অভাব বড় মর্ম্মপীড়ক হয়। রাজ-কুমার বিষন্ন-মনে বিবাহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন তাঁহার সু-সময় হইয়াছে, দারিদ্র-ক্লিষ্টা সহোদরাকে পাইলেই মন স্থির হয়।

চারিদিক হইতে উৎসবের বাড়ী লোকে পূর্ণ—হইল। এই জন-সঙ্ঘের মধ্যে ব্রহ্মচারী বেশে একটী লোককে দেখিয়া বিবাহোৎসব দর্শনকাঙ্ক্ষিনী এক রমণীকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজ-কুমার তথ্য জানিতে ব্যগ্র হইলেন, এমন সময় সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া কহিলেন "তোমাদের এখন পুনঃমিলন হইল, দুর্দ্দশার কাল অতীত হইয়াছে, ইনিই আমাদের রাজ-জামাতা।" তখন সকলেই দেখিলেন সন্ন্যাসী সেই হরিহর দাদা, রমণী সেই রাজ কুমারী। সুখের সাগর উচ্ছ্সিত হইল। মহানন্দে শুভ-কর্ম্ম সম্পন্ন হইল। গল্পও শেষ হইল।

অরণ্য-মধ্যে এই নব-প্রতিষ্ঠিতা নগরী রাজধানীতে পরিণত হইল, নাম হইল "হরিহর নগর।" হরিহর দাদার নামে বৎসরে বৎসরে এখানে মেলা বসিয়া থাকে। দূর দূরান্তর হইতে সহস্র সহস্র লোকে এই মেলা দেখিতে আইসে; লোকে ইহাকে "হরিহর ছত্র" কহে।

বিধাতারও জ্ঞান হইল যে গুপ্ত বিষয় গোপন রাখাই ভাল। এক জনের জন্যই তাঁহাকে পাগল হইতে হইয়াছিল।

# উষা।

লেখিকা—মৃণ্ময়ী দেবী।

( উষা দর্শনে কলিকার প্রতি প্রস্ফুটিত প্রসূন। )

পূরব আকাশ গায়,
শুকতারা ডুবে যায়,
অচেতনে ঘুমায় ধরণী;
আসিছে সাধের উষা,
পরিয়া কুসুম ভুষা,
কেহ নাহি জানে সে কাহিনী
সহসা পুলকে জেগে,
বাতাস বহিয়া বেগে,
জানাইল উষা আগমন;
উষার বাতাস লাগি,
নীড় মাঝে গুপ্তপাখি,
ধীরে ধীরে মেলিল নয়ন
ঘুমেতে জড়িত আঁখি,
তুলিয়া দেখিল পাখি,
উষা হাসে,—আর নাই রাত
পাতার মাঝারে থাকি,
কোকিল কহিছে ডাকি,
"জাগ জাগ হইল প্রভাত।"
শুনি সে মধুর তান,
মোহিত ফুলের প্রাণ,
ঢ'লে পড়ে কলিকার গায়;

কহে, সখি! উঠ উঠ,
এ শুভ মুহূর্ত্তে ফুট,
ফুটিবার এই ত' সময়!
আর কেন ঘুমঘোরে,
অচেতনে শয্যা'পরে?
জাগ জাগ হওগো চেতন;
নহে এ মুহূর্ত্ত হায়,
বুঝিবা চলিয়া যায়,
এইবেলা করদৃঢ় মন!
দিনকর চড়ি' রথে,
এখনি উদয় পথে,
দিলে দেখা, উষা নাহি র'বে!
উষার বাতাসে,
আপনার দোষে,
কেহ তারে ধরিতে নারিবে।
উষারাণী নভো গায়,
সেই যদি নিভে যায়,
সেই যদি থেমে যায় হাসি,—
কি হবে তখন উঠে?
কি হবে তখন ফুটে?
কি হবে বা সৌন্দর্য্য বিকাশি?

# নিশিতে কেনবা শুকায়।

লেখক—সূর্য্যকুমার সেন।

নিশিতে নলিনী কেনবা শুকায়!
সুধাংশুরে হেরি পাশে,
কুমুদিনী যবে হাসে,
চাঁদ-মুখ-খানি তখনি লুকায়;
নিশিতে নলিনী কেনবা শুকায়?
দিবসে আবার কেন,
হাসিমাখা মুখে যেন,
রবিরে মনের বাসনা জানায়,
কেনবা ভুলিয়া থাকে আপনায়?
প্রকৃতি-প্রকৃতি এই,
যারে ভালবাসে যেই,
প্রাণ কেবল তার(ই) পানে ধায়,
তারে না হেরিলে, প্রাণে ব্যথা পায়।
দিবাকরে ভালবাসে,
তাই তারে দেখে হাসে,
বিরহে ভাসায় বিষাদ-রাকায়,
নিশিতে নলিনী তাই সে শুকায়!
যামিনীতে যদি রবি,
আঁকিত সোনার ছবি,

নিশিতে নলিনী হ'তো বিকসিত,
নলিনী হাসিলে জগত হাসিত।
প্রকৃতি ত' তাহা নয়,
প্রকৃততঃ তাহা হয়,
আঁধারে উদয় হয় দিবাকর,
অমনি নলিনী অধীর অধর!
শুন ওহে দিবাকর,
উদিয়া গগনো'পর,
নিশিতে বারেক হাসাও নলিনী,
তোমারি বিরহে নলিনী মলিনী!
রাখ তারে হৃদি'পরে,
দেখ হৃদি-সরোবরে,
নলিনী আমার হাসে কি সুন্দর,
তুমিও দেখ হে হাসি মনোহর।
নলিনী, তোমার তরে
যাচিনু লো দিবাকরে,
আর না কাঁদিবে বিরহে তাহার,
নিশিতে নলিনী হাসিবে আবার,
ভুলো-না আমারে নলিনী আমার

# জিজ্ঞাসা।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

দুর্ল্লভ সে চিরসুখ যদি মর্ত্ত্যবাসে,
তবে কেন হে মানব বিষাদে কাতর?
অদৃষ্ট আকাশে যদি শশী নাহি হাসে

ভাগ্য-বৃক্ষে যদি ফলে ক্রূর কর্ম্মফল,
তৃপ্ত হোক্ এ রসনা তোরি আস্বাদনে ;
কেন অন্ধজীব হ'য়ে ভ্রমি ধরাতল,
রহস্যে বিমুগ্ধ হ'য়ে দুঃখ-বিড়ম্বনে।
কেন এ জীবন? পুনঃ কালান্তে মরণ!
কোথা ছিনু? কোথা যাব? কেন এ ধরায়?
কেন এ মর্ম্মের মাঝে প্রেমের স্বপণ,
কেন আশা? ভালবাসা? যদি গো ফুরায়!
কিবা নিত্য? কি অনিত্য? যদি না বুঝিনু,
লয়ে এ মানব-জন্ম বৃথা যে আইনু।

—:*:—

# পঞ্চ পল্লব।

## লেখিকা—শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

( সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ। )

### ১ম পল্লব।—

যদ্যপি লোভ সম্বরণ করিবার শক্তি না থাকে, অর্থাৎ লোভ রিপুকে সম্যক-রূপে দমন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, গুণ থাকিলেও সে গুণে কোনই সু-ফল দর্শেনা। যদি পিশুনতা থাকে, তাহা হইলে আর অপর পাতক সমূহ না থাকিলেও কোন লাভ নাই। যদি সত্য অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে আর তপস্যার প্রয়োজন নাই। যদি মনঃ শুচি থাকে, তাহা হইলে আর তীর্থ যাত্রায় কি ফল হইয়া থাকে? যদি সদ্বিদ্যা থাকে, তাহা হইলে আর সম্পত্তি লাভের লালসা কেন? উত্তম বিদ্যাই ত শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। জীবনে যদি অপযশ হয়, তবে মৃত্যুর দ্বারা তাহা হইতে আর কি অধিক ক্ষতি হইতে পারে? যদি সৌজন্য থাকে, তাহা হইলে আর নীতির প্রয়োজন কি? যদি মহিমা থাকে, তবে আর সুবর্ণালঙ্কারে কিছু মাত্রও প্রয়োজন নাই।

### ২য় পল্লব।—

ক্ষমা আশ্রয় করিলে আর কবচে কিছুমাত্রও প্রয়োজন নাই। ক্রোধ থাকিলে আর অনুকূল থাকায় ফল নাই। যদি আত্মীয় বা জ্ঞাতিগণ শত্রু হয়, তবে আর

অনলে প্রয়োজন কি ? যদি পরম সুহৃদ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে আর দিব্য ঔষধে প্রয়োজন নাই। দুর্জ্জন ব্যক্তি অপেক্ষা, বিষধর নাগ হইতে অধিক ক্ষতি কি হইতে পারে ? যদি উত্তম বিদ্যা লাভ করা যায়, তাহা হইলে আর বিষয় লাভের কামনা করা যুক্তি সঙ্গত নহে। যদি লজ্জা থাকে, তবে আর দিব্য অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই। যদি সুকবিত্ব থাকে তাহা হইলে আর রাজ্যেও প্রয়োজন থাকেনা।

৩য় পল্লব।—

এই সংসারে, যদি আপনার বনিতা প্রিয়তমা, মধুর ভাষিনী, সত্যবাদিনী এবং ধৈর্য্যশালিনী হয়েন, তাহা হইলে অপর কি এমন ঐশ্বর্য্য আছে যাহা পাইবার প্রয়োজন হয় ? যদি সৌজন্য থাকে, তবে আর দিব্য বসন ভূষণে কাজ কি ? যদি মধুর ও হিতজনক সত্যবচন থাকে, তবে আর সুধা-রসের প্রয়োজন হয় না। যদি অপযশ থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর দ্বারা অধিক আর কি অনিষ্ট সংসাধিত হইতে পারে ? স্বীয় অপযশ ই মৃত্যু তুল্য। যদি যাচ্ঞা থাকে, তবে আর অন্য ধিক্কারে আবশ্যক নাই। যদি নিজ গৃহ পুণ্যাস্পদ হয়, তাহা হইলে আব কল্পদ্রুমের আবশ্যক নাই।

৪র্থ পল্লব।—

যদি দীন হীনের প্রতি দয়া বা স্নেহ না করা যায়, তাহা হইলে বিপুল ঐশ্বর্য্য থাকিলেই বা তাহাতে ফল কি ? যদি পরের উপকারে যত্ন বা চেষ্টা না থাকে; তবে ধন রক্ষার ফল কি ? যদি পুত্র-বদন দেখিতে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে বিবাহেরই-বা আবশ্যক কি ? যদি নিজ বল্লভার সহিত সতত বিবাদ বা বিরোধ ঘটে; তবে আর যৌবনে কি সুখ আছে ? অসৎ ও মূর্খ বাঁচিয়া থাকিলে, তাহার পিতার কি সুখ আছে ? পরের উপকার করিতে না পারিলে, সমাজে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।

৫ম পল্লব।—

হস্তী—মদ দ্বারা, জলাশয়—নলিনী দ্বারা, রজনী—পূর্ণচন্দ্র দ্বারা, দিবা—প্রভাকর দ্বারা, বনিতা—লজ্জাদি সৎস্বভাব দ্বারা, তুরঙ্গ—বেগ দ্বারা, গৃহ—নিত্য উৎসব দ্বারা, বাক্য—ব্যাকরণ দ্বারা, নদী—হংস মিথুন দ্বারা, সভা—পণ্ডিত মণ্ডলী দ্বারা, কুল—সৎপুত্র দ্বারা, গৃহিনী—সহিষ্ণুতা দ্বারা, মন্ত্রী—বিদ্যা ও বুদ্ধি দ্বারা, বসুমতী—ন্যায় পরায়ণ রাজা দ্বারা, এবং ত্রিলোক—বিষ্ণু দ্বারা শোভা পাইয়া থাকে।

পঞ্চ পল্লব সমাপ্ত।

# সমালোচনা।

**শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।**—কৃষ্ণদাসকবিরাজ বিরচিত গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয়, বোধিনী টীকা, ও তাৎপর্য্য, ব্যাখ্যা এবং পয়ারের ভাবার্থ সম্বলিত। শ্রীনিত্যানন্দ বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে, আমরা ইহার তিন খণ্ড (আদি-লীলা) প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। ধর্ম্ম পিপাসু পাঠকবৃন্দ এই অমৃত পানে পরমতৃপ্তি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

**সোনার স্বপন।**—মহাভারত নাট্যকার প্রণেতা স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত (দ্বিতীয় সংস্করণ) ক্লাসিক থিয়েটারে ইহা অভিনয় হইয়াছিল। এখানি গীতিনাট্য। গীতগুলি অতি সুন্দর। অভিনয়াংশটি, রূপকের প্রণালিতে রচিত, অভিনয় দর্শকেরা অভিনয় দেখিয়া আমোদিত হইয়াছেন। আমরাও পাঠ করিয়া সুখী হইলাম।

**তোমারই।**—(প্রেমময়ী নাটিকা) এখানিও উক্ত নাট্যকারের বিরচিত, তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানিও ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত। আহা! প্রফুল্লচন্দ্র অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সু-নাম তিনি স্বকর্ণে শুনিতে পাইলেন না।

---

# লোকান্তর।

আমরা গভীর শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ৫ই জুলাই শুক্রবার ২০শে আষাঢ় তারিখে প্রভাতে জাপান হইতে ভারত প্রত্যাবর্ত্তন-কালে হংকং ও সিঙ্গাপুরের মধ্যপথে প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে জন্মভূমির সুসন্তান "হিতবাদীর" নির্ভিক তেজস্বী ও স্বনামধন্য সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় পরিজনবর্গকে অনাথ করিয়া, সহধর্ম্মিনী ভ্রাতা সুহৃদ, পুত্র কন্যা ও বান্ধব মণ্ডলীকে শোকের সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বদেশহিতব্রতে পরউপকারিতায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবায় তাঁহার প্রভাব আদর্শস্থানীয়।

আমরা জন্মভূমির আগামী সংখ্যায় আমাদের পরম পূজ্যপাদ কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সচিত্র জীবনী প্রকাশ করিব।




"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১৫শ বর্ষ। | ১৩১৪ সাল, আষাঢ়। | ১২শ সংখ্যা।

# ৺তারকেশ্বরাবিষ্কারক মহারাজ ভারামল্ল।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ।

(পুরাতত্ত্ব।)

কিয়দ্দিনপূর্ব্বে আমি "এডুকেশন গেজেটে" বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধতীর্থ ৺তারকেশ্বর সম্বন্ধে যথাকথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহার ফলে অনেক পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, আশা করি এ সকল বিষয় লইয়া যত আলোচনা আলোড়না হয়;—যত বাদ প্রতিবাদ চলে, যত তর্ক বিতর্ক উত্থাপিত হয়,—যত গবেষণা চলিতে থাকে, ততই ভাল। তজ্জন্য সাময়িক পত্রের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া কোন সম্পাদক মহাশয়েরই কর্ত্তব্য নহে।

বিলাতে এবম্বিধ পুরাতত্ত্বাবিষ্কারের জন্য, এতাদৃশ গবেষণার নিমিত্ত প্রভুত পরিমাণ অর্থব্যয় করা হয়, জ্ঞানে মানে বলে বুদ্ধিতে আলোচনাকারীদিগের যথাসাধ্য আনুকূল্য করা হইয়া থাকে, হয়ত আবার কোন কোন জনপদে এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, এতাদৃশ লোক হিতকর ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোচনা লইয়া থাকিলে, কিছু কিছু পুরস্কারও মিলে।

আমাদের দেশের এখন সে অবস্থা হয় নাই; সে অবস্থা হয় নাই পরন্তু সে মতি গতিও নাই; বলিতে পারেন কি, এদেশে গুণগ্রাহী, সদ্বস্তুর সমাদরকারী, উৎসাহদাতা সহানুভূতি প্রদর্শক জ্ঞানী ধনী পৃষ্ঠপোষক কয়জন আছেন? বলিতে পারেন কি—একটা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনায় সহায়তা করিতে কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হয়? বলিতে পারেন কি—একটী অবশ্য প্রকাশ্য সামগ্রীর প্রচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কয়জন উদার চেতার কায়িক বাহ্যিক আর্থিক মানসিক বা অপর সহায়তা লাভ করিতে পারা যায়!

অপরের দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া, আমিই এ বিষয়ে একজন বেশ ভুক্তভোগী লোক। আজীবন ব্যাপিয়া হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে বঙ্গ-সাহিত্যের অত্যাবশ্যকীয় অভিনব সামগ্রী "গ্রাম্যশব্দকোষ" সঙ্কলন করিয়াছি, কিন্তু তাহা ছাপাইবার সামর্থ্য দেশের লোকের হইল না, দেশের নামজাদা সভা সমিতিরও তদ্বিষয়ে তত "গা গোচ" বা চেষ্টার ভাব নাই। তাহার পর যে তারকেশ্বর সম্পর্ক লইয়া আমি দুই চার খানি সাময়িক পত্রে আলোচনা করিতেছি সেই তারকেশ্বর তথ্য লইয়াই ইতিপূর্ব্বে একখানি দৃশ্য-কাব্য বা নাটক লিখিয়াছি। উদ্দেশ্য যে কলিকাতার থিয়েটার সমূহে অভিনীত হউক। কিন্তু ও হরি! নাটকের পাণ্ডু-লিপি লইয়া কলিকাতা গিয়া একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বলুন দেখি মহাশয় এ সম্বন্ধে কি করা যায়" তখন সুহৃদ্বরকে কাজেই উত্তর দিতে হইল, বলিলেন—"মহাশয় ও সব আশা আর না করাই ভাল। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকারগণের নাটক ভিন্ন আর কাহারও নাটকাদি থিয়েটারে লওয়া হইবে না, ইহাই হইয়াছে থিয়েটারী কর্ত্তাদের স্থির নিশ্চয়, ভাল হইলেও আপনার আমার বই নগণ্য।"—ইহা বলিয়া বন্ধুবর কত আক্ষেপ করিলেন আর দুই একজন কলানিপুণ সদাভিনেতার নামোল্লেখ করিয়া বলিলেন, তাঁহারা বলেন, এই দোষেই প্রকৃত সদ্বস্তু অনাদরে পড়িয়া থাকিয়া যাইতেছে এবং উপযুক্ত নাটক লেখক আর ফুটিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না।

আমি ত শুনিয়া অবাক্, তখন বন্ধুটিকে বলিলাম, "মহাশয় এসংবাদটী যদি পূর্ব্বে

দিতে পারিতেন, তাহা হইলে নাটকখানিকে এত পরিশ্রমে থিয়েটারী ধরণে না গড়িয়া যাত্রাদলে অভিনীত করাইবার যোগ্য করিয়া প্রস্তুত করিতাম, আর যে কোন যাত্রাদলে দিয়া অভিনীত করাইতাম।”

পাঠক দেখিলেন দেশের কেমন ভাব, সমাজের কেমন উৎসাহদান, মহারথী-দিগের কেমন রীতি-পদ্ধতি। ইহাতে কি আর সাহিত্য জগতের সমুন্নতি হয়! বঙ্গবাসী বঙ্কিমকে বেশ চিনিয়া রাখিয়াছে; তাঁহার উপন্যাসের কথায় অম্লদর্শনে রসনার অবস্থার ন্যায় তাঁহাদিগের মানসিক অবস্থাও কতকটা তেমনই হয় নাকি? কিন্তু ভাবিয়া দেখ-দেখি বঙ্কিমের অনেকগ্রন্থের সমকক্ষ কত গ্রন্থমালা সাহিত্য-ক্ষেত্রের আশা-সঞ্জীবনী মেলায় দিন দিন দেখা দিতেছেন, কিন্তু তাহার ত তেমন আদর হয় না। কেন হয় না? নাম নাই বলিয়া, আর প্রসার নাই বলিয়া; দেশের ত এই গতি; এই ব্যাপার; এখন ইহার মধ্যে থাকিয়াই কাজ করিয়া যাইতে হইবে নচেৎ উপায় নাই। আমরা তাহাই করিতেছি, আর মধ্যে মধ্যে গীতার সেই মহাবাক্যটি স্মরণ করিতেছি—“কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।”—

প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ক্রটীমার্জ্জনীয়। এক্ষণে প্রকৃত কথার আলোচনা করা যাউক। যে তারকেশ্বরের ইতিবৃত্ত প্রকাশের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টায় লাগিয়াছি। নানাপ্রকারে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতেছি, সেই তারকেশ্বরের তথ্যের অবিষ্কারক বা সংস্থাপক মহারাজ রাওভারামল্ল সম্বন্ধে আজ দুই চার কথার আলোচনা করিব। তৎপরে তারকেশ্বর তীর্থাবিষ্কারের কাল নির্ণয় করা যাইবে।

## রাও ভারামল্ল সিংহ।

মহারাজ ভারামল্ল মহাপ্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার পিতৃ পিতা-মহাদির নাম এপর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই, তবে অগ্রজের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহার নাম ছিল বিষ্ণুদাস। তারকেশ্বরের অদূরবর্ত্তী রামনগর গ্রামে ইঁহাদের বাসভবন ছিল। সে বাসভবনের এখনও ভগ্নাবশেষ আছে। রামনগর অধুনাতন তারকেশ্বর হইতে মাত্র এক ক্রোশ ব্যবধানে দক্ষিণে অবস্থিত। এই রামনগরের যে স্থানে ভারামল্লের রম্য হর্ম্ম্য বিদ্যমান ছিল তাহার চৌহদ্দি এইরূপ—

পূর্ব্ব—রামক্ষেত্রার মাঠ; এই স্থান এক্ষণে চাস ভূমিতে পরিণত।
উত্তর—গঙ্গাসাগর পুস্করিণী ও দুলেপাড়া।
পশ্চিম—ব্রাহ্মণ পাড়া।

বর্ত্তমান সময়ের চতুঃসীমা এইরূপ। পূর্ব্বের চৌহদ্দি অবশ্য অন্যরকম ছিল। যে ভু-খণ্ডে রাজার প্রসাদ দেদীপ্যমান ছিল, তাহা এক্ষণে বন জঙ্গলে পরিণত, তবে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভু-ভাগ অপেক্ষা কিছু উন্নত। স্থানে স্থানে বন্দর খুঁড়িলে এখনও স্থানে স্থানে ইষ্টকাদি দেখিতে পাওয়া যায়, রাজার অন্তপুরের সদর মহলের ব্যবহার জন্য খনিত পুস্করিণী এখনও বর্ত্তমান তবে মজিয়া গিয়াছে।

গড়।—রাজা নিজবাটীকে সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন সে গড়ের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। এই গড় বড় দিঘীর পশ্চিম পাড় হইতে বাহির হইয়া উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ গিয়া পরে বাঁকিয়া পীতাম্বরা পুস্করিণীর উত্তর পাড়ে সংলগ্ন হইয়াছে। পুনরায় দক্ষিণদিক হইতে বাহির হইয়া "জলহরি" নামক পুস্করিণী বেষ্ঠন করিয়া বড় দিঘীর পশ্চিম পাড়ে লাগিয়াছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকের গড়ে এখনও সময় সময় জল থাকে, উহারও পশ্চিমদিকের গড় জঙ্গল ও চাস ভুমিতে পরিণত।

পুস্করিণী। ভারামল্ল জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণ কল্পে অনেক-গুলি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন,—তবে তাঁহার সময়ের প্রতিষ্ঠিত পুস্করিণী গুলি প্রায় যুগ্ম যুগ্ম। ইহার দ্বারা রাজার দুই রাণী ছিল, অনুমান করা যায়, বড় দিঘী ছোট দিঘী,যোড়া পুকুর ইত্যাদি সে স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে। পুরীর মধ্যে দুইটা সরবর 'জলহরি' ও 'পীতাম্বর' নামে প্রসিদ্ধ। জলহরি অন্দরের এবং পীতাম্বর সদর বাটীর পুস্করিণী ছিল বলিয়া প্রবাদ। পীতাম্বর স্থানটীর উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এখন ইহাতে শবদাহ হইতেছে। কালের গতি এই, ইহা ছাড়া গঙ্গাসাগর যোড়া পুকুর প্রভৃতি রামনগরের আরও অনেক সরোবর মহারাজ ভারামল্লের খনিত বলিয়া প্রবাদ।

শিব স্থাপন। অনেকেই জানেন রামনগরেশ্বর ভারামল্ল তারকেশ্বর শিলাতথ্য, অনভিজ্ঞ রাখালগণের মুখে জ্ঞাত হইয়া প্রথমে সেই শিলাখণ্ডকে নিজ পুরীর মধ্যে লইয়া গিয়া স্থাপন করিতে বিশেষ সচেষ্ট হন। কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বিফল মনোরথ হইয়া ভারামল্ল দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার জন্য আপন আবাসে একটি শিবস্থাপনা করেন। বর্ত্তমান সময়ে বড় দিঘীর উত্তর পাড়ে অনাবৃত স্থানে বট বৃক্ষের তলায় কিয়দংশ প্রোথিত যে লম্বা স্মৃতি শিবশিলা দেখিতে পাওয়া যায়,তাহাই মহারাজ ভারামল্লের স্থাপিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অনেকে বলেন তাহা নহে, তাঁহা হইলে উক্ত শিবের পূজার ব্যবস্থাদি থাকিত, দেবোত্তর সম্পত্তি থাকিত, এই বলিয়া তাঁহারা উক্ত শিব বেচারাকে বাণের জলে ভাসিয়া আসা

শিব, নচেৎ উক্ত শিবের নিকট হইতে শিব সন্ন্যাসীর গাজন বাহির হইয়া তারকেশ্বরে গিয়া মোহান্তের সহিত মিলিয়া ঝাঁপ আদি করিত না। শিববেচারার দেবোত্তর সম্পত্তি অবশ্যই ছিল।

**গোধন।** রাজ্য সম্পত্তি অপেক্ষা রাজার গোধন বড় অল্প ছিল না। তখনকার কালে টাকাকড়ি অপেক্ষা গবাশ্বাদি শস্য সম্পত্তি লক্ষ্মীমত্তার পরিচয় দিত। রাজার শ্বেত পীত কৃষ্ণ লোহিৎ প্রভৃতি অনেক বর্ণের ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ গো গোশালার শোভা বর্দ্ধন করিত। আজকালকার দিনে তেমন গোধন বহুল রাজা বর্ত্তমান থাকিলে বোধ হয়, লাভের আশায় ছানার ব্যবসা জুড়িয়া দিয়া রেলকোম্পানীর মাসিক টিকিট কিনিয়া বসিতেন। শ্যামলী ও ধবলী নাম্নী গাভীদ্বয় রাজসংসারে অধিক দুগ্ধ সরবরাহ করিত। সাহাপুর নিবাসী স্বর্গীয় মুকুন্দ ঘোষ মহারাজ ভারামল্লের গোয়ালরক্ষক ছিলেন তাঁহার অধীনে অনেক রাখাল অনেক গোপালক কার্য্য করিত। যে কপিলা গাভী কাননে গিয়া গোপনে তারকনাথ শিলায় দুগ্ধ প্রদান করিত; মুকুন্দ ঘোষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্ধান হয়। কপিলার সন্তানাদি ছিল না বলিয়া শুনা যায়। রাজা শেষ অবস্থায় বিশেষ মনোকষ্টে ছিলেন, বর্দ্ধমান রাজ ষ্টেটে তাঁহার সমুদায় বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল।

**তারকেশ্বরের সম্পত্তি।** মহারাজ ভারামল্ল তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কার করিয়া শিবশম্ভু তারকনাথ বাবার সেবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ন্যূনাধিক ১০২৭ বিঘা জমী ও আকর খাওলাত দান করিয়া যান পরিণামে উহা বর্দ্ধমান রাজ সরকারের আয়ত্তাধীন আসিলেও দেবোত্তর সম্পত্তি বলিয়া উহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। আজ পর্য্যন্ত সে সম্পত্তি আছেই তাহা ছাড়া তারকেশ্বরের আয় হইতে আরও অনেক ভূসম্পত্তিও বাড়ান হইয়াছে সন্দেহ নাই।

**রাম ক্ষত্রিয়।** রামক্ষত্রিয় ভারামল্লের প্রধান বাহুবল ছিল। বাস্তবিক পক্ষে এতাদৃশ বীরপদ বাঁচা পরাক্রান্ত পুরুষ প্রায় জন্ম গ্রহণ করে না। বর্দ্ধমান-রাজ ইহাঁর বীরত্বে তুষ্ট হইয়া যে সকল ভূ-ভাগ ইহাকে জায়গীর দান করেন তাহাই আজ রামনগরে রামক্ষেত্রীর মাঠ নামে প্রসিদ্ধ। অপরে বলেন তাহা নহে উক্ত জায়-গীর ভারামল্লেরই প্রদত্ত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ আবার তাহাও স্বীকার করে না তাহাদের মতে ঐ মাঠে রাম ক্ষত্রিয় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া মরিয়া গিয়াছিল বলিয়া উহার ঐরূপ নাম হইয়াছে।

**ভারামল্ল ও তদ্বংশ।** যেরূপ কিম্বদন্তী আছে তাহার উপর কথা নাই

কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারামল্ল রণনিহত হন নাই, কালক্রমে তিনি কালাক্রান্ত হন ও তাঁহার বংশবিলুপ্ত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি লোক রাম-নগরে ভারামল্লের বাটীর পতিত জমী খণ্ড দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল ভারামল্ল তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ। ওদিকে দ্বারহাটীর নিকটবর্ত্তী গড় নিবাসী সিংহ রায়গণও ভারামল্লের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

**তারকনাথ মন্দির।** মহারাজ ভারামল্ল তারকনাথদেবের বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত। নিম্নলিখিত ছড়াংশ তারকেশ্বর ধামে বহুকাল প্রচলিত গীতাংশ হইতেই উপলব্ধি করা যায়—

"শুনিয়া নৃপতি হইল আনন্দে অস্থির।
জঙ্গল কাটিয়া দিল অপূর্ব্ব মন্দির॥" ( ছড়াংশ )

ত্রাহি মাং তারকেশ্বর
আমি শরণাগত কিঙ্কর
রত্নাকল্পোজ্বল অঙ্গ মৃগবরা ভীতিকর।

* * * *

( তুমি ) ভারামল্ল প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে সদা বিহার। ( গীতাংশ )।

ভারামল্লের নির্ম্মিত মন্দির এখন লোক-লোচনে বহির্ভূত। তাহার উপর অন্য মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্দির সেই নব নির্ম্মিত মন্দির।

**মহন্তের উপাধি।** গিরি, পুরী, ভারতী, শাস্ত্রানুসারে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর এই কয় প্রকার উপাধি হইয়া থাকে। মহারাজ ভারামল্ল তারকেশ্বর বাবার প্রথমমোহান্ত মুকুন্দঘোষকে গিরি আখ্যা প্রদান করেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত মহান্তগণ গিরি আখ্যায় ভূষিত হইয়া আসিতেছেন।

**ভারামল্লের রাজত্বকাল।** তারকনাথের অধিকার নির্ণীত হইলেই ভারামল্লের রাজত্বকাল স্থির হইবে, রামনগর হইতে যে কালনির্ণয় মত পাইয়াছি তাহাতে তারকেশ্বরাবিষ্কার কাল ১০৭৮ সাল। অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে (১৩১২ —১০৭৮ ) ২৩৪ বৎসর পূর্ব্বে তারকেশ্বর আবির্ভূত হইয়াছেন। তাহার পর ১০৭৮ সাল তারকেশ্বরাবিস্কার কাল হইলে মাণিকগাঙ্গুলীর ধর্ম্ম মঙ্গলের লেখার সহিত অমিল হইয়া পড়ে মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম মঙ্গলে তারকেশ্বরের নামোল্লেখ আছে। উক্ত ধর্ম্ম মঙ্গল ১৪৭০ শকাব্দায় রচিত। সুতরাং এখন হইতে ( ১৮২৯

১শত বৎসর পূর্ব্বেও তারকনাথ আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। সন্দেহ নাই। এসকল কথা তারকনাথ আবিষ্কারের কালনির্ণয় প্রবন্ধে বিশদরূপে আলোচিত হইবে। যাহা হউক এই সকল কারণে আমরা ১০৭৮সাল তারকনাথ আবিষ্কার কাল না স্বীকার করিয়া ৮৪১ সাল তারকেশ্বর প্রকাশের সময় স্থির করিলাম। মহারাজ ভারামল্ল এই সময়ের লোক।

—•:*:•—

# জাপানের অভ্যুদয়।

## লেখক—প্রমথনাথ মিত্র।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

### রাজনৈতিক উন্নতি গবর্ণমেণ্টের গঠন প্রণালী ইত্যাদি—

সমগ্র জাপান সাম্রাজ্য ৫০টী বিভাগে বিভক্ত। কতকগুলি গ্রাম ও নগর লইয়া প্রত্যেক বিভাগ গঠিত হইয়াছে। প্রতি বিভাগে একজন করিয়া "চো" অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা অবস্থিতি করেন। সম্রাটই দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা; তিনি জাপান বাসীগণের নিকটে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এই রাজবংশ গত ২৫০০ বৎসর হইতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, মিকাডো মন্ত্রী সভার সাহার্য্যে রাজ্যের প্রকৃত শাসন সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। কার্য্যের শৃঙ্খলা সাধন নিমিত্ত মন্ত্রীসভা, রাজস্ব, শিক্ষা, সামরিক, ঔপনিবেশিক প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে এক একজন করিয়া মন্ত্রী আছেন। ব্যবস্থাদি প্রণয়ন ও সংস্করণ জন্য জেনরোইম্ নামে একটী সভা আছে; এই সভা মন্ত্রী সভার অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে পারেন না। ১৮৯০অব্দে ইংলণ্ডের অনুকরণে জাপানে পার্লামেণ্ট অর্থাৎ প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রতিনিধিবর্গ নিয়মানুসারে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। জাপানী পার্লামেণ্টে তর্কবিতর্কের পর যে সমস্ত বিষয় স্থির হয়, তাহা মন্ত্রী সভা কর্ত্তৃক সমর্থিত ও মেকাডো কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে দেশ মধ্যে প্রচারিত হয়। ইহা ভিন্ন জাপানে সাইভিন নামে আর একটী সভা আছে। ইহার সভ্যেরা বিচার সম্বন্ধীয়

অভিযোগ সকল মীমাংসা করিয়া থাকেন। জাপানে পার্লামেণ্ট সভার মেম্বর সংখ্যা ৩৭৬ জন; ইহারা প্রত্যেক বৎসরে প্রায় দশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন।

জাপানের মোট আয় তেত্রিশ কোটি টাকা। ভূমির রাজস্ব হইতে প্রায় ১৬ কোটী টাকা সংগৃহীত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট টাকা আয়কর, বাণিজ্যশুল্ক, আবগারী, রেলওয়ে, পোষ্টাফিস্ ও মিণ্ট প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হয়। প্রতি জাপানীকে গড়ে ৫।০ টাকা করিয়া কর প্রদান করিতে হয়। যুদ্ধের জন্য, বর্ত্তমান বর্ষে করের পরিমাণ আরও ৩৫ পেন্স করিয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতি বর্ষে ১০ কোটী টাকা সংগৃহীত হইয়া যুদ্ধ ঋণ পরিশোধ হইবে।

জাপান গভর্ণমেণ্ট সৈন্য পালনার্থ প্রতিবর্ষে প্রায় ছয় কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রায় এক কোটী টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। ব্যণিজ্য ও কৃষির উন্নতির জন্য প্রায় ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। জাপান গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ব্যক্তি প্রতি ।/৫ পয়সা করিয়া ব্যয় করেন।

জাপানে প্রত্যেক ব্যক্তির গড় আয় বৎসরে ৮০৲ টাকা হইবে, তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে ৮৲ টাকার অধিক কর প্রদান করিতে হয় না।

বিগত ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের দণ্ডবিধি বড়ই অদ্ভুত ভাবাপন্ন ছিল। বিচারাধীন ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই উকীল, মোক্তার এমন কি-বন্ধুবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিত না। ৭ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক ও ৯০ বৎসরের অধিক বয়স্ক বৃদ্ধ কৃত কেবল অপরাধ, আইনের আমলে আসিত না। জ্ঞানকৃত বধ, শিশুহত্যা, ও অস্ত্রাদিসহ দস্যুতায় প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা ছিল। অহিফেণের ব্যবসায় করিলে প্রাণদণ্ড এবং কারাদণ্ড হইত। পিতা মাতার মৃত্যুতে শোক চিহ্ন ধারণ বা একাদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ না করিলে পুত্রদিগকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত। এক্ষণে ইয়ুরোপীয় দণ্ডবিধি সমূহের আদেশে বিস্তর পরিবর্ত্তন বা পরিশোধন হইলেও প্রাচীন বিধি ব্যবস্থা সমূহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই।

১৮৮৩ অব্দে জাপানের সৈন্যসংখ্যা সর্ব্ব প্রকারে এক লক্ষের ন্যূন ছিল। গত চীন জাপান যুদ্ধের পর হইতে সৈন্য সংখ্যা অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সংখ্যা ২০,০০০, পদাতিক ৫ লক্ষ এবং অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্যের সংখ্যা এক লক্ষের অধিক হইবে। ইঞ্জিনিয়ারিং টেলিগ্রাফ বেলুন ও রসদ গুপ্তচর প্রভৃতি বিভাগের লোক সংখ্যা এক লক্ষের অধিক হইবে। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ ২৫০০ কামান আছে। জাপানের পদাতিক সৈন্য জর্ম্মণ আদেশে গঠিত। এই বিভাগে কোন বিদেশীয় জাতির প্রবেশাধিকার নাই।

জাতীয় বিপত্তি উপস্থিত হইলে, জাপানের সৈন্য সংখ্যা আরও বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। রাজাজ্ঞানুসারে জাপানবাসী সমর্থ পুরুষ মাত্রেই অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য। সমগ্র জাপান সাম্রাজ্যে এক্ষণে উক্তরূপ যুবকের সংখ্যা ৮০ লক্ষের অধিক হইবে। তন্মধ্যে ২০ লক্ষ যুবক নৈতিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তেই নিযুক্ত হইতে পারেন।

জাপান বাসীরা গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জলযুদ্ধ বিষয়েও অসামান্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহারা বুঝিয়াছে, দ্বীপবাসীর পক্ষে প্রবল নৌবল ভিন্ন আত্ম রক্ষার সুবিধা হইতে পারে না। অন্যান্য নৌ সেনাপতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"জাপানীরা স্বীয় প্রতিভা বলে, কোন২ বিষয়ে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা নৌ যুদ্ধের অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়াছে। জাপানে এক্ষণে অন্যূন ৭খানি যুদ্ধ জাহাজ ( Battle Ship ) ৮ খান লৌহ মণ্ডিত প্রথম শ্রেণীর রণতরী ( Cruisore ) এবং ১৫ থান ২য় শ্রেণীর রক্ষিত রণতরী, এতদ্ব্যতীত কামান বাহক তরী ও উপকূল রক্ষক পোতের সংখ্যা ২৩খানি হইবে। জাপানে টর্পেডোতরি ৮৫ খানি ও টর্পেডো নাশক তরণীর সংখ্যা ১৯খানি মাত্র এতদ্ভিন্ন ১৩০০ খানি বাণিজ্য পোত আছে, তাহাও যুদ্ধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

জাপান গভর্ণমেণ্টকে প্রচুর সৈন্য পরিপোষণ করিতে হইলেও বৎসরে ছয় কোটী টাকার অধিক ব্যয় করিতে হয় না। জাপানে প্রতি পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্যের বার্ষিক বেতন যথাক্রমে ৪৫৲ ও ৬০৲ টাকা মাত্র। কর্ণেল কাপ্তেন প্রভৃতি সেনা নায়কেরা বৎসরে ১৫০ হইতে ২০০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন প্রধান সেনাপতিগণ বার্ষিক ৫০০ হইতে ৭৫০৲ টাকা পাইয়া থাকেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদিগকে প্রত্যহ তিনবার করিয়া খাদ্য প্রদান করা হইয়া থাকে। প্রত্যুষে চা, বিস্কুট, মাছভাজা ও মধ্যাহ্নে ভাত, শুষ্কমৎস্য ও মাংস এবং সায়াহ্নে চা, বার্লি, ও পাঁওরুটী, ও পায়স ব্যবস্থা চিকিৎসকের আদেশানুসারে

অতি প্রাচীনকাল হইতে জাপানীয়া যুদ্ধ নিপুণ জাতি বলিয়া বিখ্যাত। খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দে দিগ্বিজয়ী মোগল জাতিরা পঙ্গপালের ন্যায় জাপান রাজ্য আচ্ছন্ন করে। প্রায় ৪০ বৎসর কালব্যাপী ভীষণ যুদ্ধে তিন লক্ষ মোগল সৈন্যের মধ্যে কয়েকজন মাত্র পরাজয় বার্ত্তা লইয়া স্বদেশে উপস্থিত হয়। এই মহা সমরে জাপানবাসীরা যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় কম্পিত ও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

প্রায় এক বৎসর ধরিয়া এসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে রুষ ও জাপানে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মহাযুদ্ধের ফলাফল ভবিষ্যতের সুদূর ক্রোড়ে শায়িত ছিল কি না, তাহাও অধুনা ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত।

কি স্থলে কি জলে এপর্য্যন্ত যতগুলি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীতে জয়লক্ষী জাপানের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছেন।

## রুষ জাপান যুদ্ধ।

চীনের বক্সার বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে, মার্কিণ জাপান ও অন্যান্য শক্তিগণ সকলে সমবেত হইয়া অঙ্গীকার করেন যে;—আমরা বিবিধ ক্ষতিপূরণের জন্য চীন গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একশত টাকা গ্রহণ করিব, কিন্তু চীন সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিব। সম্মিলিত সৈন্যগণ চীনের যে সমস্ত দুর্গ ও নগরাদি অধিকার করিয়াছে তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে সৈন্য সামন্ত উঠাইয়া লইব।

অন্যান্য শক্তিপুঞ্জ স্ব স্ব প্রতিজ্ঞানুসারে চীনরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু রুষ মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিলেন না। শক্তি নিচয়ের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও ভয় প্রদর্শন স্বত্বেও তিনি আজি নয় কালি, এ মাসে নয় পর মাসে ইত্যাদি বিবিধ রাজনৈতিক ছল আরম্ভ করিয়া কাল বিলম্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করা দূরে থাকুক, রুষ গভর্ণমেণ্ট কোরিয়ার উপর স্বীয় লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে আলু নদীর তীরবর্ত্তী অরণ্যের কাষ্ঠ ছেদনের অধিকার পত্র সংগৃহীত হইলে, কোরিয়ার উইজ বন্দর রুষ বন্দরে পরিণত হইল।

রুষের এই সঙ্কল্প দুরভিসন্ধি দর্শনে, জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বভাবত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন জাপান মনে করিলেন রুষত মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিবেই না; তাহার উপরে যদি কোরিয়া রাজ্য গ্রাস করিয়া বসে, তাহা হইলে কয়েক বৎসর পরে জাপানের গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে! আজ এতদিন ধরিয়া যে কোরিয়ার

উপর জাপানের অখণ্ড আধিপত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার উপরে জাপানবাসীর জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে, সেই কোরিয়া রাজ্য কখনও রুষিয়ার করাল কবলে পতিত হইতে দিব না! তাঁহারা স্থির করিলেন যদি দুরাকাঙ্ক্ষ রুষ, ন্যায়ও ধর্ম্ম যুক্তির মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক পররাজ্য গ্রাসে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমরা "নিপণের" গৌরব রক্ষার জন্য ঈশ্বরের মহামহিমান্বিত নাম স্মরণ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হইব।

রুষ কিছুতেই প্রবোধ মানিল না, কোরিয়া সম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় পূর্ব্ব মত বলবৎ রাখিলেন জাপান নিজ শেষ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তথাপিও রুষ গভর্ণমেণ্ট কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। এই ঘটনায় জাপানের মনে দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের উদয় হইল।

৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রুষিয়ার সহিত সমস্ত রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রুষের ক্রমাগত চাতুর্য্য স্বার্থ পরতা দুরাকাঙ্খা ও পররাজ্য গ্রাস স্পৃহার বিষময় ফলে সুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে লোক ভয়ঙ্কর মহা সমর প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

১৯০৪ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রুষ জাপানে প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তদবধি সমুদ্রবক্ষে যতগুলি ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে প্রত্যেকটীতেই জয় লক্ষ্মী জাপানের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন। রুষের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে তা স্মরণ করিতে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। (রুষের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ ত্রিংশতি কোটী টাকার ন্যূন হইবে না।)

রুষ জাপ সমরে এপর্য্যন্ত যতগুলি উল্লেখ যোগ্য যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে তাহার সকল গুলিতেই জয় লক্ষ্মী রুষিয়ার প্রতি কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কি আলু-তীরে, কি দুরারোহ ন্যান্ সান্ পর্ব্বতে, কি ওয়েক্যাঙ্গুক প্রান্তরে কি সুরক্ষিত কেইপিং নগরে কি ট্যাসিচিও ক্ষেত্রে সর্ব্বস্থানেই রুষ সৈন্য পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রতি যুদ্ধেই জীবনে উপেক্ষা অপূর্ব্ব বুদ্ধি মত্তা ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও নিষ্ঠুর অদৃষ্ট দেবীর চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হয় নাই।

যে মহাবীর কুরোপাট্‌কিন্ যুদ্ধারম্ভের ছয় মাস মধ্যেই তিন লক্ষ মাত্র সৈন্য লইয়া টোকিওর নন্দন কাননে প্রবেশ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু লেয়াং যুদ্ধে তাঁহাকে ভীষণ পরাজয় সহ্য করিতে হইয়াছিল; তথাপিও তাঁহাকে লজ্জা-রক্ত বদনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। গত ২৫শে জানু-য়ারী হিকণ্টাইয়ের যুদ্ধে রুষ সেনাপতি গ্রিপেন বর্গে বিপুল সেনা লইয়া অতর্কিত

ভাবে জাপান বাহিনীর বামভাগ আক্রমণ করেন। প্রথম চারি দিবসের যুদ্ধ দর্শনে অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল, এতদিনে বুঝি জয়লক্ষ্মী রুষের প্রতি অনুকূলা হইলেন। কিন্তু তাহা হইল না, রুষিয়ার অদৃষ্টে সে শুভ মূহুর্ত্ত আসিয়াও আসিল না। সেনাপতি ওয়ামার অপূর্ব্ব নেতৃত্ব কৌশলে চতুর্থ রজনীতে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ নুতনাকার ধারণ করিল, তাহার ফলে প্রভাতের পূর্ব্বেই রুষের পূর্ণ পরাজয় হইল।

আর্থার বন্দর অধিকার পৃথিবীর সমর ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। জাপানীরা ২৩৩ দিন অবরোধ করিয়া বহু সৈন্য উৎসর্গ করিয়া ১৯০৫ সালের ১ম দিনে অজেয় আর্থার দুর্গে মিকাডোর বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন। এই বন্দর অধিকার করিতে জাপানীরা যে অসাধারণ সহিষ্ণুতা, বিপুল অধ্যবসায় ও অদ্ভুত শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

দশম যুদ্ধে মুকদেন যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; এই মহাযুদ্ধে জাপানের সুসন্তান মার্শাল ওয়ামা যে অপূর্ব্ব কৃতত্ব ও আসাধারণ রণচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন পৃথিবীর সমরোতিহাসে তাহার তুলনা নাই। আজি জাপান সৈনিকেরা অনন্য সাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য দর্শন করিয়া, সকলেই স্তম্ভিত।

আর ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি মহাবীর কুরো পাটকিন্! যিনি একদা টোকিওর নন্দন কাননে দৈত্য পতির ন্যায় বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন আজি তিনি তেজ গর্ব্ব সমস্তই বিসর্জ্জন করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছেন। হায়! নিষ্ঠুর অদৃষ্ট!

বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পরিণাম ফল দেখিয়া সমগ্র সভ্য জগৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। জাপানের অচিন্তনীয় শক্তি, অপূর্ব্ব স্বদেশানুরাগ, অদ্ভুত সমর নৈপুণ্য, বিচিত্র মন্ত্র কুশলতা ও অতুলনীয় আত্মোৎসর্গ অবলোকন করিয়া এসিয়া উৎফুল্ল, একটী অতি ক্ষুদ্র জাতি কেবলমাত্র বিংশতি বৎসরের যত্নে ও অধ্যবসায়ে যে এরূপ অনন্য সাধারণ উন্নতি করিতে পারে তাহা কল্পনাতীত।

## শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উন্নতি।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের ভরণ পোষণ ও অর্থ সংগ্রহের জন্য যে সকল উপায় করিয়া দিয়াছেন, তন্মধ্যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রধান। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। বস্তুতঃ বাণিজ্যই লক্ষ্মীর আবাস স্থল। বাণিজ্য দ্বারা

যে ধন উপার্জ্জন হয় অন্য কোন উপায়ে বোধ হয় সেরূপ হয় না। জাপান যে পৃথিবীর মধ্যে এরূপ উন্নতজাতি বলিয়া পরিগণিত বাণিজ্যই তাহার অন্যতম কারণ।

জাপান হইতে যে সমস্ত দ্রব্য সম্ভার প্রতিবর্ষে প্রেরিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে দিয়াশালাই বিছানা চীনা বাসন, ছত্র তূলা পশম রেশম, চাউল, চা, তামাক, মোম্, কর্পূর, কাগজ, বার্ণিস্ তাম্র, টীন কয়লা সর্ব্বপ্রধান। চাউল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হইলেও সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত বিদেশে প্রেরিত হইতে পারে না। এইজন্য জাপানে দুর্ভিক্ষ নাই। তুলাজাত দ্রব্য ও পাথুরিয়া কয়লা চীনদেশে নীত হইয়া থাকে। দিয়াশালাই, রেশম, কর্পূর বিবিধ গন্ধ দ্রব্য, তাম্র, বাসনাদি ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে। গত ১৯০৩ অব্দে ৪৪৪০০০০০০ টাকার দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, ইহার পূর্ব্ববর্ষে রপ্তানির পরিমাণ ৪০কোটী টাকা ছিল।

গম, চিনি, গজদন্ত, স্বর্ণ, লৌহ, কাচও বিবিধ প্রকার তৈল বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চীনের গমও কোরিয়ার সুবর্ণ সমধিক প্রসিদ্ধ। গত পূর্ব্ববর্ষে আমদানীর মূল্য ৩১ কোটী টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। আমেরিকান ও ইউরোপীয় শক্তি পুঞ্জের সহিত বাণিজ্য সন্ধি স্থাপিত হওয়াতে জাপানের বাণিজ্যশ্রী দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। জাপানের ডক, টেলিগ্রাফ, রেল, কাপড়ের কল, সূতার কল মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত দেশের অর্থে দেশীয় লোকদ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এক্ষণে জাপানে বিবিধ শ্রেণীর ৭৮০০টী কল কারখানা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকলের মধ্যে ৩০০টী বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে ও বাষ্প বলে ও অবশিষ্টগুলি হস্ত কৌশলে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কল কারখানায় প্রায় ৪লক্ষ মজুরের কার্য্য চলিয়া যাইতেছে।

যে সমস্ত জাপানী সওদাগরেরা পৃথিবীর নানাস্থানে ব্যবসা করিতেছেন, তন্মধ্যে ফুকি সামা, লিটসু ও ওসাকা কোম্পানি সর্ব্বপ্রধান। ইহাঁদের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় এক কোটী টাকার ন্যূন হইবে না।

জাপান সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াও দেশীয়বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে অণুমাত্র উদাসীন হয় নাই। বাষ্পীয় যন্ত্রের প্রবল প্রতিযোগিতা স্বত্ত্বেও জাপানের প্রতি পল্লীতেই চরকা হইতে সূতা নির্ম্মাণ ও তাঁত সাহায্যে বস্ত্র বয়ন হইয়া থাকে। জাপানের গৃহে গৃহে হস্তজাত ছুরি, কাঁচি মৃত্তিকা নির্ম্মিত বাসন ও বংশ নির্ম্মিত নানাবিধ গৃহসামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায় জাপানী শিল্পিরা কাগজের দ্বারা জানালা বাঁশের বিছানা, বাক্স ব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত বিষয়ে অসামান্য

জাপান বাসীরা যে কেবলমাত্র সমর শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াই অন্যান্য উন্নত জাতিগণের সমকক্ষ হইয়াছে এরূপ নহে। তাহারা কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যাদি বিষয়েও অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। মহাযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়াও জাপানী কৃষকেরা গত বর্ষে ভূমি হইতে ১৪ কোটি মণ চাউল, ৬ কোটী মণ যব ৪কোটী মণ বিবিধ তরকারী উৎপন্ন করিয়াছে। সরকারী গণনানুসারে উক্ত বর্ষে ১৩ লক্ষ মণ নীল পত্র, ৮ লক্ষ মন তামাক, পৌণে সাত লক্ষ মন চা উৎপন্ন হইয়াছে। গত পূর্ব্ব বর্ষে জাপানের খনি হইতে ৯ লক্ষ মন তাম্র ও ২৫ কোটি মণ পাথুরিয়া কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। সম্প্রতি জাপানে যে সুবর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মূল্য আনুমানিক হিসাবে ৪০০ কোটী টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাণিজ্যাদির সুবিধার জন্ত জাপান সাম্রাজ্যে ২৩১৭টী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে জাপানের ব্যাঙ্ক সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ ইহার বর্ত্তমান মূলধন মুদ্রা ও নোট সহ ২৩ কোটী টাকা। এতদ্ব্যতীত ১৭৯৯টী সাধারণ ৫০টী কৃষি ৬৪৬৭টী সেভিং ব্যাঙ্ক আছে!

অতি প্রাচীন যুগেও জাপান বাসীরা শিল্প ও বাণিজ্য কুশল জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে খৃষ্ট জন্মিবার ৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীরা স্বদেশ জাত দ্রব্যাদি লইয়া চীন ও কোরিয়ার সহিত সমুদ্র পথে বাণিজ্য করিত। ১৭০০ বৎসর অতীত হইল জাপানে ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। সহস্রাধিক বৎসর বিগত হইল, জাপানবাসীরা রেশম বয়ন ও চীনাবাসন প্রস্তুত প্রণালী অবগত আছে।

## শিক্ষা বিষয়ক উন্নতি।

সুশিক্ষাই সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল। কি সাম্রাজ্যের পরিপুষ্টি, কি বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার কি স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, কি জ্ঞানের পরিধি প্রসারণ, ইহার কোন একটীও শিক্ষা নিরপেক্ষ নহে। জাপানবাসীরা গত ত্রিংশতি বৎসরের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে যে উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অপূর্ব্ব ও সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক।

জাপানের শিক্ষার ইতিহাস ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার তিন বৎসর পরে গভর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে জাপানে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয়। ১৮৭২ খৃঃঅব্দে শিক্ষা সংক্রান্ত কতকগুলি ব্যবস্থা প্রণীত, শিক্ষা বিভাগে নব যুগের আবির্ভাব হয়। এক্ষণে জাপানে চারি শ্রেণীর বিদ্যালয় দৃষ্ট হয় যথা;—

প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্য বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ব বিদ্যালয়। জাপানের প্রতি পল্লী গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যামন্দির অবস্থিত।

ইহাতে ষষ্ঠ বৎসর হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাগণকে জাপানী ভাষায় শিল্প, ও কৃষি ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সংক্রান্ত সাধারণ সূত্রগুলি শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্রাটের আদেশানুসারে পীড়িত ও কঠোর দারিদ্র্যগ্রস্থ ব্যতীত গ্রামের সকল বালক বালিকাই বিদ্যালয়ে আসিতে বাধ্য হইয়া থাকে। বালিকাগণের চৌদ্দ বৎসরের অধিক হইলে তাহাদিগকে উক্ত নিয়মে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলি গ্রামবাসীর অর্থসাহায্যে জমিদারের প্রতিনিধি ও গ্রামের মণ্ডলগণের তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। যাহাতে বালক বালিকাগণের কোমলান্তঃকরণে রাজভক্তি, গুরুজন ভক্তি, ভ্রাতা ভগিনীগণের সহিত সদ্ব্যবহার বয়োজ্যেষ্ঠের উপর সম্মান প্রদর্শন, বন্ধুতা, স্বদেশ-হিতৈষিতা ও স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি বিষয় সকল উত্তমরূপে মুদ্রিত হয়, জাপানী শিক্ষকেরা তৎপ্রতি সমধিক লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় সংখ্যা ত্রিশ হাজার, ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা চালিশ লক্ষ, শিক্ষক সংখ্যা বাইশ হাজার ও শিক্ষয়ত্রী সংখ্যা দুই হাজার ছিল।

মধ্য বিদ্যালয় গুলি নগরে অবস্থিত। ইহাতে জাপানী, চীনা, ইংরেজী ভাষা প্রচলিত আছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে চৌদ্দ হইতে অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক দিগকে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি বিজ্ঞান জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহাতে ছাত্রগণের ধর্ম্মজ্ঞান, নীতিও শারীরিক শক্তি সম্যক্ পরিপুষ্ট হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। এক্ষণে জাপানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০০ ছাত্র সংখ্যা সত্তর হাজার ও শিক্ষক সংখ্যা তিন হাজার দৃষ্ট হয়।

উচ্চ বিদ্যালয়গুলি রাজধানী ও প্রথম শ্রেণীর নগর সকলে অবস্থিত। ইহাতে জাপানী, ইংরেজী ও জর্ম্মণ ভাষায় গণিত, দর্শন, আইন, চিকিৎসা শাস্ত্র কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বহু বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ে বর্ষে বর্ষে পরীক্ষা দিয়া পাঁচ বৎসর অধ্যায়ন করিতে হয়।

জাপানে দুইটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে একটী রাজধানীতে ও অন্যটী মিয়াকোনগরে অবস্থিত। এখানে জর্ম্মণ ও ইংরেজী ভাষায় বিবিধ মৌলিক বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন জাপানে শিল্প, কৃষি ও স্ত্রী শিক্ষা সংক্রান্ত আরও কয়েকটী বিশ্ব বিদ্যালয় আছে।

জাপান গভর্ণমেণ্ট টোকিও বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য প্রতি বর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন।

এতদ্ভিন্ন জাপানে অন্য শ্রেণীর যে সমস্ত বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে ৩৭টী কৃষি, ৭টী শিল্প ও ১৬টী বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যালয়ই উল্লেখ যোগ্য ১৯০০ অব্দে এই সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১০ হাজার ও শিক্ষক সংখ্যা ৫ শত ছিল। জাপান গভর্ণমেণ্ট ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে বিদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ছাত্র প্রেরণ আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে জাপানী বিদ্যালয়ের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে অধ্যাপক আসিতে হইত, এক্ষণে তাহার প্রয়োজন হয় না।

সমগ্র জাপান রাজ্যে বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ৪৪লক্ষ ছাত্র বিবিধ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ করিতেছেন এখানে বিদ্যালয় গমন যোগ্য বালকও যুবকগণের মধ্যে শতকরা ৮১ জন বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্য ( united states ) পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য রাজ্য বলিয়া পরিগণিত। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সেই শক্তিশালী রাজ্যের সহিত জাপানের তুলনা হয় না।

জাপানীরা ইংলণ্ডের নিকট হইতে নৌবিদ্যা ফ্রান্সের নিকট হইতে যুদ্ধ বিদ্যা জার্ম্মাণির নিকট হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র এবং আমেরিকার নিকট হইতে শিক্ষা প্রণালী গ্রহণ করিয়া সকলগুলিই স্বদেশের উপযোগী করিয়া লইয়াছে। জাপানের সাহিত্য ভাণ্ডার পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির ন্যায় ঐশ্চর্য্য সম্পদে পরিপুষ্ট নহে! জাপানী সাহিত্যে কালিদাস বা সেক্স্পিয়ার দূরের কথা, মিলটন বা মধুসূদনের ন্যায় কবির পরিচয় পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, যে প্রাচীন জাপান যুদ্ধ বিগ্রহ ও ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকায় সাহিত্য সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই। "কোজিকী" জাপানের প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থাবলীর ন্যায় বিবিধ অতি প্রকৃত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। ইহা গদ্যে রচিত।

খৃষ্টির পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দে জাপানী সাহিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের নবীন উপাদানে নবীকৃত হইয়া উঠে। এই সময়ে চীন ভাষা হইতে বহু সংখ্যক গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনুদিত হয়, ইহাতে সমাজেরও যথোচিত উপকার হয়। সপ্তম শতাব্দে জাপানী কবিরা বিবিধ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ষোড়শ শতাব্দে জাপানী সাহিত্যে বিবিধ পৌরাণিক উপন্যাস ও নাটকের উৎপত্তি হয়।

আজি কালি জাপানী সাহিত্যে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রী কবির আবির্ভাব হইয়াছে। বিহঙ্গের সুমিষ্ট কাকলী, জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী, তুষার মণ্ডিত পর্ব্বত

অশ্রান্ত বরষা প্রভৃতি তাহাদের বর্ণনার বিষয়। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত বিদেশী গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্মাইল, স্পেনসার প্রভৃতির গ্রন্থাবলী প্রসিদ্ধ। উপন্যাসের মধ্যে টেলিমেকস্ ও রবিন্‌সনক্রুসের পাঠক সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এতদ্ভিন্ন অনেক সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকগণের গ্রন্থরাজি জাপানী সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছে, অনুদিত কবিতা পুস্তকের মধ্যে গোল্ড-স্মিথের কৃত "ডেজার্ট ভিলেজ," ও টেনিসনের "এনক আর্ডেন' উল্লেখ যোগ্য।

১৬৮৪ অব্দে "কেইগায়ো সিম্ব," নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার ৭ বৎসর পরে "জিম্ব, জিজি" নামক আর একখানি পত্র জন্মগ্রহণ করে। ১৮৭২ অব্দে জন ব্লাকি নামক জনৈক ইংরাজ সম্পাদক কর্ত্তৃক "জাপান হেরাল্ড" নামক একখানি ১ম শ্রেণীর সংবাদপত্র জন্মগ্রহণ করে এই সময় হইতে জাপানে সংবাদ পত্রের সংখ্যা অতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এক্ষণে সংবাদপত্রের সংখ্যা ১৩০০ খানিরও অধিক। টোকিয়া হইতে প্রত্যহ ২০০ শত খানি পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

জাপানের মুদ্রাযন্ত্র বিধি অতীব কঠোর। রাজ্য সম্পর্কীয় কোন গুপ্তকথা প্রকাশ করিলেই সম্পাদক মহাশয়কে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

জাপান এসিয়া বাসী বলিয়া আমাদের ধর্ম্ম ভ্রাতা, ভগবান বুদ্ধদেবের উপাসক বিধায় আমাদের ধর্ম্ম শিষ্য। আমাদের সর্ব্ব প্রধান তীর্থ গয়া, জাপানীদের অতি প্রিয় ও পরমতীর্থ। জাপানে বিধিমত সংস্কৃত চর্চ্চা হইয়া থাকে এক্ষণে বহুতর জাপানী যুবক ভারতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে-ছেন।

---

# কতদিন।

(১)

কত দিন হ'ল দেখিয়াছি তায়,
তবুও জাগিছে মনে,
তবুও সে স্মৃতি বিদ্যুতের মত
জাগায় প্রবাসী জনে।
সেই ঢল ঢল মনোহর মুখ,
আধ কাঁচা হাসি খানি,
প্রাণের আঁধার দিক দূর করি

(২)

বাল্যকাল হতে তটিনীর কুলে,
খেলিতে বাসিত ভাল,
তুলি ফুলরাশি, পরি ফুল ভূষা,
স্থানটী করিত আলো—
সরলা বালিকা জানিত না কিছু,
সংসারের জ্বালা,

( ৩ )

ছিল না শরম, ছিল না আবেগ
ছিল না সংশয় মনে,
যারে কাছে পেত, তারে ফুল দিত,
চাহিত তাহার পানে ;
বুঝাইত পাখী কি যে গান করে,
গুঞ্জরে কেন অলি,
সাঁঝের বাতাসে, উষার হাসিতে,
কেন ফোটে ফুলকলি।

( ৪ )

কতদিন পরে একদিন বালা
খেলিছে চম্পক লয়ে,
সাঁঝের আকাশে ভরিয়াছে চাঁদ
কৌমুদী পড়িছে বয়ে,
সুধা-স্নাত হয়ে প্রসূন কলিকা,
খুলিছে কোমল আঁখি
স্নিগ্ধ সমীরে ঢালি দিল হাসি,
সোহাগেতে মাথারাখি ;—

( ৫ )

সহসা কি যেন মাথার উপরে
ডাকিল আবেগ ভরে,
পাগল চকোর সুধার পিয়াসী,
চকোরী ডাকিল তারে,
পাপিয়া শুধুই প্রেমে মাতোয়ারা।
ভীমগরজন এবে করি ধরা॥

---

# জামাই ষষ্ঠি।

লেখক—শ্রীযুক্ত নকড়ি রায়।

( ১ )

আবার আইল জ্যৈষ্ঠ বৈশাখের পরে।
উত্তপ্ত হইল ধরা খর রবিকরে।
পাকিল কাটাল আম, পিয়ারা গোলাপজাম,
তাল বেল তুরমুজা কুমরা কাকুর।
শসা, ফুটি, খেড়ো আদি উঠিল প্রচুর।

( ২ )

হেন শুভ জষ্টি মাসে ষষ্ঠীপূজা ছলে।
জামতা অর্চ্চন হয় মহা কুতুহলে।
হরিষে জামাইগণ, দিন গণে অনুক্ষণ,
দিবসেতে যক্ সক্ কাটে না যামিনী।
শয্যায় সহস্র বিছা ভেবে চন্দ্রাননী॥

( ৩ )

বয়স ভেদেতে জাতি জামায়ের চারি।
কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধে বলিহারি।
অবস্থা ভেদেতে পুনঃ, তিন জাতি
হয় শুন
অভাগা চাকুরে, আর বোকা ভাগ্যবান,
সদাই বিষাদে মগ্ন নির্ধন বিদ্বান্॥

( ৪ )

ইস্কুল কলেজ বন্দ গ্রীষ্ম অবকাশে।
কিশোর জামাই সব আসিয়াছে দেশে।
হয়েছে পরীক্ষা শেষ, পাস্ চিন্তা অবশেষ,
বিশেষ কিশোরী চিন্তা ব্যাকুল অন্তর।
কবে যাবে মধুপুরী ভাবে নিরন্তর॥

( ৫ )

খুলেছে মাথার বস্ত্র যুবা সম্প্রদায়।
জাতি কুল মান রক্ষা হইয়াছে দায়।
প্রৌঢ়ে খায় ডুবে জল, ধরিতেছে
নানা ছল,
বৃদ্ধের কি আছে বল সহায় সম্বল।
কম্ম কৃত্রিম দন্ত ভরসা কেবল॥

( ৬ )

ছুটেছে চৌদিকে চিঠি নিমন্ত্রণ লয়ে।
উঠেছে আনন্দ রোল শ্বশুর আলয়ে।
দক্ষালয় যত বাড়ী কন্যারত্নে ছড়াছড়ি,
দিবা রাত্রি হুড়াহুড়ি মহিলা মহলে।
কে কার খবর রাখে কেবা কারে বলে॥

( ৭ )

ক্রমেতে জামতাগণ আসিতে লাগিল।
অবস্থা মাফিক্ যেন ব্যবস্থা হইল।
কেহ অশ্ব গজোপরে, কেহ পাল্কী নৌকাকরে,
ফিটনে আটন কারো কেহ পদব্রজে।
কেহ দেখ গাদাবোটে গোযানে বিরাজে॥

পোহাল পঞ্চমী নিশি,　　উজলিয়া দশ দিশি,
তরুণ অরুণ প্রভা ষষ্ঠী প্রকাশিল।
কোকিল পঞ্চম স্বরে,　　ভ্রমর মধু ঝঙ্কারে,
কাকে কা কা রব করে, সকলে জাগাল॥
কেবল নবীনাকুল,　　আবেশে ঘুমে আকুল,
শিথিল কবরীমূল আলু থালু বেশে।
প্রভাত বায়ু সঞ্চারে,　　নিদ্রা যায় অকাতরে
নবীনের ক্রোড়োপরে পদ্ম কুঁড়ি ভাসে॥
মৃণাল ভুজ যুগলে,　　কাষয়া বেধেছে গলে,
প্রবীণা মরাল দলে করে আনা গোণা।

না মানে গুরু গঞ্জনা, না ভাবে সখী লাঞ্ছনা,
নব অনুরাগ আহা কিছু ত মানে না ॥
যার ভাগ্যে হেন দিন, ঘটিয়াছে কোন দিন,
সেই জন প্রেমাধীন অন্যে কে তা জানে।
রস রাজ বুঝে রস, নিরসে সদা বিরস,
হরিষে বিষাদ সদা পোড়ে মনে মনে ॥
হেথায় নাগরী সব ষষ্ঠীবাটা লয়ে,
করিতে প্রেমের হাট, ধরিয়াছে না না ঠাট,
সাজায়ে পূজার ডালা যাচ্ছে সবে ধেয়ে।
বগলা, কমলা বালা, অচলা, চারু চঞ্চলা
শৈলবালা দক্ষবালা সুশীলা প্রমীলা।
কলাবতী লীলাবতী, অম্বা রমা হৈমবতী,
প্রভাতি চপলা সতী ধরে কত ছলা।
হেমন্ত বসন্ত শান্ত, শরতের নাহি অন্ত,
কান্ত ভ্রান্ত পতিপ্রেমে সুখদা মোক্ষদা।
রাধারাণী অভিমানী, উড়ে যায় কুরু কুন্দী,
কামিনী ভাবিনী প্রিয় সারদা বরদা।
গোপেশ্বরী গৌরাঙ্গিনী, কাশীশ্বরী পঙ্করাণী,
যায় সবাই ধীরে ধীরে সঙ্গে ব্রজেশ্বরী।
তরঙ্গিনী নানা রঙ্গে, চলেছে মাতঙ্গী সঙ্গে
রঙ্গ রসে মত্ত আজি যত সহচরি ॥

ভামিনী কত করে রগড়, অমরের আসে নাই বর,
কামিনী মেরেছে টেক্কা রূপের বাজারে।
প্রফুল্লর কে দেখে বাহার, পরেছে সাড়ি গুল্‌বাহার,
শান্তিপুরে চন্দ্রকোণা ভাষে আঁখি নিরে ॥
ফাঁস্‌ভাঙ্গা সিম্‌লে সাড়ি, কেন্দে যায় গড়াগড়ি,
বালুচরে বেণারসি লাগেনা আর চখে।
উঠেছে পার্শি বোম্বাই সাড়ি, তারি কেবল আদর ভারি,
ঢাকাই পরে বিষাদিনী দুঃখে মুখ ঢাকে ॥

গরদ চেলি ছুড়ে ফেলে,　　বীতরাগ হয়েছে মলে,
হার হলেই হল গলে, হাতে তাগা বালা।
কেউ কেউ পরেন চুড়,　　সেটা কেবল লুকোচুরি,
কাণেতে য়িহুদি মাকড়ি পেলেই মিট্‌ল জ্বালা॥
নাইক নথ নলক নাকে,　　নাক ছিপিতে সম্মান রাখে,
কে কাহারে চেয়ে দেখে সবাকারই এক সাজ।
কবির সদা মনঃকষ্ট,　　রূপার মান হয়েছে নষ্ট,
অন্নকষ্টে সোণা কোথা পাবে মহালাজ॥

এখানে খাশুরি মাতা কৃতাঞ্জলি হাতে।
তুষ্ট করি ষষ্ঠী দেবী দূর্ব্বা বাঁশের পাতে॥
ফলের থালা থয়ের ডালা লয়ে তাড়াতাড়ি।
আসেন বাড়ী দন্ত করি বেলা হয়েছে ভারি॥
বুড়ো জামাই কচি হ'ল মায়ের বচনে।
ঝি বৌকে গালি দেন বিবিধ বাহানে॥
জামাই বাবার গলা শুকুলো পিত্তি মাঠে মাঠে।
খাবার বেলা দেখিস্ না কেবল ছলিস্ নানা ঠাটে॥
আফিসের ভাত সিদ্ধ, পক্ক কালেজের।
কেমন করে যোগাস্ তোরা বুঝে উঠাভার॥
শুক্‌নো গাল দন্তহীন পাকা গোঁফ্ দাড়ি।
হয়েছে কেবল অনিয়মে নইলে বয়স কুড়ি॥

বসেছে জামাই কার্পেট আসনে, ধরিয়া মোহন সাজ।
কেরেপ কামিজে, শরীর ঢেকেছে, শিরেতে শোভিছে তাজ।
গলে গার্ডচেন, আঙ্গুলে অঙ্গুরী, পকেটেতে ঘড়ি সময় রাখে।
বক্ষে বনমালা, সেজে চিকণ কালা, উঁকি ঝুঁকি মারে আড়াল চোখে॥
শ্যালিকার কুল, ভাবিয়া আকুল, কেমনে মিটাবে মনের সাধ।
নাহি পরিত্রাণ, বড় বুদ্ধিমান পেটভরে খাও বুনাই চাঁদ॥
চারিদিকে যত, বৌদিদি শত, এদিক ওদিক ঘুড়িয়া ফেরে।
খাশুড়ী ননদী, গঞ্জনা জ্বালায়, মরমে মরমে গুমুরে পোড়ে॥

কথাটী কহেনা, পাদুটী নড়েনা, নয়নের বাণে ছোটে আগুণ।
ঠাকুর জামাই, বলিহারি যাই, হেসে খেলে জ্বালা বাড়ায় দ্বিগুণ॥
দিলেন শাশুড়ী কল্যাণের ফোটা, জামায়ের ভালে যতন করি।
জামাই বলদে, বাঁধিলেন ছলে, হলুদ মাখান ষষ্ঠীর দড়ি॥
দিলেন সম্মুখে, বনফল যত, লক্ষ্মী খেতে নাই শাস্ত্রের মানা।
তদবধি করি, হইয়াছে পশু, ভুলেও বাপের নামটি করে না॥
কলুর বলদ, হইয়াছি ভাই, চখেতে পড়েছে আঁধার ঠুলি।
আত্মীয় স্বজন, ভুলেছি সকলি, যেমনি চালায় তেমনি চলি॥
খাটি দিবারাতি, ঘুরি ঘুরিয়া, তবুও চাবুক মাঝে মাঝে খাই।
ধন্যরে সংসার, বলিহারি তোরে, বিনামূল্যে সওদা শ্বশুর জামাই॥

—:*:—

# অধ্যাত্ম-জগতে বিজ্ঞান।

## লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী।

অতি প্রাচীনকালে যখন মানব—মন সরল বিশ্বাস ও ধর্ম্ম ভাবের অধীন ছিল, তখন লোকে যত্নে জগতের যাবতীয় ঘটনাকেই দৈবনিয়ন্ত্রিত বলিয়া বিশ্বাস করিত। নিসর্গ রাজ্যের ভৌতিক কার্য্যাবলী যে দেবানুগ্রহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা মানব জাতির প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষগণ নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতেন। সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থেই একথার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। মানবজাতির শৈশবাস্থায় মানব মনে সে ভক্তি ও বিস্ময়ের পূর্ণাধিপত্য বিরাজমান ছিল, তাহা হিন্দুস্থানে সুপ্রাচীন আর্য্য জাতিগণের, ইরাণের পূর্ব্বতন জড়োপাসক বৃন্দের এবং আরব্য ও মিশরের প্রাচীন পৌত্তলিকগণের ধর্ম্ম পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। কাল সহকারে মানবের জ্ঞান পরিধি যেমন প্রসারিত হইতে আরম্ভ হইল। শিশু প্রকৃতি মানব তেমনি প্রকৃতির অন্তরালে সেই মহান্, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দর্শন করিতে শিক্ষা করিল।

জ্ঞান-বৃদ্ধির সহিত মানবের জ্ঞান পিপাসা ও উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সম্মুখে এই পরিদৃশ্যমান বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক ( natraul ) ঘটনাবলীর সংঘটন ও পরিবর্ত্তনাদি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারই কারণানুসন্ধানে

প্রধাবিত হইল। কিরূপে এই বিশাল বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইল? কি কি উপকরণে উহা গঠিত? দিবা রাত্রি ভেদ হইবার কারণ কি? সূর্য্য কি? এই অসংখ্য নক্ষত্র মালা-সদূর আকাশ টিপি টিপি জ্বলিতেছে, ইহারাই বা কে? সৃষ্টি তত্ত্বের এই সকল ব্যাপারের পর্য্যালোচনা করিতে মানব চিন্তা সেদিন হইতে নিযুক্ত হইল, সেইদিন সেই শুভ মুহূর্ত্তে বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইল! বিজ্ঞান সৃষ্টি হইবার পর ধর্ম্ম জগতে তুমুলান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সে আন্দোলন আজিও যায় নাই।

পাশ্চাত্য জগতে আজি কালি বিজ্ঞানের প্রভাব ও আদর পূর্ণমাত্রায়; তাই পাশ্চাত্য ধর্ম্ম জগতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা কিরূপে হইল; তাহাই আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

ভারতীয় আর্য্যজাতির কথা ছাড়িয়া দিন, কারণ তাঁহারা আজি অবধি আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। নিসর্গ রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক (spnitual) জ্ঞানের পরিচয় বর্ত্তমানে বিজ্ঞান পাঠকের মনোনীত না হইতে পারে, এই আশঙ্কায় আমরা পাশ্চত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রেরও নেতাগণের সম্মুখীন হইতে চলিলাম।

সুবিখ্যাত দার্শনিক বেকন মহোদয় (Lauhbing philosopper) "হাস্যধারদার্শনিক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাকে অনেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের একরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অনুমোদন করেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম "ডেমক্রিটস্"। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের গঠন প্রকরণ কল্পনা করিতে গিয়া ডেমক্রিটসের পূর্ব্ববর্ত্তী মনস্বীগণ অগ্রে ইহার গঠনোপযোগী উপকরণ সমূহের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন নাই। পরে এই অসীম সাহসী উন্নতবুদ্ধি দার্শনিক ডেমক্রিটস্ সৃষ্টি রাজ্যের উপকরণ সমূহের প্রয়োজনীয়তা সাধারণে নিবেদিত করেন। তাহারই ফলে পরমাণুবাদের সৃষ্টি হয়। ডেমক্রিটস্ বলেন সংখ্যাহীন অনন্তরূপী পরমাণুপুঞ্জের পারস্পরিক সংঘাত আবর্ত্তন বা আকর্ষণ-বিকর্ষণেই এক একটী পৃথিবীর সূত্রপাত।

পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম রাজ্যে এইরূপে বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইল। একথা এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে, ডেমক্রিটস্‌কে তাঁহার নবীন মত প্রচারকালে বহু ধর্ম্মযাজকের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। শুদ্ধ ইহাই নহে, যাঁহারা প্রাকৃতিক

খড়্গ উত্তোলন করিতে বিরত হইলেন না। কিন্তু এসকল "জবরদস্তী" সত্বেও ডেমক্রিটসের এম্পিডক্লিস প্রমুখ ( Empidelis ) পরবর্ত্তী শিষ্যগণ প্রকাশ্যরূপে বিজ্ঞানালোচনায় মনোসংযোগ করেন। এম্পিডক্লসের মতে পরমাণু সমূহের পারস্পরিক সংযোগ ক্রিয়া এরূপ প্রাকৃতিক শক্তির অধীন, সেই উপযুক্ত সংযোগ সংঘটিত থাকিলে পদার্থ সকল অনন্তকাল স্থায়ী হইবে এবং অনুপযোগী সংযোগ মাত্র ধ্বংশপ্রাপ্ত বা অন্তর্হিত হইবে। এ সকল কথা বিজ্ঞান রাজ্যে অতীব প্রাচীন প্রায় দুই সহস্র বৎসরের হইলেও, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ইহারই উপর স্থাপিত এবং সত্যজ্ঞানে সর্ব্বত্র সম্পূজিত।

তাহার পর লুক্রিসিয়স্। ইহার সময়েও লোকে প্রাকৃতিক কার্য্য বা দেব বলিয়া বিশ্বাস করিত, পরকাল মানিত এবং নরকবাস যন্ত্রণা বিশ্বাস করিত। লুক্রিসিয়স্ বৈজ্ঞানিক, তিনি বিজ্ঞান সাহার্য্যে বুঝিলেন, যে, এ সকল লোকের অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিজ্ঞানালোচনার দ্বারা লোকের হৃদয় হইতে এই সকল ভ্রম ধারনা দূর করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। তাঁহার মতে, পরমানু সকল অবিনশ্বর। বলপ্রয়োগ দ্বারা বস্তু মাত্রই ঘনতমভাব ধারণ করিয়া থাকে। এ সকল প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্র। বিশ্বসৃষ্টি এই প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্র। বিশ্বসৃষ্টি এই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনেই চালিত ও উদ্ভূত।

কালে কালে যতই বিজ্ঞানের ক্রমন্নোতি হইতে লাগিল, ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের সংগ্রাম ততই গুরুতর ভাব ধারণ করিতে লাগিল। এই শত শত বর্ষব্যাপী বিজ্ঞানের শিক্ষায় মানবের মন নিয়ম ও শৃঙ্খলার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক তাঁহারা নিসর্গ রাজ্যের যাবতীয় ব্যাপারকে অন্যচক্ষে দেখেন। তাঁহাদের চক্ষে প্রাকৃতিক প্রত্যেক ঘটনাই নিয়মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরীক্ষা বা যুক্তি তর্কের দ্বারা কোন বস্তু ঘষিয়া মাজিয়া না লইয়া বিজ্ঞানের বরপুত্রগণ কোন বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হন না। যে প্রথা, যে বিশ্বাস, নিয়ম শৃঙ্খলা, বা যুক্তি তর্কের শিরে পদাঘাত করে, বিজ্ঞান তাহাকে গ্রাহ্য করে না। অধ্যাত্মরাজ্যের সহিত বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব এই স্থানেই। নিয়ম বা শৃঙ্খলার আইন আদালত অগ্রাহ্য করিয়া যদি কোন ধর্ম্ম বিশ্বাস বা শাস্ত্রের অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তাহাকে অগ্রাহ্য করিবে। কোন ধর্ম্ম গ্রন্থের মতে যদি পৃথিবীর বয়স ছয় হাজার কি সাত হাজার বৎসর মাত্র হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান তোমায় ঘৃণা করিবে। কারণ বিজ্ঞান বহু প্রমাণ যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন, যে, পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে প্রায় লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হইয়াছে।

যাঁহারা বলেন বিজ্ঞান ধর্ম্মকে দূর করিয়া দিতে চান, তাঁহারা বাতুল। বিজ্ঞান কখনও ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে না। তবে ইহাই বিজ্ঞানের অভিপ্রায়, যে, ধর্ম্ম বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকবাদ যেন যুক্তি ও তর্কের অগ্নি পরীক্ষায় পবিত্র ও সত্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যেন জ্ঞানোন্নতির পক্ষে কোন প্রকার বাধা না দেয়।

বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সংগ্রাম কখনও সম্ভব হইতে পারে না। ড্রামণ্ড প্রমুখ ( Dromond ) কয়েকজন মনস্বী বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সমন্বয়-সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু সাধারণের মন আজিও সেদিকে আকৃষ্ট হয় নাই।

ভগবান করুন, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মরাজ্যের মনোবিবাদ দূরিভূত হউক। যাঁহারা সমাজ হিতার্থে ইহাদের সমন্বয় চেষ্টায় অবিরত পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হউক। কিন্তু আমাদিগের ধারণা, ধর্ম্মহীন বিজ্ঞান বা সত্য ও যুক্তি তর্কহীন ধর্ম্ম বিশ্বাস কিছুই এই বর্ত্তমান যুগে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না।

---

# শাস্ত্রোক্ত বলিদান রহস্য।

লেখক—শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কতকগুলি অনভিজ্ঞ ও স্থূলদর্শী লোক আমাদের শাস্ত্রোক্তবলিদান বিধিকে নিষ্ঠুরতা মূলক ও বর্ব্বরোচিত বিধি বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেটা তাঁহাদের বড়ই ভ্রম। শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অপরিজ্ঞাত থাকাতেই তাঁহাদের ঐরূপ ভ্রম জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, মানবগণের হিংসাপ্রবৃত্তিকে সংযত করাইবার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বিধির ন্যায় সুন্দর সুবিধি বোধ হয় আর হইতেই পারে না। অতএব আমরা এই প্রবন্ধে পাঠক-গণকে বলিদানের রহস্য বুঝাইবার জন্য যত্ন করিব।

বেদমূলক সনাতন আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্র সকলমানবগণের প্রকৃতিভেদেই উপাসনা ভেদ করিয়াছেন। সমগ্র মানব মণ্ডলী-সাধারণতঃ ঐ প্রকৃতিভেদেই তিনশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; যথা-সাত্ত্বিক প্রকৃতিক, রাজসপ্রকৃতিক ও তামসপ্রকৃতিক। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্যেই উক্ত-প্রকার প্রকৃতিভেদ

ঘটিয়া থাকে। যে সমস্ত মানব শরীরে সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকে, তাহারা সাত্ত্বিকপ্রকৃতিক; যাহাদের শরীরে রজোগুণের আধিক্য বিদ্যমান, তাহারা রাজস এবং তমোগুণ প্রধান দেহধারী মানবকেই তামসপ্রকৃতিক বলে। জীবদেহে গুণবৈষম্য ঘটিবারও নানাকারণ থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান কারণই হইল, জীবের পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত কর্ম্ম বা অদৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত পিতৃমাতৃ গুণ, দেশ, কাল-পাত্রের অবস্থা এবং জন্মকালীন গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবৈচিত্র্য ও প্রভাব ও প্রকৃতিভেদের অবান্তর কারণ বটে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণ কাহাকে বলে ও তাহার ক্রিয়া প্রণালী গত পৌষ সংখ্যক জন্মভূমিতে প্রকাশিত "হিন্দুর ঈশ্বর" নামক প্রবন্ধে আমরা যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং এইস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে, এই প্রবন্ধ পাঠের সময়, পাঠকগণ সেইস্থানটী একবার দেখিয়া লইতে পারেন। যাহাহউক গুণভেদে মানবপ্রকৃতি যেমন ত্রিবিধ, তদ্রূপ উপাসনা পদ্ধতিও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। যিনি যে প্রকৃতির লোক, তিনি সেই প্রকৃতির সহিত মিশিয়াই ভগবানের উপাসনা করিবেন; অর্থাৎ সাত্ত্বিক লোক সাত্ত্বিক ভাবে, রাজসিক লোক রাজসভাবে ও তামসিক লোক তামস ভাবে উপাসনা করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। প্রকৃতিবিরুদ্ধ উপাসনা কখন কল্যাণদায়িনী হয় না। কেননা ত্রিগুণময়ী মায়ায় অভিভূত সংসারি মানবের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যে আদৌ প্রবৃত্তি বা অনুরাগ জন্মিতেই পারে না।

ভগবদুপাসনার মূল উপকরণই হইল, একমাত্র ভক্তি। ভক্তি একটী ভাব বিশেষ এবং কেবল মনের সহিতই তাহার সম্বন্ধ। মানসপ্রত্যক্ষ বা মনে মনে নিজে অনুভব করা ব্যতীত, কেবল ভাষার দ্বারা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ অথবা সেই আনন্দময় ভাবটী প্রকৃতরূপে অভিব্যক্ত হয় না। ভক্তি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

সা পরাণুরক্তিরীশ্বরে।

শাণ্ডিল্য সূত্রম্।

ঈশ্বরে পরা আনুরক্তির নামই ভক্তি। কৃপণ ব্যক্তির সঞ্চিত ধনের প্রতি যেরূপ আসক্তি স্ত্রৈণব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি যেরূপ আসক্তি সেইরূপ আসক্তি ভগবানে হইলেই তাহা পরাভক্তি পদবাচ্য হয়। সৌভাগ্যক্রমে সাধকের অন্তঃকরণে যখন পরাভক্তির উদয় হয়, তখন আর তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না; তিনি ভগবানের সহিত এক হইয়া যান।

ভক্তি, প্রেম ও স্নেহ স্বরূপতঃ একই পদার্থ; কেবল পাত্রভেদে সংজ্ঞাভেদ মাত্র। এ তিনেরই অর্থ, আত্মবোধ বা অন্তরের সহিত ভালবাসা। সাধারণতঃ ঈশ্বরে বা গুরুজনে যে ভালবাসা, তাহা ভক্তি নামে; সমানে সমানে যে ভালবাসা, তাহা প্রেম নামে ও নিম্নশ্রেণীতে বাৎসল্যভাবে যে ভালবাসা, তাহাই স্নেহ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা লোকব্যবহারে দেখিতে পাই, সংসারী মানবমাত্রই নিজের প্রিয় বস্তু স্ত্রীপুত্রাদি প্রিয়জনকে ভোগ করাইতে পারিলেই আনন্দিত হয়—তৃপ্তি লাভ করে। অর্থাৎ সেই বস্তু নিজে ভোগ করিলে, যেরূপ আনন্দ—যেরূপ তৃপ্তি হইত, প্রিয়জনের ভোগেও তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে! কিন্তু কেন এমন হয়? ভোগ করিল একব্যক্তি, তৃপ্তি হয় অন্যের; ইহার হেতু কি? ইহার উত্তরে একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রীপুত্রাদি প্রিয়জনে লোকের আত্ম-বোধ অর্থাৎ নিজের আত্মা হইতে তাহাদের আত্মা অভিন্ন, এইপ্রকার জ্ঞান থাকে বলিয়াই তাহাদের ভোগে ঐরূপ আনন্দ ও তৃপ্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলেই আর সেরূপ আনন্দানুভূতি হয় না। আমরা এখানে লোক-ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, ইহা লৌকিক প্রেম বা স্নেহের লক্ষণ মাত্র। ভগবদ্‌ভক্তি এই আকারের হইলেও ইহা অপেক্ষাও উচ্চাঙ্গের বস্তু। ভগবানের সহিত একাত্মতা লাভই ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য। সেই জন্যই শাস্ত্রে উপাস্য দেবতাকে অভেদ-জ্ঞানে অর্চনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

"শিবো ভূত্বা শিবংযজেৎ।"

নিজে শিব হইয়া শিব পূজা করিবে।

"কালিকা মাত্মবৎ পশ্যেৎ তথা সেবেত চাত্মবৎ।"

কালিকাকে (ভগবানকে) আত্মবৎ অর্থাৎ নিজ প্রকৃতির অনুরূপে চিন্তা ও আপনার মতই সেবা করিবে। আবার শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন,—

"যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"

যাহা সাধারণতঃ প্রিয় ও নিজের যাহা প্রিয় বস্তু, ভগবদুপাসনার সময় তাহাই তাঁহাকে উপচার দিতে হইবে। নিজের প্রিয় বস্তু সাধারণের অপ্রিয় হইলেও তাহাও দিবে। বলা বাহুল্য যে, যে সমস্ত বস্তু সাধারণতঃ অনিষ্ট জনক ও পবিত্রতার হানিকারক, বলিয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ পলাণ্ডু ও লশুন প্রভৃতি দ্রব্য নিজের প্রিয় হইলেও অবশ্যই তাহা দেবতাকে দেওয়া যাইতে পারে না। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

"নাভক্ষ্যং দত্মান্নৈবেত্তম্।"

বিষ্ণু সংহিতা।

যে বস্তু নিজের ভক্ষনীয় নহে, এমন বস্তু ভগবানকে নৈবেত্ত ( উপচার ) দিবে না। উপচার প্রদানকালে ভগবান কেবল সাধকের ভাবের প্রতিই লক্ষ্য করেন; পরন্তু নৈবেত্ত উপচার দ্রব্যের প্রতি নহে। কেননা তিনি যে "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।"

আমরা এপর্য্যন্ত যে সকল কথার আলোচনা করিলাম, তাহার ফলিতার্থ এই দাঁড়াইল যে, ভগবানকে ভক্তি করিতে হইলে ভালবাসিতে হইলে, যিনি যে প্রকৃতির লোক ও যাঁহারে যাহা প্রিয়বস্তু, তিনি সেই ভাবেই ভগবানের উপাসনা করিবেন এবং সেইরূপ বস্তুই উপচার দিবেন। কিন্তু জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা সকলেরই সমভাবে প্রীতিকর হইবে। আমার যাহা প্রিয়, তোমার পক্ষে তাহা অপ্রিয়; আবার তোমার যাহা প্রিয়, অন্যের পক্ষে তাহা অপ্রিয়। বস্তুতঃ কেবল প্রকৃতিভেদেই ভিন্ন ভিন্ন মানবের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে আহারীয় পদার্থও ত্রিবিধ সত্ত্বগুণাধিক লোকের সাত্ত্বিক আহার, রজোগুণাধিক লোকের রাজসিক ও তমোগুণাধিক্য লোকের তামসিক আহারই প্রিয় হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ ভগবদগীতায় কথিত হইয়াছে,—

"আয়ুঃসত্ত্ব বলারোগ্য স্বুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ল লবণা ত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥"

যে সকল আহারীয় পদার্থ আয়ু চিত্তের স্থৈর্য্য, বল, আরোগ্য, অকৃত্রিম সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধন করে, যাহা সুরস ও সুস্নিগ্ধ, যাহার ক্রিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয় এবং যাহা হৃদ্য অর্থাৎ হৃদয়গ্রাহী, তাদৃশ আহারই সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। যে সকল খাদ্য পদার্থ অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণরসযুক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ ও অতি বিদাহী ( অত্যন্ত উত্তাপ-বর্দ্ধক ) এবং যাহা দুঃখ, শোক ও আময়ের ( ব্যাধি ) বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই সকল আহারই রাজসিক লোকের প্রিয়। আর যে সকল আহারীয় দ্রব্য অর্দ্ধপক, বিরস, পূতি, (পচা ) পর্য্যুষিত, ( বাসি ) উচ্ছিষ্ট ( ভুক্তাবশিষ্ট ) ও অমেধ্য, ( অপবিত্র ) তাহার

নামে তামসিক আহার এবং তামস প্রকৃতিক লোকেরই তাহা প্রিয় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে মৎস্য ও মাংস সাধারণতঃ রাজসিক আহারের পর্য্যায়ে স্থান পাইলেও অবস্থা ভেদে তাহা তামসিক আহার এবং তামস প্রকৃতিক লোকেরও প্রিয়। অতএব শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়তঃই প্রতিপন্ন হইল যে, মৎস্য মাংসপ্রিয় রাজস ও তামস অধিকারী মাত্রই শাস্ত্রানুমোদিত পবিত্র মৎস্য মাংস দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। এবং তাঁহাদের জন্যই শাস্ত্রে ব্যবস্থা হইয়াছে,—

"বিনা মৎস্যৈর্বিনা মাংসৈর্নার্চ্চয়েৎ পরদেবতাম্।" তন্ত্র।

মৎস্য মাংস ব্যতীত দেবতার অর্চ্চনা করিবে না। আবার শাস্ত্রান্তরেও কথিত হইয়াছে,—

"রাজসো বলিরাখ্যাতো মাংসশোণিত সংযুতঃ।"

রাজসপ্রকৃতির লোকেরা মাংসশোণিতযুক্ত বলিই দেবতাকে অর্পণ করিবেন।

কিন্তু যাঁহারা সাত্ত্বিকপ্রকৃতিক ; মৎস্য ও মাংস তাঁহাদের একবারেই অপ্রিয়। সুতরাং বলিদান তাঁহাদের অধিকার নাই। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকদিগের উপচার দান বিষয়ে শাস্ত্রে নিম্নলিখিতরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।"

সাত্ত্বিক লোকেরা জপ, যজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেদ্যের দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। কেননা তাহাই যে তাঁহাদের প্রিয় বস্তু।

অতঃপর সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস অধিকারী কাহাকে বলে ও তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ কি, তাহাই কথিত হইতেছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি-সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগ-দ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥
মুক্তসঙ্গোহনহং বাদী-ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥" ভগবদ্গীতা।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ। যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহের মধ্যে সর্ব্বস্থানব্যাপক এক অব্যয় পরমাত্মতত্ত্বরূপ ভাবের উপলব্ধি হয়; তাহার নাম সাত্ত্বিক জ্ঞান। যে জ্ঞানের দ্বারা পার্থক্যের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ তুমি, আমি, জগৎ; পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া ধারণা হয়, তাহাই রাজস জ্ঞান। আর যে জ্ঞানের উদয় হইলে, কোন একটী দৃশ্য পদার্থকে পরমাত্মা বলিয়া উপলব্ধি হয় এবং যাহা আযৌক্তিক ও অযথার্থ জ্ঞান, তাহারই নাম তামস জ্ঞান। কামনা-রহিত পুরুষ রাগদ্বেষাদি বর্জ্জিত হইয়া অনাসক্তভাবে যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। ফল কামনা করিয়া বা অহঙ্কার বশে কোন ব্যক্তি কষ্টসাধ্য কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে রাজস কর্ম্ম বলা যায়। আর ভাবী শুভাশুভ, ধনক্ষয়, হিংসা ও নিজের সামর্থ্যাদি বিচার না করিয়া, মোহবশতঃ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই তামস কর্ম্ম নামে কথিত হইয়া থাকে। ফলকামনা শূন্য, অনহংবাদী, ধৃতিমান, উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতেও যিনি নির্ব্বিকারচিত্ত, তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা। যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধচিত্ত, হিংসাপরায়ণ, অশুচি ও হর্ষশোকযুক্ত, তাহার নাম রাজস কর্ত্তা। আর যে ব্যক্তি অসাবধান, অবিবেকী, উদ্ধত স্বভাব, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী, সেই লোকই তামস কর্ত্তা।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার বিভাগ প্রদর্শিত হইল। অতঃপর এই তিন শ্রেণীর লোকের যজ্ঞের লক্ষণটাও শুনাইব। কেননা সেইটীই এই প্রবন্ধের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়।

"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরত শ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥" ভগবদ্গীতা।

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া, 'অবশ্য কর্ত্তব্য' বোধে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিক যজ্ঞ। কোন প্রকার ফল কামনা করিয়া অথবা দম্ভবশে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম রাজস। আর বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অন্নদানহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধাবিহীন যে যজ্ঞ, তাহাই তামস যজ্ঞ নামে কথিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ গুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই কোন্ ব্যক্তি কোন্ প্রকৃতির লোক এবং কাহার কোন্ প্রকার কার্য্যে বা যজ্ঞে অধিকার, তাহা অনায়াসেই সকলে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, কলি প্রাবল্যের এই ঘোর দুর্দ্দিনে প্রকৃত সাত্ত্বিক লোক সমগ্র ভারতবর্ষে অন্ততঃ গৃহস্থ মণ্ডলীতে একেবারে দুর্লভ বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই মনে হয়, দুই দশ জন রাজসিক ব্যতীত এখনকার প্রায় লোকই তামস প্রকৃতিক। সুতরাং বৈধ বলিদানে সকলেই সমান অধিকারী। শাস্ত্রোক্ত বলিদান বিধি কোন নির্দ্দিষ্ট উপাসক সম্প্রদায় অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট দেবতার অর্চ্চনোপলক্ষে ব্যবস্থিত হয় নাই। রাজস ও তামস প্রকৃতির লোক মাত্রই আপন আপন উপাস্য দেবতার নিকট বলি প্রদান করিতে পারেন। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর রাজসিকী ও তামসিকী পূজাতেও বলি প্রদানে অধিকারী। তবে দেবতা বিশেষে বলি যোগ্য পশু নির্ব্বাচনে শাস্ত্রে কিছু কিছু ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুর বলিদানে সাধারণতঃ মৃগ, শশ ও ছাগ পশুই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিন বৎসর বয়স্ক, কৃতক্লীব, ( খাসিকরা ) শ্বেত বর্ণ, ছাগই বিষ্ণুর বলিদানে প্রশস্ত।

আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়িক মহাশয়েরা পূর্ব্বসঞ্জাত কুসংস্কার ফলে, আমাদের এই উক্তিকে হয় ত প্রলাপোক্তি বলিয়াই মনে করিবেন। এবং বিষ্ণুর নিকট খাসি বলিদানের কথা শুনিয়া, নিশ্চিতই ইহাঁরা কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবেন। কেননা স্থাবর জীব অথবা জঙ্গম জীবের মধ্যে মৎস্য ভক্ষণ করিলে, ইহাঁদের মতে জীবহিংসা পাপ হয় না। ইহাঁদের যত আক্রোশ, কেবল ছাগ পশুর উপরেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক আমাদের ঐ উক্তি যে, স্বকপোল কল্পিত নহে, পরন্তু উহা শাস্ত্রের কথা, এক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। বরাহ পুরাণে কথিত হইয়াছে যে,—

"মার্গং মাংসং তথা ছাগং শাশং সমনুগৃহ্যতে।
এতানি মে প্রিয়াণি স্যুঃ প্রযোজ্যানি বসুন্ধরে॥"

বসুন্ধরার প্রতি ভগবদ্‌বাক্য।

ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং বলিতেছেন, মৃগ মাংস, ছাগ মাংস ও শশক মাংস আমার বড়ই প্রিয়। অতএব হে বসুন্ধরে! আমাকে তাহাই প্রদান করিবে। আবার তন্ত্রে আছে,—

"ত্রৈবার্ষিকঃ কৃতক্লীবঃ শ্বেতো বৃদ্ধো হ্যজাপতিঃ।
বাৰ্দ্ধীনসঃ স বিজ্ঞেয়ো মম বিষ্ণোরতিপ্রিয়ঃ॥"

নিরুত্তর তন্ত্র।

তিন বৎসর বয়স্ক, কৃতক্লীব, শ্বেতবর্ণের বৃদ্ধ ছাগের নাম বাৰ্দ্ধীনস। এই বাৰ্দ্ধীনস আমার ( বিষ্ণুর ) বড়ই প্রিয়।

ফলতঃ বিষ্ণুর রাজসী বা তামসী পূজাতে বলিদানের নিষেধ বাক্য থাকে, তবে তাহা সাত্ত্বিকী পূজোপলক্ষেই বুঝিতে হইবে। কেননা যখন ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্ত্তি সকল একই ঈশ্বরের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র এবং উপাসকের প্রকৃতি ভেদেই যখন উপাসনা ভেদ হইয়া থাকে, তখন সনাতন আর্য্যশাস্ত্রে উক্তরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থা থাকা, কথনই সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলিদান নিষিদ্ধ হইলে, যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, অশ্ববলি দ্বারা কথনই যজ্ঞকার্য্য সমাধা করাইতেন না। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব যে, পরম বৈষ্ণব, একথা মহাভারত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

আরও একটা কথা আছে। শ্রীমদ্ ভাগবত একখানি প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ। উক্ত ভাগবতের নবম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্বিজগণকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানচ্ছলে যে ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, প্রয়োজন বোধে তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত অংশ দ্বারাই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, যজ্ঞে পশুবধ বৈষ্ণব শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে।

"স একদাষ্টকা শ্রাদ্ধে ইক্ষ্বাকুঃ সুতমাদিশৎ।
মাংসমানীয়তাং মেধ্যং বিকুক্ষে গচ্ছ মা চিরম্॥
তথেতি স বনং গত্বা মৃগান্ হত্বা ক্রিয়ার্হনান্।
শ্রান্তো বুভুক্ষিতো বীরঃ শশঞ্চাদদপস্মৃতিঃ॥
শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে তেন চ তদ্‌গুরুঃ।
চোদিতঃ প্রোক্ষণায়াহ দুষ্ট-মেতদকর্ম্মকম্॥
জ্ঞাত্বা পুত্রস্য তৎকর্ম্ম গুরুণাভিহিতং নৃপঃ।
দেশান্নিঃ সারয়ামাস সুতং ত্যক্তবিধিং রুষা॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, এক দিবস মহারাজা ইক্ষ্বাকু মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবার জন্য রাজপুত্র বিকুক্ষিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন বৎস! যাও, বন হইতে পবিত্র

মাংস আনয়ন কর; বিলম্ব করিওনা। বিকুক্ষি রাজাদেশ প্রাপ্তি মাত্রই বনগমন করিয়া ক্রিয়াযোগ্য বহুতর মৃগবধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে তিনি এরূপ শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পিতার অষ্টকাশ্রাদ্ধের কথা ভুলিয়া গিয়া, তন্মধ্য হইতে একটা শশক ভক্ষণ দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। তাহার পর তিনি অবশিষ্ট মাংস সকল পিতৃসমীপে আনিয়া উপস্থিত করিলে, মহারাজ ইক্ষাকু সেই মাংসের শ্রাদ্ধোচিত সংস্কার করিবার নিমিত্ত কুলগুরু বশিষ্টদেবকে অনুরোধ করিলেন। মহামুনি বশিষ্ট ধ্যানবলে রাজপুত্রের শশক ভক্ষণের কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন যে, "এই মাংসের অগ্রভাগ গৃহীত হওয়ায়, দূষিত হইয়াছে, ইহা আর কর্ম্মই হইবে না।" মহারাজ গুরুদেবের এই মন্তব্য শুনিয়াই রোষভরে রাজপুত্র বিকুক্ষিকে দেশ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। কেননা শ্রাদ্ধীয় মাংসের অগ্রভাগ গ্রহণ করায়, তাঁহার সদাচার পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ণিত মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধরূপ পিতৃযজ্ঞ বর্ষে বর্ষে মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে সম্পন্ন করিতে হয়। এবং ইহা গৃহস্থাশ্রমী দ্বিজগণের পক্ষে শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য, এই পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় ভুক্ত দ্বিজগণই এই শ্রাদ্ধ না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইয়া থাকেন।

আমরা অতি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সেই মহাভারতের আমলের সেই পৌরাণিক কালের শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম আর এখন আমাদের দেশে প্রচলিত নাই। কাল মাহাত্ম্যে সেই পবিত্রধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া এক্ষণে নানাশাখায়, নানাসম্প্রদায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রাচীনমতে শ্রদ্ধাশীল দুই দশ জন ব্যতীত, এখনকার প্রায় সমগ্র বৈষ্ণব সমাজই শাস্ত্রবিবর্জ্জিত, সদাচার পরাঙ্মুখ ও বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ, ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণের বাক্যে আর তাহাদের শ্রদ্ধা নাই।

বলা বাহুল্য যে, ইহা কলিপ্রাবল্যের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ একাকারেরই পূর্ব্ব লক্ষণ। কলির প্রারম্ভ হইতেই এই দুর্লক্ষণ এই একাকারের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। স্বয়ং ভগবান্, বুদ্ধাবতারে সর্ব্বপ্রথমে বেদবিহিত মজ্ঞ ও যজ্ঞে পশুবধের নিন্দা প্রচার করিয়া লোকদিগের মোহৎপাদনরূপ যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং নূতন আদর্শে গঠিত রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও অপরাপর নানা প্রকার উপধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়া, ক্রমে ক্রমে

তাহারই ফল, ফুল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বস্তুতঃ ভগবান যে, কেবল লোক মোহনার্থই বুদ্ধাবতার হইয়াছিলেন, একথা শাস্ত্রেও বর্ণিত আছে। মহাকবি জয়দেব বলিয়াছেন.—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।

সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতম্।

কেশব! ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।" দশাবতার বর্ণন।

হে কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! তুমি বুদ্ধশরীর ধারণ করিয়া, লোক মোহনার্থে বেদবিহিত যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছ এবং পশুবধে সদয়হৃদয়তা দেখাইয়াছ। অতএব তোমার জয় হউক।

বলিদানের রহস্য বুঝাইতে গিয়া. প্রয়োজন বোধে দুই একটা অপ্রাসঙ্গিক কথারও আলোচনা করিতে হইল। যাউক সেকথা, এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়েরই অনুসরণ করা যাইতেছে।

বলিদান বা যজ্ঞে পশুবধের উপযোগিতা প্রতিপাদনের জন্য আমাদের আরও একটা শাস্ত্রীয় যুক্তিমূলক কথা বলিবার আছে। মানবগণ যে, অহরহঃ সংসার জ্বালায় জ্বালাতন হইতেছে, অবিদ্যামূলক একমাত্র বিষয়াসক্তিই তাহার মূল কারণ। বিষয়াসক্তির ন্যায় ভয়ঙ্কর রিপু আর নাই। এক বিষয়াসক্তি হইতে মানবের কতদূর পর্য্যন্ত অধঃপতন বা সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় অতি সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কার ভাষায়, তাহা বুঝান হইয়াছে। যথাঃ—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে,

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাদ্ স্মৃতিবিভ্রমঃ,

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

মর্ম্মার্থ এই যে, নিরন্তর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমেই তাহাতে আসক্তি জন্মে। এবং সেই আসক্তি হইতেই কামনার উদয় হয়। কামনা কোন কারণে প্রতিহত হইলে, তাহা হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ক্রোধ হইতে মোহ; (অজ্ঞানতা) মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ; স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং তাহার পরেই ঘোর অধঃপতন বা সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে।

বস্তুতঃ জীবের সংসার বন্ধনেরও মূল কারণ ঐ বিষয়াসক্তি। যে পর্য্যন্ত বাসনা আসক্তির তিরোধান না হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি বা সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণের কোনই সম্ভাবনা নাই। সংসারী মানব মাত্রই

প্রকৃতির অধীন স্বভাবের অধীন এবং স্ব স্ব স্বভাব কর্তৃকই সকলে হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিষয়াসক্তি যখন সেই প্রকৃতি সম্ভা... এব... তখন তাহাকে পরিত্যাগ করাও ত সহজসাধ্য নহে! কেননা পূর্বে বলিয়াছি, প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যে কখনই জীবের প্রবৃত্তি বা অনুরাগ পারে না। তবে বিষয়াসক্তি নিবৃত্তির উপায় কি? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে হয়। কিন্তু উপায় অবশ্যই আছে, আমাদের মঙ্গলময় শাস্ত্রই তাহার উপায় উদ্‌ভাবিত করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"বিষয়াকৃষ্ট চিত্তস্য যন্মহৌষধ মুচ্যতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াপ্যবস্তুনাং ভগবত্যৈ সমর্পণম্॥"

অর্থাৎ যে বিষয়ে যাহার আসক্তি থাকে, সেই বিষয় দ্বারা শ্রদ্ধা সহ ভগবানের অর্চ্চনা করিতে করিতে ক্রমেই সেই আসক্তি কমিয়া যায়। সু আসক্তিত্যাগের তাহাই একমাত্র মহৌষধ।

কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেখাইব। মনে কর, নিজে প্রকৃতি অনুসারে ছাগমাংস তোমার অতীব প্রিয় পদার্থ। মাংস দেখিলে তাহার কথা শুনিলেও তোমার রসনাতে জল সঞ্চার হইয়া থাকে। সু তাহাতে যে তোমার গুরুতর আসক্তি জন্মিয়া গিয়াছে, সে কথা বলাই বাহুল এরূপ স্থলে যদি তুমি রসনা তৃপ্তির জন্য যথেচ্ছ ভাবে যখন তখন ছাগ-পশু হ না করিয়া, ভক্তিযোগ সহকারে স্বীয় উপাস্যদেবতার অর্চ্চনোপলক্ষে মাংসাষ্টকাদি শ্রাদ্ধরূপ পিতৃযজ্ঞে শাস্ত্রীয় বিধানমতে পশুহনন ও দেবাদিকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজে প্রসাদ গ্রহণের নিয়মাবলম্বন করিতে তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তোমার মাংসাহার লালসা ত সংযত হইবেই, ত মাংসের প্রতি তোমার যে অনুরাগছিল, সেই অনুরাগ ভগবচ্চরণে সমর্পিত ভক্তিভাব বশতঃ তাঁহার কৃপালাভেও সমর্থ হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম দ্বারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ তোমার দুই চারিবারের মাংসাহারের সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কেননা যজ্ঞে হত পশু-ব্যতীত শাস্ত্রমতে অন্য বৃথা মাংস খাইবার ত কাহারও অধিকার নাই। বলিয়াছেন,— "ভক্ষয়েৎ প্রোক্ষিতং মাংসং সকৃদ্‌ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
দৈবে নিযুক্তঃ শ্রাদ্ধে বা নিয়মে তু বিবর্জ্জয়েৎ॥" ধর্ম্মসংহিতা

ব্রাহ্মণগণের কামনা হেতু ব্রাহ্মণ ভোজনরূপ যজ্ঞে, অথবা দেবার্চ্চ শ্রাদ্ধাদিরূপ পিতৃযজ্ঞে যে মাংস প্রোক্ষিপ্ত হয়, কেবল সেই মাংসই সকলে খা ...রেন অন্য বৃথা মাংস নহে। কিন্তু যিনি নিয়মী অর্থাৎ মাংসাহার একক

...ন্ন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অবিধি নহে। বস্তুতঃ মাংসাহার বর্জ্জন পুণ্যের সীমা নাই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি হয়মেধ ফলং তথা।
গৃহেঽপি নিবসন্ বিপ্রো মুনির্মাংসস্য বর্জ্জনাৎ॥"

বিপ্র মাংসভোজন ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ ও ...যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং তিনি গৃহে বাস করিলেও মুনি। আবার ভগবান ...লিয়াছেন,—"বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।

মাংসানি ন তু খাদেদ্ যঃ তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্॥"

যিনি বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন, আর যিনি মাংসাহার এককালীন ...জন করিয়াছেন, এই উভয়ের পুণ্যফলে কিছুমাত্র তারতম্য নাই।

কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল মাত্র উদরতৃপ্তির উদ্দেশে বা দেবার্চ্চনাদির ভাণমাত্র ...রিয়া অবিধি পূর্ব্বক পশুহনন করে, সেই দুরাচার ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া ...কে। এবং হত পশুগাত্রে যে পরিমাণে রোম থাকে, তত কাল পর্য্যন্ত তাহাকে ...রকে বাস করিতে হয়। যথা,—

"বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্॥" যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অপ্রোক্ষিত বৃথা পশুহননোপলক্ষে মনু আরও বলিয়াছেন,—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥"

অর্থাৎ, বৃথা পশুহননে অনুমতিদাতা, মাংসবিভাগকারী, স্বয়ং পশুহন্তা, মাংসক্রয়বিক্রয়কারী, মাংসপাচক, মাংসপরিবেশক এবং মাংসভক্ষক, এই সাত ব্যক্তিকেই ঘাতক বলা যায়।

পরন্তু যজ্ঞার্থে যে পশুবধ হয়, যাজ্ঞিকের তাহাতে হিংসা পাপ হয় না। যথা—

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কেবল যজ্ঞের নিমিত্তই পশুর সৃষ্টি করিয়াছেন। ...জ্ঞ দ্বারাই জগৎ রক্ষা হয়। অতএব যজ্ঞে যে বধ, তাহা অবধ (অহিংসা) ...ই পরিগণিত।

উপসংহার কালে কর্ত্তব্য এই যে, আমরা এই প্রবন্ধে যে সকল কথার ...লোচনা করিলাম, তদ্দ্বারাই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ঘোর ...ষয়াসক্ত ও অসংযতচিত্ত রাজস তামস প্রকৃতির লোকদিগের মাংসাহার প্রবৃত্তিকে ...রূপ সুকৌশলে প্রবৃত্তিমার্গের মধ্যদিয়া ধীরে ধীরে সংযত করিবার উপায় ...র্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে একদিকে ক্রমে ক্রমে যেমন মানবের হিংসা- ...ত্তি সংযত হইবে, আবার পক্ষান্তরে তাহারা ভক্তিভাব বশতঃ ভগবানের কৃপা- ...ভেও সমর্থ হইতে পারিবে। বস্তুতঃ বিষয় ত্যাগের ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট ...পায় আর হইতেই পারে না।

পঞ্চদশ বর্ষ সমাপ্ত।